১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩২১।



সম্পাদক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস্ সি।



কিশোরী

আমার দেশ।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা] [illegible] ১৩২৭

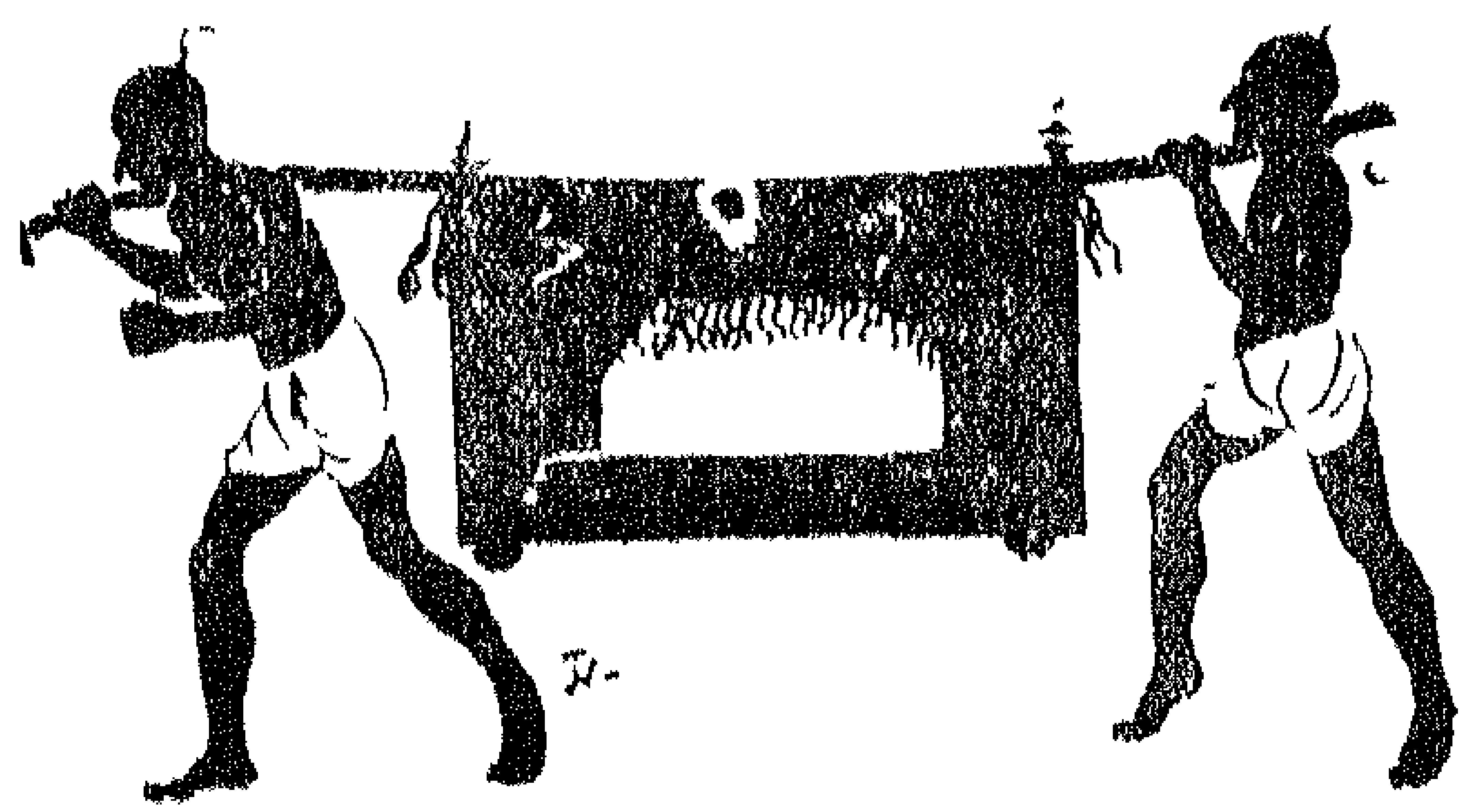
ছড়া



আয় রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধরিতে যাই,



মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে দোলায় উঠে যাই।





দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি,
গুণতে গুণতে যাই।
বড় শাঁখাটি, ছোট শাঁখাটি
ঝামুর ঝুমুর করে;

তিন কড়ার পায়েস কিনে দুগ্গা কেন এলে।
আজ দুগ্গার অধিবাস কাল দুগ্গার বে;



তিন মিন্‌ষে নেড়া ফকীর

কোমর বেঁধেছে

কোমরে কদম্বের ফুল

ফুটে উঠেছে।

একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টে ;

টিয়ের বাপের বে,

লাল গামছা দে।

লাল গামছা খসর্ মসর্, ধোপার বাড়ী দে।

ও ধুপনী, ও ধুপনী, কাপড় কেচে দে।
ভেঁর বিয়েতে নাচতে যাব ঢুল্‌কী কিনে দে



আমার দেশ

অনেকদিন আগে বাংলাদেশের একজন মহাপুরুষ একটি মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। মন্ত্রটি "বন্দে মাতরম্" অর্থাৎ দেশমাতাকে পূজা কর। তাহার এই মন্ত্র শুধু বাঙালীর মনে নয় সমস্ত ভারতবাসীর শিক্ষিত লোকের মনে দেশপ্রেম জাগাইয়া দিল। আজ যে ভারতবর্ষের নানাদেশ হইতে হাজার হাজার শিক্ষিত লোক একমনে দেশের কাজে মন দিতেছে, ইহার মন্ত্রটি "বন্দে মাতরম্"।

কিন্তু দেশমাতাকে পূজা কর মুখে এই বলিলেই দেশের পূজা হয় না, পূজার আয়োজন করিতে হয়, মনকে প্রস্তুত করিতে হয়, দেশের জলবায়ু, ইতিহাস, লোকজন, সম্পত্তি, ধর্ম, সকল বিষয় জানিতে হয়। তাহা হইলে দেশের সহিত তোমাদের সত্য পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় যতই লাভ করিবে, ততই মনে মনে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়িবে। তারপর তোমরা যখন দেশের কাজে হাত দিবে, তখনই যথার্থ দেশকে পূজা করা হইবে।

আমাদের এই জন্মভূমির বৃত্তান্ত কিছু কিছু তোমাদের বলিব। তোমরা মন দিয়া ইহা পড়িবে ও যদি কোনো প্রশ্ন মনে আসে "আমার দেশের" সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখিবে।

এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। ইংরেজিতে বলে "ইন্ডিয়া"। "ইন্ডিয়া" কথাটির মূল সিন্ধু — সংস্কৃত ভাষা এবং ইহার মধ্যে ইতিহাসের যে খানিকটুকু আছে তাহা তোমাদের বলি।

তোমরা এশিয়ার মানচিত্র খানি খুলিয়া মধ্য এশিয়ার দিকে তাকাও। মধ্য এশিয়ায় না আছে ভাল নদী, না আছে ভাল মাটি। মানুষ খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিতে পারে দেশের এমন অবস্থা নয়—তাই সে দেশ হইতে দল বাঁধিয়া কোনো ভাল দেশের খোঁজে এক এক দল বাহির হইয়া পড়িল।

একেকদল ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে আসিয়া পৌঁছিল। মধ্য এশিয়ার তুলনায় এই দেশ তাহাদের কাছে স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। দুইকূল ছাপাইয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে, দেশে গাছপালার অভাব নাই, জমিতে শস্যও ভাল জন্মে। এই জন্য তাহারা এই নদীর কিনারায় বসতি করিল। নদীর নাম রাখিল "সিন্ধু"; তোমরা মানচিত্রে যে নদীর নাম দেখিতেছ ইন্ডাস্ (Indus), উহাই এই সিন্ধুনদী। আর দেশের যে অংশের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদী ও তাহার শাখাপ্রশাখা বহিয়া গিয়াছে তাহার নামকরণ করা হইল "সিন্ধুদেশ"।

আমাদের দেশ

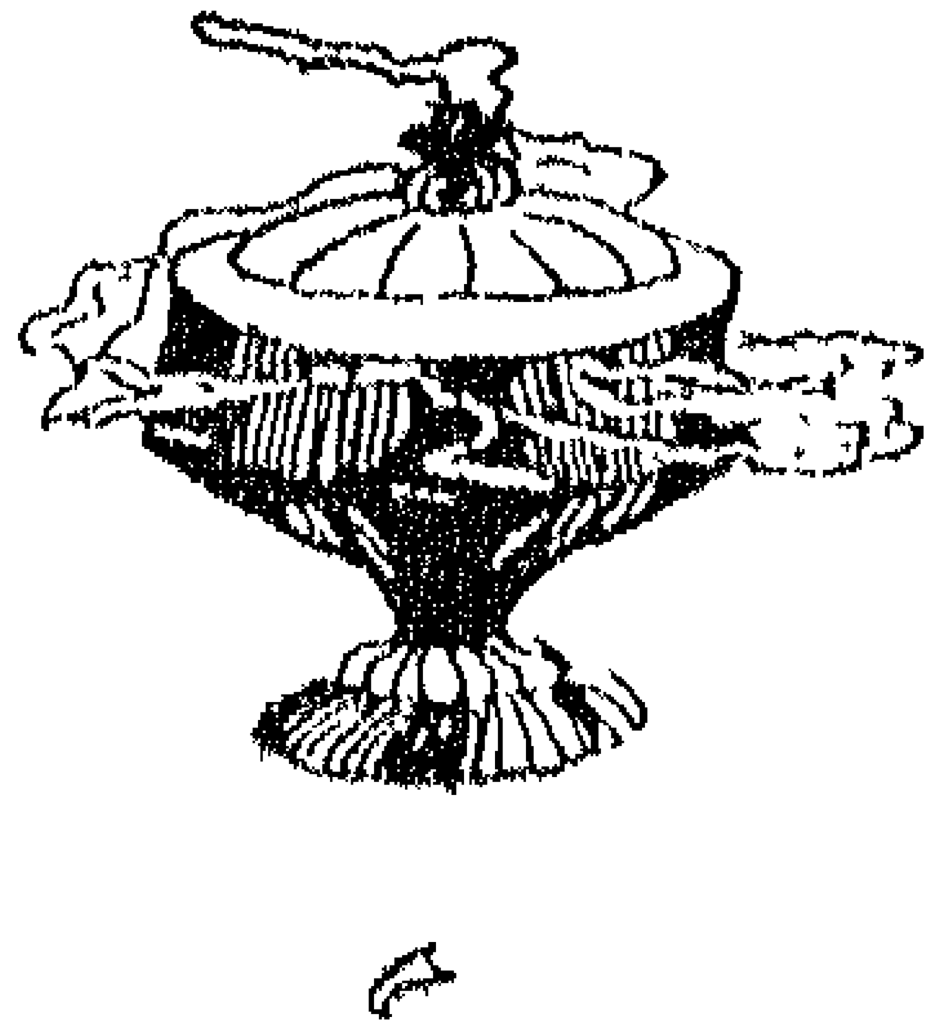
মধ্য এসিয়া হইতে যাহারা এইদেশে আসিয়া বাস করিল তাহারা আর্য্য নামে পরিচিত। কবে ইহারা আসিয়াছিল কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন যে চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহারা অনেকদল সিন্ধুনদীর তীরে আসিয়া বাস করে।

যাহা হউক, সিন্ধুদেশে আসিয়া ইহারা খুব খুসি হইয়াছিল। প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য্য ত মধ্য এসিয়ায় দেখা যায় না। আর্য্যদের যাগ যজ্ঞ পূজা প্রভৃতি উপলক্ষে যে সকল গান গাওয়া হইত তাহা "ঋগ্বেদ" নামক সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া যায়। তোমরা বড় হইয়া এই সকল সংস্কৃত গাথা পড়িলে বুঝিতে পারিবে ইহাদের চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কেমন লাগিয়াছিল। কেবল সিন্ধুনদী নয়, ভারতবর্ষের উত্তর সীমার পর্ব্বত শ্রেণী দেখিয়া ইহাদের মনে কত কল্পনাই না সৃষ্টি হইয়াছিল। এমন দৃশ্য ত ইহারা কখন দেখে নাই। পর্ব্বতের চূড়ায় বরফ জমিয়া থাকে, সে বরফের আর অন্ত নাই। তাই ইহার নামকরণ হইল "হিমালয়"।

আর্য্যরা দেখিল যে নদীর কূলে তাহারা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, যাহার জলে ভাসিয়া ক্ষেতে শস্য জন্মে, সবুজ ঘাসে মাঠ ছাইয়া যায়, গাছপালায় ফলফুল ধরে, সেই নদীর জল আসে এই হিমালয়ের গা হইতে। কিছু কিছু বরফ গলিতে থাকিলে নদী জলে ভরিয়া উঠে। নদীতে জল না থাকিলে গাছপালা জনপ্রাণী কিছুই বাঁচিতে পারে না। এই জন্য আর্য্যরা কল্পনা করিল যে হিমালয়েই দেবতারা বাস করেন ও সেখান হইতে কৃপা করিয়া তাঁহারা মানুষকে রক্ষা করেন।

হিমালয়কে লক্ষ্য করিয়া আর্য্যরা কত যে কল্পনা করিল তাহা পড়িলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। হিমালয় সম্বন্ধে তোমাদের আগামী বারে বলিব। ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
"পার্ব্বণী" ১ম বর্ষ।



ভিক্ষুক

টুর্গেনিভ

আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার পথে দাঁড়াইল।

রক্তবর্ণ সজল চক্ষু, ফ্যাকাশে ঠোঁট, ছেঁড়া ন্যাকড়া, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত—দারিদ্র্য বেচারার শরীর ও মন কিরূপ তিলে তিলেই না দগ্ধ করিয়াছে।

সে তাহার রক্তাক্ত হাতখানি আমার নিকটে ধরিল—কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইল—ভিক্ষা।

আমি পকেট হাতড়াইতে লাগিলাম—পকেটে কিছুই ছিল না, টাকা, পয়সা, রুমালখানি পর্য্যন্ত ছিল না। ভিক্ষুক তখনও সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পাতা হাতখানি তখনও কাঁপিতেছিল।



আমি ভারী অপ্রস্তুত, ভারী লজ্জিত হইলাম। মনের আবেগে সেই হাত চাপিয়া ধরিয়া মনের আবেগ জানাইলাম, বলিলাম,

"রাগ করিও না, ভাই। সত্য ভাই, আমার কাছে কিছুই নাই।"

ভিক্ষুক একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার ফ্যাকাশে ঠোঁটে হাসি দেখা দিল। সেও আমার ঠাণ্ডা আঙ্গুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

"তাতে কি হইয়াছে, ভাই, এর জন্যও ধন্যবাদ। যা দিলে ভাই এও ত কম বড় দান নয়—"

আমি ত জানিতাম—আমার ভাইর দানও কম নয়—আমি তাহার নিকট হইতে ঢের বড় শিক্ষা পাইলাম।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন।

কীর্ত্তি গাথা

সে অনেকদিনের কথা কয়েকজন সৈনিক একটি দুর্গের দেওয়াল মেরামত করিতেছিল। একজন সেনাপতি খুব জাঁকাল রকমের পোষাক পরিয়া তাহাদিগকে খাটাইতেছিল।

একখণ্ড বড় কাঠের কড়ি উপরে টানিয়া তুলিতে হইবে যে কয়জন ছিল তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের শক্তিতে কুলাইল না অার একজন সহায় করিলেই সহজেই কাজটা হইয়া যাইতে পারে

তথাপি সেনানায়ক একটিবারও হাত বাড়াইল না, একটিও সহানুভূতির কথা বলিল না। তাহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া হুকুম করিতে লাগিল

"জল্‌দি, জল্‌দি। আরো টান, হো হো" এমনি আরও কত কি!

এই সময়ে একজন সাদাসিদে পোষাক পরা ভদ্র ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দূর হইতে সবই দেখিতে পাইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে সেনাপতির নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন না কেন?

সেনাপতি রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল,

"জানেন আমি কে?—আমি সেনাপতি"

"সত্যি নাকি? তা হবে। মাপ করুন আমায়।"

এই বলিয়া আগন্তুক তখনি যাইয়া কাজে লাগিয়া গেলেন মিলিত চেষ্টায় কাঠ সহজেই যায়গায় পঁহুছিল

সেনাপতি একটি ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিল না। যাইবার সময় আগন্তুক ধীরভাবে আসিয়া সেনাপতির নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন।

"মহাশয়, আবার যদি কোন কার্য্য সম্পন্ন করা দরকার হয়, ও আপনার যদি লোক না থাকে, ত আমাকে বলিবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করিব।

সেনাপতি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,

"কে মশায় আপনি—খুব লম্বা লম্বা কথা ত বলিতেছেন।"

"আমার নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন—আমিই প্রধান সেনাপতি। নমস্কার মশায়।"

এই বলিয়া আগন্তুক চলিয়া গেল, একটিবারও ফিরিয়া তাকাইল না। আর আমাদের জাঁকাল সেনাপতি হতভম্বের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেকালের রোমান জাতি।

তোমরা বোধ হয় রোমের নাম শুনিয়াছ। সেখানে যাহারা থাকিত তাহাদিগকেই রোমান বলা হইত। রোমানেরা প্রথম দলে খুব বেশী লোক ছিল না, একটি গ্রামের মত স্থানে তাহারা বাস করিত। কিন্তু সেই যে কয়জন লোক তাহারা সকলেই কাজের ছিল। তাই তাহারা ক্রমে নিজেদের উন্নতি করিতে লাগিল। শেষে এমন হইয়াছিল যে পৃথিবীর সর্বত্রই রোমানেরা রাজত্ব করিত।

তোমরা বলিতে পার, কি গুণ থাকাতে রোমানেরা এত উন্নতি করিতে পারিল? প্রথম তাহারা খুব কাজের লোক ছিল। বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহারা জানিত না। তাহাদের রাজ্যের চারিপাশে অন্য যে সব রাজ্য ছিল সে সবের অধিবাসী সকলেই রোমের সঙ্গে শত্রুতা করিত। সময় পাইলেই আসিয়া রোম আক্রমণ করে। তাই রোমানদের সব সময়েই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। বিলাসিতা কিম্বা অলসতায় দিন কাটাইবার উপায় ছিল না। আর তাহারা নিজেদের দেশকে বড় ভালবাসিত। দেশের উন্নতির জন্য তাহারা সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিত।

রোমের যখন ক্ষমতা খুব বেশী তখন প্রজারাই রাজ্য শাসন করিত। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজন শাসন কর্তা বাছিয়া, তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজ্যভার দিত। নিজের যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে এই শাসনভার যে কেহ পাইতে পারিত—সে চাষী কিম্বা যে কেহ হউক না কেন।

কিউরিয়াস্ ডেনটেটাস্ (Curius Dentatus) নামে একজন চাষী রোমের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। দেশকে তিনি অনেকবার শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। রোমানেরা তাহার উপর এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, যে তিন তিন বার তাহারা তাহাকে রাজ্যের শাসন ভার দিয়াছিল। শুধু তাই নয়, তাহার সম্মানের জন্য দুইবার খুব ধুম করিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল।

কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ থামিয়া গেলে ডেনটেটাস্ চাষ করিবার জন্য আবার নিজের জমিতে ফিরিয়া গেলেন। আগেও যেমন চাষার কাজ করিতেন, শাসন কর্তার পদ ছাড়িয়া দিয়া তখনও তেমনি আর দশজন চাষীর সঙ্গে কাজ করিতে লাগিলেন। আত্মসম্মান জ্ঞান তাঁহার খুবই ছিল, তাই তিনি পাড়াগাঁয়ে সরল ভাবে জীবন কাটাইতেন, বিলাসিতা দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

রোমের যাহারা শত্রু ছিল তাহারা ডেনটেটাসের কাছে অনেক টাকা পয়সা ঘুষ পাঠাইয়া দিল, যাহাতে তিনি তাহাদের পক্ষে যোগ দেন। দূতেরা যখন তাঁহার কাছে পৌঁছিল তখন

তিনি অন্যান্য চাষীদের মতই খোলা মাঠে বসিয়া নিজের রান্না রাঁধিতেছিলেন। দূতেদের কথা শুনিয়া তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন জান? তিনি বলিয়াছিলেন,

'ধনীদের উপর প্রভুত্ব তিনি করিয়া থাকেন বটে কিন্তু নিজেরা বরাবর সরল ভাবেই জীবন কাটাইবেন। আর যুদ্ধে হারানও তাকে খুব শক্ত, কিন্তু স্বার্থে বশ করা একেবারেই অসম্ভব"

দূতেরা আর কি বলে, লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

সিনসিনেটাস নামে আর একজন চাষা ছিল রোমের যখন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়, তখন রোমানেরা তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন প্রধান শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করে—যার আজ্ঞা তাহারা বিনা বিচারে মানিত। এইরূপ এক বিপদে পড়িয়াই তাহারা সিনসিনেটাসকে প্রধান শাসন কর্ত্তার পদ দিবে স্থির করিল যখন রোমানরা তাঁহার নিকট গেল তখন সিনসিনেটাস লাঙ্গল দিয়া জমি চষিতে ছিলেন, হাতে পায়ে কাদা মাখা। প্রধান শাসন কর্ত্তার এক রকম জমকাল পোষাক ছিল, যাহা দেখিয়া সকলকে নির্বিচারে তাহার হুকুম মানিতে হইত। রোমানরা তাঁহার সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে ঐ পোষাক পরাইয়া দিল। সিনসিনেটাস আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করিয়া মাঠ হইতে বরাবর রাজধানীতে আসিল—



যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর আবার সিনেসিনেটাস চাষবাস আরম্ভ করিলেন

এই রকম সরল কর্ম্মঠ লোকই রোমের এতবড় রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহারা ধন দৌলত, বিলাসিতার চাইতেও, নিজেদের সম্মান, দেশের মর্য্যাদা আগে রাখা দরকার মনে করিত। এত সরল ভাবে থাকিয়া তাহারা কতবড় রাজ্যটাই না শাসন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু রোমানরা যখন বিলাসিতা হইতে স্বার্থের গন্ধ পাইল, রোমের অবনতি তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।

টেলিফোনের গল্প

বিজ্ঞান

"মিষ্টার ওয়াটসন (Watson) এদিকে এস, কাজ আছে"

একদিন পূর্বের ১০০ বছর ১৮৭৬ সালে এলেকজান্দার গ্রাহাম বেল টেলিফোনে ঠিক এই কয়টি কথাই প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই টেলিফোনের আবিষ্কার কার্যে মহিম এলেকজান্দার গ্রাহামের তখন একমাত্র সহযোগী ছিল তাহার বন্ধু ওয়াটসন।

বেল কত কাল ধরিয়া কালা ও বোবাদিগের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই হতভাগ্যদের দুঃখ দূর করিতে তাহার পূর্বে তাহার পিতার মহান হইল।

এই সূত্রে এলেকজান্দার গ্রাহামকে অনেক রকম গবেষণা করিতে হয় কি করিয়া এই সকল কালা বোবাদিগের দুঃখ কষ্ট কিছু মাত্র কমান যায়। এই গবেষণার ফলেই তাহার মনে হয় এমন একটি যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব যাহা দ্বারা ইলেকট্রিক তারের উপর দিয়া মানুষের স্বর চালান (carried over) হইতে পারে। দৈবক্রমে একদিন ইলেকট্রিক তারের মধ্য দিয়া একটি স্বর তাহার কানে আসে। তখন আর তাহার যে ধারণা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। সকল কার্য ছাড়িয়া, মাসের পর মাস তিনি এই সম্বন্ধে গবেষণা করিতে লাগিলেন। একদিন চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তিনি যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা ঠিক হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ওয়াটসনকে ইলেকট্রিক তারের উপর দিয়া ডাকিলেন,

"মিষ্টার ওয়াটসন, এদিকে এস, কাজ আছে

ইহার দুই মাস পরে ফিলাডেলফিয়াতে একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হয়। দরিদ্র গ্রাহাম বেল সেখানে যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল; কিন্তু কি করিবে? সে যে দরিদ্র।

এই সময়ে মিস্ হিউবার্ড নাম্নী একটি বালিকার সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা হয়। এই বালিকার পিতা প্রদর্শনীর একজন পরিচালক ছিলেন। একদিন বালিকা হিউবার্ড আসিয়া গ্রাহাম বেলকে ফিলাডেলফিয়ার প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, বলিলেন,

"আমি নিজেই যাইতেছি, আমার সঙ্গে চল।"

বালক উত্তর করিল,

"কি করিয়া যাই? আমার যে পয়সা নাই, কাপড় নাই।"

বেচারী হিউবার্ড তখন কাঁদিয়া ফেলিল

বেল হিউবার্ডের চোখের জল সহ্য করিতে পারিল না তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "কেঁদো না, আমি যাব" এবং তৎক্ষণাৎ কোনরূপ কিছু চিন্তা না করিয়া জিনিষপত্র কিছু না লইয়াই সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

ছয় সপ্তাহ হইল প্রদর্শনী চলিতেছে, কিন্তু একটি প্রাণীও কি ছোট টেবিলের উপর রক্ষিত টেলিফোনটি একবার চোখের দেখা দিয়াও দেখিল না কে দেখিবে বল? ছোট জিনিষত আর কাহারও নজরে আসে না অবশেষে হতাশ হইয়া কুমারী হিউবার্ড তাহার পিতাকে অনুরোধ করিল যেন কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেটা মাত্র একবার পরীক্ষা করেন

পিতা রাজী হইলেন। সাতটার আগে কেহই আসিলেন না যখন আসিলেন, তখন তাঁহারা একেবারেই পরিশ্রান্ত—আহারের জন্য ব্যস্ত। বেল সেই পরিশ্রান্ত লোকদের নিকট তাহার যন্ত্রটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু কে কাহার কথা শুনিবে? কেহই তাহার যন্ত্রটি পরীক্ষা করিবার জন্য এতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

দরিদ্র বেল একেবারেই দমিয়া গেল। এই সময়ে একজন সুন্দর পুরুষ তাহার নিকট আসিয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,

"কি রকম আছ, মিষ্টার বেল? আমাকে চিনতে পার না? তুমি কালা বোবাদের জন্য যে পাঠশালা খুলিয়াছিলে তাহা দেখিতে আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলাম। আমি আমার রাজধানীতেও ঐরূপ একটি পাঠাগার খুলিয়াছি"

বেল জড়সড় হইয়া বলিল,

"মনে আছে, আপনি, আপনি ব্রেজিলের সম্রাট" দমপেড্রো একটুমাত্র হাসিলেন, বলিলেন,

"এ কি আপনারই আবিষ্কার?"

বেল তখন যন্ত্রটির সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন, সম্রাটও খুব মনোযোগ দিয়া শুনিলেন।

সম্রাট টেলিফোনটি কাণের কাছে ধরিতেই, বেলের এক বন্ধু হইয়া টেলিফোনের অপর দিক হইতে কথা বলিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট চমকিয়া উঠিলেন,

"একি! এ যে কথা বলে"

ইতিমধ্যে চারিদিকে ভয়ানক ভীড় জমিয়া গিয়াছিল সে ভীড়ের মধ্যে ছিলেন, দেশের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।

ইলেক্‌ট্রিক সম্বন্ধে সে সময়ে যাঁহার অভিজ্ঞতা সকলের চেয়ে বেশী ছিল, সেই লর্ড কেলভিন্ আসিয়া তাহার টেলিফোন যন্ত্রটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,

"সত্যই ত এ কথা বলে। এর অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক আমি আমেরিকায় কিছুই দেখি নাই।"

তাহার পর, প্রতিপত্তি, অর্থ, সবই জলের স্রোতের মত আসিয়া বেলকে ডুবাইয়া দিল, বেল কিন্তু একদিনের জন্যও ভোলে নাই তাহার সফলতার জন্য সে তাহার ভাবী স্ত্রীর নিকট কতটা ঋণী।

ছেলেদের বাইবেল।

৭৮।

তোমাদের জন্য "ছেলেদের রামায়ণ", "ছেলেদের মহাভারত" প্রভৃতি পুস্তক ছাপা হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে তোমরা কত সুন্দর সুন্দর গল্প পড়িয়াছ। আমাদের দেশের কত বীর পুরুষের, কত দেবতুল্য মহাপুরুষের, কত ধর্ম্মপরায়ণা সুশীলা সচ্চরিত্রা রমণীর জীবনচরিত তাহার মধ্যে লেখা আছে—তাহা পড়িয়া তোমরা কত শিক্ষালাভ করিয়াছ। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদের মত বড় হইবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে কতবার জাগিয়াছে এবং এখন হইতেই তোমরা তাঁহাদিগের মত ধার্ম্মিক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, সাহসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং পরোপকারী হইবার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করিতেছ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের এই শুভ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করুক।

আজ আমি এক মহাপুরুষের জীবনচরিত তোমাদিগকে শুনাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি যদিও আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে তিনি পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির নিকট সম্মান ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহাপুরুষেরা যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহাদের উপদেশ ও বাণী তাঁহাদের স্বদেশের ক্ষুদ্র সীমানা মধ্যে, তাঁহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে মহাপুরুষগণ সমস্ত মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত মনুষ্য-সমাজ তাঁহাদের পবিত্র অধিকারী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলভোগী হইয়া থাকে।

প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্যালেষ্টাইন্ নামক একটী দেশে এইরূপ একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম যীশুখ্রীষ্ট। বুদ্ধদেব যেমন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, মহম্মদ যেমন আরব দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নানক যেমন পঞ্জাবে শিখধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্যদেব যেমন বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ যীশুখ্রীষ্টও একটী নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই ধর্ম্মের নাম খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ খ্রীষ্টান নামে পরিচিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি, রুসিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই এই ধর্ম্মাবলম্বী। এই মহাপুরুষ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বারজন মাত্র শ্রমজীবি দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মমত স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই

ধর্ম্মের মধ্যে এমনি একটী জীবনীশক্তি, এমনি একটী অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাব নিহিত আছে, যে আজ সভ্যজগতের অর্দ্ধেক মানবের মনের উপর ইহা সুদৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিয়া মানুষকে সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে লইয়া যাইবার প্রধান সহায় হইয়াছে। যাঁহারা অপর ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারাও এই ধর্ম্মের মহত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

আজ আমি সংক্ষেপে এই জগৎপূজ্য মহাপুরুষের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিব বেদ যেমন আমাদিগের এবং কোরাণ যেমন মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম-পুস্তক এই পুস্তক "নব বিধান" এবং "প্রাচীন বিধান" নামক দুই প্রধান অংশে বিভক্ত। "নব বিধানে" যীশুখৃষ্টের জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। "প্রাচীন বিধানে" ইহুদীজাতির প্রাচীন ধর্ম্ম এবং তৎসম্পর্কীয় বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা এবং অনেকানেক ভগবদ্ভক্তের জীবনী আলোচিত হইয়াছে আমরা এই প্রবন্ধে "নব বিধান" হইতে খৃষ্ট জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সংকলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। থিওডোরা উইংসেন-উইল্‌সন্ নাম্নী একজন খৃষ্টভক্তিমতী বিদুষী মহিলা প্রণীত "নব বিধানের গল্প" নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকে খৃষ্টচরিত যেরূপ সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমি এখানেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি (ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু

* * * * * * *

লীলা—বেলা তুমিত হারমোনিয়াম বাজাতে জান না, তবে কেন হারমোনিয়ামের কাছে বসে আছ?

বেলা হ্যাঁ, আমি বাজাতে পারি না, বটে কিন্তু তোমরাও ত কেউ পারবে না, সুতরাং আমি এখানে বসে আছি

* * * * * * *

খাটের তলে খইর মোয়া ছিল। বেলা ছোট্ট মেয়ে সে তাই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। কাকী দেখিয়া বলিল

"মা বুঝি উপকার কচ্ছ?"

বেলা মিথ্যা কথা বলে না কি না, তাই বলিল,

হ্যাঁ, কাকী, নিজের উপকার কচ্ছি"



পিঠে পার্ব্বণ।

ইয়া মোটা ইয়া ভারী,
এত বড় ভুঁড়ী;
তেজ পুরের রাজা বাবু,
চড়ে বেড়ান জুড়ী।
ভাল খান ভাল পরেন,
আছেন তিনি খাসা;
দুনিয়াটা ভাবেন তিনি,
কুলি মজুর ঠাসা।
বাজার থেকে বাছা জিনিস,
নিজেই এনে খান;
আত্মীয়রা পায়না খেতে,
এমনি কৃপাবান।
মুষ্টি ভিক্ষা পায়না কেহ,
এসে তাঁহার দোরে;
আগুলে ধরেন টাকা শুধু,
পাছে নে যায় চোরে।
পৌষের শীতে ঘর থাকিয়ে,
ভাজল মরার খুদ;
চার দিকেতে পিঠে খাবার,
পড়ে গেল ধুম।

রাজা বাবু আসর করে,
বসে সকাল বেলা;
মো সাহেব ঘিরে ছিল,
চার দিকেতে মেলা।
রাজা বাবু বলেন হঠাৎ,
"খাওয়া উচিত কি?"
মো সাহেব সব উঠলো বলে,
"বাটি বাটি ঘি।"
রাজা বাবু বলেন "না না
খাওয়া উচিত পিঠে;
পৌষ পার্ব্বে পিঠেটাই
লাগে বেজায় মিঠে"



অমনি হলো হুকুম জারি,
এলো ক্ষীরের হাঁড়ি ,
চিনি ছানা এলো কত,
অমনি গাড়ি গাড়ি ।
রান্না ঘরে পড়ে গেল,
পিঠে গড়ার ধুম ;
হরেক রকম পিঠে গড়ে,
নাইকো কারুর ঘুম ।
এমন সময় কোথা থেকে
এলো এক বুড়ো ;
বল্লে, "আমায় দিতে হবে,
একটু পিঠের গুঁড়ো ।

চার পাঁচটি ছেলে আমার,
কাঁদছে পিঠের তরে ;
গরীব বুড়ো বামুন আমি,
চাল নাইকো ঘরে ।

ভিক্ষা করে খাওয়াই তাদের
তুমি কৃপাবান ;
হুকুম কর দিতে আমায়,
পিঠে কয়েকখান ।"
গরীবের ছেলে আবার,
পিঠে খেতে চায় ;
রাজা বাবু চটে গেলেন,
বেজায় রকম তায় ।
বল্লেন রেগে "কে আছিসরে,
দেউড়ীতে দরবান ।
বামুনটাকে দূর করে দে,
মলে দিয়ে কাণ ।



আনন্দমেলা



গরীবগুলো হলো কি গো ?
পিটে যাবে বলে !
আস্পর্ধার কথা শুনে,
সর্ব শরীর জ্বলে ।"
দেউড়িতে বসে ছিল,
সে যে পালওয়ান ;
একেবারে বামুনের,
ধরে এসে কান ।
ভজন সিং সে বামুনের
কানটা কোষে ধরে
রাজার হুকুম করে তামিল
ঠে কাঠুকি করে
পিঠে চেয়ে বাড়ার কাছে
এমনি অপমান
দুঃখে ক্ষোভে বামুনের,
ভেঙ্গে গেল প্রাণ ।
যাবার ও বামুন তখন,
বলে কঠিন স্বরে ,
"আমি যদি বামুন হই,
পাবে এর ফল পরে ।
বামুন বলে মান নাকো,
এমনি অহঙ্কার ;
পিঠে খাবার সখটী তোমার,
মিটবে নাকো আর ।
পিঠে তোমার পড়বে পিঠে,
জেনো সুনিশ্চয় ;
বামুন আমি আমার কথা,
মিথ্যা হবার নয় ।"
এই না বলে বামুন গেল,
নিজের বাড়ী চ'লে ;
হা হা করে মোসাহেবরা,
হেসে পড়ে ঢ'লে ।

ধরার কোলে সন্ধ্যা এলো ;
কালো বসন প'রে ;
রাজার সভায় পিঠে এলো,
বাটী থালা ভ'রে
র'জা ব'বু যেমনি পিঠে,
মুখে দিতে যান ;
পিটের ওপর অমনি পড়ে
আস্ত পিঠে খান ।



রাজাবাবু হতভম্ব,
ব্যাপার চমৎকার ;
পিঠেগুলো পিটের উপর,
পড়ছে কিবা তাঁর ।
মহা বিপদ রাজা বাবুর,
বেরিয়ে গেল ঘাম ,
পিটের উপর পিঠে তবু
পড়ছে অবিরাম ।

৩

আমার দেশ

রঙে ভরে গেল বাজার,
　　　　　　বিরাট দেহ খানি
ঘাম ঝরিয়ে পড়্‌ছে ঝরে
　　　　　　দু'নয়নে পানি
পিঠের ভারে উবুড় হয়ে,
　　　　　　কাঁদেন তিনি ত্রাসে ;
ব্যাপার দেখে যে জানেনা,
　　　　　　হা হা করে হাসে।
সবাকারে না দিয়ে যে,
　　　　　　সকল খেতে চায়,
ভগবানের কাছে সে জন,
　　　　　　এমনি সাজা পায়
একলা খেতে যে চেষ্টা করে,
　　　　　　এমনি মারা যাল ;
এই কথাটি মনে যেন,
　　　　　　থাকে চিরকাল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।



অতিশয় কিছু করিতে নাই।

এক শাক্ত বামুন অনেক বছর ধ'রে পাঁঠা, পায়রা প্রভৃতি জীব ভক্ষণ পূর্ব্বক শেষে মনে করলেন, 'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম'। যিনি "মায়ের প্রসাদ" পেলে ভাত না খেয়ে মাংসের দ্বারাই উদর পূর্ত্তি করতেন, তিনি এখন সেই অতি সাধের মাংস ত্যাগ করলেন এমন কি যাঁর মাছ না হোলে একসন্ধ্যা ও চল্‌ত না তিনি রুই, কাৎলার দিকে ফিরেও তাকান না। হাঁসের ডিম



দেখলেন একটা পুঁটিমাছ আটকে গেছে।

ছেড়ে দিলেন দেখে তাঁর স্ত্রী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, এবং তাঁর কন্যা শ্বশুর বাড়ী হোতে এই সংবাদ পেয়ে কিছুতেই বিশ্বাস করলে না, এমন কি একটা বড় রকমের বাজি রাখতেও প্রস্তুত হো'ল।

কিন্তু হোলে কি হয়? "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"। যিনি এক সময় রুই কাৎলা বটিতে কাটতে দেখলে আনন্দিত হোতেন, এবং বড়শীর ফাৎনাটা নড়তে দেখলে লাফিয়ে উঠতেন, এখন তিনি একটা পুঁটি মাছের পাছে অনিষ্ট হয় তাই ভেবে আকুল। কোন কোন দুষ্ট লোক বলতে ছাড়ে না যে প্রতিবাসীরা যখন রুইমাছের মুড়িঘণ্ট বেশ রসিয়ে রসিয়ে

যায়, তখন মাঝে মাঝে বামুন তাদের পায়ের দিকে চেয়ে একবার জোড়হাত কটাক্ষপাত করেন কিন্তু হবে কি হবে? 'অহিংসা পরম ধর্ম'

এ ব'লে ভাবুকে যেরূপ সুতো পোকা কানখোলা হয়ে যায় বামুনের প্রকৃতি কালে সেইরূপ হয়ে গেল। তিনি কেবল নিরামিষ খান। কোনোদিন মাছ মাংস ছেড়ে দিলে শেষে সাপের মুখে গা বমি বমি করে বামুনের ও তাই হোল।

বামুন সর্বদাই বলেন 'অহিংসা পরম ধর্ম।' কালে তার উনুন পর্যন্ত ভিন্ন হয়ে গেল। বাড়ীতে কে কখন মাছ ছুঁয়ে এসে তাঁর রান্না ঘরে ঢুকে বসবে, এই আশঙ্কায় তিনি বাড়ীর বাইরে ছোট একটা তাল পাতার ছাউনির ঘরে উনুন তৈরী ক'রে নিজে রান্না করেন এবং খান।



তারপর শোনা গেল যে জেলেরা মাছ ধরে তখন পাকাবে জলের ওপর তার একটা পোকা জোটে গেল। তিনি প্রায় এক মাইল দূরে এক নদী হ'তে জল এনে রান্না ক'রে খান, এবং যথাসাধ্য নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে তৃপ্তি বোধ করেন।



একদিন তিনি নদীর জলে নেমে স্নান করে সন্ধ্যা আহ্নিক করছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, তাঁর কোঁচার কাপড়ের ভাঁজে একটা পুঁটি মাছ আটকে গেছে। তখন আগুনের ফিনকি গায়ে পড়লে মানুষ যেরূপ ক'রে ওঠে, তিনি সেইরূপ চমকে উঠে পাড়ে এলেন। তদবধি নদীর জলে নাওয়া ত্যাগ করলেন, এবং রান্না বান্নায় সে জল আর ব্যবহার করা ছেড়ে দিলেন।

তখন বর্ষা কাল, সুতরাং প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টি হচ্ছে। আগুলো বামুন আকাশের দিকে হাঁ করে থাকেন, বৃষ্টির জলে তৃষ্ণা মিটান, এবং ঘটি ভরে সেই জল রেখে দেন। বর্ষা চলে গেলে শরৎ কালে তিনি নিজের শুদ্ধতা কি ভাবে রক্ষা করবেন নিরন্তর তাই চিন্তা করেন।

ইহার মধ্যে দুটি দিন বৃষ্টি হ'ল না, এবং তাঁর ঘটির জল ফুরিয়ে গেল তখন দারুণ



তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে হা ক'রে চলতে লাগলেন ইতিমধ্যে একটা কাক কিসের এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল চিলে তাড়া করাতে সে সেই মাংসখণ্ড আমাদের বামুন মহাশয়ের মুখে ফেলে চলে গেল। একেত তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তার উপর মাংসের টুকরো মুখ বিকৃত করে ফেলে দিয়ে মুখ ধোবার জল কোথায় পাবেন, ঠিক করতে পারলেন না পচা মাংসের রক্ত ও দুর্গন্ধ তাঁর মুখে লেগে গিয়েছিল। এই দারুণ অবস্থায় তিনি হা ক'রেই রয়ে গেলেন

তখন এক সন্ন্যাসী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বামুনকে গালি দিয়ে নিজের কমণ্ডলু হোতে তাঁকে জল দিলেন। বামুন সেই জলে ভাল ক'রে মুখ ধুয়ে নিলেন। তখন সন্ন্যাসী বল্লেন,

"অতিশয় কিছু কোরো না আজ থেকে এই কথাটী শিখে নেও"

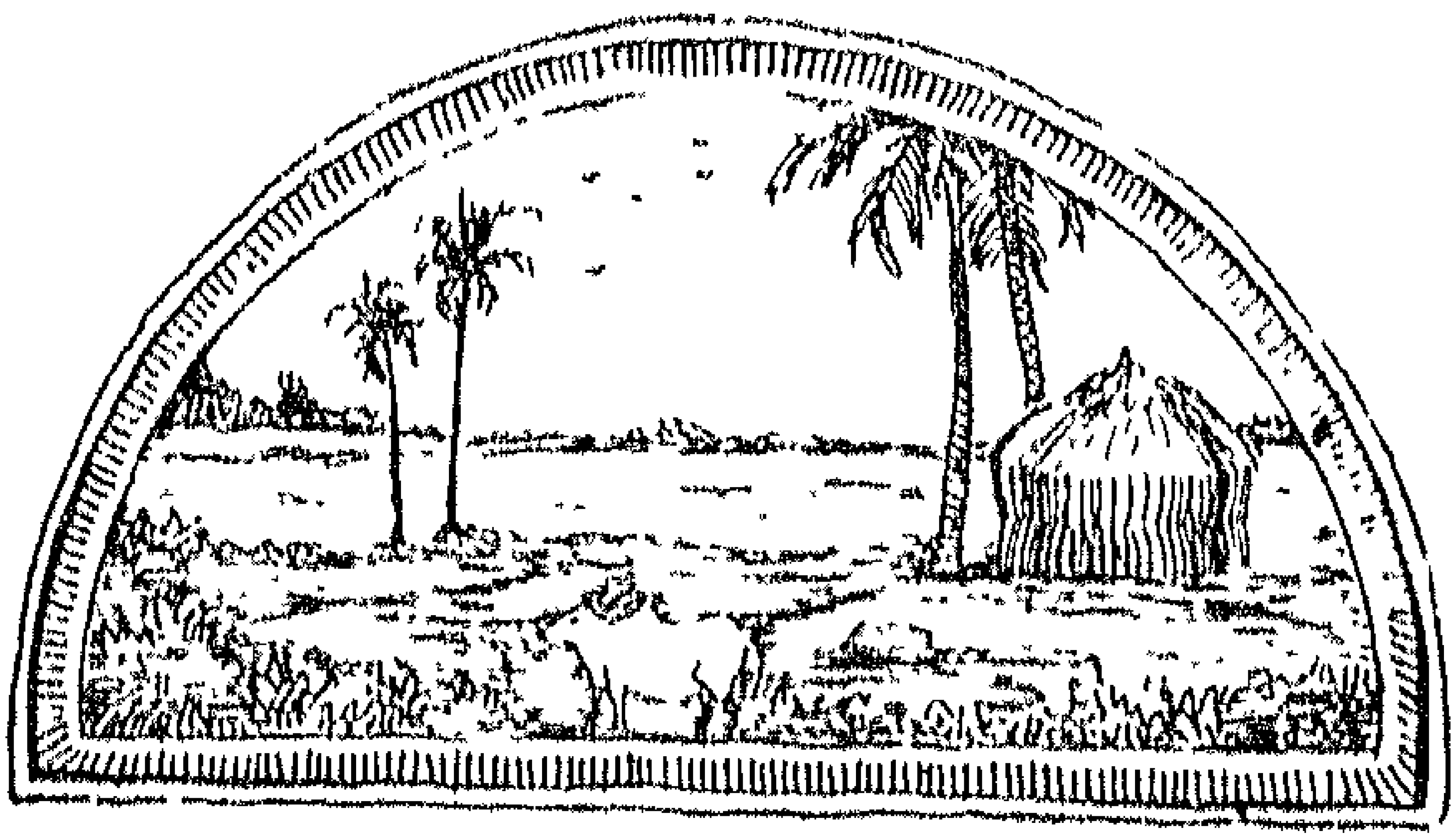
তদবধি ব্রাহ্মণ নিরামিষ খেলেও আর এ সকল পাগলামি করতেন না তোমরাও শিখে রাখ, অতিশয় কিছু করলে শেষ এইরূপ হয় এবং লোকেরা ঠাট্টা করতে সুবিধা পায়

* * * *

ছেলে—মা, সত্যি কথা বলার জন্য কি কেউ শাস্তি পায় ?

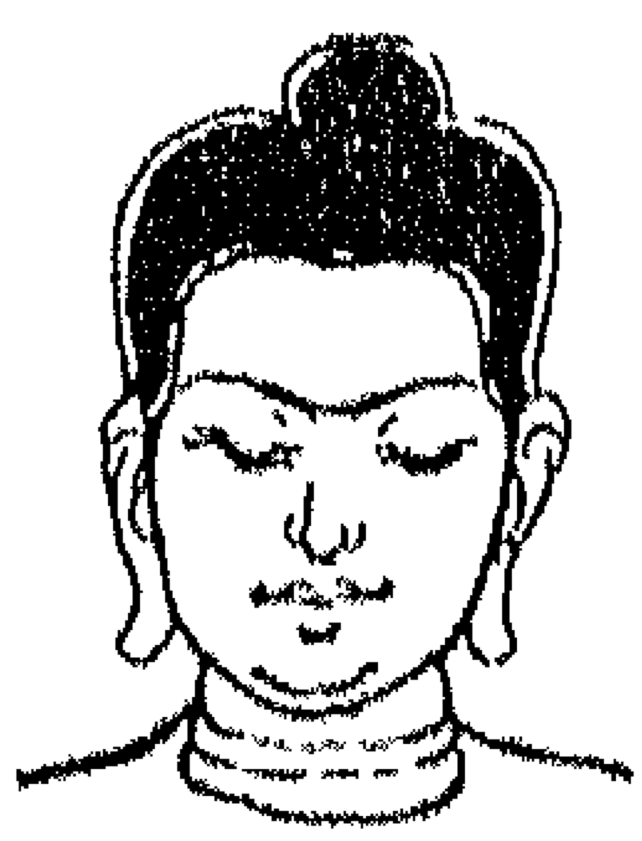
মা—না, বাছা ; কেন ?

ছেলে—আমি এই খানিকক্ষণ হল নতুন পাথর বাটিটা ভেঙেছি।



দেশের কথা

বুদ্ধদেব



তোমরা নিশ্চয়ই সকলে বুদ্ধদেবের নাম শুনিয়াছ। আড়াই হাজার বৎসরেরও আগের কথা, মহারাজ শুদ্ধোদনের একটি ছেলে হইল, নাম সিদ্ধার্থ। রাজার ছেলে শিকার রাজকার্য লইয়া থাকিবে, কিন্তু যুবরাজের সে সব মোটেই ভাল লাগিত না। শিকার করা দূরে থাকুক কোন জীব জন্তুর উপর কোন অত্যাচার হইয়াছে দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। রাজা দেখিলেন ভারী বিপদ! রাজপুত্র

এরকম হইলে রাজ্যরক্ষা করে কে? তিনি অল্প বয়সেই সিদ্ধার্থের বিবাহ দিলেন আর হুকুম দিয়া দিলেন তাহার চারিদিকে খালি গান বাজনা আমোদ আহ্লাদ হইবে।

কিন্তু যে ছেলে বুদ্ধিমান তাহাকে কি খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায় সিদ্ধার্থের মত মহৎ আত্মা পুরুষকে গান বাজনা দিয়া ক'দিন ভুলাইয়া রাখা সম্ভব? যুবরাজ একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া পথে মড়া, বুড়ো, এইসব দেখিয়া একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তখন একটি ছেলে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সত্যকার সুখের সন্ধানে গৃহ-ত্যাগ করিলেন

তাহার পর তিনি অনেক দিন তপস্যা করিয়া যথার্থ বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইলেন। তিনি তখন দেশের চারিদিকে নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন বুদ্ধের উপদেশে তাঁহার শিষ্যেরা বুঝিতে পারিলেন, নিজের উন্নতি করাই ধর্ম্মের মূল—মনে পাপ রাখিবে না, সকলের সঙ্গে ভাল কথা কহিবে, ভাল ব্যবহার করিবে, সদ্‌ উপায়ে জীবন কাটাইবে, মন্দ কথা ভুলিয়া যাইবে, ভাল কথা মনে রাখিবে

এই গৌতম বুদ্ধ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এ আমাদের একটা মস্ত বড় গৌরবের বিষয়। আমাদের দেশের লোকই চীন জাপান প্রভৃতি দেশের লোককে বৌদ্ধ করিয়াছিলেন আর দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের লোকই গিয়াছিল সুদূর ইউরোপে বুদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য সে সময়ে আমাদের রাজা ছিলেন বৌদ্ধ, আর রাজ্যময় ছিল বৌদ্ধ মন্দির—বিহার। বুদ্ধ তখন আমাদেরই ছিল—পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদেরও সে কথা স্বীকার করিতে হইত কিন্তু এখনত আমরা আর সে কথা বলিতে পারি না সুদূর চীন জাপানের লোক এখনও বুদ্ধধর্ম্ম মানিয়া চলে কিন্তু বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষে—একটি বিহারও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ একটা কত বড় লজ্জার কথা।

প্রায় হাজার বৎসর ভারতবাসী বুদ্ধদেবকে একেবারে ভুলিয়াছিল—আবার বুঝি তাহাদের মনে পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই এত দিন বাদে বুদ্ধের একটি বিহার হইল

এতদিন বাদেও ভারতে বৌদ্ধ বিহার হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না, যদি না, বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন এই ভারতের মাটি হইতেই পাওয়া যাইত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কৃষ্ণা নদের অদূরে ভট্টিপ্রলু নামে একটি গ্রাম আছে গভর্ণমেন্টের লোক মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেখান হইতে দু'হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বের বৌদ্ধ স্তূপ, তৈজিষপত্র আবিষ্কার করেন। সেই সবের মধ্যে গুটিকয়েক স্ফটিকের কৌটা পাওয়া যায় বহুকাল ধরিয়া ঐ কৌটাগুলি বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন সগৌরবে রক্ষা করিতেছিল। তাহার একটির মধ্যেই গৌতম বুদ্ধের অস্থি পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব ছিলেন জগতের একজন প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারক। আজ পর্য্যন্ত লাখ লাখ লোক তাঁহার ধর্ম্মের উপাসক হিন্দুই বল, খৃষ্টানই বল, এমন কোন জাতি নাই যে বুদ্ধকে ভক্তি না করে সেই ধর্ম্মবীর গৌতম বুদ্ধের অস্থি এত দিন পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে সম্রাট হইতে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির হৃদয়ে পর্য্যন্ত যে সে ভাব বহিয়া যাইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে।

গভর্নমেন্ট এই ধাতু এতদিন মিউজিয়মে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মিউজিয়ম ত ইহার ঠিক স্থান নহে, ইহার প্রকৃত স্থান হইবে ধর্ম-মন্দির। তাই আমাদের রাজপ্রতিনিধি এই ধাতু প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিতে বৌদ্ধ উপাসকদিগকে অনুরোধ করেন।

এতদিন বাদে কলিকাতায় সেই বিহার নির্মিত হইয়াছে। ২৬শে নভেম্বর শুক্রবার, প্রায় অর্ধ মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা করিয়া কলিকাতার অধিবাসী—কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান সকলে লাটসাহেবের বাড়ীতে গিয়াছিল, ভগবান বুদ্ধের অস্থি আনিয়া বিহারে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য।

তোমরা হয়ত অনেক বড় শোভাযাত্রা দেখিয়াছ, কিন্তু এ শোভাযাত্রা সে সব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার বিশেষত্ব ছিল শোভাযাত্রীদের ধর্ম ও পবিত্রতা। কি সুন্দর সে দৃশ্য! বুদ্ধের সেই সব উপদেশ—নির্বাণের মন্ত্র খোদিত অসংখ্য পতাকা আকাশে উড়িতেছে। চারিদিকে পবিত্র শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনি। ধূপ ধূনা ফুলের ছড়াছড়ি—যেন শোভাযাত্রা দেবমন্দিরের ভিতর হইতেই চলিয়াছে।

এই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন কর্মী ও মেধাবী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বৈদিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে এত বড় যজ্ঞ ভারতে বেশী হয় নাই, আর সেই আর্য-ঋষিদের কথা ছাড়িয়া দিলে এ যুগে এমন পুরোহিতও পাওয়া যায় না। লাট সাহেবের বাড়ী হইতে এই পবিত্র অস্থি আনিতে হইবে। লাটসাহেবের বাড়ীতে বাঙ্গালী পুরোহিতের স্থান নাই—সেখানে যাইতে হইলে সকলকেই সাহেবী পোষাক পরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু আমাদের এই যজ্ঞের পুরোহিত আশুতোষ সে বাধা মানিলেন না। তিনি সেই ধুতি ও চাদর পরিয়া খালি পায়ে লাট-সাহেবের নিকট গেলেন সেই পবিত্র অস্থি আনিতে। সোনার কলস হাতে লইয়া, হলুদ রংএর চাদর গায়ে জড়াইয়া তিনি পবিত্র অস্থি গ্রহণ করেন।

আশুতোষের মনুষ্যত্ব ও তেজস্বিতা তোমরা মনে রাখিও। ধন, জন, চাকরী, প্রতিপত্তি—এই সব কারণে মানুষ নিজের আদর্শ ভুলিয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ নিজের আদর্শ ভুলেন নাই। তিনি হাইকোর্টের জজ, বাঙ্গালার একজন প্রধান লোক, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী, বাঙ্গালার প্রধান শাসনকর্তার নিকট ধুতি চাদর পরিয়া যাইতে তাঁহার একটুকু লজ্জা করে নাই। তিনি জানেন মানুষের মনের বলই বল, বাহিরের পোষাক কিছুই নহে। তাহার ভিতরে জিনিষ আছে। তাই তিনি বাহিরের জিনিষ চাহেন না। তোমাদিগকেও এইরূপ সরল হইয়া থাকা চাই। আর তোমাদের ভুলিলে চলিবে না—তোমরা দেশের ছেলে।

বিকালে বিহার উদ্ঘাটিত করিতে যাইয়া লাট-সাহেব বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, "বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান মন্ত্র ছিল অহিংসা। আজ জগতে যেদিকে দেখা যায় সেই দিকেই মারামারি কাটাকাটি। বুদ্ধদেবের এই অহিংসা মন্ত্র আজ জগতের প্রচার করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এতদিন বুদ্ধদেবকে ভুলিয়াছিল; কে জানে আবার এই বিহারই ভারতে বৌদ্ধ যুগের প্রবর্তক কি না?"

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নাম আজ দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সাদাসিদে জীবন যাপন, দেবতার মত চরিত্র, অসাধারণ বিদ্যা সবই তাঁহার নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বিনা তারে কি করিয়া টেলিগ্রাফ করিতে হয় তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে এ কথা অনেকে জানিতেন না, কিন্তু তিনি বড় বড় পণ্ডিতদের সামনে প্রমাণ করিয়াছেন উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই সব বিষয় লইয়া গবেষণা করিবার জন্য একটি পাঠাগার করিয়া দিয়াছেন। সেখানে তিনি যা কিছু আবিষ্কার করেন সে সম্বন্ধে তাঁহার ছাত্র ও দেশের অন্যান্য লোককে শিক্ষা দেন।

সম্প্রতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছিলেন সেইখানেই লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যশের গৌরব আজ পৃথিবীর চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরাও বাঙ্গলার ছেলে মেয়ের তরফ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

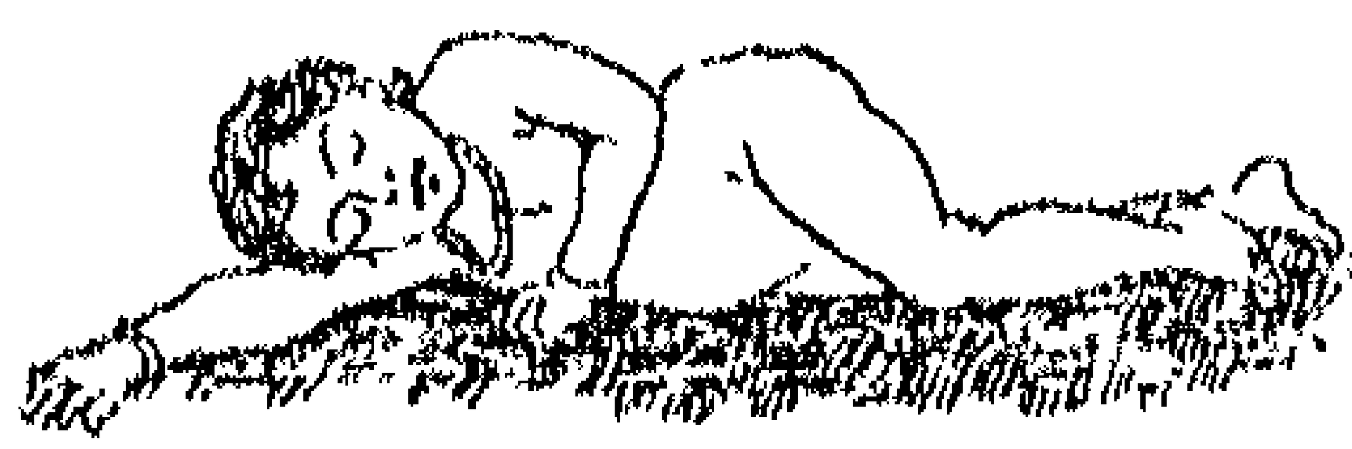
অনেকদিন পরে দেশে ফিরিয়া প্রথমেই তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন— পৃথিবীর চারিদিকেই এখন ওলোট পালটের সময় আসিয়াছে, দুর্ব্বল ও চঞ্চল চিত্তের এখানে স্থান নাই। যাহারা পরের মাথায় কাটাল ভাঙিতে চায় তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই সময়ে আমাদের দেশের লোককে শরীর ও মনে বল আনিতে হইবে। শুধু সুখের মধ্য দিয়া মানুষ হইলে চলিবে না, প্রকৃত মনুষ্যত্ব দুঃখের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠে। দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ হইলেই তুমি নিঃশঙ্কভাবে দিন কাটাইতে পারিবে। আর এই ভাবে দিন কাটাইতে পারিলেই তোমার যা কিছু শক্তি কথায় খরচ না করিয়া কাজে দেখাইতে পারিবে। তোমার যা কিছু করিতে হইবে, তাহা তোমার নিজেকেই করিতেই হইবে, পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

শুধু পড়া মুখস্থের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। যে পথে কেউ যায় না, এখন তোমাদিগকে সেই পথে যাইতে হইবে। কাজ যত বড়ই শক্ত হউক, ইচ্ছা শক্তির কাছে সবই সহজ।

অনেকেই বলিয়া থাকেন সুযোগ পাইলে তাঁহারা বড় বড় কাজ করিতে পারেন। সুযোগ কেহ কাহা-কেও দেয় না। সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিও, তোমা-দের নিজেদের ভবিষ্যত তোমাদের নিজেদের হাতে।

আগুন পরীক্ষা

বর্ম্মা প্রদেশে সিঙ্গাপুর নামে একটি সহর আছে। সেখানে একটি টামিল মন্দিরে প্রতি বৎসর এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া থাকে। চার পাঁচ ফিট গভীর, আর প্রায় ত্রিশ ফিট লম্বা কাটিয়া কয়লার স্তূপ করা হয়। প্রতিবৎসর উৎসবের সময় সেই কয়লায় আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। অনেক যাত্রী, ছেলে মেয়ে বুড়ো শুধু পায় সেই জলন্ত কয়লার উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের পা পোড়ে না। কেন পোড়ে না সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কোন ভাল জবাব দিতে পারিতেছেন না।



দাদাঠাকুরের গল্প।

একবার একটা ছোট কাঠবেড়ালী [illegible] গাছের ডাল থেকে [illegible] [illegible] ঘুমোচ্ছিলেন, কাঠবেড়ালী একেবারে তাঁর গায়ের উপর গিয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙ্গে গেল ব'লে বাঘ মশা'য়ও রেগেমেগে উঠলেন। কাঠবেড়ালী বেচারী ভয়ে কেঁপে বাঘের কাছে মাপ চাইল, বললো যে, সে ইচ্ছে ক'রে ঘুম ভাঙ্গায়নি।

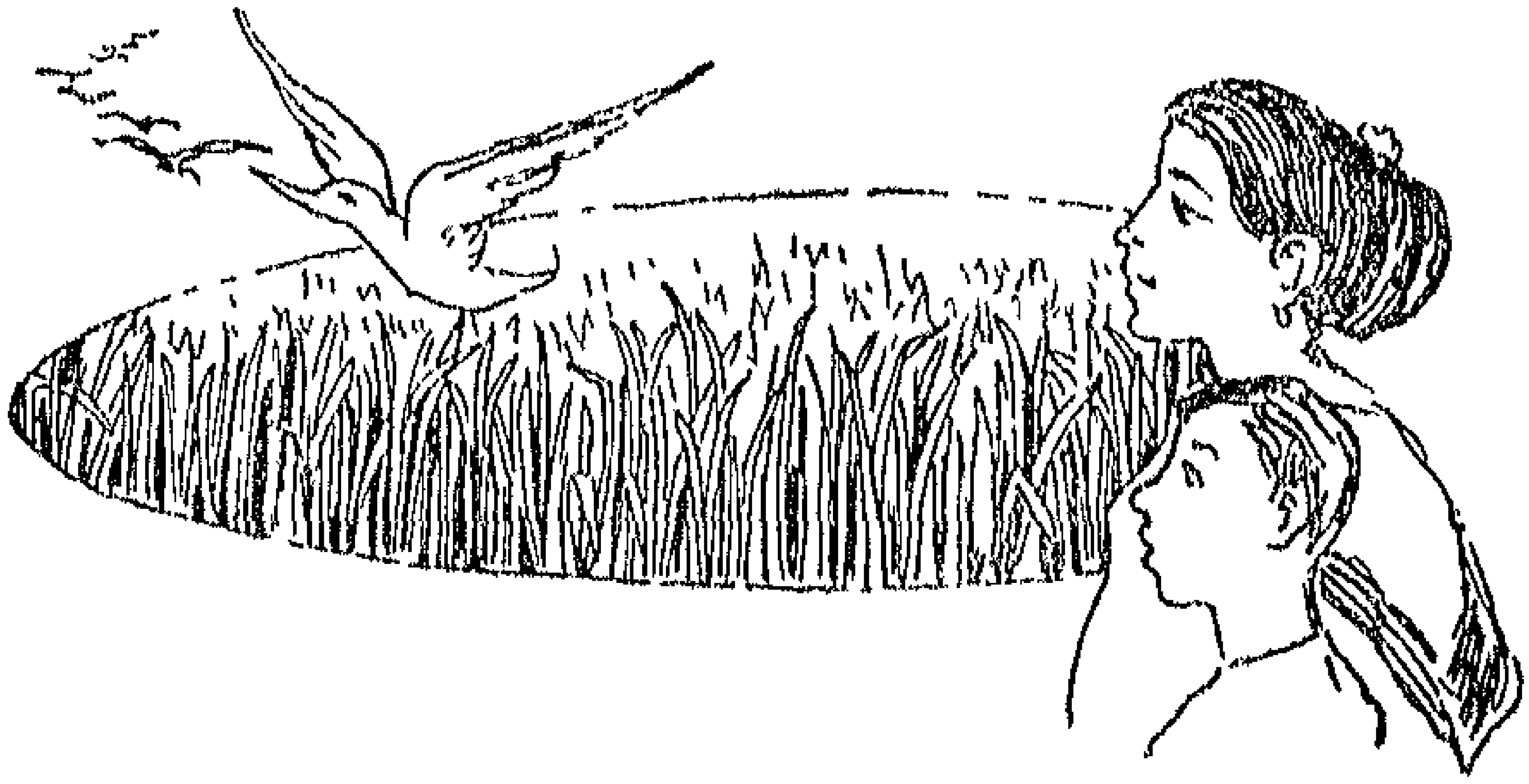
বাঘ বললেন, "আচ্ছা, তুই যদি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিস্‌ তবে তোকে মারব না। অনেকদিন থেকে আমি তোদের সবসময় দেখছি, তোরা ছোট জানোয়ার, আর গায়ে তোদের কিছুমাত্র জোর নেই, তবু যেন সব জানোয়ারের চেয়ে তোরাই সুখী, সমস্ত দিন গাছের ডালে ছুটোছুটি দেখে মনে হয় তোরা বেশ স্ফূর্তিতে আছিস্‌। আর আমার শক্তি সব চেয়ে বড় [illegible] জানোয়ার, [illegible] সবাই আমাদের ভয় ক'রে চলে, তবু আমি সুখী নই, এর কারণ কি বলতে পারিস্‌?"

কাঠবেড়ালী বলিল, "আমাকে গাছের উপরে যেতে দিন। আমি সেখান থেকে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব।"

বাঘ রাজি হ'লেন।

কাঠবেড়ালী বললো, "[illegible], আপনারা যেমন ক'রে সুখ পেতে চান, সত্যি সুখ কেমন ক'রে [illegible] [illegible], [illegible] সবই করি কিন্তু কারো ক্ষতি করিনে, [illegible] পরের নাশ ক'রে সুখী হ'তে চাইলেন। বনের ফলমূল আমাদের খাবার [illegible], [illegible] হেসেখেলে দিন কাটাই, তাই বনে আমাদের শত্রু ব'লে কেউ নেই। আর, আপনাদের সবাই ভয় করে; নিরীহ জীবজন্তু মেরে আপনারা খান; আপনারা মনে করেন চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে সবাইকে বশ করা যায়। দিনরাত আপনারা নিজের ভাবনা নিয়ে থাকেন, তাই বনের আর কোনো পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনাদের মিল নেই। অন্যকে যারা অসুখী করে তারা নিজেরা কেমন ক'রে সুখী হবে?"

এই ব'লে কাঠবেড়ালী সকলের চেয়ে উঁচু একটা ডালে গিয়ে বসল, আর, বাঘ ম'শায় মাথা হেঁট ক'রে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।



মজার অঙ্ক

১ × ৮ + ১ = ৯

১২ × ৮ + ২ = ৯৮

১২৩ × ৮ + ৩ = ৯৮৭

১২৩৪ × ৮ + ৪ = ৯৮৭৬

১২৩৪৫ × ৮ + ৫ = ৯৮৭৬৫

১২৩৪৫৬ × ৮ + ৬ = ৯৮৭৬৫৪

১২৩৪৫৬৭ × ৮ + ৭ = ৯৮৭৬৫৪৩

১২৩৪৫৬৭৮ × ৮ + ৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২

১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৮ + ৯ = ৯৮৭৬৫৪৩২১



দেশ বিদেশের কথা

আকাশ বিহারী লোকেদের সহিত কথাবার্তা।

টেলিফোনের মধ্যে পাইন

বিনা তারে টেলিগ্রাফের কথা তোমরা বোধহয় শুনিয়াছ। দূর সমুদ্রে যে সব জাহাজ যায় তাহাদের খবর কি করিয়া পাওয়া যাইবে? হঠাৎ যদি ঝড় উঠে তখন কি উপায় হইবে? বিনা তারের এক রকম টেলিগ্রাম এবং টেলিফোনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তার সাহায্যে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজে থাকিয়া লোকে অনায়াসে সমস্ত সংবাদই পাইয়া থাকে।

আকাশে এরোপ্লেন চলিবার ব্যবস্থা হইবার পর হইতেই এরোপ্লেনে ও বিনা তারে টেলিফোন করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত বন্দোবস্ত গভর্ণমেন্ট নিজের জন্যই করিয়াছেন সাধারণ লোকে সে টেলিফোনের সাহায্যে কথা কহিতে পারে না। সম্প্রতি বিলাতে যে বড় এরোপ্লেন কোম্পানীর সাহেবের এরোপ্লেনের চালকদের সঙ্গে কথা বলিবার বড় দরকার পড়িয়াছিল। লণ্ডন হইতে এরোপ্লেন ছাড়িবে সেখানে টেলিফোন করিয়া জানিলেন যে এরোপ্লেন কিছু আগে চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি গভর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া আকাশবাসী সেই এরোপ্লেনে অবস্থিত চালকের সঙ্গে কথা কহিলেন। এরোপ্লেনের বড় বড় শব্দ টেলিফোনের ভিতর দিয়া বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। তবে কথাবার্তাও বেশ বুঝা যাইতেছিল। মনে কর যদি তোমাদের কোন বন্ধু কখনো আকাশে এরোপ্লেনে চড়িয়া বেড়াইতে গেলেও তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে পারিবে। দিন দিন বিজ্ঞানের কত উন্নতি হইতেছে।

তোমরা যদি শহরে যাইয়া থাক তবে দেখিয়া থাকিবে কি করিয়া টেলিফোনের সাহায্যে অনেক দূরে থাকিয়াও দুই ব্যক্তি কথা বার্তা বলিতেছে। সিঁড়িতে তোমার এক বন্ধু থাকে— তুমি কলিকাতায় বসিয়া তাহার সঙ্গে ইচ্ছা মত কথাবার্তা চালাইতে পার, যেন সে তোমার কাছে বসিয়াই কথার উত্তর দিতেছে।

আজকাল টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সাহায্যে কাল যে ঘটনা ঘটিয়াছে আজই তাহা জানিতে পার। তোমরা রেলের লাইনের পাশে বিস্তর টেলিগ্রাফের তার দেখিয়াছ। এই বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরের সংবাদ অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আসিয়া পৌছায়। টেলিফোনে এই তারের সাহায্যেই অবিকল গলার স্বর পর্য্যন্ত শুনা যায়।

ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এডওয়ার্ড বেলিন ভাবিলেন লোকে যখন টেলিফোনের তারের সাহায্যে কথাবার্তা চালাইতে পারে, তখন ছবিই বা পাঠাইতে পারিবে না কেন? তের বৎসর সাধনার পর তিনি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

টেলিফোনের তারের সাহায্যে ছবি পাঠানও এতদিন পরে সম্ভব হইল।

এমন কি বিনা তারের টেলিফোনেও ছবি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

প্যাটাগনিয়ার নূতন ব্যবসা

মেষ-পালন --

প্যাটাগনিয়া নামে একটি দেশ আছে। এতদিন সে যায়গা ভারী বিশ্রী ছিল। লোকে প্যাটাগনিয়া যাওয়ার নামেই ভয় পাইত, ভাবিত, ঐ যায়গা বুঝি ঈশ্বর মরুভূমি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সে ভুল বিশ্বাস এতদিনে দূর হইয়াছে। প্যাটাগনিয়ায় এখন মেষপালকেরা মেষের ব্যবসা করিতেছে।

প্যাটাগনিয়া মেষপালনের পক্ষে খুব উপযুক্ত যায়গা। আমরা যে পশমের কাপড় চোপড় পরি, ভবিষ্যতে তাহার অধিকাংশ পশমই প্যাটাগনিয়া হইতে আসিবে। যে দেশ কিছুদিন আগেও এত গরীব ছিল, আজ তাহাই ধনী হইতে চলিল।

ওখানকার এক একজন মেষপালক খুব জাঁকাল রকমের ব্যবসা জুড়িয়া দিয়াছে। এমন অনেক মেষপালক আছে যাহাদের প্রত্যেকের দেড় লাখের উপর মেষ আছে। এই সকল মেষ পালিবার জন্য, তাহাদের লোম কাটিবার জন্য, বিজ্ঞানের কল্যাণে যে সব উন্নত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সব মেষপালকের সেই সব উপায় দ্বারাই মেষ পালিয়া থাকে। মেষপালকেরা এখন এত বড় লোক হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মটর গাড়ী চড়িয়া থাকে।

কাজের লোকই গাড়ীঘোড়া চড়ে। সামান্য রাখালগিরি করিয়া একটা জাতি বড় হইতে চলিল।

কাগজের পোষাক

জার্ম্মানী চিরদিনই সস্তায় জিনিষ দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। যুদ্ধেতে জিনিষের দর বাড়িয়া যাওয়ায় চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; এই সময়ে জার্ম্মানী আসিয়াছে সস্তার জামাকাপড় হাতে লইয়া।

তোমরা পশম, সিল্ক, তুলা প্রভৃতিরই কাপড় পড়িয়াছ, কিন্তু জার্ম্মানী এবার কাগজের পোষাক তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল। আর দাম এত সস্তা যে, কোট, পেণ্টুলন, সব শুদ্ধ এক সেট পোষাক এক টাকা, দেড় টাকাতেই পাওয়া যায়।

অবশ্য এসব জিনিষ খুব টেকসই হয় না। তবে যাই হউক, কাগজেরও যে পোষাক হইতে পারে এবং এক টাকা, দেড় টাকা খরচ করিলেই যে সাদা ধবধবে পোষাক পড়া যাইবে এ কথাও এত দিন কাহারও মাথায় আসে নাই।

আমেরিকার [illegible]

তোমরা জান বোধ হয় যে, আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান দেশ, অনেক কিছুই নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। বৃষ্টি ভাল না হইলে গাছ পালা শুকাইয়া যায়। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান কি না, তাই এ দেশের অধিকাংশ লোক চাষ বাস করিয়া সংসার চালায়। এক বৎসর বৃষ্টি কম হইলে দেশের চারিদিকে হাহাকার শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু উপায় কি? বৃষ্টি পড়ানত আর মানুষের হাতে না, তবে এই দৈব বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ কি করিয়া থাকে?

সংসারে মানুষ খাল, কুয়া খুঁড়িয়া, তাহা হইতে জল সেঁচিয়া ক্ষেতে দেয়। কিন্তু ইহাতে বিস্তর খরচ, পরিশ্রমও অনেক। তাহা ছাড়া এক এক সময়ে এমন হয়, যে খালে বিলে পর্যাপ্ত জল থাকে না। আমরা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি লোকেদের বইতে পড়িয়াছি, প্রাচীন কালে পৃথিবীর লোকেরা দেবতা ইন্দ্রকে বৃষ্টির কর্তা বলিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খুসি হইলে পৃথিবীতে জল আসে।

তোমরা হয়ত শুনিয়া হাসিবে। কিন্তু এ হাসিবার কথা নয়। যাহা একদিন দৈব ছিল তাহাই ধীরে ধীরে মানুষের হাতে পড়িয়া মানুষের আয়ত্তাধীন হইতে চলিল। একদিন পরে বৃষ্টিকেও মানুষের ইচ্ছামত পৃথিবীতে আনিতে হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই আমেরিকার নাম শুনিয়াছ — সেই যে মস্ত বড় এক ভূখণ্ড কলম্বস্ আবিষ্কার করেন। আমেরিকার মধ্যে ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশে হাটফিল্ড (Hatfield) নামে একজন লোক আছেন। তাঁকে বৃষ্টির কর্তা বলিলেও চলে। তিনি ইচ্ছামত যে কোন দেশে বৃষ্টি ডাকিয়া আনিতে পারেন।

গত ১ বৎসরে তিনি ৫২ যায়গায় বাক্স বাঁধিয়া বৃষ্টি ডাকিয়া আনিয়াছেন, এবং সব যায়গাতেই তিনি বাজী জিতিয়াছেন। কোন যায়গায় হয়ত কিছু কম বৃষ্টি হইয়াছে, কিছু বেশী বৃষ্টি হওয়া দরকার, কোন যায়গায় বা মোটেই হয় নাই, শস্য তখন সব শুকাইয়া যায়। তখন হাটফিল্ডকে খবর দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া তিনদিনে যত বৃষ্টি দরকার আনিয়া দিলেন।

এমন অনেক সহর আছে যেখানে, যদি বৃষ্টি একটু বেশী হয় তবে বিস্তর ফসল জন্মায়। সেখানকার লোকেরা সব হাটফিল্ডকে খবর দিতেছে, হাটফিল্ড আসিয়া তাহাদের যতটা বৃষ্টি দরকার ততটা বৃষ্টি আনিয়া দিতেছে। ফলে কৃষকদের অনেক লাভ হয়, এবং তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া হাটফিল্ডকে বিস্তর টাকা দেয়।

হাটফিল্ড যে কি করিয়া বৃষ্টি আনেন, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের নিকট এখনও একটা ধাঁধাঁর মত ঠেকিতেছে। অনেকে ত এ কথা স্বীকারই করিতে চায় না, কিন্তু যেখানে হাটফিল্ড যান সেইখানেই যে বৃষ্টি হয়, একথা ত অস্বীকার করিবার যো নাই।

কি উপায়ে যে বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনেন সে হাটফিল্ড এখনও কাহারও নিকট ভাঙেন নাই। তবে দেখা যায় যেখানে বৃষ্টি আনিতে হয় সেখানে তিনি তাহার কাজের জন্য সেই দেশের সকলের চাইতে উঁচু যায়গা বাছিয়া লন। তাহার পর, তোমরা রেলের ষ্টেশনের কাছে জল রাখিবার জন্য যেমন বড় বড় ট্যাঙ্ক উঁচুতে টাঙান দেখিয়াছ, ঐ রকম একটা কিম্বা চারিটা ট্যাঙ্ক উঁচু যায়গায় টাঙান হয়। ঐ ট্যাঙ্কের মধ্যে কি সব ([illegible]) জিনিষ থাকে, তাহা হাটফিল্ড ছাড়া আর কেউ জানে না।

এখন পৃথিবীর চারিদিক হইতে তাহার ডাক পড়িয়াছে, বৃষ্টি আন, বৃষ্টি আন। দেখি তিনি ভারতে কতদিনে আসেন।

বিজ্ঞানের আর একটি আবিষ্কার

১। রোগবীজের উচ্ছেদ

তোমরা প্যাসটিয়রের নাম হয়ত শুন নাই তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন এবং রোগ ব্যায়রামের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য এমন সুন্দর সব উপায় বাহির করিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার নাম চিরকাল লোকের মুখে মুখে থাকিবে তাঁহার কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার জন্য আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর যেমন একটি পাঠাগার হইয়াছে, প্যাসটিয়র ঐ রকম একটি পাঠাগার করিয়া দিয়া গিয়াছেন সেখানে বড় বড় বিজ্ঞানবিদেরা দিন রাত্রি আলোচনা করিতেছেন, কি করিয়া রোগ ব্যায়রামকে দেশ হইতে দূর করা যায়

তোমরা হয়ত জান ম্যালেরিয়া এনোফেলিস নামে এক রকম মশার কামড়ে হয় এখন এই এনোফেলিসকে যদি কোন রকমে মারিয়া ফেলা যায় তবে হয়ত ম্যালেরিয়া দেশ হইতে দূর হয়।

উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখান হইতে একটি খাল কাটা হইয়াছিল। সেখানে এত বেশী ম্যালেরিয়া ছিল যে প্রথম সেখানে যাহারা খাল কাটিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী লোক মারা গিয়াছে ম্যালেরিয়ায় তাহারা কি করিয়া ম্যালেরিয়া সেদেশ হইতে তাড়াইয়াছে জান? মশা সাধারণতঃ ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে থাকে, আর ডিম পাড়ে পচা পুকুরের জলের মধ্যে। তাহারা সেখানে যত খানা ডোবা ছিল সবের মধ্যে তেল ঢালিয়া দিয়াছিল। জলের মধ্যে তেল দেওয়ার জন্য সব মশা মরিয়া গেল শুধু মশা কেন, জলের মাছ, তা ছাড়া যা কিছু ছিল সব মরিয়া গেল।

কিন্তু এ উপায়ে মশা তাড়ান সব সময়ে সুবিধাজনক হয় না প্যাসটিয়রের পাঠাগারে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন শুধু সরম্যালিন জলে ছড়াইয়া দিলেই মশার সব ছানা মরিয়া যাইবে সত্য সত্যই যদি এই উপায়ে মশার বংশ নির্ম্মূল করা যায় তবে যে যুগ আসিতেছে সে যুগে পৃথিবী এক নূতন জীবন পাইবে। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা পরে বলিব।

পরীর ছবি

তোমরা ত রূপ কথার পরীর গল্প শুনিতে বেজায় ভালবাস। ঘুমাইতে ঘুমাইতেও পরীর কথা স্বপ্ন দেখ সে সব যে মিথ্যা তাও তোমরা জান, তবু তোমাদের তা শুনিতে ভাল লাগে কিন্তু এখন যদি কেউ বলে যে রূপ কথার পরী সত্য সত্যই আছে তবে তোমরা হয়ত সহজে সে কথা বিশ্বাস করিবে না বলিবে, রাক্ষস, খোক্কস, ভূত, পরী, সে সব জ্ঞানের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই দূর হইয়া গিয়াছে, এখন আর তারা তোমাদের কাছে ভয়ে আসিবে না কথাটা সত্য, কিন্তু বিলাতে একজন খুব জ্ঞানী লোক প্রমাণ করিতে চান যে সত্য সত্যই পৃথিবীতে পরী আছে। শুধু আছে তা নয়, তাহাদের চেহারা ফটোগ্রাফে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে

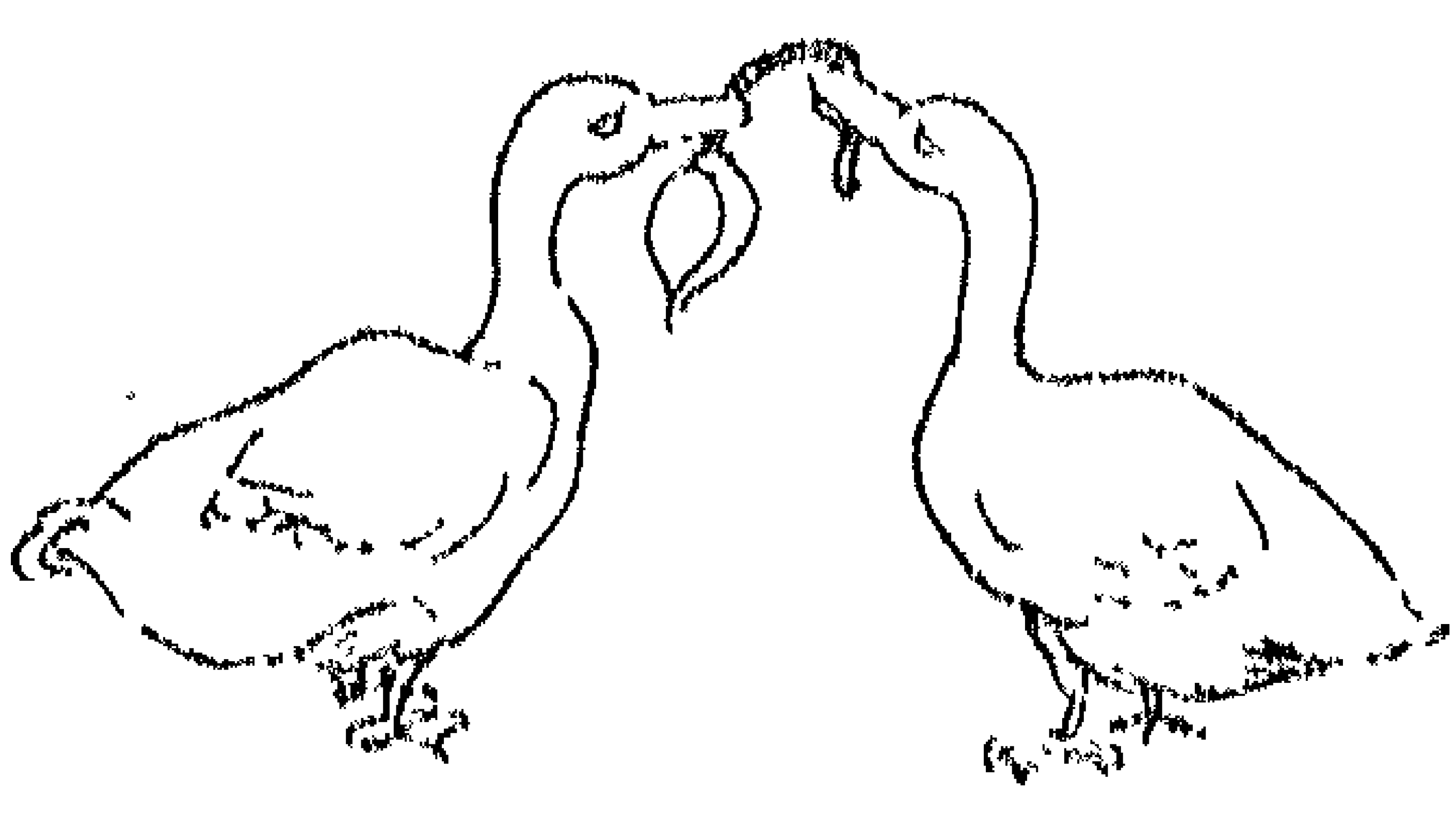
তোমরা কোনান ডয়েলের নাম শুনিয়াছ কি? তিনি বিলাতের একজন বড় লেখক, লক্ষ লক্ষ লোক তাহার বই পড়ে তিনি সম্প্রতি বলিতেছেন তার দেশের দুইটি মেয়ে কতকগুলি পরীর ফটো তুলিয়াছে আর অনেক অভিজ্ঞ লোক বলিয়াছেন যে সে সব ফটোর মধ্যে মিথ্যা কারবার নাই, সত্য সত্যই সেগুলি পরীর ফটো।

সেই পরীগুলি দেখিতে ছোট পুতুলের মত ডানা আছে। আকাশে উড়িয়া বেড়ায়

পৃথিবীতে কত নতুন নতুন ঘটনা রোজ ঘটিতেছে কে তাহার সংখ্যা করিবে?

সময় কাটান।

[illegible]



সম্পাদকের চিঠি।

আমার দেশের প্রিয় পাঠক পাঠিকা,

তোমাদের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ আলাপ নাই বটে, কিন্তু তা নাই থাকিল, আমার দেশ লইয়া তোমাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ত নিত্যই ঘটিবে আর তোমাদের ত দূরে থাকিলে চলিবে না, তোমাদের মনস্তুষ্টিই ত আমাদের কাজ, তা তোমরা দূরে দূরে থাকিলে ত আমাদের কাজকর্ম্ম ত সবই বন্ধ হইয়া যাইবে

'আমার দেশ' একখানি নূতন মাসিক পত্র এ মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় তোমাদেরই জন্য তোমাদের যাহা ভাল লাগে তাই যোগাবার জন্যই আমরা আছি। তোমাদের কি কি ভাল লাগে, এ মাসিকে কি কি থাকা উচিত আমাদের লিখিলে, আমরা সেইসব দিতে চেষ্টা করিব

এখন প্রথম কথা হইতেছে, তোমাদিগকে আমরা কাছে টানিয়া আনিতে চাই, তোমাদিগকে বলিতে হইবে এ মাসিকে কি কি বিষয় থাকা উচিত অবশ্য, আমাদেরও একটা মত আছে, সেই মত অনুসারেই প্রথম সংখ্যা ছাপা হইল কিন্তু এ জিনিষ যখন তোমাদেরই তখন তোমাদের ইচ্ছা মতই সব কাজ চলিবে

তবে তার আগে তোমাদের দুই চারিটা কথা বলিয়া লইতে চাই 'আমার দেশ' ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্র, ৮ হইতে ১৫ ১৬ বৎসরের বালকবালিকাদের জন্য অবশ্য সব জিনিষ সব বয়সের ছেলে মেয়ে খুব ভাল বুঝিবে না। তবে প্রত্যেক শিশু, বালক, বালিকা অন্ততঃ কতক অংশ পড়িয়া আমোদ পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইবে

এখন দ্বিতীয় কথা এই, এই মাসিক পত্রে কি কি থাকা উচিত তোমরা হয়ত অনেক মাসিক পত্র দেখিয়াছ কিন্তু 'আমার দেশ' সে সব হইতে একটু ভিন্ন রকমের

হইবে — দেশ-ভ্রমণ, কৌতুক, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ও থাকিবেই। তাহা ছাড়া এই মাসিক পত্রে বিশেষ হইবে 'দেশের কথা' আর 'দেশ বিদেশের খবর'। আমাদের বিশ্বাস আছে, প্রতি মাসে আমাদের দেশের ও বিদেশের পাঠককে নূতন নূতন কথা বলিতে পারিব।

'আমার দেশ' একখানি মাসিক পত্র — সুতরাং এতে বেশীর ভাগ চটক চটকা খবরই থাকিবে। কিন্তু একটা কথার বুঝিতে হইবে মোটামুটি সব বিষয়ে কিছু কিছু জানা দরকার। বাঙলা ভাষায় সেরূপ বই বড় বেশী নাই; আমরা শিশুতোষ সিরিজে তোমাদেরই জন্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, গল্প প্রভৃতি এক একটি বিষয় লইয়া এক একখানি বই করিতেছি। সে সব বইয়ের উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে তোমাদের পণ্ডিত করিয়া তোলা। তোমরা হয়ত বলিবে আমরা পণ্ডিত হইতে চাই না। কিন্তু ও সব তো শুনি কই? আমরা তোমাদের পণ্ডিত করিয়া তবে ছাড়িব।

যাহা হউক, এই ত হইল আমাদের উদ্দেশ্য। এখন তোমরা বিচার করিয়া বল তোমরা কি চাও।

শিশুতোষ সিরিজের প্রথম বই বাহির হয় 'পৃথিবীর কথা'। আমরা সে সময়ে শিশুতোষ সিরিজের পাঠকদের নিকট হইতে জানিতে চাই, বই তাহাদের পছন্দ হইয়াছে কিনা এবং কি কি বিষয় তাহাদের ভাল লাগে। অনেকেই তাহার উত্তর দিয়াছে, তবে অনেকেরই উত্তর পাই নাই। উত্তর আরও বেশী পাইলে ভাল হইত। তোমাদের জন্যই যখন বই, তখন তোমাদের মতামত না জানিলে কি করা চলে?

চল্লিশ জনে উত্তর দিয়াছে বইখানি তাহাদের ভাল লাগিয়াছে এবং সব অংশই বুঝিতে পারিয়াছে। এই চল্লিশজনের মধ্যে ৮টি মেয়ে আছে। আশার কথা, কি বল? আমাদের দেশের মেয়েরাও এ সব বিষয়ে পড়িয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর ১০ জন লিখিয়াছে তাহারা সব অংশ ভাল বুঝিতে পারে নাই, কিম্বা বুঝিয়া থাকিলেও এ রকম বই তাহাদের ভাল লাগে না। এই দশজনের মধ্যে দু'জন মেয়ে আছে।

সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায়, অধিকাংশ পাঠক পাঠিকাই বইখানি বুঝিয়াছে। তবে কতকে বোঝে নাই। তাই তাহাদের ইচ্ছা মত বইগুলি আরও সহজ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছি। এমন কি যে সব বই ছাপাখানায় দিয়াছিলাম সেগুলি ফেরৎ আনিয়া, তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী আরও সহজ বই ছাপাবার বন্দোবস্ত করিতেছি। এবং এই সব করিতে বিস্তর দেরী হইয়া যাইতেছে। তাগিদ পত্রও আসিতেছে। কিন্তু আমরা এটাও চাইনা যে যাদের জন্য বই করা তাদের কেউ আমাদের বই না বোঝে। তোমরা

যদি এইরকম তোমাদের অভাব, অনুযোগ না জানাও, তবে কি করিয়া আমরা ব্যবস্থা করিব, বল ত ?

দেশের কথা অনেকে জানিতে চাহিয়াছে দেখিয়া খুব খুসি হইলাম শিশুতোষ সিরিজে এবং আমার দেশে ক্রমে ক্রমে হরেক রকম জিনিষ বাহির হইবে, তোমরা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক

তারপর আর একটা কথা গল্প পড়িবার ইচ্ছা তোমাদের সকলেরই খুব বেশী। এ খুব স্বাভাবিক, কিন্তু ত বলিয়ে গল্প-সাহিত্যেরও একটা সীমা আছে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েদের মনের স্বাস্থ্যকর খোরাক জোগানও ত দরকার। সে দিকটাও আমাদের দেখিতে হইবে। তাই মাঝে মাঝে বিজ্ঞান, ইতিহাসও কিছু কিছু আমার দেশ এবং শিশুতোষ সিরিজে বাহির হইবে তবে খুব যাতে সহজ হয় তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব তোমরা কোন বিষয় না বুঝিতে পারিলে, আমাদের কাছে পত্র লিখিও

আমার শেষ কথা, তোমাদের মধ্যে যারা বালিকা, তাদের জন্য কি করি ? বালিকাদের শিক্ষা ত ঠিক পুরুষদের মত নয়, আর তাহাদের যাহা কিছু শিক্ষা সবই অল্প বয়সে শেষ করিতে হয়—তাই ভাবিতেছি মেয়েদের উপযোগী একটি করিয়া বিষয় প্রত্যেক মাসে বাহির করিব। এ মাসে আর হইয়া উঠিল না, পরের মাস হইতে বাহির করিব, ইচ্ছা আছে।

এখন যে সময় কাল আসিয়াছে তাহাতে খুব ছেলেবেলা হইতেই তোমাদের এই পৃথিবী সম্বন্ধে সব জানিতে হইবে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের খবরও একটু একটু রাখিতে হইবে এমন অনেক ছেলে আছে, যে ছেলেবেলা হইতে তাদের সম্পর্ক শুধু স্কুল আর পড়ার বহির সঙ্গে। কিন্তু সে ত ভাল নয় সব জিনিষ না জানিলে শুনিলে কি করিয়া তোমরা নিজের পথ বাছিয়া লইবে ? এই সব না, স্কুলে থাকিতেই তোমাদের কোন বিষয় পড়িবে না পড়িবে তাহা স্থির করিতে হইবে। কিন্তু তুমি হয় ত জান না কোন বিষয় লইলে তোমার ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে কিম্বা কোন বিষয়ে তোমার দখল বেশী।

একটা উদাহরণ দিই অনেকে অনেক বিষয় পড়ে না, কারণ অনেকের ধারণা অমুক বিষয়ে নম্বর ওঠে না ফলে বড় হইয়া হয় ত নিজের ভুল বুঝিতে পারে তখন আর ফিরিবার উপায় থাকে না। ছেলেবেলায় বিজ্ঞান জিনিষটা কি তাই অনেকে জানে না। হয়ত বিজ্ঞান একেবারেই পড়ে না তারপর দেখা যায় বিজ্ঞান পড়াটাই তাহার উচিত ছিল—কারণ বিজ্ঞানের দিকেই তাহার ঝোঁকটা বেশী। তাই বড় হইয়া অনেকে

আমাদের দেশ

কিনিয়া খাবার জিনিস [illegible] ক্রয় করে একেবারে ছোট ছেলেবেলা হইতে শিখিলে তা [illegible] আদিনা। কিন্তু সে হয়ত ভুল হইয়া পড়িয়াছে। আপনার মত সে ইতিহাস [illegible] কথা ছাড়ি, এখন ইতিহাস [illegible] চলিয়া গিয়াছে [illegible] ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু 'আমাদের দেশ' এ কিশোরদের নিবন্ধন পাঠকদের মন জানা চাই, না বিষয়ের খোঁজ রাখা চাই। জানিয়া শুনিয়া তোমরা যা হয় করিও, কিন্তু সব বিষয় না জানার জন্য একটু বড় ভুল করিয়া যেন ভবিষ্যতে আফসোস না করিতে হয়।

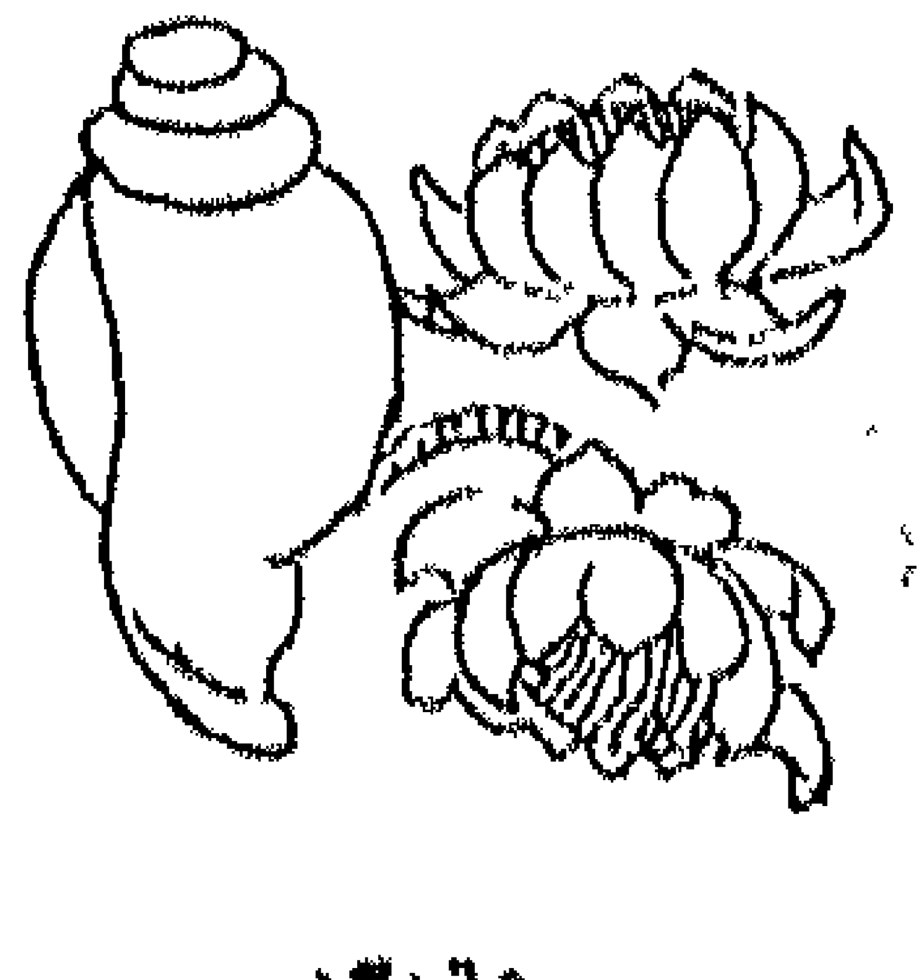
এখন খুব ছেলেবেলা হইতেই তোমাদের সব বিষয় খোঁজ খবর রাখিতে হইবে। এই ছেলেবেলার একটু ভুল করিয়া যেদিন বড় হইবে আর তাহা শোধরাইবার ইচ্ছা হইবে না। এই দেশ গভর্ণমেন্টের সবাইর চেয়ে যে বড় চাকরী তার শেষ পরীক্ষা দিতে হয় ২১ বছর বয়সের আগে। বিলাতে কত অল্প বয়সে কত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিবার জন্য যে ছেলেরা বাহিরে প্রস্তুত হয়, তোমাদেরও তাদের সঙ্গে চেষ্টা দিতে হইবে। তাই তোমাদের এখন বয়সেই সচেতন হওয়া চাই।

কিন্তু কি করিয়া? একটু বয়স হইলে না হইলেই খবরের কাগজ আমরা পড়ি। আপনার মত কিছু করেন, কেবল করিয়া এই সব কাজ কিছু [illegible] যায় সেই বিষয় পরের মতামত আলোচনা করিব। কিছুদিন তোমরা বল দেখি কি করা যায়? তোমাদের কথা শুনিয়া আমার নিজের মত জানাইব। [illegible] দেখি তোমরা কি বল? তোমাদের অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছি, হয়ত তোমাদের আর ধৈর্য থাকিতেছে না। আবার ফাল্গুনের প্রথম দেখা হইবে।

ইতি —

সম্পাদক

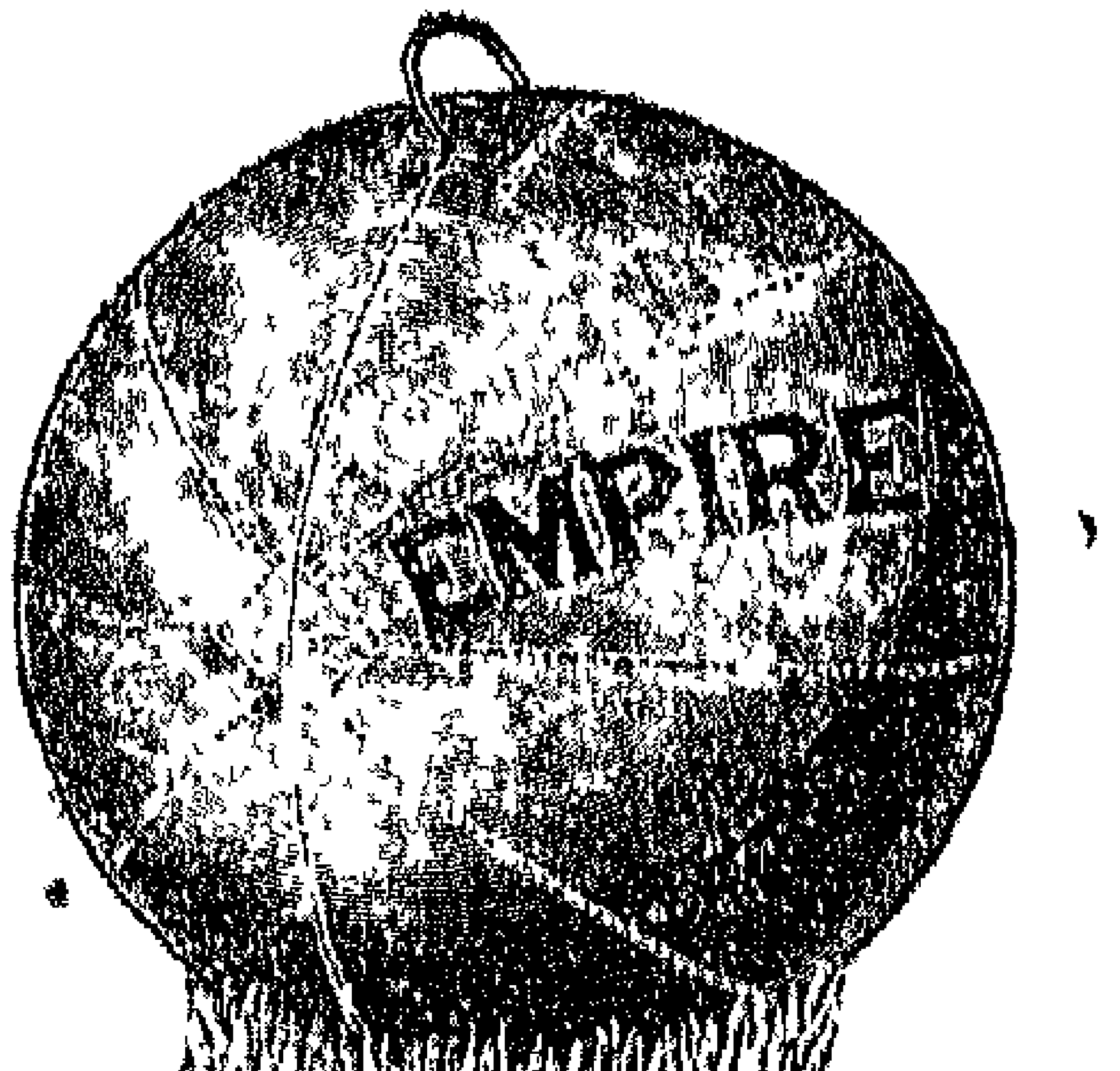
"আমাদের-দেশ"



টেলিফোন—১৪৭০

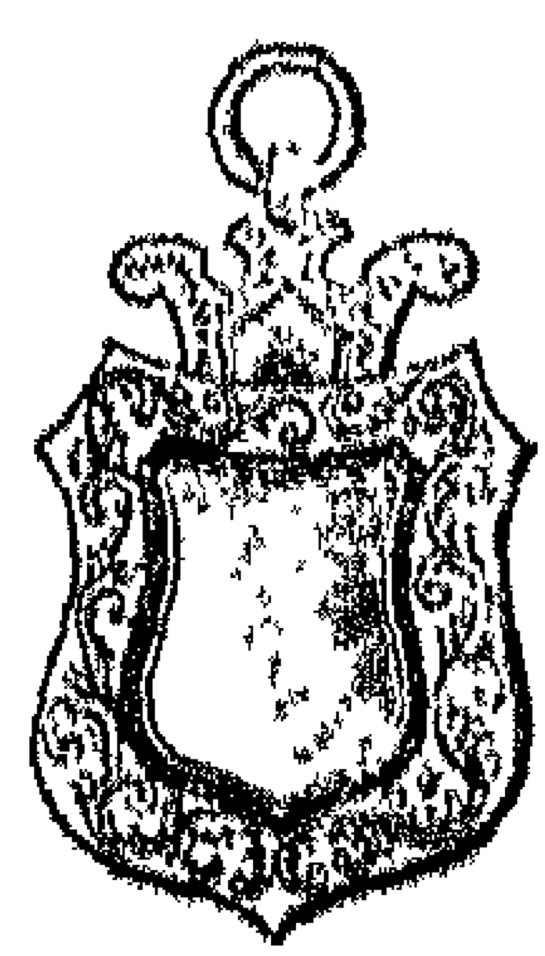
কার এণ্ড মহলানবিশ

সর্ব্বপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা

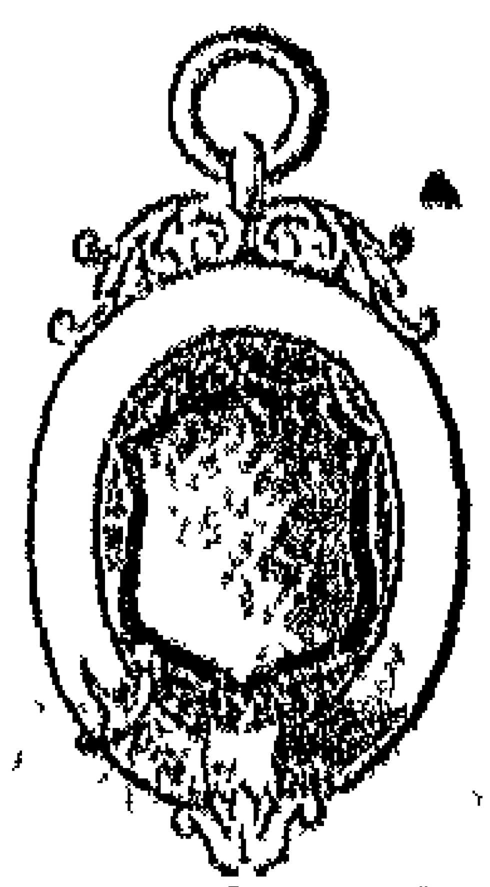


ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, হকি, স্যাণ্ডোর ডাম্বেল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার খেলার সরঞ্জামের সচিত্র কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন।

নানাবিধ রূপার মেডেল ও সিলভার প্লেটেড কাপ। স্কুল ও কলেজের প্রাইজ মেডেল।







No. 31A Rs. 4-4. **No. 70A Rs. 27-8.** **No. 30A Rs. 4.**

১২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

পার্ব্বণী

(১৩২৭)

ছেলেমেয়েদের একখানি বার্ষিক বই। পড়িলে আনন্দ জ্ঞান দুইই হইবে।

লেখিকা :—

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ।
শ্রীমতী সীতা দেবী, বি, এ।
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বি, এ।
শ্রীমতী এণা দেবী

চিত্র লেখক :—

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
শ্রীমতী গৌরীবালা বসু
শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার দাস

লেখক :—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।
শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু।
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত।
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত।
শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র।
শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীমান্ শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীমান্ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাবলিশিং হাউস কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে

ছেলেমেয়েদের জন্য



শ্রীনরেন্দ্রকুমার মিত্র
বি, এস, সি
(গ্লাসগো) এম্, আর
এস্, আই,
(লণ্ডন) প্রণীত

মূল্য এক টাকা

শিশির পাব্লিশিং
হাউস, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

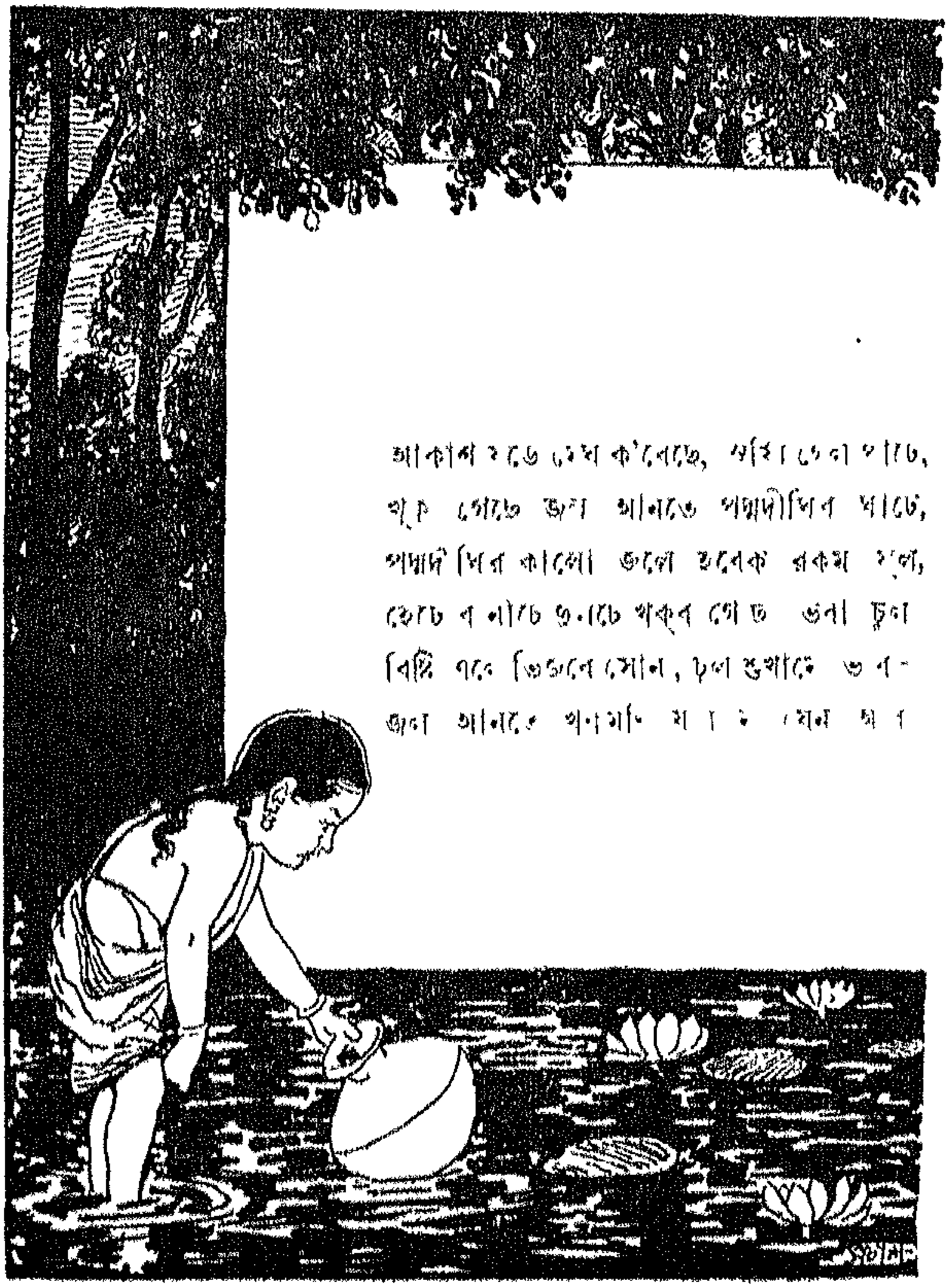
ফাল্গুন, ১৩২৭



শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস্‌, সি
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ

আমার দেশ

১১ বর্ষ ২য় সংখ্যা ২০ জুন ১৯৫৭



আকাশ জুড়ে মেঘ ক'রেছে, সূর্যি গেল পাটে,
খুকু গেছে জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে,
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল,
হাঁটুর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল
বিষ্টি পড়ে ভিজবে সোনা, চুল শুকাতে ভার
জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর

আমার দেশ।

। হিমালয়

এসিয়ার মধ্যপ্রদেশ ও ভারতবর্ষ — ইহার মাঝখানে হিমালয় পর্বতশ্রেণী। মধ্য এসিয়া ও তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে এই দুর্গম পর্বতশ্রেণী ডিঙাইয়া আসিতে হয়; কিন্তু তাহা ত সম্ভব নহে। যদি ইহার মাঝ দিয়া দুই একটি স্বাভাবিক পথ না থাকিত তাহা হইলে ঐ সকল দেশ হইতে কেহ ভারতবর্ষে আসিতে পারিত না। মধ্যএসিয়া ও ... যাতায়াতের পথ সহজ না হইয়া ভালোই হইয়াছে, যদি হইত তবে ঐ দেশের লোকেরা আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিত।

পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটি পথ আছে — একটার নাম খাইবার ও বোলান। ইহা ছাড়া তিব্বতের দিকে যাইবার একটি পথ আছে। এই পর্বতের মাঝ দিয়া যে সংকীর্ণ পথ থাকে তাহাকে গিরিবর্ত্ম বলা যাইতে পারে। ইহার ইংরাজী নাম পাস্ (Pass)। তোমরা এই দুইটি পথের নাম মনে রাখিও — ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িবার সময়ে জানিতে পারিবে কেন আমি বিশেষ করিয়া এই দুই পথের নাম মনে রাখিতে বলিতেছি।

মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্তর সীমানায় হিমালয় পর্বতের চিহ্নিত রেখা দেখিয়া মনে হয় যেন একটি পর্বতশ্রেণী এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত সরাসরি চলিয়াছে, ইহার ভিতরে কোনো সমতল ভূমি নাই। তোমরা এইরূপ ভুল করিও না। পাহাড়ের গায়ে পাহাড় তাহার গায়ে পাহাড় এমন করিয়া হিমালয় পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি হইয়াছে। সিন্ধুদেশের সীমানা হইতে আসাম পর্যন্ত হিমালয়ের বিস্তার, — দৈর্ঘ্যে প্রায় পনের শত মাইল হইবে।

তোমাদের মধ্যে অনেকের হয়ত বিশ্বাস হিমালয়ের সর্বাঙ্গ কেবল বরফে ঢাকা। অবশ্য, হিমালয়ের কোন কোন অংশ এত উঁচু যে সেখানে মানুষের বসতি নাই; পর্বতের গায়ে কেবল রাশীকৃত বরফ জমিয়া থাকে। পর্বতের যে স্থান হইতে চিরতুষার আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে বলে হিমানীরেখা। ইহার নীচে পাহাড়িদের বসতি আছে; তাহারা পাহাড়ের গা কাটিয়া যতটুকু জমি পায় তাহাতে ফসল বোনায়। যেখানে চাষবাস ভাল হয় তাহারই কাছে কৃষকপল্লী। হিমালয় প্রদেশে ছোটবড় অনেক কৃষকপল্লী আছে; এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যাইবার রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়া কিন্তু পথ

এত সঙ্কীর্ণ যে ইহার উপর দিয়া কোনোপ্রকার গাড়ী চলিতে পারে না। ঘোড়া কিংবা গাধার পিঠে মালপত্র চাপাইয়া দেওয়া হয় আর লোকজন প্রায়ই হাঁটিয়া পথ চলে। যেখানে শীত কিছু বেশী, সেখানে ছাগল ভেড়া জিনিষপত্র বহন করে।

হিমানী রেখার নীচে হিমালয়ের নানা স্থানে নানা প্রকার দৃশ্য দেখা যায়। কোথাও দেখিবে গাছপালা নাই—কেবল প্রকাণ্ড পাহাড় রাশীকৃত পাথর বুকে করিয়া আছে; আবার কোথাও নিবিড় বন পাহাড়কে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হিমানী রেখার উপরিভাগে হিমালয়ের উচ্চশিখর গুলি তুষারে ঢাকা—ইহার উপর যখন সূর্য্যের আলো পড়ে তখন বুঝিতে পারি আর্য্যেরা হিমালয়কে দেবতার বাসভূমি বলিয়া কেন কল্পনা করিয়াছিলেন

তুষার ও বরফ এই দুইটি কথার মধ্যে প্রভেদ আছে, ইহা মনে রাখিও। তুষার বরফের মতন কঠিন নয়, ইহা অতি কোমল, দেখিতে তুলা রাশির মত, অল্প উত্তাপেই ইহা গলিতে থাকে। হিমালয় সম্বন্ধে তোমাদের মনে মোটামুটি একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিলাম। এখন ইহার গা হইতে ঝির ঝির করিয়া ঝরণার জল পড়িতে পড়িতে যে জলস্রোতের সৃষ্টি হয়, তাহার কথা বলিব।

পর্ব্বতের শিখরে তুষার জমিয়া ভারী হইয়া উঠিলে নীচের বরফ গলিতে থাকে। ইহার ফলে রাশিকৃত বরফ একত্রিত হয় ও গলিয়া ক্রমশ নদীর আকার ধারণ করে। ইহাকে বলে 'হিমশিলা প্রবাহ'। ইংরাজী নাম Glacier। এই হিমশিলা প্রবাহ হইতে নদী জল পায়।

যে তিনটি প্রধান নদী হিমালয়ের বরফ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত দেশে জল জোগাইতেছে তাহার নাম তোমরা মনে রাখিও—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। হিমালয়ের গুহাগহ্বরে যেখানে মানুষ সহজে যাইতে পারে না সেই বরফের দেশে নদীর জন্মস্থান। সিন্ধুনদী হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমকোণ হইতে বাহির হইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়াছে ও সাতশত মাইল চলিয়া তারপর পেশোয়ারে আটকের কাছে ইহা সমুদ্রের দিকে ছুটিবার সহজ পথ পাইয়াছে। সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়া সেই পথ হইল, আর এই নদীর তীরেই আর্য্যেরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

গঙ্গার উৎপত্তি গঙ্গোত্তরী হইতে। এই স্থানটি তোমরা মানচিত্রে খুঁজিয়া পাইবেনা। গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গা পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া উত্তর পশ্চিম ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। আর, ব্রহ্মপুত্রের জন্মস্থান মানস সরোবরে; হিমালয়ের কোলে এই হ্রদটি না জানি কত সুন্দর। ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের মধ্য দিয়া হিমালয়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত আসিয়া

গিয়াছে, তারপর আসাম প্রদেশের উত্তর পূর্ব সীমা দিয়া [illegible] নদীর সঙ্গে মিলিয়া [illegible] দিকে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর [illegible] তোমাদের [illegible] [illegible] বলিবার [illegible]। [illegible] উত্তর [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানুষ [illegible] [illegible] আনিয়াছে। কিন্তু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহারা দেশে দেশে [illegible] [illegible] [illegible] নদী [illegible] [illegible] [illegible], তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সেখানে [illegible] [illegible] [illegible] পারিত না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] [illegible] নদী হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কিন্তু [illegible] নদীর [illegible] দেশের [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible] চাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] থাকি। তোমরা মানচিত্রে দেখিয়া থাকিবে বিষুবরেখা (Equator) [illegible] [illegible] গিয়াছে। বিষুবরেখার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বায়ু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু হিমালয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] হিমালয়ের [illegible] বায়ুর [illegible] বৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবর্ষের মাঠ, ঘাট, [illegible] বৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] না থাকিলে [illegible] [illegible] বৃষ্টি [illegible], আর [illegible] বৃষ্টি না হইলে ভারতবর্ষ [illegible] [illegible]।

হিমালয় আমাদের কি কি উপকার করিতেছে [illegible] তোমরা [illegible] [illegible] পারিবে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া আনাগোনার পথ দুর্গম বলিয়া [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] লোকজন ভারতবর্ষের মাঠের উপর [illegible] পড়িতে পারে নাই [illegible] [illegible] [illegible] এ দেশকে [illegible] হইতে [illegible] রাখিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষ [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিয়াছে। হিমালয়ের কথা বলিবার সময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] মনে [illegible] যে, নদীগুলোর [illegible] [illegible] হিমালয় ভারতবর্ষকে [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] বৃষ্টি [illegible] [illegible]; আর, [illegible] [illegible] [illegible] পথ আটক করিয়া ভারতবর্ষের [illegible] রক্ষা করিতেছে।

আজ আমরা বৈজ্ঞানিক [illegible] ও [illegible] [illegible] পারিয়া বুঝিতেছি যে হিমালয় [illegible] ভারতবর্ষকে বাহিরের আক্রমণ হইতে [illegible] [illegible] জলবৃষ্টি দিয়া রক্ষা

করিতেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন আর্য্যঋষিদের কথা ভাব দেখি, তাঁহারা কল্পনার চোখে হিমালয়কে দেখিয়াছিলেন — যিনি শিব, তিনি মানুষের মঙ্গল করেন, তিনি জীবন ও মৃত্যুর বিধাতা, হিমালয়ে তাঁহার বাস, পার্ব্বতী তাঁহার সঙ্গে থাকেন, তাঁর শিরের জটা হইতেই গঙ্গার জন্ম। এই সকল কাল্পনিক ছবি যে অর্থশূন্য নয় আজ আমরা তাহা বুঝিতেছি।

হিমালয় হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন তিব্বতদেশ ও হিমালয় একই সময় ভূগর্ভ হইতে জন্ম পাইয়াছে। আগামীবারে হিমালয়ের জন্মকথা বলিব।

ক্রমশঃ।

শ্রী গজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।



সময় কাটান।

খেলা ২

মাঘ মাসের "আমার দেশ" পত্রিকায় সময় কাটাইবার জন্য আমরা তোমাদের একটা খেলার কথা বলিয়াছি। আজ তোমাদের কাছে একটি প্রশ্ন করিব, তোমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইহার উত্তর দিবে। নিজেরা যদি না পার, আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া খবর লইবে। "আমার দেশ" পত্রিকার গ্রাহকগ্রাহিকার মধ্যে যাহার উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে, তাহাকে আমরা একখণ্ড "মাধবী" (১৩২৭) ও একখানি ভাল ইংরাজী বই উপহার দিব।

প্রশ্নটি এই—আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চাল। কত রকমের ধান বাংলা দেশে আছে তাহার ঠিকানা নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন চারিশতের রকমের আমন ধান আছে। তোমরা কত রকম ধানের নাম জান ও ধানের নাম, কখন বোনে, কখন ফসল কাটে আর ইহার বিশেষত্ব কি, এই কয়েকটি কথা জানিয়া তোমরা সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দিবে। চিঠিতে ঠিকানা লিখিতে ভুলিও না।

সম্পাদক।



ট্যাপট্যাপের ভয়।

বর্ষাকাল,—সমস্ত দিন মুষলধারে বৃষ্টি নেমে সন্ধ্যার একটু আগে বৃষ্টি থেমেছে। গাঁয়ের পথ ঘাট দিয়ে আর হাঁটবার জো নেই, তা যাদের পুকুর ঘাটে না গেলেই নয় তারা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আসছে।

এদিকে অভয় তাঁতির ছোট্ট মেয়ে সারাদিন খুঁটিনাটি কাজকর্ম সেরে তার মাকে বল্‌ল, "মা, একবার আয় না,—আমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি চল্‌, আমি পুকুর ঘাট থেকে কাপড় কেচে আনি।"

মা বল্‌ল, "বাছা, আজ না হয় কাপড় কাচা থাক্‌, সন্ধ্যা হয়েছে, এখন ঘাটে গিয়ে কাজ নেই।"

মেয়ে কিছুতেই ছাড়লোনা—অগত্যা তারা দু'জনে ঘাটের দিকে চল্‌ল।

মেয়েটি পুকুরে নেমেছে আর মা ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি সময় ঘাটের খুব কাছে বেতবনের ঝোপটা নড়ে উঠল। তাঁতি-বৌ চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখে একটা মস্ত বাঘ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে।

তাঁতি-বৌর খুব বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল—তাই সে ভড়কে না গিয়ে মেয়েকে ডেকে বল্‌ল, "ওমা, শিগ্‌গির করে' উঠে আয়। আর না দেখ্‌ টিপ্‌ টিপ্‌ করে' বৃষ্টি পড়ছে।"

মেয়ে বল্‌ল, "টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টিতে ভিজবে বলে' বুঝি তোর ভয় হচ্ছে যে আমার আবার জ্বর হবে?"

মা বল্‌ল, "না বাছা, টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির ভয় করিনে—ট্যাপ ট্যাপের ভয় আছে ত, তুই শিগ্‌গির করে' আয়, আমরা ঘরে যাই।"

এদিকে ঝোপের ভিতর বসে' বাঘ ভাবছে এমন বাদ্‌লার দিনে মেলা শিকার জুটে গেছে। যেমন করেই হোক্‌ একটা ধরতে হবে। এই ভাবছেন আর লোভে জিভ্‌ দিয়ে' জল পড়ছে।

কিন্তু যখন তাঁতি-বৌ তার মেয়েকে ডেকে বল্‌ল, "ওরে, ট্যাপট্যাপের ভয় আছে ত—তুই শিগ্‌গির উঠে আয়" তখন বাঘ মশায়ের জিভের জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে এল। সে ভাবলে যে, মেয়েমানুষটা তাকে দেখেও কিনা ভয় পেলেনা আর বল্‌লে ট্যাপট্যাপের ভয় আছে। ট্যাপট্যাপ আবার কি জানোয়ার! এই সব ভাবতে ভাবতে বাঘের আর আড়ি পাতা হ'লনা। এর মধ্যে মেয়েটি পুকুর থেকে আচমকা সিঁড়িতে সিঁড়িতে উঠে এসে মা'য়ে ঝিয়ে বাড়ী পালাল।

[illegible] মনে হলো।

[illegible] করে' [illegible]

[illegible]

[illegible] হয়েছে, [illegible] মনে হচ্ছে, [illegible] নিশ্চয় [illegible] দেখলো না, [illegible] কাছে [illegible] দিয়ে দেখে [illegible] করলো না, [illegible]

[illegible] কোমার [illegible] অনেক [illegible]

এই সব ভেবে [illegible] তার বাবার [illegible] পা দিয়ে [illegible] আঁকা [illegible] চললো। [illegible] পাশাপাশি [illegible] কাছ [illegible] মাথাটা [illegible] কিন্তু

সাহসে কুলোয় না। চোর ভাবতে লাগল বাঘটা যখন এত দৌড়তে পারে তখন ঘোড়ার জাতটা খুবই ভাল। চোর নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে, তাই এত দৌড়চ্ছে। তবে খানিকটা গেলেই হাঁপিয়ে যাবে।

এদিকে ক্রমে ক্রমে মেঘ পাতলা হ'য়ে এল। পূবের আকাশে আলো দেখা দিল। ভোরবেলার সেই আলোতে চোরের ভুল ভাঙল। সে দেখল সে সত্যিকারের বাঘের পিঠে চড়ে চলেছে। ভয়ে তার গায়ের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। কি করবে ঠিক করতে পারছে না। তবে রক্ষে বাঘটা হয়ত টের পায়নি যে একটা মানুষ তার পিঠের উপর চড়েছে, টের পেলেই ত ঘাড় ভেঙে দেবে।

বাঘ ত ছুটতে ছুটতে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে' চলেছে। আর কোন উপায় নেই দেখে চোর এই মতলব করল যে কোনো গাছের নীচ দিয়ে গেলে সে একটা ডাল ধরে' ঝুলে পড়বে। চোরের অদৃষ্ট ভাল—তাই বাঘটা একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে এসে পৌঁছল, আর অমনি চোর খপ্ করে বটগাছের একটা নীচু ডাল ধরে ফেললে। চোর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বাঘটাও তার পিঠ থেকে টাপ-টা পে নেমে গেছে জেনে খুসি হ'ল।

চোর বেচারা চারিদিকে চেয়ে দেখে এক ভীষণ জঙ্গলের মাঝখানে সে বন্দী হয়েছে। পথ ঘাট কিছু দেখা যাচ্ছে না—কাছাকাছি যে কোনো লোকজন আছে তাও জানবার জো নেই। গাছ থেকে নেমে পথ খুঁজবে এমন সাহসও তার নেই —তাই সে গাছের একটা কোটরে ব'সে রইল। মনে মনে ঠিক করল তার কখনও চুরি করবে না— এবার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

এদিকে বাঘের কুটুম্বেরা ত ভেবে অস্থির—সারা রাত কেটে গেল এখনও সে ফিরলো না কেন? বাঘ্যোর দিকে বনের আর সব জন্তুও কেউ শিকারে যায়নি। বাঘের পথ চেয়ে' সবাই আশা করে আছে বাঘটা নিশ্চয়ই কিছু শিকার নিয়ে ফিরবে;



বটগাছের একটা নীচু ডাল ধরে ফেলে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিয়ে খুব ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল। শেষকালে সে বল্লে, "ও তোমার যা ঠাওর করেছ তা হতেও পারে। আজকালকার আমায় যখন ধরলে তখন গাছটাও যেন মানুষ মানুষ ঠেকছিল।"

বাঘের কথা শেষ হতে না হতেই চারদিক থেকে বাঘেরা গর্জে উঠল। আর দেরি করে কাজ নেই, এইবার দল বেঁধে গিয়ে মানুষটাকে ধরতে হবে। সর্দার বাঘ রাজি হলেন কিন্তু পথ দেখিয়ে দেবার জন্য বাঘটা কিছুতেই যেতে চাইল না। এখনও তার মনে চাঁটাপেটার ভয় আছে। অনেক বলা-কওয়ার পর সে পথ দেখিয়ে চলল আর বাঘের দল এদিকে-ওদিকে মানুষটার খোঁজ করতে লাগল। বটগাছের নীচে আসতেই সর্দার বলল, "মনে হচ্ছে যেন এই গাছের কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে; আমি তো গন্ধ পাচ্ছি।" বাঘেরা হালুম, হালুম করতে করতে কেউ গাছের উপরে, কেউ গাছের নীচে বেড়ে বেড়ে মানুষটির খোঁজ করতে লাগল।

চোর বেচারার তো প্রাণ শুকিয়ে গেছে। সে মনে মনে বল্ল যে বাঘের মুখেই প্রাণটা দিতে হবে। তবু গাছের কোটরের মধ্যে ঢুকে রইল; নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত ফেলেনা পাছে বাঘেরা টের পায়।

কিন্তু সর্দার বাঘের পাকা নাক। সে টের পেলে যে কোটরে মানুষ লুকিয়ে আছে। তখন কোটরের কাছে গিয়ে সে বল্ল, "ও, আমি গন্ধ পাচ্ছি; তবে রোস, ভাল করে দেখেনি।"

এর মধ্যে হয়েছে না কি সর্দারের লেজটি কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে, চোরের হাতে ছুরি ছিল, সে তাড়াতাড়ি ক্যাচ্ করে লেজটি কেটে নিল।

ওরে বাপ, সে কি ভীষণ চিৎকার! সর্দার বাঘ, "ও বাবা গো, আমার সর্বনাশ হল গো" বলতে বলতে গাছ থেকে লাফিয়ে ঘরের দিকে ছুটে চলল। সর্দারের এই অবস্থা দেখে আর সব বাঘেরাও তার পিছন পিছন পালাল। তারা মনে করলে তবে সত্যিই চাঁটাপেটা সর্দারের লেজ কেটে নিয়েছে।

বাঘেরা পালিয়ে গেলে চোর তো তাড়াতাড়ি কোটর থেকে বেরিয়ে এল। আর তো এই গাছে থাকা চলবে না, আবার যদি বাঘেরা এসে হাজির হয়! এই মনে করে চোর বটগাছ থেকে নেমে একটা তালগাছে উঠে বসে রইল।

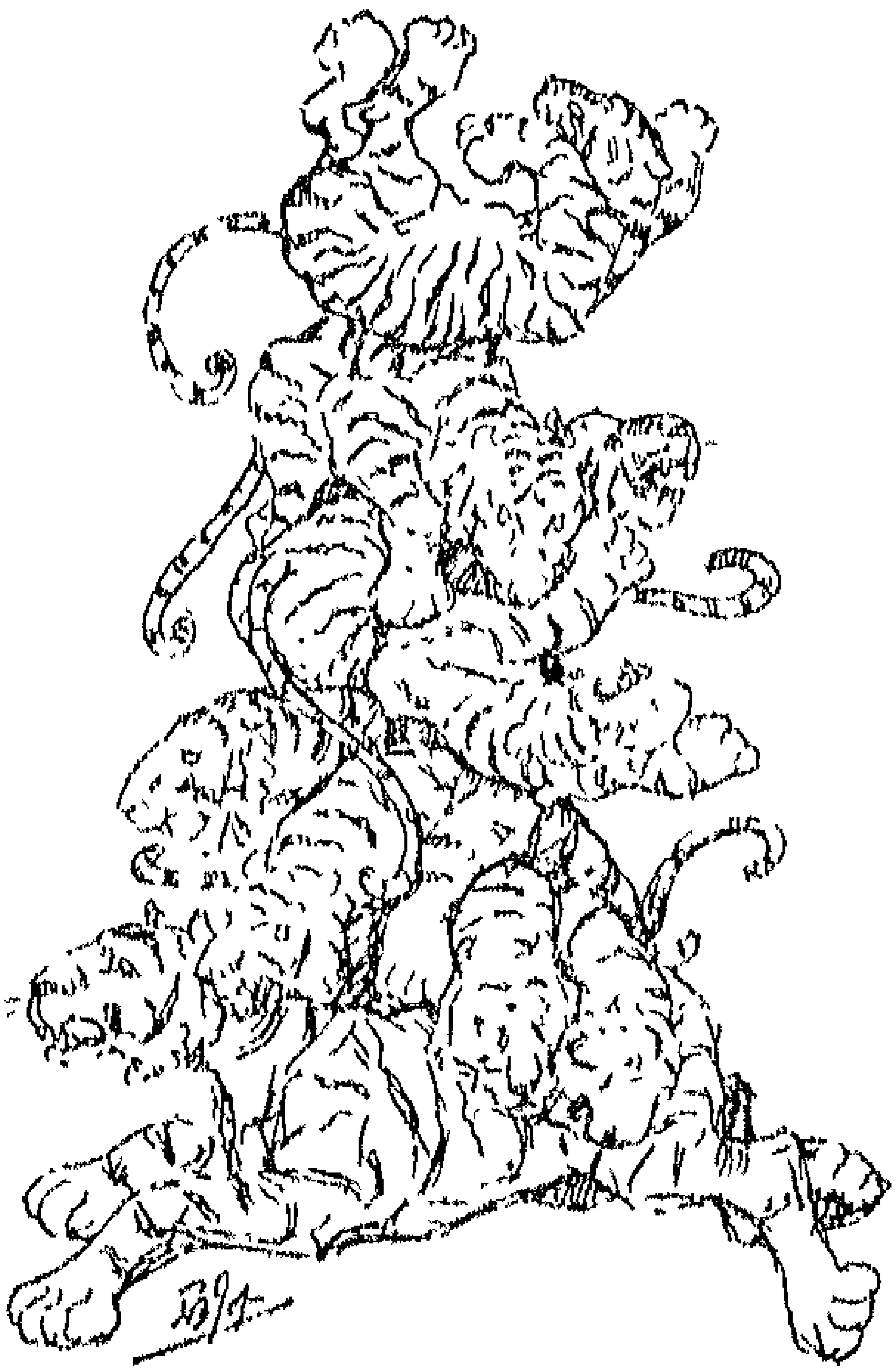
সর্দার বাঘের লেজ কাটা গেছে বলে বাঘের দল অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করল। সর্দার কাঁদতে কাঁদতে বলিল, "লেজটা গেছে বলে দুঃখ নেই কিন্তু আমায় যে সকলে বেঁড়ে বাঘ বলে ঠাট্টা করবে তা তো আমি সইতে পারব না।" অন্য বাঘেরা তাকে



যখন কিছুতেই শুনলোনা তখন আর সব বাঘ একে একে তার পিঠে উঠতে লাগলো। দু'চারটে বাঘ উঠলেই চোরের নাগাল পাওয়া যায় — চোর দেখলো এইবার আর বাঁচবার উপায় নেই।

ঠিক এমনি সময়ে চোরের মনে পড়লো যে সর্দার বাঘটি সবার নীচে বসে আছে আর তারই পিঠে বাঘের দল চড়েছে — সে খুব চেঁচিয়ে বলে উঠল "ওরে ভাই খোঁদের বক্স, সরুত নাচোবার বেঁড়ে ধরেছে—"

যেমনি বলা অমনি বেঁড়ে বাঘটা একেবারে পিঠ-ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠল, আর সব বাঘগুলো হুড়মুড় করে' এ ওর ঘাড়ে, ও এর পিঠে, কেউ বা মাটিতে পড়ে গেল। সর্দার বাঘের পিছনে পিছনে বাঘের দল ছুটে চললো। বনে ফিরে সবাই মুখ ভার করে বসে আছে এমনি সময় সেই প্রথম বাঘটা বলে' উঠল, "কি হে ভাই বাবা, আমার কথা মানলে না, খোঁড়া দেখলে ত মজা। চ্যাপটাদের ভয় আছে কিনা।"



বাঘগুলো হুড়মুড় ক'রে, এ ওর ঘাড়ে ও এর পিঠে, কেউ বা মাটিতে পড়ে গেল

এদিকে বেলা অনেক বেশী হ'য়েছে, গাঁয়ের লোকেরা বনে কাঠ কাটতে এসেছে — তখন চোর আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে তাদের সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এল। এর পর আর কোনো দিন সে চুরি করতে যায়নি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয় লোকের কাছে এই গল্প শুনেছিলাম। তোমরা অনেকেই হয়ত এই গল্পটা জান, তবু মনে হ'ল "আমার দেশে"র পড়ুয়ারা গল্পটা পড়ে' খুসি হবে

দাদাঠাকুরের গল্প।

প্রকাণ্ড দীঘি, তার চারিদিকে বাগান। সেখানে বুনোহাঁস, রাজহাঁস, গাংশালিক, মাছরাঙা, চখাচখি, সারস এরা সব বাসা বেঁধে থাকে। তারপর বসন্তের শুরু থেকেই আবার যে কোথায় উড়ে যায়, তার ঠিকানা নাই।

একদিন দীঘির পারে একটা কচ্ছপের সঙ্গে রোদ পোহাচ্ছে, এমন সময় দুটো বুনোহাঁস কাছে এসে বল্লে "কচ্ছপ ভায়া, শীত ত ফুরিয়ে এল, আমরা শীগ্গির হিমালয়ে যাচ্ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না?"

কচ্ছপ খুঁড়ে বার করে বল্লে 'আমার কি ডানা আছে যে ইচ্ছা করলেই যেখানে সেখানে উড়ে যেতে পারি? আমাকে এই দীঘিতেই জন্ম আর এখানেই মরতে হবে।"

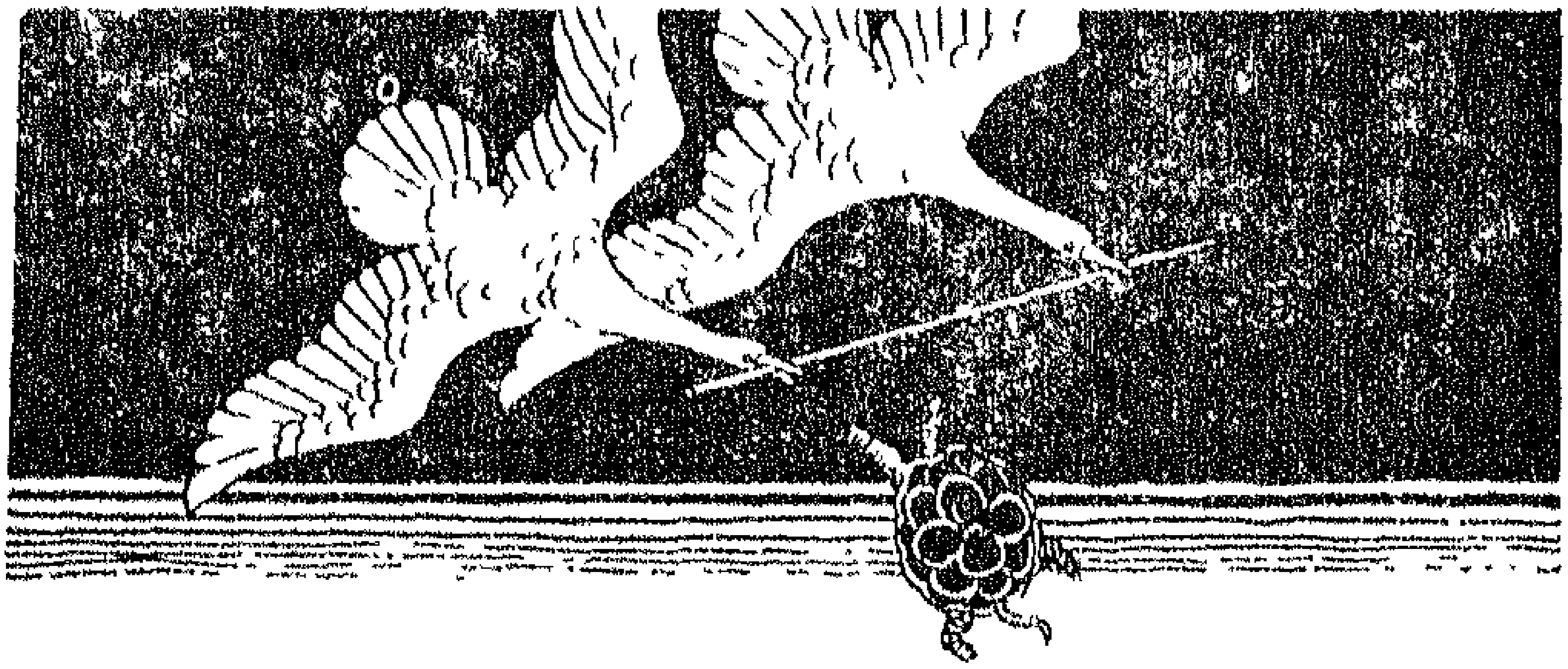
বুনোহাঁস বল্লে "তুমি যদি সত্যিই যেতে চাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। আমরা দু'জনে ঠোঁটে এক গাছা লাঠি নেব আর তুমি মাঝখানে কামড়ে ধরে ঝুলে থাকবে। যদি তোমার মুখ বন্ধ রাখতে পার তবে কোনো ভয় নেই।"

কচ্ছপ তখন রাজি হ'ল।

তারপর দুজনে কচ্ছপকে নিয়ে বুনোহাঁস উড়ে চল্ল হিমালয়ের দিকে। কত গ্রাম, মাঠ, ঘাট, নদী পাহাড় পেরিয়ে গেল। যেখানে বড় বড় শহর সেখানে বুনোহাঁস একটু নেমে আসে আর শহরের লোকেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে যে বুনোহাঁস দুটো একটা কচ্ছপকে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। এমন দৃশ্য কেউ কখনো দেখেনি। রাস্তায় লোক জমে যায়, তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছুটতে থাকে।

একদিন তারা রাজবাড়ীর উপর দিয়ে চলেছে, এমন সময় রাজার ছেলেমেয়েরা আহ্লাদ করে ছাদে বসে খেলছিল। বুনোহাঁস যেমনি মাথার উপর এসেছে অমনি তারা চেঁচিয়ে উঠল "ঐ দ্যাখ, দু'টো বুনোহাঁস একটা কচ্ছপকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" রাজবাড়ীর ছেলেমেয়ের দল চেঁচিয়ে উঠল "কচ্ছপের নাক, কচ্ছপের নাক।"

কথাটা কচ্ছপের কানে পৌঁছতেই তার খুব রাগ হ'ল। সে আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারলে না; সে বলতে গেল, 'বাঁদর ছেলের দল'; কিন্তু তার মুখ খোলা আর লাঠি ছেড়ে পড়া একসঙ্গে হ'ল—এমন অপমান কি সহ্য করা যায় না।



কচ্ছপ আর মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারে না

কিন্তু মুখ খুল্‌তেই তার যে কি দুর্দশা ঘটলো তা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝ্‌তে পারছ। বেচারা কচ্ছপ রাজবাড়ীর শক্ত পাথরের উঠোনে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। বুনোহাঁস দু'টো আর কি করবে?—একবার এসে তাদের কচ্ছপ-বন্ধুকে দেখে আবার উ'ড়ে চল্‌লো।

এদিকে রাজা শব্দ শুনে বাহিরে এসে দেখেন কোথা থেকে একটা কচ্ছপ তার উঠোনে পড়ে মারা গেছে। তিনি দাদাঠাকুরকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন "এ কচ্ছপটার এমন দুর্গতি হ'ল কেন?" দাদাঠাকুর বল্‌লেন "ওর নিজের দোষ—ও একটু কাল মুখ বন্ধ করে থাক্‌তে পারে না কেউ কিছু বল্‌লে তখুনি তার জবাব না দিতে পারলে মনে করে ওর হার হ'ল। স্বভাবের এই দোষের জন্যই ওর মরণ ঘটল"

রাজা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন তাঁর স্বভাবেও ত এমন দোষ আছে। তাই সেদিন থেকে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে বেশী কথা বল্‌বেন না, কেউ কিছু বল্‌লে ভেবে চিন্তে তার উত্তর দেবেন"

সুকুমারী।

তোমার অনেক আগে [illegible] তোমাদের গোপাল যে সুবোধ বালক [illegible] মা বাপ যেন [illegible] গিয়ে [illegible] "ভুবন" যে বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলত না, টেবিলে পড়ত, বেঞ্চিতে পড়ত [illegible] বলে বলে, বেচারা পণ্ডিত হয়ে উঠল — আর সেই [illegible] মেয়েটি [illegible], আগে চলে আগে বলে চোখ তুলে বড় করে চায় না — তার [illegible] কোনো দোষ নেই। আমি যে মেয়েটির কথা বলব সে কিন্তু একেবারে বিপরীত। [illegible] যা পাওয়া যাবে না তাই পাবার জন্যে [illegible], মা দিতে [illegible] গেছে। পাঁচ বছরের মেয়ে [illegible] দিদিমার বেনারসী [illegible] বইয়ের [illegible] রেখে [illegible] ছিল না। বইয়ের পাতার চেয়ে [illegible] মনোযোগ বেশ বেশি ছিল। আকাশের মস্ত বড় নীল পাতায় [illegible] যে বই টেবিলে খোলা থাকে তার অর্থ [illegible] আঁকজোক করে তুলত। সুশীলা হওয়া তার ঘটে ওঠে নি, আর আগে হলে কিনা [illegible] বলা যায় না। কেন না শুনেছি পাখি, এ জন্মে আমরা যেমন করি মরতে আবার [illegible] পাখী হয় পাখী আর মানুষ হয় মানুষ, তবু কারো কারো বেলায় ব্যতিক্রম, [illegible] নেই। তাই ঐ খাওয়া, পরা, পড়া আর কাজ করা, এই সব নিয়ে নিত্য [illegible] গোলমাল বাধত। কারোর চেয়ে [illegible] দিকেই মনের ঝোঁক জিনিস ছেড়ে [illegible] গালি [illegible] করা, এই ছিল তার রোজকার নিয়ম; তার [illegible] দিয়ে [illegible] মাটি [illegible] চাইতেন, এই নিয়ে [illegible] থাকত না, কিন্তু [illegible] বিশেষ কিছু [illegible] তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি

ধীরে চলা আর ধীরে বলা কতকটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, [illegible] কিন্তু উৎসাহের মুখে [illegible] ভুল হয়ে যেত। [illegible]; এ থেকেই তার পরিচয় কিছু পেলে বোধ হয় — এই তোমাদের [illegible] — এখানে আসল কথা শুরু করা যাক। মানুষকে জানতে হলে তার একটা নাম দরকার হয়। তাই একটা কিছু

নাম বলে কেউ। ভাল ধর, তার নাম, সুকুমারী—তবে নাম দেন বাপ মায়ে, আত্মীয় স্বজনে, বন্ধু বান্ধবে; নামের সঙ্গে মানুষটার যদি গরমিল হয়, তবে তার জন্যে তাকে দায়ী করা ঠিক নয় কিন্তু—কি বল?

সুকুমারী থাকত পাড়াগাঁয়ে, একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে নয়, যাকে বলে মফঃস্বল, অর্থাৎ আমাদের এই কলকাতা সহরের মত একেবারে ইট কাঠের পাঁজা নয়, পাকা রাস্তা যেমন ছিল, তেমি চারিধারে সবুজ ধানের ক্ষেত; আমের বাগান, দিঘী, পুষ্করিণীরও অভাব ছিল না একটি পাশে একটি ছোট্ট নদী ছিল, তাতে বর্ষার দিনে পশ্চিমে মাঝি-মাল্লা সমেত মাল বোঝাই করা বড় বড় নৌকার দল এসে দেখা দিত। এক সময় ষ্টীমারও চলেছিল, তবে বারমাস যা চলত, সে কচ্ছে ছোট খাট, আঁট সাঁট, ডিঙ্গী, পানসী সুরকি ঢাক রাঙা রাস্তার দু'ধারে সারি সারি প্রকাণ্ড সেগুন গাছ—তাতে কত পাখীরই বাসা—তারা কত হরেক রকমের গানই শোনাত। কোকিল, দয়েল, বউ-কথা কও, চোখ গেল, ঘু ঘু, গৃহস্থের খোকা হ'ক বুলবুল, শালিখ, হাঁড়ি-চাচা, কাঠ-ঠোকরা চড়াই, টীয়ে, খঞ্জন, মাছ-রাঙা, নীল-কণ্ঠ, সবই পালায় পালায় এসে বাড়ীর চারিদিক ঘিরে নাচ গান করে চলে যেত। বারো মাসের বাসিন্দা ছিল শুধু চড়াই শালিখ, কাক চিল। তাব থাকলে এদের ভাবভঙ্গীও ভাল লাগে।

যখন সুকুমারীর বয়স তিন পুরে চারে চলছে, তখন তাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল মেয়ে বিদুষী হয়ে উঠবে এমন দুরাশা অভিভাবকের মনে ছিল কিনা জানিনে, তার দৌরাত্ম্য হতে রক্ষা পাবার এইটি সবচেয়ে সহজ উপায় মনে হয়েছিল; বোধ হয় তাই শুনতে পাই এটা ঐতিহাসিক সত্য যে এক দিন সন্ধ্যায় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে বাতি, গেলাস পেয়ালা, পাথর, দোয়াত, খড়ি ও পুতুলে সে চৌদ্দটি জিনিষ ভেঙে চুর চুর করেছিল, তা কোনটি কৌতূহল বশতঃ কোনটি কৌতুক দেখবার জন্যে, কোনটি অসাবধানতায় বা স্বেচ্ছাকৃত অকারণ আনন্দের উচ্ছ্বাসে সেই রাত্রে সে ঘুমলে পর পারিবারিক মন্ত্রী সভায় সাব্যস্ত হল, এ মেয়ে ঘরে রাখা নয়—পাঠশালায় নির্ব্বাসনই বিধেয়। শুনে তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে না—যে কোনও দাসী এ মেয়েটির পরিচর্য্যায় টিকে থাকতে পারত না। তাদের উপর যে সব বদ ফরমায়েস হত তা পালন করা কোন ঝিএর সাধ্য নয়—তাই দুজন চাকর পালা করে এই দুর্দ্দান্ত মুনিবের মন বুঝিয়ে চলত। ঘোড়া হওয়া—গাছে চড়া—লুকোচুরি খেলা, কাণা মাছি সাজা, এ সব আদেশ ভৃত্যদ্বয় সানন্দ মনে পালন করতো, বালিকা প্রভুরও আর কোন বালাই থাকত না।

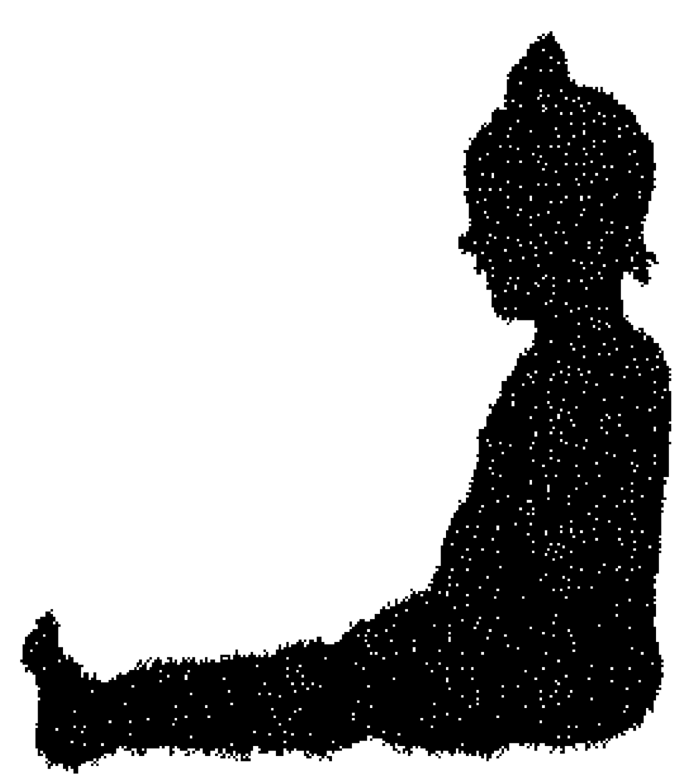
স্কুলে গেলেই মাষ্টার দরকার হয়—কিন্তু যে মেয়ে তার উপযুক্ত মাষ্টারটি খুঁজে পাওয়া

শক্ত! কেন না মেয়ে এ বিষয়ে জোর মত প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল- মাষ্টারকে পছন্দ না হলে পড়বেই না। এ সব আবদার বড় কেউ সহ্য করে না, কিন্তু দাদা মহাশয় নাতনীটিকে আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তুলে দিলেন, তিনি তার পক্ষ নিলেন। স্থির হল মাষ্টারের পরখ করা মেয়েই করবে। অনেক এসে অনেক গিয়ে শেষ টিকলেন দুজনে; একের নাম গণেশ, অন্যের নাম গোপীনাথ। ছিচকাঁদুনে মেয়ে হলে নিশ্চিন্তমনে গণেশকেই পছন্দ করত; কিন্তু সুকুমারী নাক সিঁটকে, চোখ কপালে তুলে বল্লে "বাবা! ভুঁড়ো গণেশকে কে চায়? আমি ওর কাছে পড়ব না" অগত্যা গোপীনাথ মনোনীত হলেন তিনি যে বংশীধর বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরান সে কথা তখন তার জানা ছিল না। যাহোক লেখা পড়া এ মাষ্টারের কাছে কি রকম এগোল তার খবর তোমরা শীঘ্রই পাবে।

বাড়ীতে ছুলো দেখি সুকুমারীর সমবয়সী একটি পিসি ছিলেন তার নাম কমলা। গণেশ ঠাকুর পড়াতেন তারি ভাগে। কমলা ও কমলাটি, একেবারে যাকে বলে "লক্ষ্মী মেয়ে" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গোপালের মেয়েলি সংস্করণ। ও থেকে দুষ্টুমি কখনো করত না। সুকুমারী, পিসির মাষ্টারকে বলত "গোবর গণেশ"— তার নিজেরটিকে "খ্যাপা"—তবে এটুকু বাঁচিয়ে চলত---মুখের উপর নয়, আড়ালে আড়ালে গিয়ে ডাক ছেড়ে উঠত। যাই হোক— তোমরা কিন্তু বাপু এসব শিখো না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।



"পি-পো" আর "ফি-শো"।

এক দেশেতে দুজন কুঁড়ে
ছিল কখন ভাই,
লোক খুঁজে তাদের কভু
তুলনা মিলে নাই।

সকাল-সাঁঝে দিবস-রাতে
কেবলি শুয়ে থাকা
মনের সুখে আরাম করে
বিকট নাক ডাকা!

এই তো শুধু তা'দের কাজ
সব কাজের সেরা,
ভাবত তারা জীবন খানি
এমনি সুখে ঘেরা।

বেড়ার ফাঁকে বৃথাই রবি
দেখত উঁকি দিয়ে,
বৃথাই পাখী গাইত গান
দিনের কথা নিয়ে।

ফুলের হাসি চাঁদের হাসি,
তারার সুধা-মেলা,
কুঁড়ের পাশে বৃথাই সব—
দেখেনি কোন বেলা!

কেবলি ঘুম, কেবলি ঘুম,
ঘুমই শুধু সার,—
কেমন করে হোত খাওয়া
ঠিকানা নাই তার।

এমনি ভাবে ঘুমের ঘুমে
কুঁড়ে দুজন রয়,
একটী ঘরে একই সনে
কিবা স্বপনময়।

একদিন সে ঠিক্ দুপুর
ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ,
পাড়ার মাঝে আগুন লাগে
হয় নি কারো বোধ।

সবাই মিলে করছে গোল
যুঝছে প্রাণপণে,—
অনলদেব নহেন কাবু
বাড়েন ক্ষণে ক্ষণে।

কুঁড়ে দু'জন শুয়েই আছে
খবর কিছু নাই,
ঘরের চালে আগুন ধরে
গায়ে পড়ল ছাই।

আ[illegible] দেখা

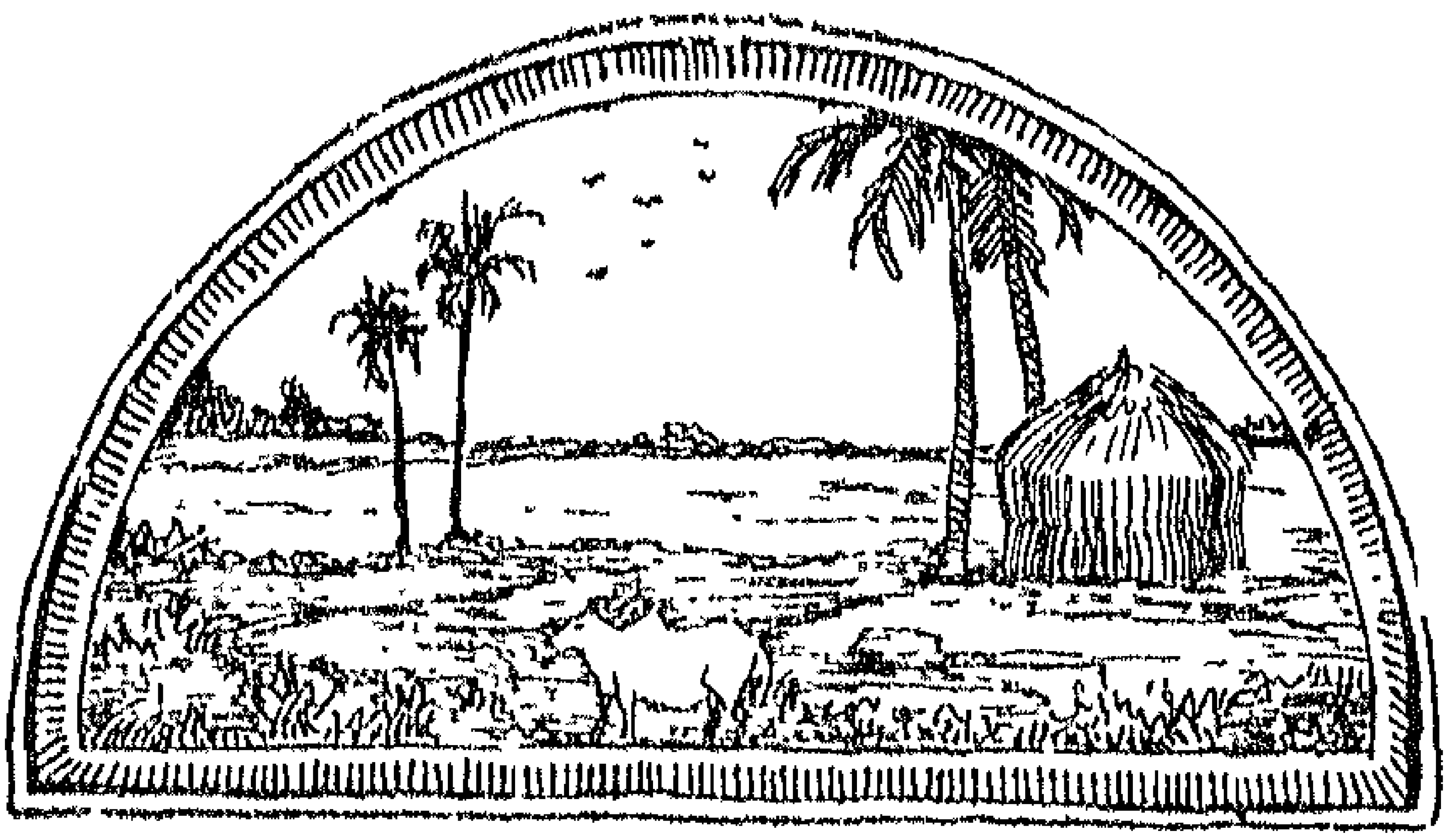
[illegible] মাঝে [illegible] [illegible] কিনা '[illegible]'
[illegible] [illegible] [illegible]
"[illegible]" অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

মাথের ঘুম [illegible] [illegible] '[illegible]' ও "[illegible]"
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আরেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],--- [illegible] [illegible],
তেমনি মাথে [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
কথা চমৎকার। [illegible] [illegible] [illegible]
মাথের ঘুম [illegible] [illegible]
ঘুমটা [illegible] [illegible],
জনম ভরে [illegible] [illegible]
[illegible] না আর [illegible]।

শ্রী জ্যো[illegible]কুমার দত্ত।





দেশের কথা

চরকা।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই চরকা দেখিয়া থাকিবে। ইহা দ্বারা তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত হয়, তারপর সেই সূতা দিয়া তাঁতে কাপড় বোনা হয়। কলকারখানার সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল দেশেই চরকা ও তাঁতের সাহায্যে কাপড় বোনা হইত। এখনও অনেক দেশে ইহার ব্যবহার আছে।

আমাদের দেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী আরম্ভ হইতে ইহা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। একদিন এ দেশের গ্রামে গ্রামে তাঁতিদের বসতি ছিল; তাঁতি পাড়ায় বৌ-ঝিরা চরকায় সূতা কাটিত, মাড় দিয়া সূতা মাজিত, নানা রঙ দিয়া সূতা রঙ্গিন করিয়া দিত, আর তাঁতি বাপ-বেটায় মিলিয়া তাঁত চালাইত। তাঁতির ঘরে সমস্ত দিনই সকলে কাজ করে, আর হাটের দিন তাঁতি কাপড় ও সূতা লইয়া গ্রামের লোকের কাছে বেচিয়া আসে। এই ব্যবস্থায় তাহার ব্যবসা চলিত বলিয়া দালালের পর দালাল তাহার কাছের মন ভুলিতে পারিতনা। সে একদিন গিয়াছে।

আমাদের দেশ

আজ আমাদের হাটে বাজারে বিদেশী কাপড়, বিদেশী গামছা প্রভৃতি বিদেশী জিনিষে ভরিয়া গিয়াছে। বিদেশী বড় বড় কলকারখানায় তৈরী হয় ও বিদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া এদেশের বাজারে বাজারে দেশী কাপড়ের জায়গা আসিয়া দখল করে। কলকারখানার সাহায্যে কাপড় বোনা হয় বলিয়া উহা দেশী কাপড় অপেক্ষা কিছু সস্তায় দেওয়া যায়। কেবল দরে সস্তা নয়, তাঁতের কাপড় অপেক্ষা দেখিতেও কিছু মিহি হয়। সস্তা ও মিহি কাপড় পাইয়া আমরা যেদিন হইতে কাপড় কেনা আরম্ভ করিয়াছি, সেদিন হইতে বিদেশী কলওয়ালার ঘরে সোনার খনি খুলিয়াছে আর আমাদের দেশের তাঁতির মুখে ভাত উঠে নাই। তাঁতিরা উপবাসী থাকিয়া যেদিন দেশের লোক বিদেশী কাপড় পরিয়া বাবু সাজিয়াছে, সেদিন হইতেই দেশের দুর্গতি আরম্ভ। তোমরা ছেলেবেলা হইতে মোটা কাপড় পরিতে আরম্ভ কর; তাহা হইলে দেশে তাঁত চলিবে, তাঁতি উপবাসী থাকিবেনা, আর, আমরা যাহা হারাইয়াছি তাহা ফিরিয়া পাইব।

বেশভূষা।

বাজারে বা সহরের বড় বড় কাপড়ের দোকানের দিকে তাকাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় কত রকম ধরণের কাপড় বিক্রয় হয়। কেবল বিদেশী কাপড়-চোপড় আমরা কিনি তাহা নয়, ছোট হইতে বড় সকলের ছেলেদের জন্য বিদেশীয় ধরণের পোষাক তৈরী করাইয়া রাখি। ইহাতে আমাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যে ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ বিদেশীয় ছেলেমেয়েদের সাজে, তাহা কখনই তোমাদের মানায় না। বড় হইয়া যদি কখনও বিদেশীয় পোষাক পরিতে হয়, সেইটুকু মনে রাখা দরকার যে উহা কাজের খাতিরে পরিতে হইয়াছে, সেই পোষাক পরিচ্ছদকে কখনও নিজের বলিয়া মনে করিওনা। অনেকে বলেন যে দেশী কাপড় ও দেশী ধরণের পোষাক পরিলে লোকে নিন্দা করে, এমন কথা নয়। ভাল হউক, কি মন্দ হউক তোমরা উহা শুনিওনা। বাঙ্গালাদেশের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে,

"তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক গর্ব, করি করজোড়,
ভরি ভিক্ষাঝুলি।

ছেলেদের বাইবেল্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যীশুখৃষ্ট জাতিতে ইহুদী ছিলেন। ইহুদীদিগের প্রাচীন রাজা ডেভিডের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। আর্য্য, রোমক, গ্রীক, মিস্‌রীয় প্রভৃতি জাতির ন্যায় ইহুদী জাতিও অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত। এই ইহুদী জাতি "হিব্রু-ইস্রায়েলাইট্" নামক অপর একটী নামেও ইতিহাস-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। পাণ্ডিত্য, ব্যবসা ও ঐশ্বর্য্যের জন্য ইহারা চিরদিন বিখ্যাত, কিন্তু ধনবান্ হইলেও অতিশয় অর্থলোলুপ ও কৃপণ বলিয়া ইহাদিগের অপযশ আছে। অতিরিক্ত সুদ গ্রহণের জন্য ইহুদী জাতি পৃথিবীর সকল দেশেই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞাভাজন হইয়াছে।

ইহুদী জাতি শৌর্য্য বীর্য্যে পৃথিবীতে কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এক সময়ে স্বাধীনতা ভোগ করিলেও, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই জাতি পৃথিবীর অপর পরাক্রান্ত জাতিগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। এক সময়ে হিব্রু-ইস্রায়েলগণ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মিসর দেশে অতি হীনাবস্থায় বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদিগের ধর্ম্মগুরু মোজেসের সহায়তায় ও কর্তৃত্বে ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্তস্থিত তুরস্কের অন্তর্গত প্যালেস্টাইন্ দেশ ইঁহাদিগের জন্মভূমি। সুনামপ্রসিদ্ধ জেরুসালেম্ এই দেশের প্রধান নগর। বারাণসী যেমন হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থক্ষেত্র, মক্কা যেমন মুসলমানদিগের তীর্থস্থান, সেইরূপ এক সময়ে জেরুসালেম্ খ্রীষ্টানদিগের তীর্থস্থান ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জেরুসালেম্ মুসলমান নৃপতিদিগের শাসনাধীনে ছিল। সেই সময়ে ইউরোপের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণ ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের তীর্থক্ষেত্র মুসলমানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক যুদ্ধ, অনেক জীবন নষ্ট হইয়াছিল এবং খৃষ্টান ও মুসলমানগণের মধ্যে এই সূত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব জাগরিত হইয়াছিল। তখন এই দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কর্তৃক পরস্পরের বিনাশ ধর্ম্মানুমোদিত পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তোমরা এই সকল বৃত্তান্ত ইতিহাস পাঠে অবগত হইবে।

ইহুদীরা মোজেসের সময় হইতে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন। মোজেসই তাঁহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহারা নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি

পূজা করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, অপর সকল মানব জাতি অপেক্ষা তাহাদের মর্যাদা অধিক এবং তাহাদের আত্মিক সাধনের জন্য ঈশ্বর বিধান নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন এবং পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপনে তাঁহাদের অধিকার। এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন। এই অহং ভাবের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে তাঁহাদের অপেক্ষা হীন মনে করিতেন এবং অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন।

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থ ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, জগতে যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়া পবিত্র ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখনই স্বয়ং ঈশ্বর অধর্মের উচ্ছেদ এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই মতবাদ শুধু যে ভারতবর্ষে প্রযোজ্য, তাহা নহে। দেখা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন সময়ে অধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই সময়ে সেই দেশে কেহ না কেহ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মকে অধর্মের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীদিগের ধর্মের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। তাহারা ধর্মের নামে নানারূপ পাপাচারের অনুষ্ঠান করিত। তাহাদের ধর্মমন্দির উপাসনার পরিবর্তে ব্যবসার স্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মজীবন একরূপ লোপ পাইয়াছিল। তাহাদের ধর্মযাজকগণ কেবল কতকগুলি অসার বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা জনসাধারণের নিকট ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। ধর্মের ভেক দেখাইয়া তাঁহারা বিলাস ও ব্যসনের সেবা করিতেন। প্রকৃত সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইত। সাধারণ লোকে ঈশ্বরোপাসনা ভুলিয়া তাহাদিগের সেবা ও আজ্ঞা-পালন করাই প্রকৃত ধর্মকার্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্মপুস্তক পাঠ ও ধর্মতত্ত্বালোচনা এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মের প্রভাব তাহাদিগের জাতীয় জীবন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল; আত্মাভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমান, ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহ তাহাদিগের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বিবেকবুদ্ধির লোপ সাধন করিয়াছিল।

ইহুদীদিগের মধ্যে ধর্মের যখন এইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল এবং ধর্মের নামে অধর্ম প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া সমাজকে নানারূপ পাপানুষ্ঠানে কলঙ্কিত করিতেছিল, ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট সেই সময়ে সত্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইহুদী-দিগের দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু



দেশ বিদেশের কথা

রাশিয়ার কথা।

মাঘ মাসের 'আমার দেশ' পত্রিকায় 'ভিক্ষুক' নাম দিয়া ছোট একটি গল্প তোমাদের বলিয়াছি যাঁর লেখা গল্প তর্জ্জমা করিয়াছি তাঁর নাম টুরগেনিভ—রাশিয়া নামক মহাদেশ তাঁর জন্মভূমি। দেশের দুর্গতি দেখিয়া ইহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল—তাই তিনি গল্প ও উপন্যাসের সাহায্যে দেশের সম্মুখে প্রকৃত অবস্থা উপস্থিত করিলেন। রাশিয়ার সহিত তোমাদের পরিচয় থাকা ভাল—তাই সেই দেশের কিছু খবর দিতেছি।

য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে আয়তনে রাশিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই বিস্তৃত রাজ্যে জনসংখ্যাও অন্য দেশ হইতে অনেক বেশী। প্রজারা অধিকাংশই চাষবাস করিয়া দুই মুঠা অন্ন সংগ্রহ করে; ক্ষেতের ফসল হইতে কলকারখানার সাহায্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে ইহাদের এমন সুযোগও নাই, তেমন বিদ্যাবুদ্ধিও নাই য়ুরোপের অন্যান্য দেশকে ক্ষেতের ফসল, বনের কাঠখড়, খনির তেল ও ধাতু জোগায় রাশিয়া। যে-দেশের চৌদ্দ আনা লোক কেবলমাত্র চাষবাসের উপর নির্ভর করে, সে দেশের লোকের অবস্থা মন্দ হইলে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের দেশেও এইরূপ অবস্থা।

য়ুরোপের সকল দেশেই প্রজারা স্বাধীন; কিন্তু রাশিয়ায় রাজার শক্তি খুব প্রবল

ছিঃ [illegible] রাজার মধ্যে [illegible] চলিতে পারিবে যে [illegible]। সুখ পাবে না, তোমাদিগও [illegible]। [illegible]

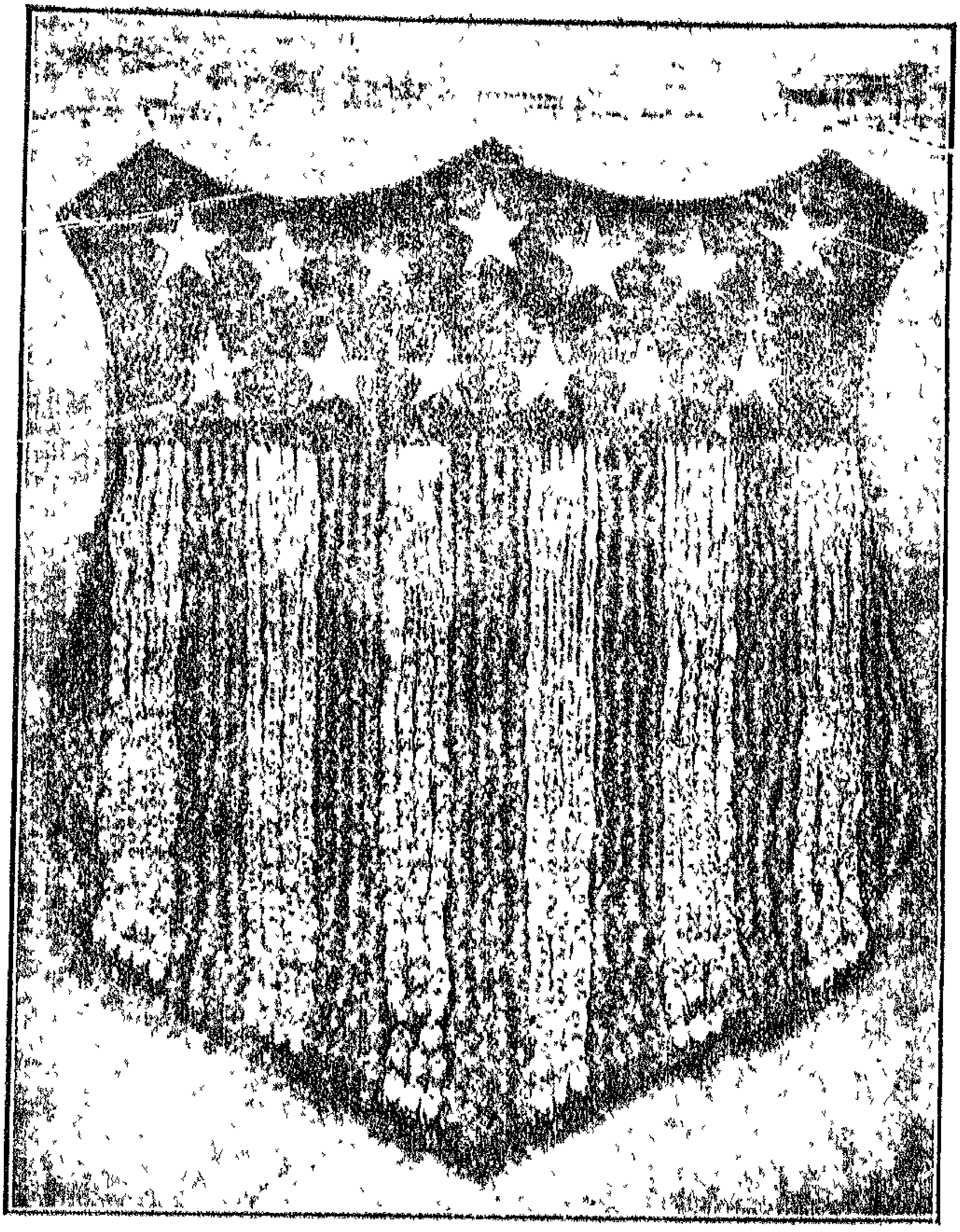
[illegible]

'ডুমা' পার্লামেন্টের সঙ্গে কিছু যুক্তি করিল বটে কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার দাবী মিটাইতে পারিল না। রাশিয়ার শিক্ষিত যাঁরা [illegible] মনে মনে [illegible] করিয়া বলিলেন যে [illegible] তাহারা [illegible] হইবেন না। [illegible] মনে হইতে [illegible] লাগিল [illegible] ক্রমশঃ [illegible] বলিতে লাগিলেন [illegible] চলিবে না। এমন করিয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে [illegible] সৃষ্টি হইল।

জাপান যুদ্ধের পরে [illegible] ; [illegible] ইহাদের [illegible] হইয়া [illegible] ইহারা [illegible] বলিতে পারিত ?

রাশিয়ার কথা পড়িলে দুঃখ হয়। [illegible] পাইয়াছে, [illegible] উপরন্তু [illegible] হইয়াছে। ইহা তাহা কি মন্দ হইয়াছে [illegible] কেহ বলিতে পারে না। আমরা শুধু এই চাই যে রাশিয়ার প্রজা সুখে থাকুক ; তাদের [illegible] জীবন যেন [illegible] সুযোগ পায় ; এমন অবস্থা ও [illegible] মধ্যে তাহারা যেন না থাকে যাহাতে তাহাদের [illegible] হইতে হয়। স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার এক এক প্রদেশ [illegible] স্বীকার করিয়াছে, তাহারা [illegible] ভয় করে নাই, এমন কি হাসিমুখে দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে। যদি সময় হয় তবে তাহা হইতে ভগবান রাশিয়াকে স্বাধীন করিয়া দিবেন।

সম্পাদক।



আমেরিকার জাতীয় পতাকা

মজার ছবি।

সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে, আমি "আমার দেশের" ছোট ছোট পাঠক-পাঠিকাদের জন্য কিছু লিখি। মাসিক পত্রে লেখা আমার অভ্যাস নয়। কিন্তু অনেক সময় বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে দেশ বিদেশের কথা বলতে ইচ্ছা হয়, তাই আজ আমেরিকার একটি খবর দিচ্ছি। যদি তাদের ভাল লাগে তবে আবার লিখবো।

আমেরিকার কথা শুনলে বা তাদের কাজকর্মের কথা পড়লে আমার মনে হয় এ দেশের ছেলেবুড়ো সকলেরই প্রাণে আনন্দের কোনো অভাব নেই। স্বদেশের উন্নতি গৌরব ও নিজেদের জন্য যে কাজ করা ভাল মনে করে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে কাজ সাধন করে তোলে। এদের উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় সে দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়, সে নিয়ম পরে বলব।

তোমরা কি আমেরিকার জাতীয় পতাকা দেখেছ? আগের পৃষ্ঠার ছবিখানি দেখ — নমুনা একরূপ হ'ল কেন তা ইতিহাস না পড়লে বুঝবে না। ছবিখানি কিন্তু কাপড়ের নিশানের ছবি নয়, তিন হাজার সৈন্য, সেনাপতি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই ছবি তুলেছে। সাজানোর কি আশ্চর্য কৌশল! আমাদের দেশে বিশজন লোককে সোজা লাইন করে দাঁড় করাতে গেলে কত গোলমাল হয় আর —



Statue of Liberty.

ত্রিশ হাজার লোক কেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে দেখ। দেখি ছবিখানির কেথাও একটি ত্রুটি ঘটতে পারেনি।

তোমরা বড় হ'য়ে যদি আমেরিকায় যাও তবে নিউইয়র্ক নামক বন্দরের কিছুদূরে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে। মূর্ত্তিট পিতল ও তামা এই দুইটি ধাতু দিয়ে তৈরী। ইহাকে বলে "Statue of libe ty" অর্থাৎ স্বাধীনতার মূর্ত্তি। চারিদিকে সমুদ্র, তার মাঝখানে পাথরের ভিত্তির উপর মূর্ত্তিটি বসানো। হাতে প্রদীপ। আমেরিকার স্বাধীনতায় খুসি হয়ে ফরাসীদেশের লোকেরা এই উপহার দেন। আমেরিকার ছেলেবুড়ো সকলেই মূর্ত্তিটাকে ভালবাসে। জাতীয় উৎসবে দেশের সর্ব্বত্র এই মূর্ত্তির ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমাদের যে ছবিখানি দেখান হ'ল, আঠারো হাজার সৈন্য একসঙ্গে মিলে শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার মূর্ত্তিটি নকল করেছে। এতগুলি মানুষ নিয়ে ছবিখানি তোলা হয়েছে অথচ কোথাও কোনো গলদ হয় নাই।

আঠারো হাজার লোক স্থির হ'য়ে দাঁড়ালে, তারপর ছবি তোলা হ'ল, আর একজন মেপে দেখ্‌লে এতে কতটা জায়গা দখল করেছে। সবশুদ্ধ—১২৩৫ ফিট্ লম্বা; পা থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত ১০০ ফিট্, ডান্‌হাতখানি ৩৪০ ফিট্, আর হাতের প্রদীপের শিখা ৬০০ ফিট্। এই বর্ণনা থেকেই বুঝ্‌তে পারছ যে ছবিখানি তুল্‌তে কত পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে, আর যাদের নিয়ে এই কাজ করা হয়েছে তাদের ধৈর্য্য ও সংযমই বা কত।

শ্রীকমলা দেবী।



মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

লেখাপড়া না শিখিলে মানুষের মন [illegible] দেশের লোক মাথা তুলিতে পারে না। যে দেশের অবস্থা ভাল হইলে [illegible] করিবার জন্য এখনও নানা চেষ্টা হইয়াছে, লেখাপড়া [illegible] বলিয়া না বুঝিলে কোনো কাজ টিকিয়া থাকিতে পারে না [illegible] প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। [illegible] ভাল বলিয়া গড়িয়া তোলেন [illegible] তাঁহারা দেশের [illegible] ঘুচাইয়া সকল আমার উন্নতি করিতে হইলে সব আগে শিক্ষার দিকে মন দিতে হইবে। এই ভিত হইতেছে শিক্ষা। [illegible] ভিত [illegible] খুঁড়িয়া [illegible] তুলিতে হয়, শিক্ষার ভিত গড়িতেও দেশের [illegible] হইতে নীচে [illegible] করিতে হইবে। যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, এই কাজের ভার তাঁহাদের উপর। [illegible] এই কাজে মন না দেন [illegible] থাকিবে।

আজ তোমাদের কাছে [illegible] কথা [illegible] তিনি [illegible] বুঝিয়াছিলেন, [illegible] তিনি ভুল করিয়া যান নাই। দেশের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের বলিতেন, "দেশের দুর্গতি দূর করিতে চাও ত শিক্ষা বিস্তার কর" আর দেশের শাসনকর্তাদের বলিতেন, "তোমরা [illegible] কল্যাণ যদি যথার্থ ইচ্ছা কর তবে এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে [illegible] অল্পব্যয়ে শিক্ষা [illegible] হইতে [illegible]।"

শিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন দেশের মধ্যে [illegible] মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলের কথা মনে হইতেছে। [illegible] সঙ্গে তাঁহাকে [illegible] করিয়া তোমাদের কাছে তাঁহার জীবনের দু একটা কথা বলিতেছি।

ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকে মহারাষ্ট্র দেশ। তোমরা ছত্রপতি শিবাজীর নাম শুনিয়াছ [illegible] গোখলে এই দেশের লোক ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে [illegible] ব্রাহ্মণেরা বিলাসী নন—তাঁহাদের জীবনযাত্রায় কোনো আড়ম্বর নাই, বিদেশী ভাব তাঁহাদের জীবনকে স্পর্শ করে নাই

যাঁহার পিতা সামান্য কিছু রোজগার করিতেন, কিন্তু গোখলের বয়স যখন পাঁচ কি ছয়

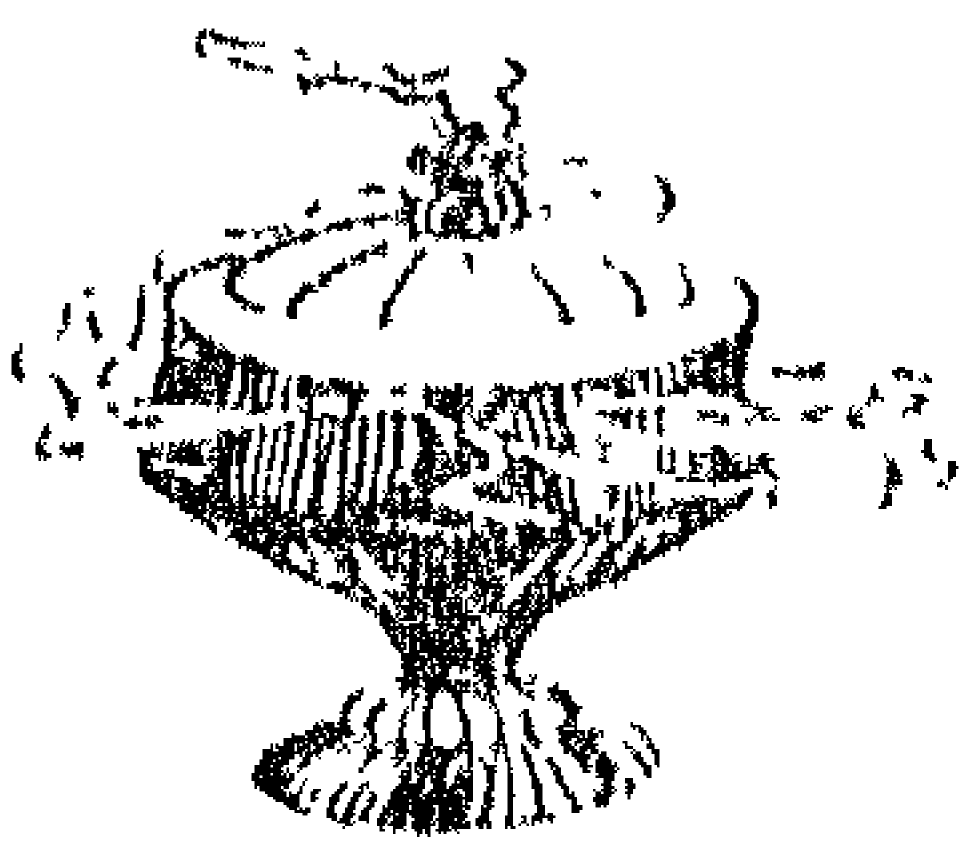
হইবে তখন তাহার পিতার মৃত্যু ঘটিল। গোখ্‌লেকে মানুষ করিবার ভার পড়িল বিধবা মা ও আত্মীয় স্বজনের উপর কোলাপুরের বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষকের গোখ্‌লের বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইলেন কোলাপুরের পাঠ শেষ করিয়া তিনি বোম্বাই সহরের এক বড় কলেজে—এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে,—গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি বি, এ, পাশ করিলে আত্মীয় স্বজনেরা চেষ্টা করিলেন তাহাকে ইঞ্জিনিয়ার কলেজে ভর্ত্তি করিতে। কিন্তু ভাগ্য বিধাতা গোখ্‌লের জন্য সে ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন নাই—তাই ইহা সম্ভব হইল না পুণা সহরের এক বিদ্যালয়ে গোখ্‌লে শিক্ষকের কাজ লইলেন।

তখন মহারাষ্ট্রদেশের একদল দেশসেবক দেশ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নানা সভা সমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন বেতনভোগী শিক্ষকের দ্বারা যথার্থ কাজ হইতেছে না—এমন লোক চাই যাহারা ইহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া কাজে ব্রতী হইবে। 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি' নাম দিয়া এক সমিতি গঠন করা হইল; সমিতির সভ্যেরা প্রতিজ্ঞা করিলেন আজীবন মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনে কাজ করিবেন।

ত্যাগ ও স্বদেশ প্রীতির এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া গোখ্‌লের মন উৎসাহিত হইয়া উঠিল; তিনিও সমিতির কাজে যোগ দিলেন। পুণার যে বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষক ছিলেন, তাহা দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতির চেষ্টায় বড় এক কলেজে পরিণত হইল এই কলেজের নাম ফারগুসন কলেজ। গোখ্‌লে প্রায় আঠারো বৎসর ফারগুসন কলেজে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়াছিলেন—যে কাজ হাতে লইলেন তাহা সার্থক করিবার জন্য দিবারাত্রে তিনি পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাইয়া মহারাষ্ট্রদেশের একজন মহাপুরুষ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে তাহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন এখানে দাঁড়াইয়া গোখ্‌লে একদিকে স্বদেশকে অপরদিকে দেশের শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানাইলেন সভাসমিতি কংগ্রেস লইয়া তিনি কি দুরন্ত পরিশ্রমই না করিয়াছিলেন। সে সব কথা তোমাদের পরে বলিব কিন্তু প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে যেমন ইহার শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মহাত্মা গোখলের শেষ জীবনের একটি কর্ম্মচেষ্টা তেমনই উজ্জ্বল। তিনি দেখিলেন সমস্ত ভারতবর্ষে হাজার লোকের মধ্যে দেড়শত লোক লিখিতে পড়িতে পারে। যে দেশের এত লোক অশিক্ষিত সে দেশের লোকের মনে স্বদেশের জন্য টান জন্মিবে কেমন করিয়া; কেমন করিয়াই বা তাহারা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইবে? তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন যে এমন এক আইন করা হউক যাহাতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেই হইবে ও তাহার জন্য দেশের শহরে, গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক। গোখলের এই প্রস্তাবে সমস্ত দেশ সাড়া দিল; দেশসেবকেরা সম্মতি দিলেন কিন্তু শাসনকর্তারা বলিলেন যে এরূপ ব্যবস্থা করিবার সময় এখনও আসে নাই।

গোখলে আজ বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত শিক্ষার এমন আয়োজন করা হইত; তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা স্বদেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করি তবে নিশ্চয়ই এমন একদিন আসিবে যেদিন দেশের কোটি কোটি লোক লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার সুযোগ পাইবে



সম্পাদকের কথা—

আগের মাসে বলিয়াছিলাম, এই মাস হইতে মেয়েদের উপযোগী একটি করিয়া বিষয় বাহির করিতে চেষ্টা করিব। আমরা যেরূপ প্রবন্ধ চাই, সেরূপ প্রবন্ধ এখনও পাই নাই। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ, মেয়েদের পাঠোপযোগী একটি বড় গল্প দিয়াছেন। সেই গল্পটি এই মাস হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

*　　　*　　　*　　　*

বাঙালীর ছেলে মেয়েরা কি করিয়া সব বিষয় খোঁজ খবর রাখিতে পারে, সে সম্বন্ধে তোমাদের মত জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা তোমাদের কেহই সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখিলে না। আরও এক মাস অপেক্ষা করিয়া দেখি—এর মধ্যে তোমাদের যা কিছু বলার আছে লিখিও। তোমরা লিখিলে পর সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

*　　　*　　　*　　　*

দেশমাতাকে

পূজা

ষষ্ঠ ।

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পের কয়েকটি বিষয়।

আবিষ্কারের গল্প

- জাহাজ পোড়ান (আর্কিমেডিস)
- গ্যালিলিও
- ফলটি পড়িল কেন ? (নিউটন)
- রেলগাড়ীর উৎপত্তি (জেম্‌স্ ওয়াট্)
- বেলুন
- এয়ারশিপ্
- এরোপ্লেন

বিজ্ঞানের দান

- নাবিকের দিক্ নির্ণয় যন্ত্র
- মুদ্রাযন্ত্র
- ঘড়ি
- বিনা ঘোড়ায় কল চালান (সাইকেল ও মোটরগাড়ি)
- দিয়াশলাই
- ডিনামাইট
- বৈদ্যুতিক শক্তি
- বায়স্কোপ
- দূরবীক্ষণ
- অণুবীক্ষণ
- এক্স-রে
- টেলিফোন
- টেলিগ্রাফ
- তারহীন টেলিগ্রাফ
- দূরত্বের হ্রাস
- আধুনিক চিকিৎসা
- উদ্ভিদের প্রাণ

বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য

* *

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩২



সম্পাদক—
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস্, সি
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ।

আমার দেশ

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা | চৈং ১৩৩৭



স্বর্গীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ



গতবারের পত্রিকায় তোমাদের মহাত্মা গোখেলের জীবনী বলিয়াছি। তিনি একবার বড়লাটের সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী যেমন তেমন জাতি নহে। ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা, কবি, বৈজ্ঞানিক, আইনজ্ঞ কিছুরই অভাব নাই। বাঙ্গালার রত্নগুলির নাম করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহারা পৃথিবীর যে কোন দেশের অলঙ্কার বলিয়া আদৃত হইতেন। মহাত্মা যে যুগে যাঁহাদের নাম করিয়াছিলেন, আজ বঙ্গমাতার গলা হইতে সেই রত্নগুলির একটি রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে—তিনিই স্বর্গীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ। তিনি বুদ্ধিমান্ উকিল

ছিলেন, [illegible] মনের [illegible] তাঁহার [illegible] পূজার নৈবেদ্য [illegible] গেলেন তাই [illegible] তাঁহাকে [illegible] মাতার হৃদয়ের দিকে [illegible] করিল [illegible] নাই —তাই [illegible] চলিল [illegible] দান করিয়া গিয়াছি [illegible] এই দান [illegible] আমাদের [illegible] এক সময়ে [illegible] থাকে [illegible] দান করিয়া গিয়াছেন [illegible] তোমরা ভুলিও না।

যদি সবাই দেশী কাপড় পরি

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে দেশী কাপড়ের [illegible] শোনা যাইতেছে দেশী কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলে দেশের ভাল হইবে; কিন্তু কি করিয়া হইবে তোমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে।

প্রথম কথা,—দেশী কাপড় ব্যবহার করিলে স্বভাবতঃ বিদেশীয় কাপড়ের বিক্রী কম হইবে, বিদেশীয় কাপড় কম বিক্রী হইলে দেশী কাপড়ের আমদানী বাড়িতে থাকিবে, বিদেশী কাপড় ব্যবসায়ীদের পেটের ভাত জুটাইতে [illegible] তোমাদের চাকরি [illegible] মজুর না হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া দেশের জন্য [illegible] পারিবে।

দ্বিতীয় কথা—বিদেশী কাপড় কিনিয়া আমরা যত টাকা বিদেশে [illegible] দিই, দেশী কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলে তাহা আমাদের দেশেই থাকিবে। সে টাকা কম নহে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় একশত পঁচিশ কোটি টাকার কাপড় আমরা কিনি [illegible] মাত্র কোটি টাকা—কিন্তু যাহারা কাপড় [illegible] এই [illegible] পাওয়া যায়। বাজারে আমরা যে দর দিয়া কাপড় কিনি তাহা ইহার [illegible] হইবে।

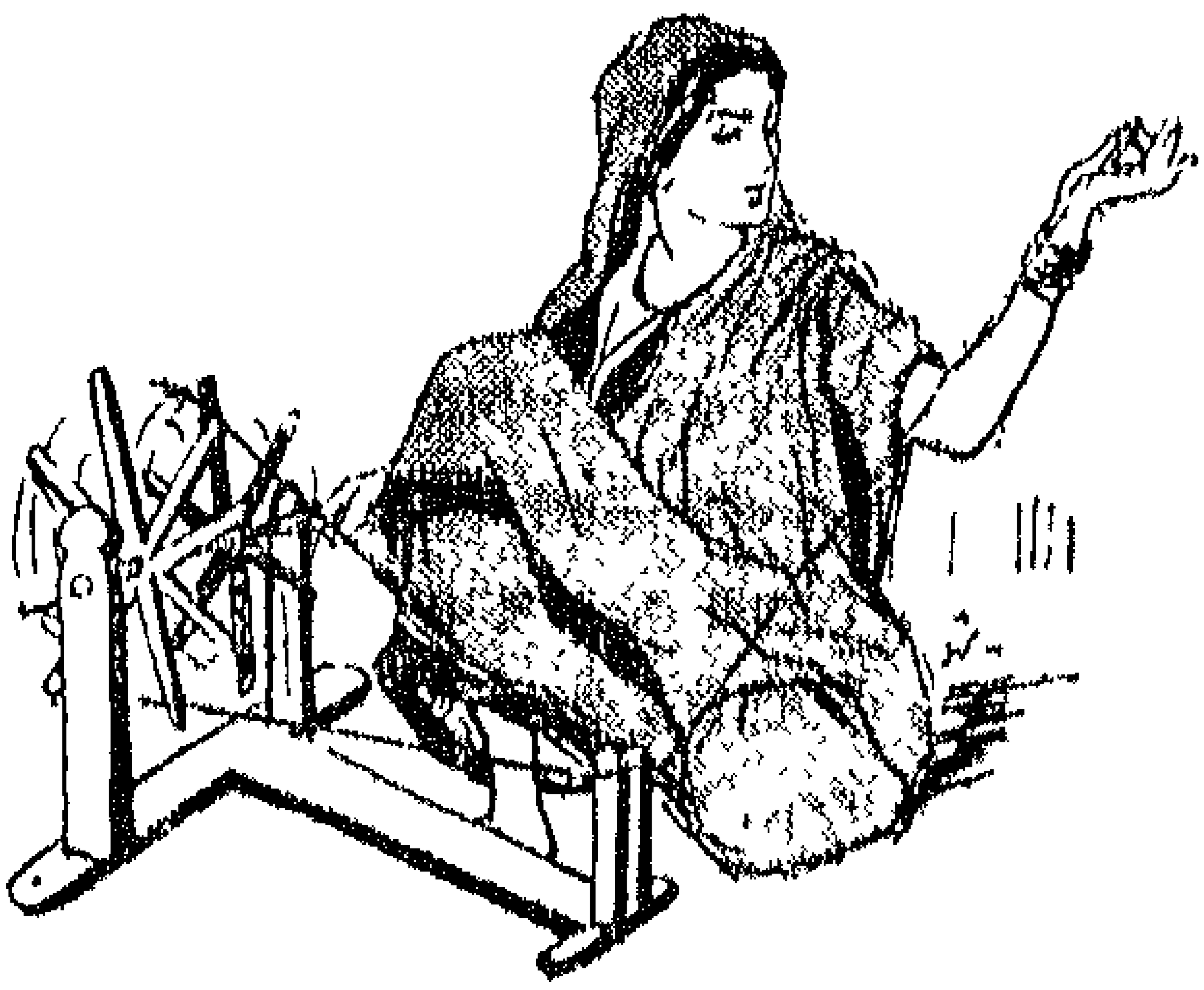
একশত পঁচিশ কোটি টাকা—তোমরা শ্লেটের উপর অঙ্কটি লিখিয়া একবার ভাবিতে চেষ্টা কর যে বিলাতী কাপড়ের জামা, মোজা, গেঞ্জি এই সব কিনিয়া আমরা কত টাকা বিদেশে পাঠাই।

দেশী কাপড়

দেশী কাপড়ের কথা বলিতে গিয়া তোমাদের একটা কথা মনে করাইয়া দিতেছি। দোকানে গিয়া দেশী কাপড় চাহিলে দোকানদার তাঁত ও দেশীয় মিলের নানা রকম কাপড় বাহির করিয়া দেয়। তোমরা কাপড় হাতে লইয়া সুতা মিহি কি মোটা দেখিয়া লও। মোটা হইলে তোমরা অনেকে ইহা পছন্দ কর না। মিহি সুতার কাপড় সাড়ী তাঁতের বোনাই হউক আর দেশের মিলেরই হউক, ইহাকে সম্পূর্ণ স্বদেশী কাপড় বলা চলে না। মিহি সুতা আসে বিদেশ হইতে। আমরা গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ মণ সুতা প্রতি বছরে আমদানী করি। স্বদেশী কাপড়ের কলে কিছু কিছু সুতা কাটা হয় বটে, কিন্তু ইহা চল্লিশ কিম্বা আটচল্লিশ নম্বরের সুতা এদেশে মিহি সুতা তৈরী হয় না।

চরকা

কথার পিঠে কথা ওঠে—তাই আবার চরকার কথা পাড়িলাম। বিলাতী সুতা না হইলে স্বদেশী কলগুলি কাপড় বুনিতে পারে না ও তাঁতির তাঁত বন্ধ থাকে। এই জন্য দরকার হাতে কাটা সুতা। সুতা মোটা হইলেও ইহা খাঁটি স্বদেশী হইবে। তাই দেশ-সেবকেরা বলিতেছেন, চরকায় সুতা কাটা বুনিবার লোক আছে কিন্তু সুতা নাই। সকলেই যদি অল্প অল্প নিজের সুতা কাটিতে পারে, তাহা হইলে দেশের তাঁতিরা বিদেশী সুতা না কিনিয়া হাতে-কাটা সুতা দিয়া তোমাদের জন্য কাপড় বুনিয়া দিবে।



চরকা চালান কিছু শক্ত নয়—তোমরা সহজেই শিখিতে পার। নিজেদের প্রয়োজন মত সামান্য কিছু সুতা কাটিতে পারিলেও জানিবে তোমরা দেশের জন্য কিছু করিলে।

কেহ কেহ বলেন আমাদের দেশে যথেষ্ট তুলা পাওয়া যায় না। ইহা সত্য নহে আমাদের দেশ হইতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় আট কোটি মন তুলা বিদেশীরা খরিদ করে।

দেশী কাপড় [illegible] যদি আমরা এমন সংকল্প করি যে [illegible] তবে দেশে [illegible] তাহা বিদেশী [illegible] পারিবে না [illegible] আমরা [illegible] তাহা হইলে আমাদের বিদেশ হইতে [illegible] হইবে [illegible] আর বিদেশী [illegible] পারিবে না।

জাপানের কথা

তোমরা জাপানের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ [illegible] মানচিত্র খুলিয়া দেখিলেই মহাসাগরের [illegible] তোমাদের চোখে পড়িবে। জাপানীরা দেশকে ও দেশের [illegible] খুব ভালবাসে। [illegible] বিদেশীরা ইহাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লয় সেইজন্য ইহারা সবল ও সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতির সঙ্গে [illegible] পারে। অল্পকাল মধ্যে ইহারা ব্যবসা ও বাণিজ্যে কত উন্নতি করিয়াছে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। জাপানের উন্নতির [illegible] আমাদের [illegible] উচিত।

প্রথম কারণ [illegible] ও মাছ খায় [illegible] দেখা যায় না। [illegible] অল্পেতেই সন্তুষ্ট। আমাদের [illegible] চলে, [illegible] ইহাতে কেবল সময় ও শক্তি নষ্ট হয় তাহা নহে [illegible] পেটের পূজা করিবার চেষ্টায় আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। [illegible] পরিমাণে খাইলেই শরীর সুস্থ থাকে। [illegible]

জাপানী মেয়েরা গহনা পরিতে ভালবাসে না [illegible] ইহাদের আর বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয় না। [illegible] ইহাদের মন নাই বলিয়া ইহারা অন্য কাজে মন দিতে পারে।

দ্বিতীয় কারণঃ—জাপানীরা কাজকে ডরায় না। কাজ যতই শক্ত হউক না কেন ইহা ভাল করিয়া করিবার জন্য ইহাদের খুব চেষ্টা আছে। আমাদের দেশে কাহাকেও যদি বলা যায় "তুমি এই কাজটা ভাল করিয়া করিতেছ না" সে অনেক সময় রাগ করে মনে করে তাহাকে অপমান করা হইল। জাপানীরা কিন্তু ইহা মনে করে না। কেমন করিয়া জিনিসটি নিখুঁত হইবে, ইহাই জাপানীদের ইচ্ছা ও চেষ্টা।

তৃতীয় কারণঃ—জাপানীরা নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখে। ইহা না থাকিলে কোনো জাতি কখন বড় হইতে পারে না। আমরা এই বিশ্বাস হারাইয়াছি। তাই আমাদের কানের কাছে বিদেশীরা বলিতে থাকে "তোমরা অকর্মণ্য, তোমাদের দিয়া কোনো কাজ নিখুঁত করা হয় না; তোমরা বেশী পরিশ্রম করিতে পার না, তোমাদের দ্বারা কোনো কাজ হইবে না—" আর আমরা সেই কথা মানিয়া লই। নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস থাকিলে আমরা পদে পদে অপমানিত হইতাম না।

চতুর্থ কারণঃ—যাহা স্বদেশের জন্য ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা করিতে জাপানীরা কোনো দ্বিধা করে নাই। যখনই বুঝিয়াছে কোনো লোভ বা অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ায় দেশের ক্ষতি হইতেছে, তখনই ইহারা ঐ সকল দুর্বলতা ত্যাগ করিয়াছে। আজ পৃথিবীর চারিদিকে সকল জাতিই বড় হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে—জাপান ইহা লক্ষ্য করিয়া নিজেরা শক্তিশালী হইবার জন্য জোট বাঁধিল। আমরাও যদি মানুষ হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে দুর্বলতার যে সকল কারণ আছে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে।

একটী প্রশ্ন

বিদ্যালয়ের ছুটিতে চারিটা বাজিতেই ছেলের দল কলিকাতার রাস্তায় আসিয়া ভীড় করিয়াছে—আমি একদিন সেই ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ছেলেরা কি বিষয় বলাবলি করিতেছিল তাহা শুনিবার ইচ্ছা হইল—তাই আমি আস্তে আস্তে ইহাদের সঙ্গে পথ চলিতে লাগিলাম। ছেলেদের এই অনেক বকাবকি চেঁচামিচির মধ্যে একটি কথা আমার কানে আসিল—তাহা এই। একজন বলিল "ভেবেছিলাম আজ পণ্ডিত মশায়কে জিজ্ঞাসা করব স্বরাজ মানে কি?" একটি বালক তাহার উত্তরে বলিল, "স্বরাজ মানে স্বদেশী।" তারপর, দুইজনে ইহা লইয়া অনেক কথাই বলিল; বোঝা গেল স্বরাজ কথাটির অর্থ ইহারা ঠিক জানে না। আমি সেই ছেলের দলকে যাহা বলিয়াছিলাম আমার দেশের পড়ুয়াদের আজ তাহা বলিব।

স্বরাজ কথাটি দুইটি শব্দ মিলিয়া হইয়াছে—স্ব আর রাজ। স্ব মানে নিজ, আপন। স্বরাজ মানে আপনি আপনার রাজা। এমন সকল অভ্যাস আমাদের মনকে পুরামাত্রায় পাইয়া বসে যে আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি; তখন আমরা আর 'আপনি আপনার রাজা' হইতে পারি না। দেশের মধ্যে যখন এমন দুর্গতি ঘটে যে, দেশ নানাপ্রকার অভ্যাস ও সংস্কারের দাস হইয়া পড়ে তখন সে দেশ "আপনি আপনার রাজা" হইতে পারে না। আজ তোমরা চারিদিকে

'স্বরাজ' কথাটি শুনিতেছ, কিন্তু ইহা পাইতে হইলে আমাদের অনেক অভ্যাস ছাড়িতে হইবে, অনেক পুরাতন সংস্কার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, ও সেই ভাঙা ভিতের উপর আবার নতুন করিয়া ইমারত গড়িবার জন্য অনেক স্বার্থ অনেক সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিতে হইবে কিন্তু ইহা করিবার পূর্ব্বে তোমার নিজেদের জীবনকে স্বাধীন ও সক্ষম করিয়া তোল—তাহা হইলেই তোমার দেশ 'স্বরাজ' পাইবে

একভাষা

গত মাসে তোমাদের বলিয়াছি যে আমাদের দেশে সকলেরই হিন্দী-শিক্ষা করা দরকার· কোনো এক দেশীয় ভাষায় আমরা যদি পরস্পরের কাছে মনের ভাব বলিতে পারিতাম—তাহা হইলে দেশের পক্ষে ভাল হইত কেহ কেহ বলেন ইহা সম্ভব নহে; কিন্তু য়ুরোপেও একটি ভাষা চালাইবার আয়োজন করা হইয়াছে আজ তোমাদের সেই কথা বলিতেছি

য়ুরোপের মানচিত্র খুলিয়া তোমরা পোল্যাণ্ড খুঁজিয়া বাহির কর পোল্যাণ্ডের যে· অংশটুকু রাশিয়ার হাতে পড়িয়াছে, সেই অংশে একটি সহর আছে—তার নাম বিয়ালীষ্টক্ সহরে অনেক জাতির বাস—তাই ভাষাও নানাপ্রকার। সেখানে কেহ রাশিয়ান কেহ জর্ম্মান কেহ পোলিস্ ভাষায় কথা বলে আবার য়াহুদীরা ইডিস্ নামক এক খিচুড়ী ভাষা বলিত। সকলেই নিজ নিজ ভাষা ভিন্ন অন্য কারো ভাষা শিখিত না। এই কারণে ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না—এমন কি কখন কখন ঝগড়া বাধিয়া খুন খুনি হইত পরস্পর পরস্পরকে যদি বুঝিতে পারিত, এক ভাষায় যদি মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে এইরূপ ঘটিত না। কেবল যে বিয়ালীষ্টক্ সহরে ভাষা লইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঝগড়াঝাটি হইত তাহা নহে, য়ুরোপের অনেক স্থানেই ইহা ঘটিত

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিয়ালীষ্টক্ সহরের এক বিদ্যালয়ে য়াহুদীদের একটি ছেলে পড়িতে যাইত তাহার নাম লুডোভিক্ জ্যামেনোফ্ য়াহুদীদের উপর নানা কারণে অন্য জাতিরা বড় বেশী অত্যাচার করিত—তারপর ভাষা লইয়া সময়-অসময়ে পথে ঘাটে ইহাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়া উঠিত

ছেলেমানুষ লুডোভিকের মনে হইল যে, কোনো এক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে হয়ত এক জাতি অপর জাতিকে সহজে বুঝিতে পারিবে আর তাহা হইলে অনর্থক ঝগড়াঝাটি, মারামারি ও খুনোখুনি হইবে না কিন্তু কেহ যে কাহারও ভাষা শিখিতে চায় না তাই লুডোভিক্ ইংরেজী, ফরাসী ও জর্ম্মান ও রাশিয়ান ভাষার অভিধান ও

ব্যাকরণ খুঁজিয়া কতকগুলি কথা রচনা করিলেন, তাহা ব্যবহার করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হইল। [illegible] এই ভাষা শিখাইবার চেষ্টা করিলে লুডোভিককে লোকে পাগল বলিতে লাগিল। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই ভাষা শিখাইতে পারিলে জগতের মঙ্গল হইবে, তাই তিনি উঠিয়া পড়িয়া এই ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ পৃথিবীর অনেক দেশে এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। য়ুরোপে ও আমেরিকায় অনেক সভাসমিতিতে এই ভাষা ব্যবহার করা হয়। ১৯১১ সালে বেলজিয়ম্ দেশে এক মহাসভা বসিয়াছিল। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সেখানে লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখানে গান, বক্তৃতা, নাটক, সমস্তই এই ইহুদীর ছেলে লুডোভিকের রচিত ভাষায় হইয়াছিল। যাহা একদিন কল্পনামাত্র ছিল, তাহা সত্য সত্যই ঘটিল দেখিয়া লুডোভিক না জানি কত খুসি হইয়াছিলেন।

লুডোভিকের রচিত সেই ভাষার নাম "এস্পেরান্টো"।

পৃথিবীর সব জাতি এক ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে, দেখ ইহার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। আর, ভারতবর্ষে কি আমরা এক ভাষায় কথা বলিতে পারিব না? ভারতবর্ষের অনেকেই হিন্দী জানে—মাদ্রাজ, বাঙ্গলা ও আসাম এই তিন প্রদেশের লোক জানে না। তোমরা হিন্দী শিখিবে এইরূপ সংকল্প কর। "আমার দেশ" তোমাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবে।



দাদাঠাকুরের গল্প

পশুরাজ সিংহের অদৃষ্টে অনেকদিন ভাল শিকার জোটে নাই। বনের জানোয়ারেরা সকলেই সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে, পশুরাজ শিকারে বাহির হইলেই সকলে সাবধান হয়। দিন রাত্রি পশুরাজ ভাবেন কেমন করিয়া উহাদের ধরা যায়।

একদিন পশুরাজ শুনিতে পাইলেন যে বাঘ, নেকড়ে, ভালুক সকলেই নালিশ করিতেছে যে ভিন্দুবনে আর শিকার জুটিতেছে না। ব্যাপার গুরুতর বটে—শিকার না পাইলে ইহাদের দিন কেমন করিয়া চলে। তাই ইহারা এক সভা ডাকিল—পশুর রাজা সিংহ মহাশয় হইলেন সভাপতি।

বনের হরিণ, শুয়র, খরগোস্ এমন কি গাঁয়ের গরু বাছুরগুলি পর্যন্ত যে ভারি সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে সকলেই ইহার সাক্ষ্য দিল। তারপর এই সাব্যস্ত হইল যে, যেমন করিয়া হউক শিকারের একটা ভাল ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে পশুরাজ বনের বাহিরে আসিয়া গাঁয়ের দিকে চলিলেন। গাঁয়ে ঢুকিতে যাইবেন এমন সময় ধোপাদের একটা গাধা চেঁচাইয়া উঠিল। এমন বিকট স্বর তিনি কখনও শোনেন নাই। তাঁহার মনে হইল এই জানোয়ারের সাহায্য লইলে হয়ত শিকার পাইবার কিছু সুবিধা হইবে। এইজন্য তিনি গাধার কাছে গিয়া বলিলেন, "তুমি ত বনে থাক না, তাই বনের রাজাকে চিনিতে পারিলে না। আমি সিংহ—পশুদের রাজা। তোমার গলার আওয়াজ শুনিয়া তোমার কাছে আসিলাম।"



চেঁচাইয়া উঠিল

গাধার একটু ভয় হইল কিন্তু সিংহরাজের মুখে তাহার কণ্ঠস্বরের প্রশংসা শুনিয়া মন খুসিও হইল। সে ঘাড় নীচু করিয়া সিংহকে নমস্কার করিল।

সিংহরাজ বলিলেন, "তুমি পশু হইয়া কেন ধোপার বোঝা বহিয়া বেড়াইবে? চল, আমার সঙ্গে চল। আমার রাজদরবারে তোমার মতন গায়ক থাকা চাই।"

গাধা বলিল, "আমি হুজুরের কি কাজে লাগিতে পারি?"

সিংহরাজ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি শিকারে বাহির হইলে তুমিও আমার

সঙ্গে বাহির হইবে। বনের একপাশে তুমি চেঁচাইতে আরম্ভ করিলে নিরীহ জীবজন্তুরা ভয়ে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে আর আমি দলবল লইয়া অন্যদিকে পাহারা দিব। ছুটিতে ছুটিতে ইহারা তখন আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে।"

গাধা রাজি হইল।

সিংহ মহাশয় বনে পৌঁছিয়া গাধাটিকে চেঁচাইতে বলিলে সে প্রাণপণে গলা ছাড়িয়া দিল; আর সিংহ দলবল লইয়া বনের অন্যদিকে ঘাটি পাতিয়া বসিলেন।

তখন রাত্রি—বনে কোনো সাড়াশব্দ নাই। কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, তার শেষে গাছে শিয়ালের চীৎকার। নিরীহ জন্তুরা সকলেই নিজ নিজ গর্তে ঘুমাইয়া আছে, এমন সময় গাধার ডাকে ইহারা চমকিয়া উঠিল, সে যে কি ভীষণ বিকট শব্দ। কিছুতেই উহা থামিতেছে না শুনিয়া নিরীহ প্রাণীদের মনে ভয় হইল; তাহারা ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পশুরাজ যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই হইল। একে একে অনেকগুলি নিরীহপ্রাণী সিংহ মহাশয়ের দলবলের মুখে গিয়া পড়িল। সেই রাত্রিতে শিকারের অভাব হইল না।

তার পর পশুরাজ মত ডাকিয়া গাধাকে ধন্যবাদ দিলেন, বলিলেন, "সাবাস্, গাধার বেটা গাধা—এমন গাধা আমাদের কাহারো নাই।"

গাধা এ কথাটা কান পাতিয়া পশুরাজের কথা শুনিল, আর লেজ নাড়িতে লাগিল। তাহার মুখে হাসি আর ধরে না।

এই জন্যই বুঝি জানোয়ারের মধ্যে গাধাকে সকলে বোকা বলে, আর সে চেঁচাইতে আরম্ভ করিলে কেউ না হাসিয়া থাকিতে পারে না।



মনের পাখীর ডিম

(১)

ভাই।

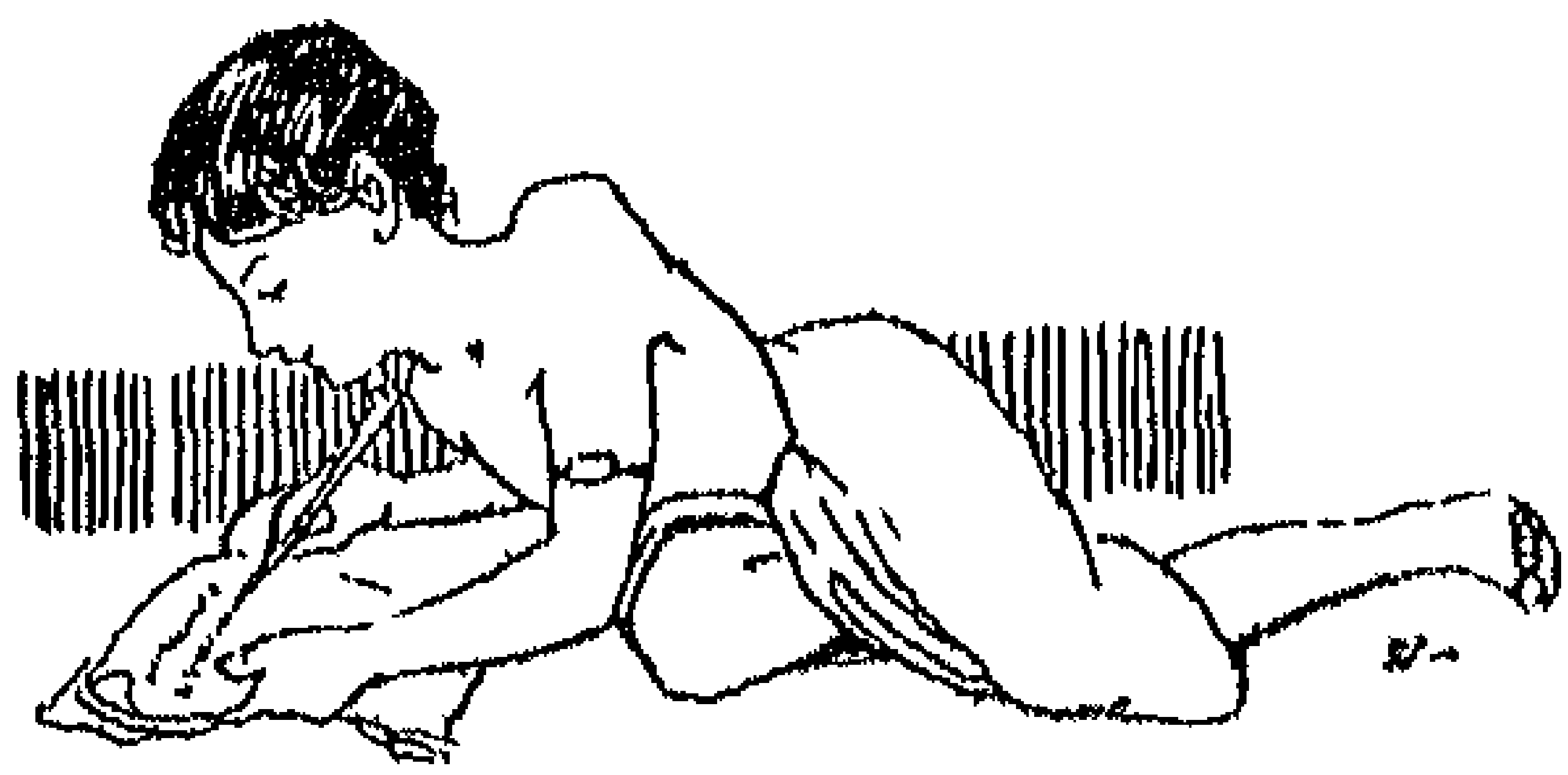
বেরিয়ে এল কে বে

২য়

কে রে এল কে রে ?

৩য়

সত্যি ভাই, ছাখ্ তো কলম ঝেড়ে—



১ম

কলম কালীর মুখে মোদের   কাগজগুলির বুকে

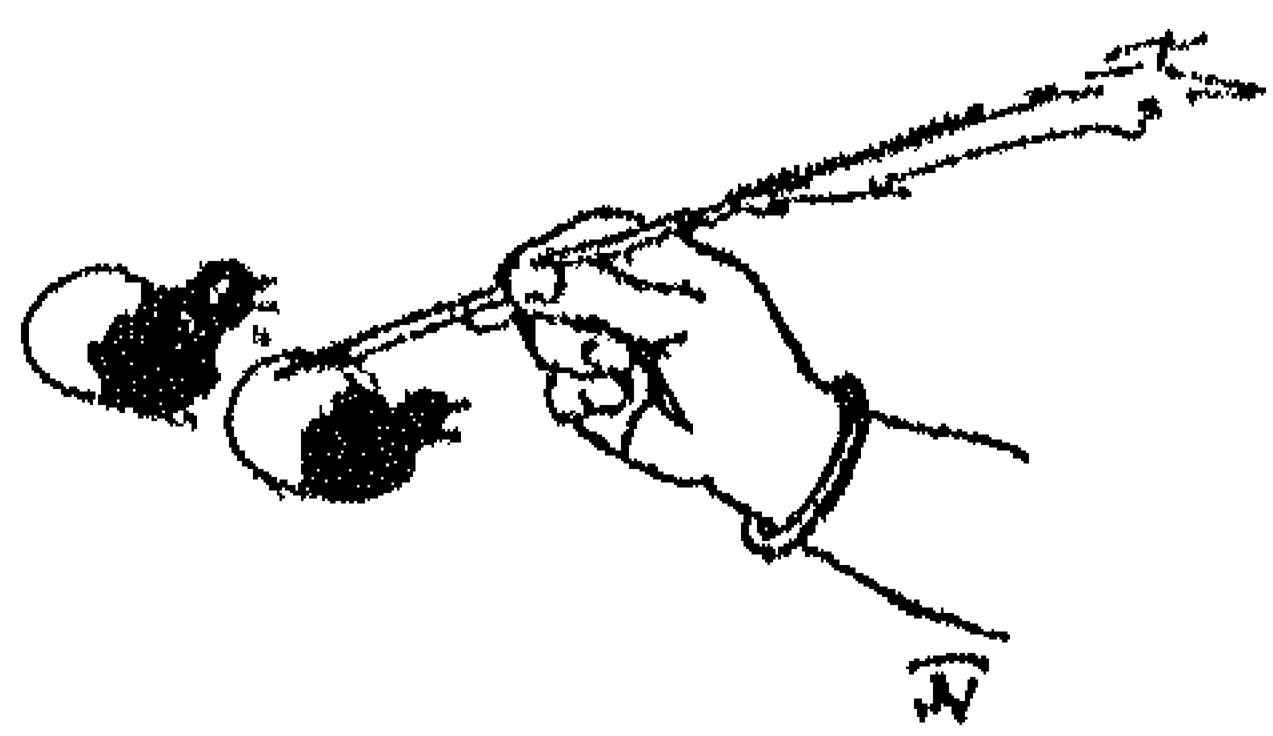
এল ভাই, মনেব কথার ডিম নাকি বে মনের   বাসা ছেড়ে ?

৩য় ৪র্থ

তাই তো—ডিমের খোলস ছেড়ে

ঠোঁট

বের করেছে বেড়ে।



পঞ্চম, ষষ্ঠ

হ্যাঁ রে। এই বুঝি রে চোক চায় রে মাথাটি ঐ নেড়ে।

২য় ৩য় ৪র্থ সপ্তম অষ্টম

এই যে—

মনের কথা ঠোঁটে নিয়ে বুকের কথা কেড়ে—

ফুট্‌ল ছানা ডিম থেকে ভাই মনের বাস ছেড়ে।

সকলে

কেমন করে এল ওরে কেমন করে এল ?

আমাদের এই আঙুল দিয়ে ছুয়ার কে থায় পেল ?

(১)

নবম দশম

এই বসেছে। কেউ উঠেছে

মোদের সাড়া পেয়ে

৩য় ৪র্থ

সোনালি ঠোঁট বের করে কে ঐ যে আছে চেয়ে।

সকলে

পালক যে ওর গজিয়ে উঠে সারাটি গা ছেয়ে —

কলম ছুঁ'তে

মোদের সাড়া পেয়ে যে ভাই মোদের সাড়া পেয়ে।

১ম ২য়

ঐ হয়েছে পাখা দু'টি,

৩য়— কি হ'ল রে?

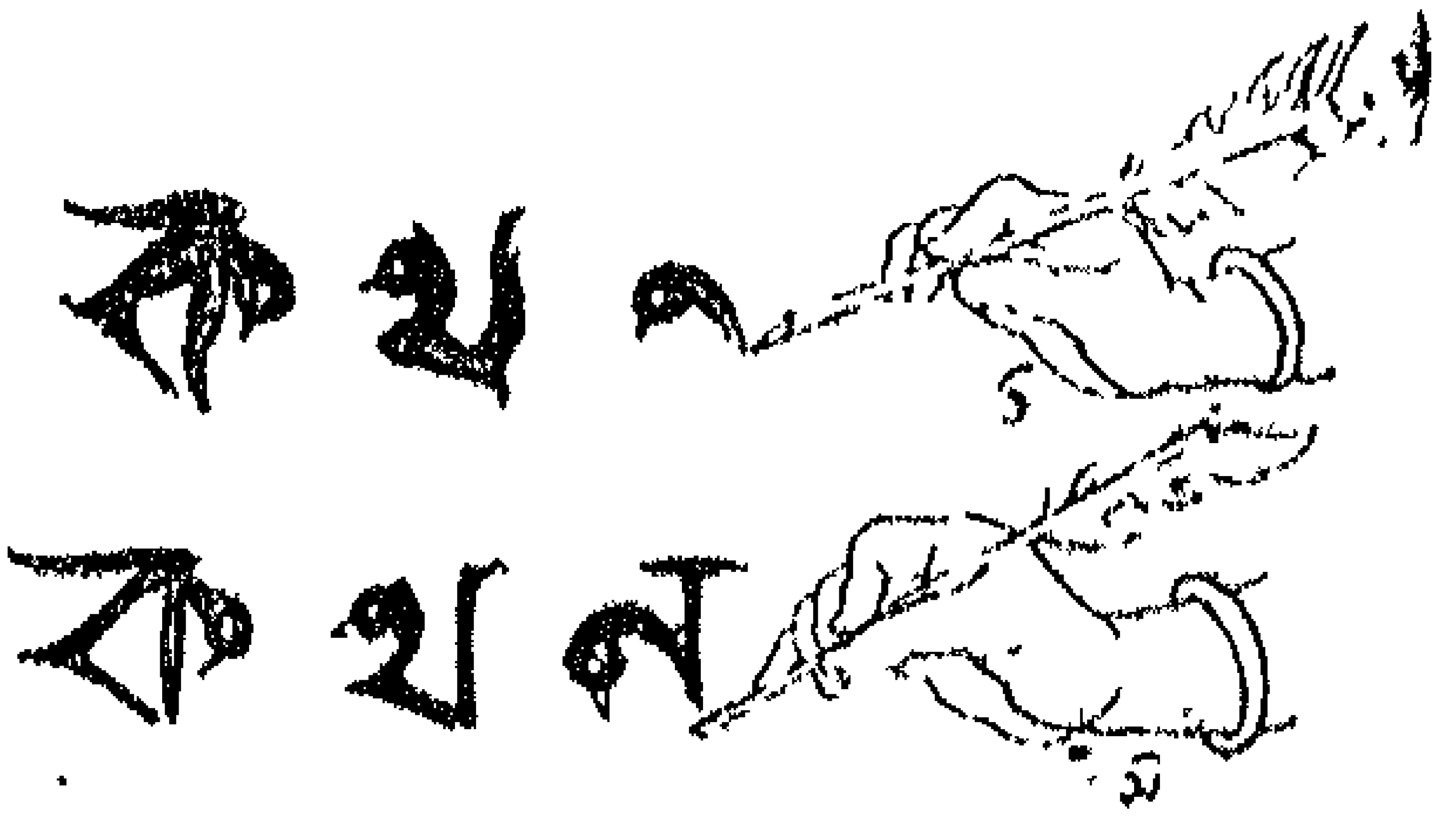
৪র্থ— পুচ্ছ এটি,

৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম

মাথায় ঝুঁটি, ঠোঁট খুলেছে, ঐ যে ওঠে গেয়ে

সকলে

ঐ যে ওঠে গেয়ে,—ঘাড় হেলিয়ে মোদের দিকে চেয়ে।



আফকলো
এসে
ফুটেছে।

সকলে

বাঃ ঐ যে ওঠে গেয়ে

চোখোচোখি হতেই যে ও অমনি ওঠে গেয়ে

বাঃ অমনি উঠে গেয়ে,

বাঃ রে —অমনি উঠে গেয়ে,

(৩)

২য় ৪র্থ

ন ভাই আর কি চুপ করে ঘরে থাক্‌তে পারি মোটে?

৭ম ৮ম

হা হা

পাখী সব কও যে

বলে দিয়ে

শিস্ দে' ওঠে ঠোঁটে

পঞ্চম ষষ্ঠ নবম দশম



কখন্
মনের কথা
চোকে
দেখা যায়?

ও ভাই,

দুষ্ট পাখী

চোকটি মেলে চাইতে গেলেই ওমনি হেসে ওঠে

আর সকলে

ঝর্ ঝর্ ঝর্ মনের কথা ফুলের মত ফোটে

খবর দিল টিয়ে—

ঘুমে ছিল রাজকন্যা

কোন্ স্বপনের দেশে,

কেমন করে ভাঙ্‌ল সে ঘুম

রাজপুত্র এসে,

সোনার কাঠি দিয়ে!

৩য় ও দশম

ভাই

ওরা কেমন করে

শিখ্‌লে রে? এমন মজার গান?

৫ম ও নবম

কেমন করে'

অনল কেড়ে বের করে ভাই

মোদের মনো প্রাণ?

সপ্তম অষ্টম

সব ই সাবধান —

সব কথা যে বলছে ডেকে [illegible]

[illegible]

মনের পাখী [illegible]

১ম ২য় ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ

যা' ভাবি তাই বলবে

[illegible]

পাখী [illegible]

[illegible]

৩য় ৫ম [illegible]—

[illegible]



চুপ ক'রে সব বয় যে ব'সে মুক্তা [illegible] মানি,

চাইতে গেলেই [illegible]

([illegible])

—[illegible]—

ভাই !

যার কথা আর যার গানে এই

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বুকের তলে তলে

ও ভাই,

কতই যে না মুক্তা [illegible] লো !

কাগজ কলম কালিতে আর

তুলিতে ভাই

সেই মুক্তা গড়ে'

হাজার হাজার সে সব কথা

[illegible] আর

লেখা, ছবির ছলে

লেখা

[illegible]

আমাদের লেখা

আর

বইয়ের [illegible] ছবি

কাল কালো হাঁসের

আর কবুতরের মত

আমাদের সব মনের কথা

বলে' বলে'

ঝাঁকে ঝাঁকে

উড়ে' চলেছে।

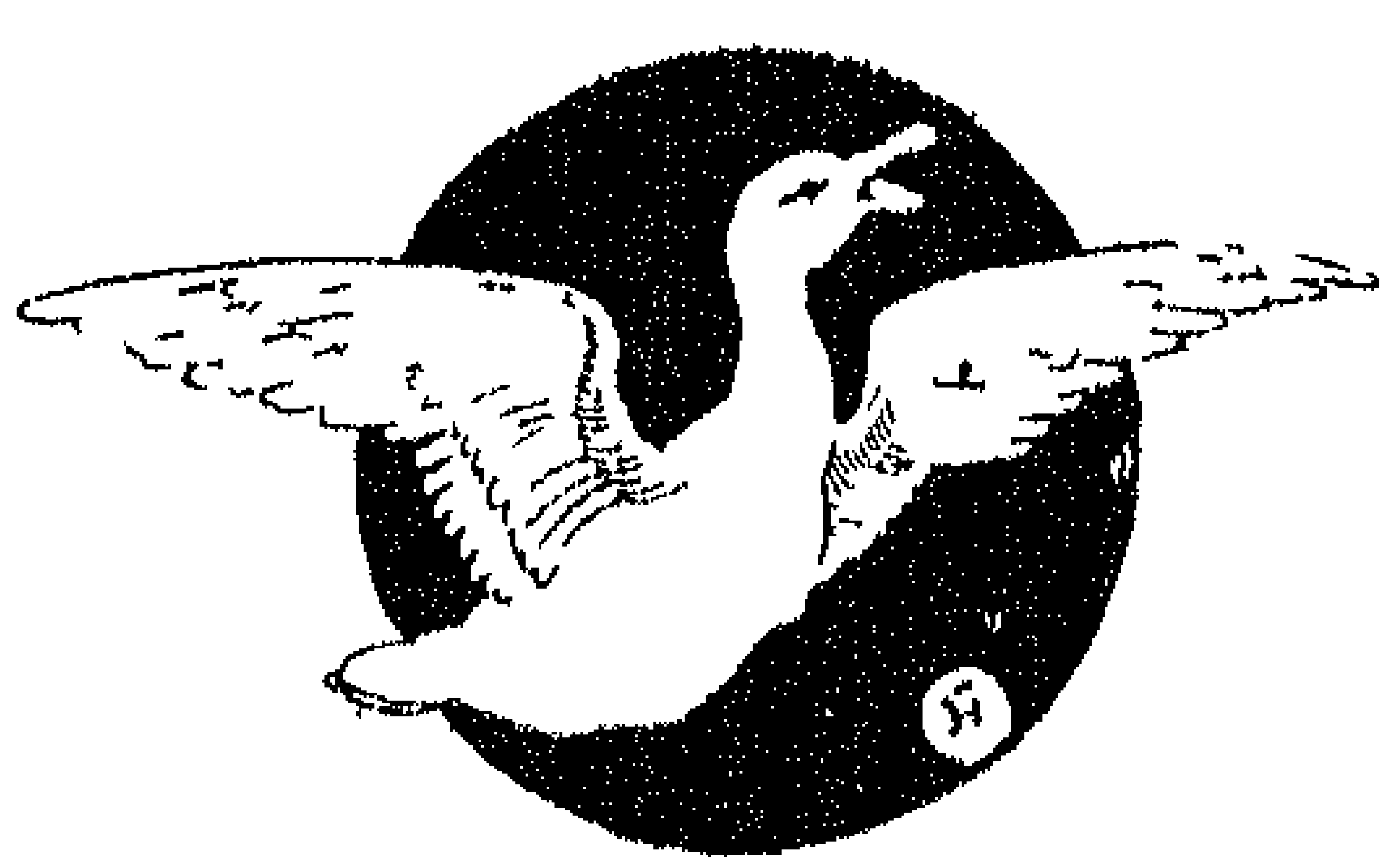


২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম—
ঐ যে
কেমন করে'
মুক্তাগাছের হীরার পাখী
সবায় ডাকি'
সব কথা তার, সব গান তার বলে!

—সকলে—

সেই গানেরি সুধার ধারা
জমাট হয়ে
চাঁদের পারা ছবি গুলি
হাস্‌ছে খলখলে,
বইয়ের পাতার আকাশ ভরা
মনের আলোর পাখী ওরা
দেশ বিদেশে—ভুবন জুড়ে' চলে
লুকিয়ে ঠোঁটে কথার খনি চোকে নিয়ে তারার মণি
ঝাঁকে ঝাঁকে ছাপার আখর উড়ছে দলে দলে,
—এই যে মোদের চোকের আগে
উড়্‌ছে কুতূহলে,
তাই
ওরা মোদের জগৎ জুড়ে চলে!

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।



আমার দেশ

হিমালয়ের জন্মকথা তোমাদের বুঝাইতে হইলে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়; আবার সে বিষয়টি ভাল করিয়া বলিতে গেলে প্রথমে বিজ্ঞানের দুই একটি কথা বুঝাইয়া বলা দরকার। হিমালয়ের জন্মকথা বলিতে গিয়া ভূমিকায় এত সব কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তোমাদের ধৈর্য্য থাকিবে না। তাই হিমালয় সম্বন্ধে সোজাসুজি কয়েকটি কথা বলিতেছি।

তোমরা জান হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্বত। উচ্চতা অনুসারে ইহার ভাগ তিনটি। প্রথম, মধ্য হিমালয়। ইহা ২০,০০০ ফিট উঁচু, এইখানেই গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি, নন্দাদেবী প্রভৃতি শিখর তুষারের স্তূপ মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বিতীয় ভাগকে বলে ছোট হিমালয়। ইহার উচ্চতা ১২০০০ ফিট; আর ইহা প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা। তৃতীয় ভাগ ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফিট উঁচু হইবে, আর চওড়া পাঁচ হইতে ত্রিশ মাইল মাত্র।

হিমালয়ের জন্মও হইয়াছে তিন ভাগে। তোমরা পড়িয়া বিস্ময়ে মনে করিবে যে আমি আজগুবি উপকথা বলিতেছি, কিন্তু ইহা সত্য। সমুদ্রের তলদেশ হইতে হিমালয়ের জন্ম। অত বড় পাহাড়, যাহার সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৯,৫৭২ ফিট উঁচু, ইহা সমুদ্র হইতে উঠিয়াছে এই কথাটি সহজে বিশ্বাস করা যায় না বটে।

আমাদের দেশটা একদিন সমুদ্রের তলে ছিল। সমুদ্রের নাম ছিল টেথিস্। সে আজ হাজার হাজার বছরের কথা, তখনও পৃথিবীটা জমাট বাঁধে নাই — কেবলই ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিত। টেথিস্ সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত মাটির স্তূপে চাপ পড়িতেই হিমালয় একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে কেমন করিয়া ইহা হইল। একটা কাপড়ের টুকরা টেবিলে রাখিয়া দুই দিকে চাপ দিলে দেখিবে কাপড়ে ভাঁজ পড়িয়াছে ও কাপড় একটু উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের তলে এই প্রকার চাপ পড়ায় পাহাড় পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ এই প্রকার চাপ পড়িল কেন? ইহার দুইটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ, তখন পৃথিবীটা তরল অবস্থায় ছিল বলিয়া ইহা জমাট বাঁধিতে লাগিলে একটা চাপের সৃষ্টি হইল।

দ্বিতীয় কারণ, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তোমরা ইহা নিশ্চয়ই জান। পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর গতি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বলের মত একটা তরল পদার্থ যখন ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দাঁড়ায় তখন ইহা সব জায়গায় সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়ে। বিষুবরেখার নিকটস্থ তরল পদার্থ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টায় আবার একটা চাপের সৃষ্টি করে।

তোমাদের বলিয়াছি পৃথিবী যখন তরল অবস্থায় ছিল তখন বারম্বার ভূমিকম্প হইত। এই রকম তিন তিনটা ভূমিকম্পে হিমালয়ের জন্ম। প্রথম ভূমিকম্পে হিমালয়ের মেরুদণ্ডটা যেন সমুদ্র হইতে একটু উপরে উঠিল, তারপর আবার ভূমিকম্পের অত্যাচার আরম্ভ হইলে হিমালয়ের আশেপাশের পাহাড়গুলি মাথা তুলিল আর তৃতীয়বার অর্থাৎ শেষ কম্পে হিমালয় একেবারে সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল। তিব্বতের দিক হইতে চাপ পড়িয়া ও ভারতবর্ষের দিক হইতে অগ্রসরে বাধা পাইয়া হিমালয়ের উঁচু মাথা আরও উঁচু হইয়াছে। এই জন্যই তিব্বতের দিকে হিমালয় একটু ঢালু আর ভারতের দিকে একেবারে খাড়া।

তোমরা ভূগোল খুলিয়া দেখিও—তিব্বতে পামির বলিয়া একটা অধিত্যকা আছে। পাহাড়ের মাথায় সমভূমিকে অধিত্যকা বলে। এই পামির হইতেই হিমালয়ের উচ্চতা সুরু হইয়াছে। নেপাল ও ভুটানের মাঝখানে হিমালয় একেবারে মেঘের রাজ্য ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। ধবলগিরি, গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে—দার্জিলিং হইতে হিমালয়ের এই শিখরগুলি বড় সুন্দর দেখা যায়। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য কত যাত্রী আসে। হিমালয়ের বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা অবাক্ হয়।

তোমাদের একটা কথা বলা হয় নাই। হাজার হাজার বছর আগে সমুদ্র হইতে হিমালয়ের জন্ম হইয়াছে ইহা আজ আমরা কেমন করিয়া জানিলাম তোমরা হয় ত এই প্রশ্ন করিবে; আমি আগে ভাগেই ইহার উত্তর দিতেছি।

সমুদ্রে মাছ, শামুক আর কত কি প্রাণী বাস করে তাহার অন্ত নাই। টেথিস্ সমুদ্রেও নানারকম সামুদ্রিক জীব বাস করিত। হিমালয় সমুদ্র হইতে উঠিবার কালে অনেক সামুদ্রিক জীব ইহার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে এবং পাথরের গায়ে গায়ে ইহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা হিমালয়ের উৎপত্তির খোঁজ করিতে করিতে তিব্বতে "জ্যান্সকর" নামক একটা জায়গায় সামুদ্রিক শঙ্খ, শামুক ইত্যাদি পাইয়াছেন। 'জ্যান্সকর'

প্রায় ২০,০০০ ফিট উচ্চ [illegible] 'পিম্মি' নামে একটি স্থান আছে, সেখানেও সামরিক জীবনের অনেক চিহ্ন [illegible] গিয়াছে, [illegible] সেখানে [illegible] চোরদের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায়।

এ পর্যন্ত তিব্বতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে স্থানে আছে [illegible] বলেন ইহা সাধুদের কাজ [illegible] আছে; কিন্তু দুঃখের কথা এই অভিযানে আমাদের দেশের [illegible] নাই বিদেশী পণ্ডিতেরা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া "[illegible]" [illegible] আর আমরা কেবল তাঁহাদের আবিষ্কৃত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া থাকি।

হিমালয় পর্বতের নানাস্থানে [illegible] দেখিয়াছে অনেক [illegible] লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক উঠিয়াছে। কেউ বলেন [illegible] আদিম [illegible] কেহ বলেন [illegible] ([illegible]) কুণ্ড, [illegible]

হিমালয়ের সৌন্দর্য [illegible] বর্ণনা [illegible] হাওয়ায় হিমালয়ের [illegible] হিমালয়ের [illegible] উপর পড়িলে আশ্চর্য শোভা হয়।

একটি কথা তোমাদের বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি [illegible] বলেন হিমালয়ের উচ্চতা ক্রমেই বাড়িতেছে। হুণ্ডেস্ (Hundes) নামক স্থানে [illegible] একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সে স্থানটি এত ঠাণ্ডা যে কোনো প্রাণী সেখানে বাঁচিতে পারে না। এই কারণে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, গত কয়েক লক্ষ বৎসরের মধ্যে ঐস্থান প্রায় ১০,০০০ হইতে ১৫০০০ ফিট উচ্চতায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রকম আরো কত কথা এখনও আমাদের অজানা রহিয়াছে। ইহা আবিষ্কারের জন্য বিদেশী পণ্ডিতগণের চেষ্টার অন্ত নাই। হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠিয়া সেখানকার অবস্থা জানিবার জন্য একদল বীর সাহেব প্রস্তুত হইতেছেন। [illegible] এই যাত্রার ফলে আমরা হিমালয় সম্বন্ধে আরো কিছু খবর পাইব।

তোমাদের বলিয়াছি হিমালয়ের কোলে ছোট নদী জন্ম পাইয়া ভারতবর্ষকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার চল, নদীপথ দিয়া "আমাদের দেশে" [illegible] ক্রমশঃ

শ্রী [illegible] চট্টোপাধ্যায়

* হিমালয়ের প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া আমি আমার বন্ধু শ্রীমান্ অশোককুমার চৌধুরী নিকট হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

৩



[১]

সকল দেশের সেরা যে ভাই, আমারি দেশ, আমারি দেশ।
ধন্য আমি, জনম হেথায় দিলেন মোরে পরমেশ।
আমার দেশের ঊষার মত এমন ঊষা কোথায় আর?
সন্ধ্যাবেলা কাহার দেশে তুলসী তলে দীপের হার?
এমন দয়েল কে কিল শ্যামা কার দেশে রে এমন গায়?
বকুল চাঁপার সুবাস মাখা কোথায় হেন মধুর বায়?
কোথায় হেন সুনীল গগন উজল তপন শশী তারা?
ষড়ঋতুর নৃত্যলীলায় কোথায় ঝরে সুধার ধারা?
সকল দেশের সেরা যে ভাই, আমারি দেশ। আমারি দেশ।
ধন্য আমি, জনম হেথায় দিলেন মোরে পরমেশ।

[২]

আমার দেশের হিমাচল সকল দেশের অচল-রাজা।
আমার দেশের সাগর নদী করছে ধরা শ্যামল তাজা।
আমার দেশের গঙ্গাতটে কত যুগের কত ঋষি,
হোমের ধূমে বেদের গানে করিলা পূত দশ দিশি।
কত ভক্ত কত সাধক জনম নিলা আমার দেশে,
রাজার ছেলে দীনের দুখে বাহিরিলা দীনের বেশে।

আমার দেশ

আমার দেশের নিতাই গৌর, বৈদিক বেদা তাঁদের [illegible],
হরিনাম যে পাগলপারা, উদাসীন [illegible]
সকল দেশের সেরা যে ভাই, আমারি দেশ! আমারি দেশ!
ধন্য আমি, জনম হেথায় দিলেন মোরে পরমেশ।

৩

আমার দেশে ভাই বোন সব আপন টুকু বিলায় পরে,
স্নেহ মায়ায় দয়া মমতায় পরকে ভাই আপন করে।
আমার দেশের গোঠে মাঠে বাজে কেমন চাষীর বেণু,
কেমন সরল উদার তারা মনের সুখে চড়ায় ধেনু
আমার দেশের সর্ব্বঘটে দেবতারই অধিষ্ঠান,
অশ্বত্থ-বট-গোধন-পূজা আমার দেশেই বিদ্যমান;
পিতা-মাতা-গুরু মোদের প্রত্যক্ষদেব আমার দেশে,
পদের ধূলি তীর্থ যে ভাই মরতে পারি হেথায় এসে,
সকল দেশের সেরা যে ভাই, আমারি দেশ! আমারি দেশ!
ধন্য আমি, জনম হেথায় দিলেন মোরে পরমেশ,

৪

আমার দেশের মাটির নীচে আমার পিতৃপুরুষেরা,
ঘুমিয়ে আছেন মায়ের কোলে যেমন শিশু সন্তানেরা।
আমার দেশের পূণ্য বায়ে তাঁদের শেষশ্বাস মিশে আছে,
এখনো যেন পরশ তার পাচ্ছি মোর প্রাণের কাছে
স্বরগ হতে বড় যে ভাই আমার দেশ আমারি পাশে,
শৈশব হতে সারা হৃদয় এ দেশটি যে ভালবাসে।
আমার দেশের সেবার তরে যদিনা সয় যাবে জীবন,
তাই যে মম পরম সাধ, তাই মম পরম [illegible]
সকল দেশের সেরা যে ভাই, আমারি দেশ আমারি দেশ
ধন্য আমি, জনম হেথায় দিলেন মোরে পরমেশ।

শ্রীসুবোধকুমার দত্ত।

কুড়ানো ছেলের কাহিনী।

আমার মা বাপ কে, কোথায় আমার জন্ম তা আমি জানি না শৈশবে যার কোলে আমি মানুষ হইয়াছিলাম তাঁর নাম বারবেরে তাকেই আমি মা বলিয়া জানিতাম কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম তিনি আমার মা নন্ আমার যখন ৬ মাস মাত্র বয়স তখন তিনি আমাকে রাস্তায় কুড়াইয়া পান

ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমরা বাস করিতাম—ইহার নাম শোভানোঁ শোভোনোঁ খুবই একটী ছোট পল্লী; তাতে সামান্য কয়েকঘর মাত্র লোক বাস করিত, তারা সকলেই গরীব আমাদের একটি গাই ছিল তার নাম রুজেট্ রুজেট্ আমাদের দুধ জোগাইত, অবসর সময়ে আমি তার সঙ্গে খেলা করিতাম। বাড়ীতে সমবয়স্ক লোক না থাকায় সেই আমার খেলার একমাত্র সঙ্গী ছিল

আমাদের ছোট একটি মাত্র ঘর ছিল—তাহাতেই আমাদের রান্না, আহার, নিদ্রা শয়ন, সবই হইত। আমি ও মা বারবেরেঁ একই শয্যায় শয়ন করিতাম ঘুমাইবার পূর্ব্বে মা বারবেরেঁ গল্প করিতেন, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম

মা বারবেরেঁ বিধবা নন, তার স্বামী পারি নগরীতে পাথরের খনিতে কাজ করিতেন। কিন্তু আমার আট বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও তাঁহাকে বাড়ী আসিতে দেখি নাই একজন লোক মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিত, তার নিকট মা বারবেরেঁ স্বামীর সংবাদ পাইতেন।

একদিন সেই ব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসিলে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিলাম তিনি যেন কি একটা দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে মা বারবেরেঁ ঘরে রান্না করিতেছিলেন আগন্তুকের গলার শব্দ শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন অগন্তুকের মুখের দিকে তাকাইয়া মা বারবেরেঁর মুখ শুকাইয়া গেল ভয়ে ভয়ে তিনি তাহাকে স্বামীর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন

আগন্তুক বলিলেন—হাঁ হাঁ সেই কথাই তো আমি বলিতে আসিয়াছি। তুমি অত ব্যস্ত হইও না। বিপদ আপদ মানুষের ঘটিয়াই থাকে। জেরম্ ভালই আছে, তবে কাজ করিবার সময় পাথর পড়িয়া একটা পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বেচারা এখন হাঁসপাতালে আছে। আঘাত একটু গুরুতরই বটে, হয়তো বা চিরজীবন খোঁড় হইয়া থাকিতে হইবে ”

মা বারবেরের স্বামী পা ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি এখন কাজ করিতে অক্ষম, এখন আমাদের উপায় কি হইবে?

সেদিন রাত্রিতে মা বারবেরে তার আগন্তুককে ছাড়িলেন না। চুল্লির ধারে বসিয়া রাত্রিতে আহারের পর অনেক রকমের পরামর্শ করিলেন। আগন্তুক বলিলেন কোম্পানীর নামে নালিশ কর—তারা তোমাদের প্রতিপালন করিতে বাধ্য। মা বলিলেন তাহাতে যে খরচ অনেক লাগিবে।

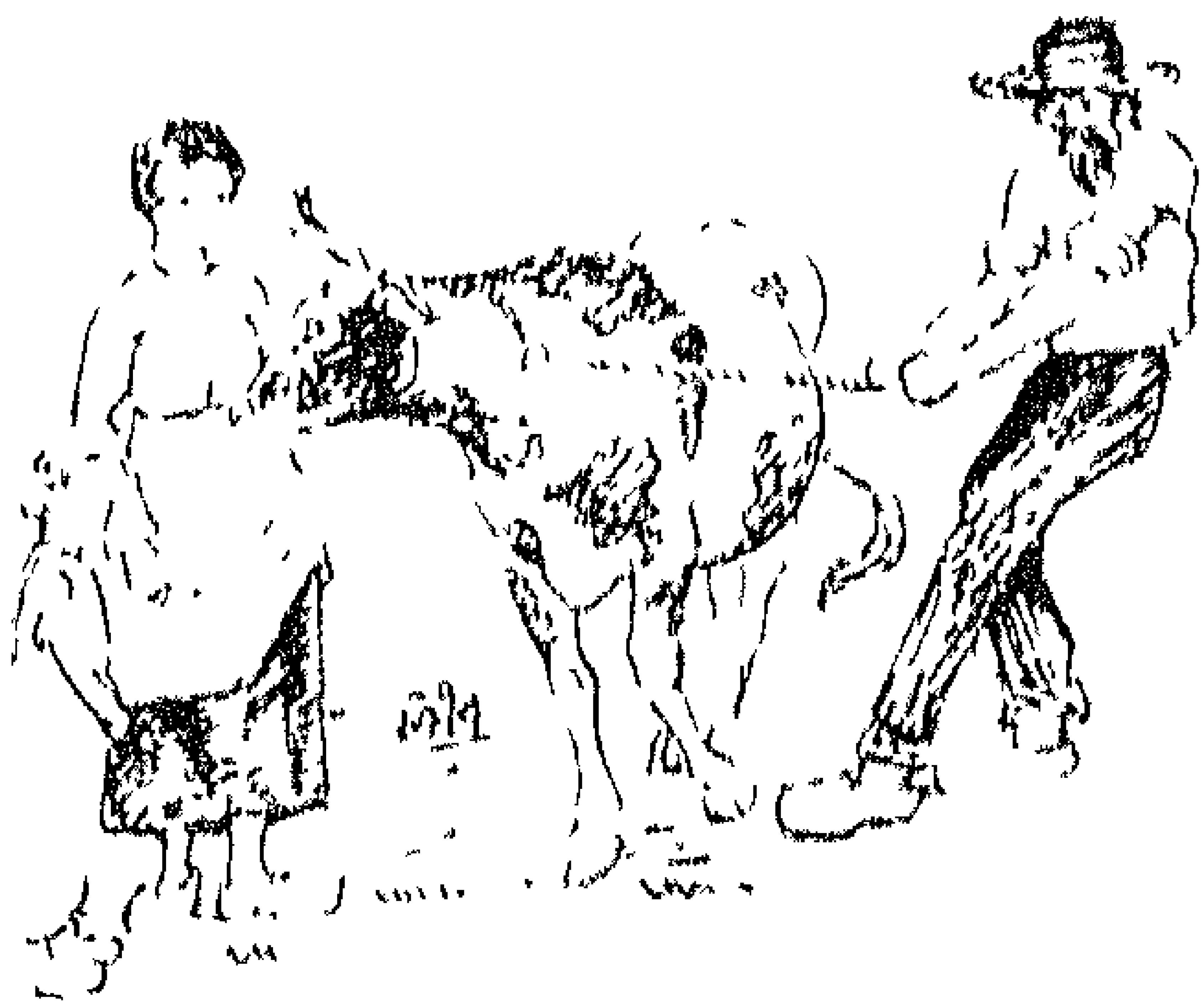
মা বারবেরের ইচ্ছা স্বামীকে দেখিবার জন্য তখনই প্যারিস চলিয়া যান। কিন্তু এত পথ কি করিয়া যাইবেন? তা ছাড়া খরচও যে অনেক বেশী।

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রথমেই তিনি গ্রামের পুরোহিতঠাকুরের কাছে গেলেন। গ্রামের মধ্যে তিনিই একমাত্র লেখাপড়া জানেন—বিপদে আপদে সকলেই তার পরামর্শ লইতে যায়। মা বারবেরের মুখে সকল কথা শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন— "প্রথমে তোমার স্বামীকে চিঠি লিখ। উত্তর আসিলে পরে কর্তব্য স্থির করিও।"

সেই দিনই চিঠি লেখা হইল। পুরোহিত ঠাকুর নিজেই চিঠি লিখিয়া দিলেন।

যথাসময়ে চিঠির উত্তর আসিল। জেরম (মা বারবেরের স্বামীর নাম) তাহাকে প্যারিস যাইতে নিষেধ করিয়াছে। সে যেন তাহাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়।

মা বারবেরে টাকা কোথায় পাইবেন? কয়েকদিন পরে জেরমের কাছ হইতে আর একখানা চিঠি আসিল। তাহাতেও তিনি টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছেন। টাকা যদি কোথাও যোগাড় করিতে না পারেন, তাহা হইলে গাইটা বিক্রি করিয়া যেন টাকা পাঠায়।



কজেটিকে বিক্রি করিতে হইবে? আমাদের কে দুধ জোগাইবে? আমরা কি খাইব? কজেটির দুধ, ননী, মাখন বিক্রি করিয়াই যে আমাদের দিন চলে! তাছাড়া কজেটিকে আমরা কত ভালবাসি, সেও আমাদের কত ভালবাসে। তাহাকে ছাড়িয়া আমরা কি করিয়া থাকিব?

তবু রুজেটিকে বিক্রী করিতে হইল তাহার নুতন মনিব যখন তাহাকে লইতে আসিল, বেচারা তখন কি ফেল্ ফেল্ করিয়াই আমাদের দিকে তাকাইয়া ছিল, সে প্রথম কিছুতেই তাহার সঙ্গে যাইবে না। বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য তার নূতন মনিব তার দড়ি ধরিয়া কত টান টানি করিল সে এক পাও নড়িল না। তখন সে অধৈর্য্য হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে মা বারবেরেঁ তাহাকে নিষেধ করিয়া রুজেটির গলা ধরিয়া ডাকিতেই সে আর তাহার সহিত যাইতে আপত্তি করিল না। চলিয়া যাইবার সময় বেচারা যতদূর হইতে আমাদের দেখিতে পাইতেছিল তত দূর পর্য্যন্ত বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদের দেখিতেছিল। তারপর তাহাকে যখন আর দেখা গেল না তখন আমরাও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলাম।

তার পরদিন হইতেই আমাদের আহারে দুধ বন্ধ হইল—দুই বেলা শুকনো রুটি আলুসিদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পাইতাম না।

একদিন মা বারবেরেঁ কোথা হইতে কিছু মাখন, ময়দা, চিনি ধার করিয়া আনিলেন। সেদিন শ্রোভ-টুইজ্‌ডে (আমাদের যেমন পৌষ-সংক্রান্তি)। প্রতি বৎসরই এই দিনে মা বারবেরেঁ পিঠা তৈরী করিতেন আজও তিনি পিঠে তৈরী করিতেছিলেন। আমি উনুনের ধারে মা-বারবেরেঁর পাশেই বসিয়াছিলাম। এতদিন পর আজ আবার পিঠে খাইতে পাইব মনে করিয়া আমার মনে খুবই উল্লাস হইতেছিল

হঠাৎ বাহিরে দুয়ারের কাছে কার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। একটু পরেই দুয়ারটা খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কে একজন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। চোয়াড়ে শক্ত মজবুত তার চেহারা—হাতে মোটা একটা লাঠি। পূর্ব্বে কখনও তাকে আর দেখি নাই—আমি কেমন ভয় পাইয়া একটু দূরে সরিয়া গেলাম মা-বারবেরেঁর উনুনের উপর উপুড় হইয়া পিঠা ভাজিতেছিলেন—তিনি প্রথম তাকে দেখিতে পান নাই। পিঠা ভাজিতে ভাজিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ?" তিনি মনে করিয়াছিলেন প্রতিবেশী কোন্ ব্যক্তি বুঝি হইবে। কিন্তু মুখ তুলিয়াই তিনি অবাক হইয়া গেলেন। একি, এযে তাঁর স্বামী—জেরম্. তিনি তাড়াতাড়ি পিঠে ভাজা রাখিয়া তার কাছে আসিয়া বলিলেন "জেরম্, তুমি এসময় ?" আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"রিমি, এই তোমার পিতা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খ্রীষ্ট জন্মিবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই [illegible] রোমকগণ [illegible] খ্রীষ্টের জন্মকালে হেরোড্ নামক একজন ব্যক্তি [illegible] রাজা [illegible] ছিলেন।

ইহুদী জাতির মধ্যে একটি প্রাচীন [illegible] কোন সময়ে তাহাদের স্বজাতীয় এক ব্যক্তি তাহাদের রাজা হইবেন। [illegible] ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত ছিল যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ দায়ুদ্ [illegible] বেথলেহেম্ নামক নগরে তাঁহাদের জন্ম [illegible] [illegible] ইহুদীজাতি উৎসুকচিত্তে তাহাদের ভবিষ্যৎ নৃপতির আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল। যোষেফ নামক একজন পুরুষ ও মরিয়ম নাম্নী [illegible] জীবিত ছিলেন না। যোষেফ মরিয়মকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বেথলেহেম্ নগরে তাঁহাদের জন্ম হইলেও [illegible] নাসরৎ নামক গ্রামে বাস করিতেন। [illegible] ধর্ম্মশীল [illegible] প্রকৃতি [illegible] লোকের [illegible] সমর্থ হইয়াছিলেন। যোষেফ ছুতারের কার্য্য করিয়া জীবিকা [illegible] করিতেন।

সেই সময়ে রোমের সম্রাটের আজ্ঞানুসারে [illegible] শাসনাধীন দেশ সমূহের লোক গণনা হইতেছিল। সম্রাটের আদেশে প্রত্যেক যে স্থানে জন্ম, সে ব্যক্তি সেই স্থানেই আপনার নাম [illegible] [illegible] উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এই কারণে যোষেফ্ ও স্ত্রীকে [illegible] নাসরৎ হইতে আগমন করিয়া তাঁহাদের জন্মস্থান বেথলেহেম্ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তাহাদের বেথলেহেম্ নগরে পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল। [illegible] যখন ঐ নগরের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার [illegible] সমাগত যাত্রীদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, একটীও খালি ছিল না। অগত্যা যোষেফ্ গর্ভবতী পত্নীকে লইয়া পান্থশালাস্থিত পশুশালার মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। [illegible] এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে হইবে। যীশুখ্রীষ্ট যে দীন হীন কাঙ্গালের বন্ধু, ইহাই যেন

জগতের মানুষকে দেখাইবার জন্য ঐ মহাপুরুষ দরিদ্র শ্রমজীবির সন্তান রূপে ঐ পশুশালার ন্যায় নিকৃষ্ট স্থানে সেই রাত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

তোমরা বোধ হয় সকলেই জান যে খ্রীষ্ট কোন দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শীতকালে তোমাদের স্কুলে "বড়দিনের" বন্ধ ছুটী হইয়া থাকে। সেই ছুটীর মধ্যে ২৫শে ডিসেম্বরই "বড় দিন"। ঐ দিবসে যীশুখ্রীষ্ট মানবকে পাপ পথ হইতে পুণ্য পথে লইয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া উহাকে "বড় দিন" বলাই সঙ্গত। তোমরা "বড় দিনে" গাঁদা ফুলের মালা দিয়া গৃহদ্বার সজ্জিত করিয়া থাক, কমলালেবু ও মিষ্টান্ন নিজেরা খাইয়া এবং অপর সকলকে বিতরণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব কর। তোমরা এই আনন্দের দিনে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইও না।

সেদিন গভীর রাত্রে কতিপয় পশুপালক স্ব স্ব পশুগণকে পাহাড়ের ধারে বিচরণ করিতে দিয়া বন্য জন্তুদিগের আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জাগিয়া গল্প করিতেছিল। সেদিন বেথলেহেম্ নগরে যে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল, তাহাই তাহাদের আলোচনার বিষয় ছিল। জোসেফ্ ও মেরীকে তাহারা জানিত না এবং তাঁহারা যে ঐ রাত্রে বেথলেহেম্ নগরের পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তাহারা অবগত ছিল না।

অকস্মাৎ তাহারা দেখিল যে আকাশের প্রান্ত দেশ এক অতি উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বিস্মিত ও ভীত চিত্তে ঐ আলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। ঐ জ্যোতিঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বিস্ময়মুগ্ধনেত্রে দেখিল যে এক পরম সুন্দর দেবদূতের বদন হইতে ঐ জ্যোতিঃ বিকীরিত হইতেছে। তাহাদিগকে ভয়ে অভিভূত দেখিয়া দেবদূত স্মিত মুখে মধুর স্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —"তোমরা ভীত হইও না। আমি স্বর্গ হইতে তোমাদের জন্য সুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি। তোমাদের ভবিষ্যৎ ভূপতি ডেভিডের বংশে এই রাত্রে বেথলেহেম্ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্ট নামে জগতে সকলের নিকট পরিচিত হইবেন এবং পাপী তাপী মানবগণের উদ্ধার সাধন করিবেন। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমরা এই নগরের পান্থশালায় গমন কর। ঐ স্থানের পশুশালার মধ্যে পশুদিগের খাদ্যাধারে শায়িত বস্ত্রাবৃত যে সুন্দর শিশুকে দেখিতে পাইবে, তিনিই তোমাদের জাতির ভাবী রাজ

ঠিক সেই সময়ে স্বর্গের সঙ্গীতধ্বনি তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রাখালগণ বিস্ময়পূর্ণনেত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে অপূর্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন শত শত দেবদূত মধুর স্বরে ঈশ্বরের জয়গান করিতেছে এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া খ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্কালে শান্তি ও মানব হৃদয়ে প্রীতির বার্তা প্রচার করিতেছে।

সরল স্বভাব পশুপালকগণ এই অদৃষ্টপূর্ব বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ... তাহারা স্থির করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহারা স্থির করিল যে সকলে একত্র মিলিত হইয়া বেথলেহেম নগরে গমন করিবে এবং পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া যদি দেবদূত-বর্ণিত শিশুকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে ... উক্ত শিশুর ভবিষ্যৎ ... বিশ্বাস করিবে। তখন তাহারা নিদ্রিত ... গণকে জাগাইয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া নবজাত শিশুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

জোসেফ ও মেরী উভয়েই তখন জাগিয়া ছিলেন। মেরী সদ্যপ্রসূত শিশুকে উপযুক্ত শয্যার অভাবে পশুদিগের একটী খাদ্যাধারের মধ্যে বস্ত্রাবৃত করিয়া শায়িত রাখিয়াছিলেন এবং পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া মুগ্ধনেত্রে সেই দেবশিশুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। সেই গভীর রাত্রে তথায় বহু লোকের সমাগম দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহারা তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপালকেরা একে একে অগ্রসর হইয়া পশুখাদ্যাধারে শায়িত বস্ত্রাবৃত অপূর্ব সৌন্দর্য্যশালী শিশুকে



যীশুর জন্ম

পশুপালকেরা পশুশালায় শায়িত খ্রীষ্টকে দর্শন করিতেছে

দেখিতে পাইয়া দেবদূতের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিল এবং নতজানু হইয়া ভক্তিভাবে শিশু খ্রীষ্টকে অভিবাদন করিল অতঃপর তাহারা তাহাদের দৃষ্ট সেই রাত্রের আশ্চর্য্য ঘটনা জোসেফ্ ও মেরীর নিকট বর্ণন করিল। তাহারা উভয়েই বিশ্বাস করিলেন যে ভগবান নিজ কার্য্য সাধনের জন্য এই শিশুর দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন মেরীর তখন পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে একজন দেবদূত তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া এই শুভ সম্বাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন

আগন্তুকদিগের কলরবে পান্থনিবাসের সকল লোকই জাগিয়া উঠিল এবং একটী অপূর্ব্ব দেবশিশু সেই পান্থনিবাসের পশুশালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা সকলেই জানিতে পারিল মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকে লোক মুখে প্রচার হইয়া গেল যে ইহুদীজাতির ভাবী নরপতি ঐ রাত্রে বেথলহেমের পান্থশালাস্থিত পশুশালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে তাহাদের শাস্ত্রোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি বা এতদিনে সফল হইল যীশুখ্রীষ্টের জীবন চরিত পড়িবার সময়ে তোমরা অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা জানিতে পারিবে আমাদের দেশের মহাপুরুষদিগের জীবনে ও এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে (ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু

বায়স্কোপ

আজ কাল তোমরা বায়স্কোপ দেখতে কত ভালবাস ছ'টায় আরম্ভ হ'লে চা'রটায় গিয়ে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাক, এতেই মনে হয়, তোমাদের বায়স্কোপ জিনিষটা কত ভাল লাগে শুধু তোমাদের কেন—যুবকদের বৃদ্ধদের সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু কেমন করিয়া এমন আশ্চর্য্য জিনিষ তৈরী হ'ল তা কি তোমাদের জানতে ইচ্ছা করে না ? নিশ্চয়ই করে। অনেক অদ্ভুত জিনিষ দেখে কত আমোদ পাওয়া যায় কিন্তু কেমন করে তৈরী হয় তা যদি জানতে পারা যায় তা হ'লে আরও কত ভাল লাগবে আমি তোমাদের দু'একটি গোড়ার কথা বায়স্কোপ সম্বন্ধে বলবো।

তোমরা সাধারণ ফটো তোলা নিশ্চয়ই দেখেছো; অনেকে হয়তো নিজেদের চেহারা তুলিয়েছ—কেমন নয় কি ? আচ্ছা যে জিনিষটা দিয়ে ছবি তোলে সে কলটাকে কি বলে জান ? "ক্যামেরা" বলে বায়স্কোপের ছবি তুলবার যন্ত্রটিকে "ক্যামেরা" বলে সাধারণ ছবি তোলাকে Photograph বলে, আর বায়স্কোপের ছবি কে Photo-Play বলে। দু'টোর মধ্যে তফাতে হচ্ছে একটাতে নড়লে খারাপ হয়ে যায়, আর Photo-Playতে নড়লেও ছবি উঠতে থাকে—খারাপ হয় না তোমরা যখন Photo তুলেছ, তুলবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কেউ সাবধান করে দিয়েছেন, যেন একটুও নড়ো না অনেকে দম আটকে গম্ভীর হ'য়ে

যেমে একশেষ হয়ে থাকে, কিন্তু এই Photo-Playতে তার দরকার করে না। Photo কাঁচের উপর প্রথম ফুটে ওঠে তাকে নেগেটিভ বলে। ঐ নেগেটিভ থেকে কাগজে যত খুসী (Print) ছাপা করা যায়। এ কাজের জন্য আবার নেগেটিভ হয়, তা দিয়ে Print করতে হয়। এ যন্ত্রেরের নেগেটিভ ফেন্স-ফেন্ডের ... যে ফিতের মত তৈরী হয়। এক মঙ্গে সাধারণতঃ দুই শত হতে তিন শত ফিটের লম্বা প্রস্তুত হয় পাশে সোয়া এক ইঞ্চি হয় ... তাতে খুব সাবধানে রাখতে হয় ঐ ফিতে ... মধ্যে ... অন্ধকারে বসে বন্ধ করতে হয় ... না লাগতে পারে, তার জন্য খুব ... এ দৃশ্যের মধ্যে আর্টকে ক্যামেরার মধ্যে রেখে ... ছবি তুলবার সময় সেট ঘোরাতে হয় কিন্তু ক্যামেরা ঠিক আছে কি না রেখে দেখতে হয়, ... মুখে ঠিক আলো পড়েছে কি না, কে ... ঢাকা পড়েছে কি না। কি করে দেখে ... ঠিক চেহারা দেখা যায়, কিন্তু মজা এমনি ... উল্টো দেখা যায় ... চেহারা ... দেখা যায়, তখন ঠিক ফোকাস্ হয়েছে বলে জানা যায়। এই দেখে নেওয়াকেই ফোকাস করা বলে।

... যে তোমরা দেখতে পাও, যা মানুষের ... না ... সেগুলিকে ট্রিক বলে। কিন্তু অনেক সাহসের কাজ বায়োস্কোপে করতে হয়। ... ছবি নিতে গিয়ে প্রাণটাকে হারিয়ে ফেলেছেন এমনও ... দৌড়তে, লাফাতে ... এগুলি সবই স্বভাব ... অভিনয় করতে হয়।

বিদেশে যাঁরা এই Photo-Playতে অভিনয় করেন, তাঁদের ... এমনও শোনা যায়, একখানি ছবির অভিনয় করে এত অর্থ উপার্জন করেছেন যে, তা আমরা ধারণাও করতে পারি না। তবে এ অভিনয় সাধারণ থিয়েটারের অভিনয় হতে একটুখানি আলাদা রকমের। নিজের অঙ্গ-ভঙ্গিতে সকল কথাই ফুটিয়ে দিতে হয়। বিদেশে ... কথা, অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা এমন সুন্দর অভিনয় করে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বায়োস্কোপে ছবির জন্য অভিনয় করতে হ'লে অনেক জিনিষ শিখতে হয়। যে কোন রকমের আর্টকে উন্নতি করে চলো তার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করা চাই সাধনা চাই, কোন কাজই ফাঁকি দিয়ে চলতে পারে না। এক একটা কাজের জন্য অসীম সাহসে বুক বেঁধে জোর করে দাঁড়াতে পারে তাঁরাই যাঁর ... আমাদের ... উন্নতি করবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বৈঠক

পূজা :—

গত মাসের "আমার দেশ" পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "দেশমাতাকে পূজা কর"। তোমরা ইহার অর্থ কে কি বুঝিয়াছ জানিতে ইচ্ছা হয়; কেন না ইহা লইয়া নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা সারাজীবন চাকুরী করিয়া কেবল নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, তাহারা মনে করেন চাকুরী দ্বারা দেশমাতাকে পূজা করা হইতেছে; যাহারা ব্যবসাবাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত, তাহারা মনে করেন ইহার বিস্তারে সাহায্য করিয়া তাহারা দেশমাতার পূজা করিতেছেন; যাহারা ধনী তাহারা দেশের কোনো কাজে কিছু দান করিয়া মনে করেন দেশমাতার পূজা করা হইল

কিন্তু পূজা মানে নিজেকে নিবেদন করিয়া দেওয়া, "দেশমাতাকে পূজা কর" মানে দেশমাতার কাছে নিজেকে নিবেদন কর নিবেদন করিতে না পারিলে দেশমাতার সেবা হয় না

আমাদের দেশে মানুষের দুঃখের অন্ত নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ত লাগিয়াই আছে। দেশের অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানে না। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য যে যতটুকু কাজ করিবে তাহাই দেশমাতার সেবা বলিয়া জানিও। তোমরা দেশমাতার পূজার জন্য প্রস্তুত হও। জগতের সকল জাতিই নিজের দুঃখ ও অভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে আমরাই কি কেবল পিছনে পড়িয়া থাকিব?

মহাত্মা গোখলে — দেশের তরে সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়াছেন এমন একটি দৃষ্টান্ত তোমাদের সম্মুখে ধরিবার জন্য চাই বলিয়া মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলের চরিত্রকথা বলিয়াছি। দেশমাতার পূজারিদের মধ্যে একে একে তাঁদের পরিচয় করাইয়া দিব। তোমরা তাঁদের দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া চলিবে।

মহাত্মা গোখলের সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িতেছে—গল্পটি মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের উপর খুব অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া গোখলে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিলেন। "[illegible]" জাহাজ কেপটাউনের বন্দরে আসিতে মহাত্মা গান্ধি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। গোখলের সঙ্গে ছিল একজন জার্মান [illegible]। ইনি অনেকদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। ভারতবাসীদের প্রতি ইহার খুব টান ছিল।

জাহাজের যাত্রার সময় কাটাইবার জন্য একরকম খেলা খেলেন—তাহার নাম কয়েটস্ ([illegible])। গোখলের সঙ্গী জার্মান ভদ্রলোকটি এই খেলায় একজন ওস্তাদ ছিলেন। গোখলে তাঁহার কাছে খেলাটি শিখিয়া লইলেন। কিন্তু পরে এই খেলায় এমন কি জার্মান ভদ্রলোকটি পর্যন্ত তাঁহাকে হারাইতে পারেন নাই। [illegible] সঙ্গে [illegible] খেলার বিষয় কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, "আমি এই য়ুরোপীয়দের সঙ্গে কোন খেলায় হারিয়াও পরিশ্রান্ত হইতে চাই না? আমি কোন কাজে পিছপা হইতে চাহি না। উহারা মনে করে আমরা সব কাজেই উহাদের চেয়ে নীচু, কিন্তু আমি যতটা নিজে পারি এই দেখাইতে চাই যে সব উহাদের তুলনায় কোন অংশে খাটো নই, বরং অনেক বিষয়ে বড়।"

আমাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া [illegible]। তোমরা আত্মবিশ্বাসী হও, তোমরা যে দেশে জন্ম, পৃথিবীর কাহারো চেয়ে ছোট হইবার নও, ইহা বিশ্বাস কর। তোমরা এই বিশ্বাস লইয়া [illegible] দিলে নিশ্চয়ই তাহাতে সুফল পাইবে।

আমার কাহিনী — এত রকমের ধান বাংলাদেশে জন্মে তাহার নাম ও বিশেষত্ব জানিয়া আমাদের লিখিবার জন্য আমরা তোমাদের বলিয়াছিলাম। কিছু পুরস্কার দিব তাহাও বলিয়াছিলাম। কিন্তু [illegible] চারি পাঁচ জনের কাছ হইতে জবাব পাইয়াছি। তোমরা চেষ্টা করিয়া এই সকল খবর জানিয়া আমাদের পত্র লিখিবে।

"আমার দেশের" ছবি — আমাদের এই পত্রিকায় [illegible] ছবি কেন থাকে না দুই একজনে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তোমাদেরও মনে এই

প্রশ্ন আসিতে পারে তাই তোমাদের বলিতেছি যে ছবি দিয়া তোমাদের মন ভুলাইবার জন্য "আমার দেশ" বাহির করা হয় নাই, যাহাতে তোমাদের মনে দেশসেবার ভাব জাগাইতে পারি, তোমাদের সঙ্গে দেশের যথার্থ পরিচয় ঘটে, এই আশা লইয়াই এই পত্রিকা তোমাদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি এইরূপ পত্রিকার খুব বেশী রকম প্রচার দরকার তোমরা যাহারা "আমার দেশ" পড় চেষ্টা করিলে অন্ততঃ দুইজন করিয়া নূতন গ্রাহক করিয়া দিতে পার না কি?

চরকা ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাসেরই 'আমার দেশে' চরকার কথা তোমাদের বলিয়াছি তোমরা কি সূতা কাটিতে শিখিতেছ? লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ শেখা ভাল, তা ছাড়া, যতটুকু সূতা তোমরা কাটিতে পারিবে, জানিও সেই পরিমাণ বিদেশী সুতা কম বিক্রী হইল এমন দিন কবে হইবে যখন সব আমাদের প্রয়োজনীয় সূতা ও কাপড় এই দেশেই প্রস্তুত করিতে পারিব

বৈশাখের "আমার দেশ" নতুন বছর আসিলে মনে অনেক নতুন সংকল্প জাগে আমরাও মনে করিতেছি বৈশাখ হইতে 'আমার দেশ' পত্রিকাখানি তোমাদের মনের মতন করিয়া তুলিব 'আমার দেশ' পড়িয়া তোমরা দেশ সেবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিবে, তোমাদের জন্মভূমির দুর্গতি আর বিদেশের উন্নতির কথা পড়িয়া তোমরা জানিতে পারিবে যে আজ পৃথিবীর সব সকল জাতিই সবল, সক্ষম ও স্বাধীন হইয়া উঠিতেছে, আর ভারতবর্ষ সকলের পিছনে নিতান্ত কাঙালিনীর বেশে দাঁড়াইয়া আছে এমন হীনাবস্থা ও দুর্গতি হইতে এ দেশকে কে বাঁচাইবে বল

সুকুমারী

স্কুল যাওয়া আরম্ভ হ'ল, লেখাপড়া বেশ চল্‌ছে মেয়ে "ফার্ষ্ট" থাকে—গরবে মাটীতে পা দেয় না চাকরের কোলে কিম্বা কাঁধে চড়ে স্কুল যাতায়াত করে 'একে চন্দ্র' 'দুয়ে পক্ষ' জেনে ফেলেছে, 'দশে দিক' ভুল হয় না দাদা মহাশয়ের বন্ধু মহলে নাতনীর খুব পসার, "কর" "খল" হ'তে আরম্ভ ক'রে "গণ" "ঘট" পেরিয়ে শেষ অবধি গড়গড়িয়ে পৌঁছে যায় যাই হোক, খণা, লীলাবতী, একটা কিছু হবে, এম্নি ভবিষ্যৎবাণী শোনা যাচ্ছে, এমন সময় ভারী এক দুর্দ্দৈব ঘটল স্কুলে ইন্‌স্পেক্টর বাবু উপস্থিত হলেন, ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ। গুরু মহাশয়রা ভারী ভরসা করে, স্কুলের সেরা-ছাত্রীকে পরীক্ষায় প্রথম হাজির ক'রলেন, ফলাফল দেখে তাঁদের চক্ষু স্থির

হয়ে গেল [illegible] ছেড়ে দিতে [illegible] তখন [illegible] চেয়ে [illegible] দেন নি
[illegible] দিয়ে বলেন, "[illegible]" [illegible] ছিলেন
না বলো না, এমন কি দেখা হোল না [illegible] জানাশোনার [illegible]
দাবী [illegible] কথা। [illegible]
স্বাবলম্বিকে [illegible] তৃতীয় ভাগে [illegible] ছিলেন [illegible] অবস্থা হ'য়
তা আর বলো [illegible] সংবাদ [illegible] —
এ [illegible] নির্বাচিতেন [illegible]
হ'ল দাদা মহাশয়ের দরবারে। সেখানে অনেকগুলি [illegible] মুখ চুন করে
ফিরলেন—চাকরী গেল। [illegible] হ'ল [illegible]
লোকেদের সঙ্গে যার নামের [illegible]
অবশেষে অনেক চোখের জল খরচ ক'রে [illegible] হ'ল [illegible]
[illegible] ঠাকুরের [illegible] হ'ল [illegible]

সুকুমারীর বয়স তখন [illegible] হ'ল [illegible] মেয়েরা
[illegible] ছুটি, চারটি [illegible]
[illegible] বেঠকখানা [illegible] দশটা [illegible]
[illegible] অবিকল [illegible] পণ্ডিত [illegible] ছি।
একটা বাক্সে মেয়েরা আম কাঁঠাল ছুটি [illegible] ফিরে খাবার
কিনে খেত [illegible] একটি
নাম দমদমার বড়ী [illegible] মেয়েদের [illegible] বাবুদের
[illegible] খোলা [illegible] কুমীর কুমীর
খেলবার খুব সুবিধা ছিল। তা'ছাড়া [illegible] সেদিন মেয়েরা
বাড়ীর ভিতর গিয়া [illegible] বউ-ঠাকরাণীর ঘরে [illegible] বউমা আর তাঁর শাশুড়ী
সমবয়সী ছিলেন।

সেদিন একাদশীর [illegible] ছিলেন, মেয়েরা সব
হুড়মুড় করে বাড়ীর ভিতর গিয়ে পড়তে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসে সব
এখানে কেন? তোদের ছুটি হ'ল নাকি?" মেয়েরা বল্লে, "না [illegible] ছুটি,
খেলা করতে এসেছি।" "আচ্ছা, [illegible] খেলবি?" "[illegible]" বলে
সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলো। "কি খেলা, কাণ মাছি, না লুকোচুরি?—আপনি বুড়ী হবেন?"

তিনি বল্লেন "ও-সব বড্ড পুরোনো খেলা, এ খেলার নাম, 'গোলায় ধান ভরাই'—আয় তোরা আমার সঙ্গে।" মেয়েদের সঙ্গে করে পণ্ডিত মশায় বাড়ীর পিছনে পাঁচীল দিয়ে ঘেরা উঠোনে নিয়ে গেলেন। সেখানে একখানি মস্ত বড় পরিমাণের গোলা, নূতন তৈরি, পরিষ্কার ঝরঝরে করে খড় দিয়ে ছাওয়া, তার গায়ে ছোট একটি জানালা, তাতে দরজা আঁটা, সেখানে উঠবার জন্যে ছোট্ট একখানি বাঁশের মই। পাশে রাশীকৃত ধান। পণ্ডিত মশায় জানালা খুলে দিয়ে বল্লেন "এইখান দিয়ে ধান ঢেলে গোলা বোঝাই করবি। এই দেখ আমি মই লাগিয়ে দিচ্ছি। একজন উঠে উপরে ব'স্। দুজনে শক্ত করে মইটা ধরে থাক্, একজন ধামায় করে ধান এগিয়ে দে, যে উপরে থাক্বে সেই গোলায় ঢাল্বে এখন।"—মইয়ের উপর উঠ্তে কেউ চায় না, সবাই ডরায়, সুকুমারী বল্লে, আমি উঠ্ব—যেমনি বলা, তেমনি কর, তরতর করে মই বেয়ে উপরে উঠে বস্‌ল, গাছে চড়া অভ্যাস তার ছিল, আগ্‌ডালে বসে দোল খেত—আর ঐ যে পড়ি পড়ি ভয়ে পিঠের শির-দাঁড়াটা সির সির করত, বুকের মধ্যেটা গুর গুর করে উঠ্‌তে, সে তার ভারী মজা মনে হ'ত। সুকুর হাতে ধামা পৌঁছে দেয়, সে ঝুঁকে ঢালে, ধান পড়ার বেশ একটি ঝুর ঝুর শব্দ হয়, তার ভারী ভাল লাগে—উৎসাহ করে বলে, "আরো আন্‌ আরো আন্‌।" উৎসাহের উচ্ছ্বাসে টিফিনের সময় কখন যে পেরিয়ে গেছে তার হুঁসও হয় নি, তিনটের জোর ঘণ্টা শুনে তারা চম্‌কে উঠ্‌লে, পণ্ডিত মশায় বল্লেন "আজ ঢের খেলা হয়েছে, এখন পালা।" বাহিরে গিয়ে দেখে শুধু বুড়ো ঝি দরজা আগলে বসে আছে—গুরুমহাশয়রা চলে গেছেন। নামতা হাঁকা, গুরুমায়ের কাছে শেলাই করা কিছুই হল না, তাতে কারো দুঃখ নেই, নতুন খেলার উৎসাহে মনভরা। সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল, "বেশ মজার খেলা ভাই গোলায় ধান ভরাই, কালকেও খেল্‌তে হবে, কি বলিস্?" সবাই বল্লে "খেল্‌ব খেল্‌ব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

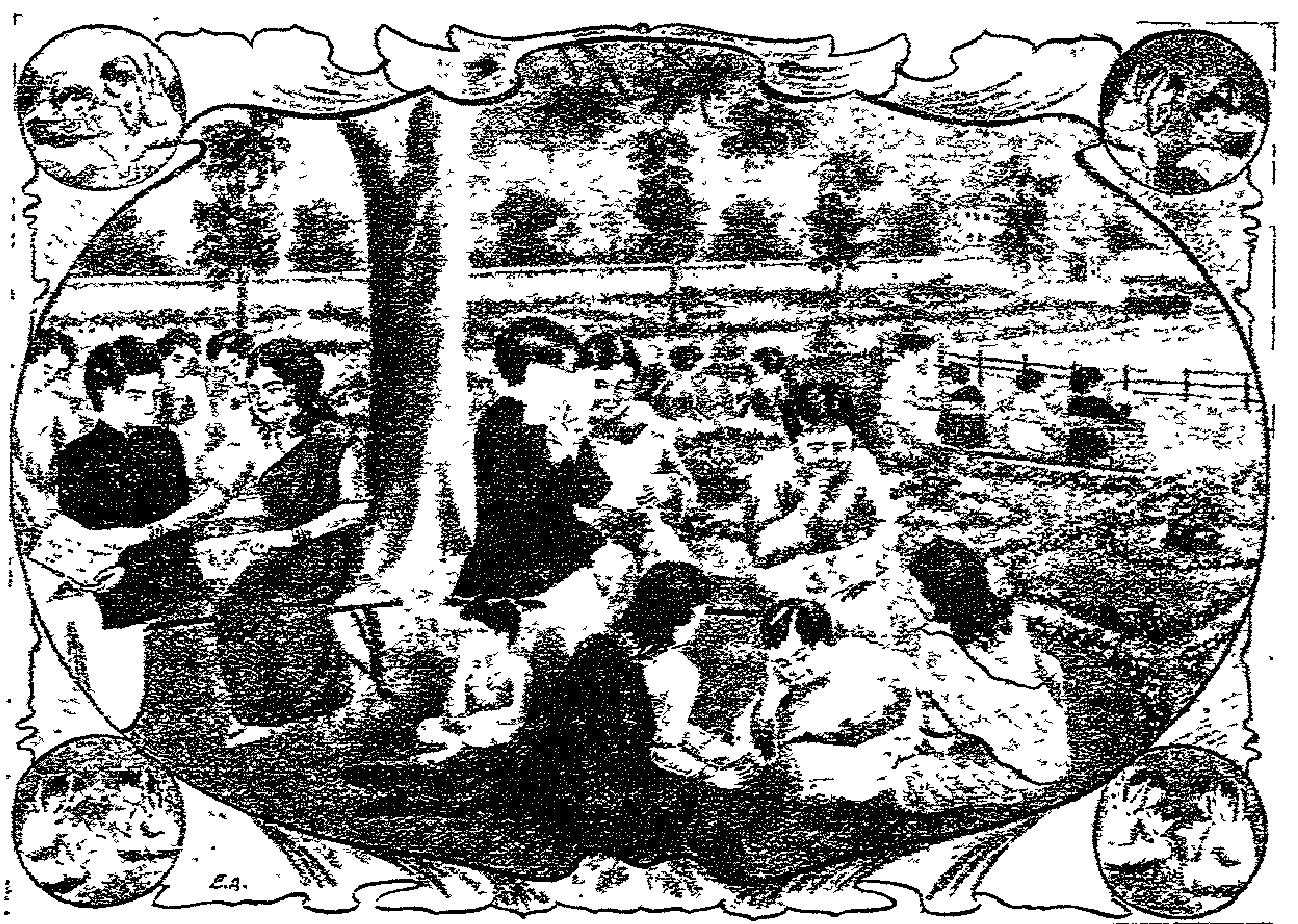
আমার দেশ



[illegible]

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

[illegible]



নূতন ভোরের গান।

আমার দেশ

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]

[বৈশাখ ১৩ ৮

নূতন ভোরের গান।

—সকলে—

ওগো ,
আলোর স্বরগ থেকে
রাঙা আলো গায়ে মেখে
এসেছি এসেছি
ভাই বোন্ সব এসেছি ভোরের রাতে
সোনার কিরণে পথ এঁকে এঁকে—
নূতন আঙিনাতে।

—ক'জন—

এই যে ভোরের সাথে
এসেছি এসেছি ভোরের পাখীর
উজল কিরণ মাথে
ঝিকিমিকি আলো বুক-ভরা,
আর,
সোণার বাঁশীটি হাতে।

—সকলে—

এসগো এসগো সবে
আজ লুটে পুটে নিতে হবে!—

—ক'জন—

এনেছি এনেছি প্রাণ ভরে মোরা
গলাগলি চুমো হাসি,

—সকলে—

এনেছি যে আজ নূতন জীবন,
মোদের
অবাক-করা এ উজল ভুবন!
এনেছি এনেছি নূতন জানার
নূতন গানের বাঁশি।

—ক'জন—

নিতে হবে, নিতে হবে!
যেখানে যা কিছু আছে।
সকল ভুবনে যা আছে গোপনে
আজ তারা হাসিয়াছে।

—আর ক'জন—

এই
মোদের বুকের কাছে তা'রা
হাসিয়াছে! হাসিয়াছে!

— সকলে —

উঠিয়াছে, আসিয়াছে,

তা'র

বুকের চোখের কাছে!

তা'রা

ঘুমায় বুকের কাছে।

— ক'জন —

উঠে'

নাও নাও তুলে বুকে,

— সকলে —

ওঠ, নাও, নাও বুকে

দিয়ে আলো নব চুমে তাদের চক্ষের মুখে।

— আর ক'জন —

ঘুমের কি আর হয়?

— আর ক'জন —

আর হয়— কভু হয়?

— আর ক'জন —

নয়! নয়!— চল ছুটে।

— সকলে —

আর কি ঘুমাব? ঘুম ভেঙে দিব সবার সকলে জুটে'।

নিয়ে

নাও আলো মুঠে মুঠে

চল ছুটে! চল ছুটে

— আর ক'জন —

কাহারে চোখের জল

করে কিরে টল্ টল্?

— ক'জন —

মুছে ফেল, মুছে ফেল! নূতন দিন যে এল!

—তার ক'জন—

সবার মুখের হাসি সবার হৃদয় বাঁশি
প্রাণ ভরে যেন উঠে
আজ ফুলের মতন ফুটে'।

—আর ক'জন—

আজ ফুলের মতন ফুটে'
সকল ভুবন উঠে

—সকলে—

কোথায় কে আছে
সব খুঁজে নিব সব জেনে নিব সবে
সব জেনে নিব কোথায় কি হয় কোথায় কি সব হবে

—আর ক'জন—

কোথায় কি সব হবে
আর
কোথায় যে সব হয়

—আর ক'জন—

কি সব এমন
কেন যে কেমন,
কিছুই যে মিছে নয়—

—উভয় দল—

মোদের বুকের সকল স্বপন
জেনে নিব সমুদয়।

—সকলে—

জয় জয় ওই জয়। ওই হাসেন অমৃতময়।
অজান জানার ভোর যে তাঁহার
উদয় জগৎময়।—

আমার দেশ

-একদল

সোনার উষার গানটি ভরে ভরে জয়

প্রাণ করে আলোময়

সকলে--

সব আলোয় গিয়েছে ভেসে -

আঁধার রাতের শেষে

ভোরের পাখীর ডাক শুনে' কে রে পাহারা থাকে দেশে?

—একদল—

ভোর বাতাসের উছল গানের সাজ র ঝুলানো বেশে

—সকলে

এসে

এই

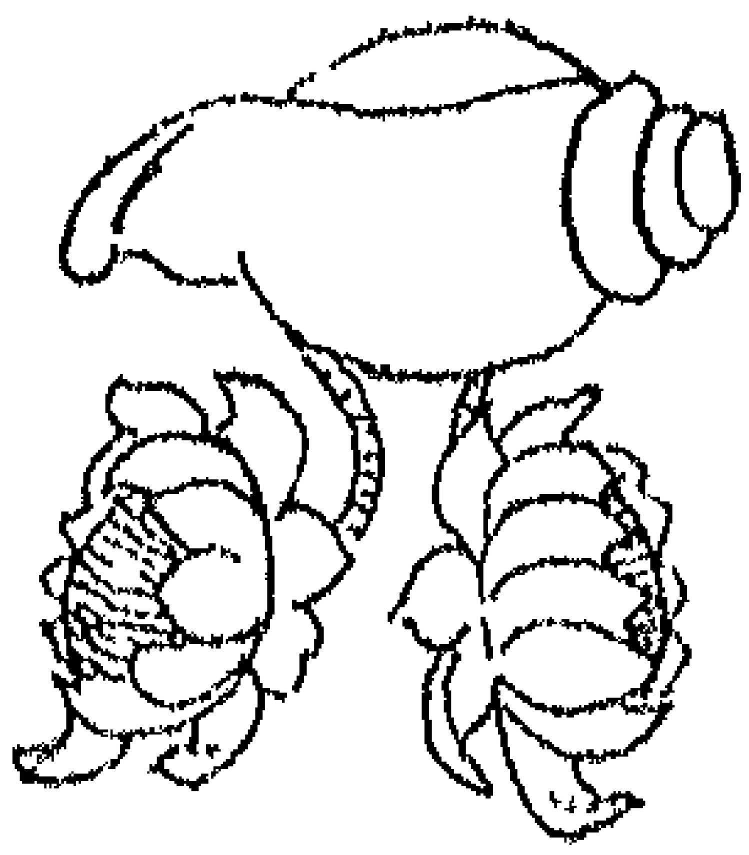
আলোর মুকুট ভোরের মুকুট

লও এসে লও হেসে

এই নূতন জীবনে এসে--

এই সোনার জীবনে, আমার জীবনে, সোনার আলোর দেশে।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার



সাপ ও সন্ন্যাসী

(১)

এক গ্রামের ধারে এক মাঠে একটা প্রকাণ্ড সাপ একটা গর্তের ভিতর বাসা করিয়াছিল সাপটা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি ভয়ঙ্কর। সাপটার ভয়ে গ্রামের লোক সেই মাঠের ত্রিসীমানায় যাইতে সাহস করিত না। যদি কোন লোক না জানিয়া সেই মাঠের নিকট যাইয়া পড়িত তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা ছিল না, সাপটা অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইত।

সেই মাঠের পাশের মাঠে রাখালের ছেলেরা গরু চরাইত, আর যদি কাহাকেও সেই মাঠের দিকে যাইতে দেখিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাপের কথা বলিয়া সে দিকে যাইতে নিষেধ করিত। একদিন রাখালেরা গরুর পাল লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় দেখিল একজন সন্ন্যাসী সেই মাঠের দিকে যাইতেছে অমনি একজন ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিল,

"ঠাকুর ওদিকে যাইবেন না, ওদিকে যাইবেন না। ঐ মাঠে একটা প্রকাণ্ড সাপ আছে সাপটা বড় ভয়ঙ্কর—মানুষের শব্দ পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া কামড়ায়।"

রাখাল বালকের কথায় সন্ন্যাসী একটু স্তব্ধ হইলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বৎস! আমি সন্ন্যাসী, আমি সাপের ভয় রাখি না সাপের এমন শক্তি নাই যে সন্ন্যাসীকে কামড়াইতে পারে।

সন্ন্যাসী আর বিশেষ কোন কথা কহিলেন না, একটু মৃদু হাসিলেন, তাহার পর আবার সেই মাঠের দিকেই অগ্রসর হইলেন সন্ন্যাসী তাহাদের নিষেধ না মানিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া রাখাল ছেলেদের আর গ্রামে ফেরা হইল না, সাপটা কি করে দেখিবার জন্য গরুর পাল লইয়া তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল সন্ন্যাসী মাঠে যাইবামাত্র সাপটা ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসীকে কামড়াইবার জন্য ছুটিয়া আসিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার দিকে ফিরিবামাত্র তাহার গর্জ্জন বন্ধ হইয়া গেল, সে আর ফণা তুলিতে পারিল না, মরার মত সন্ন্যাসীর পায়ের সম্মুখে পড়িয়া রহিল তখন সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে সাপটাকে বলিলেন,—

"কি হে বন্ধু, আমাকে কি কামড়াইতে চাও।"

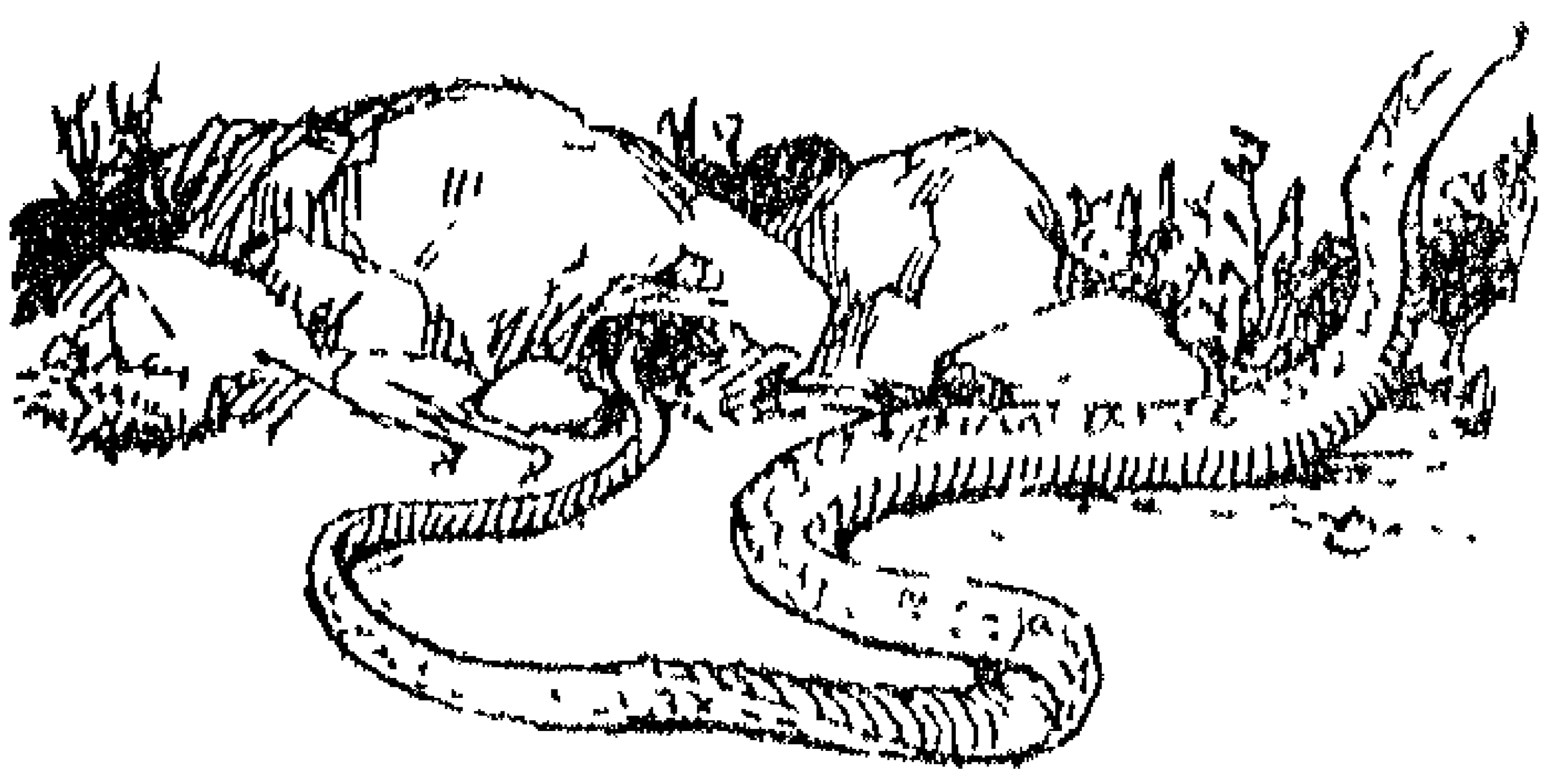
সাপটার তখন এমন অবস্থা হইয়াছিল যে সে আর লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না,—যেমন ফণা নীচু করিয়াছিল তেমনি ফণা নীচু করিয়া রহিল। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—

"বন্ধু, তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখন কাহাকেও কামড়াইবে না তাহা হইলে আমি আবার তোমাকে তোমার পূর্ব্ব শক্তি ফিরাইয়া দিতে পারি।"

সাপ মশাই তখন করেন কি,—অন্য উপায় ত আর নাই। বাধ্য হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট তাহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে, সে আর ভবিষ্যতে কাহাকেও কামড়াইবে না। সন্ন্যাসী তাহার পূর্ব্ব শক্তি তখন ফিরাইয়া দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আর সাপ মহাশয়ও গুড় গুড় করিয়া নিজের গর্ত্তের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—কাজেই সাপ আর কেমন করিয়া মানুষকে কামড়াইবে। সে অতি ভদ্রভাবে জীবন কাটাইতে লাগিল। সাপটার এই ভাব দেখিয়া রাখালের ছেলেরা ভাবিল, সাপটার নিশ্চয়ই বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—সাপটার আর কোন শক্তি নাই। তাহার পর হইতে তাহারা সাপটাকে দেখিতে পাইলেই ঢেল মারিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তবুও সাপটাকে ফণা পর্য্যন্ত তুলিতে না দেখিয়া তাহাদের সাহস আরও





সাপ বশ হইয়া গেল।

বাড়িয়া গেল। তাহারা একদিন সাপটার লেজ ধরিয়া এমনি ঘুরান ঘুরাইল যে সাপটার সর্ব্বাঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একসা হইয়া গেল। কিন্তু তবুও সে কাহাকেও কিছু বলিল না, কোনও ক্রমে প্রাণটুকু লইয়া গর্ত্তে গিয়া প্রবেশ করিল।

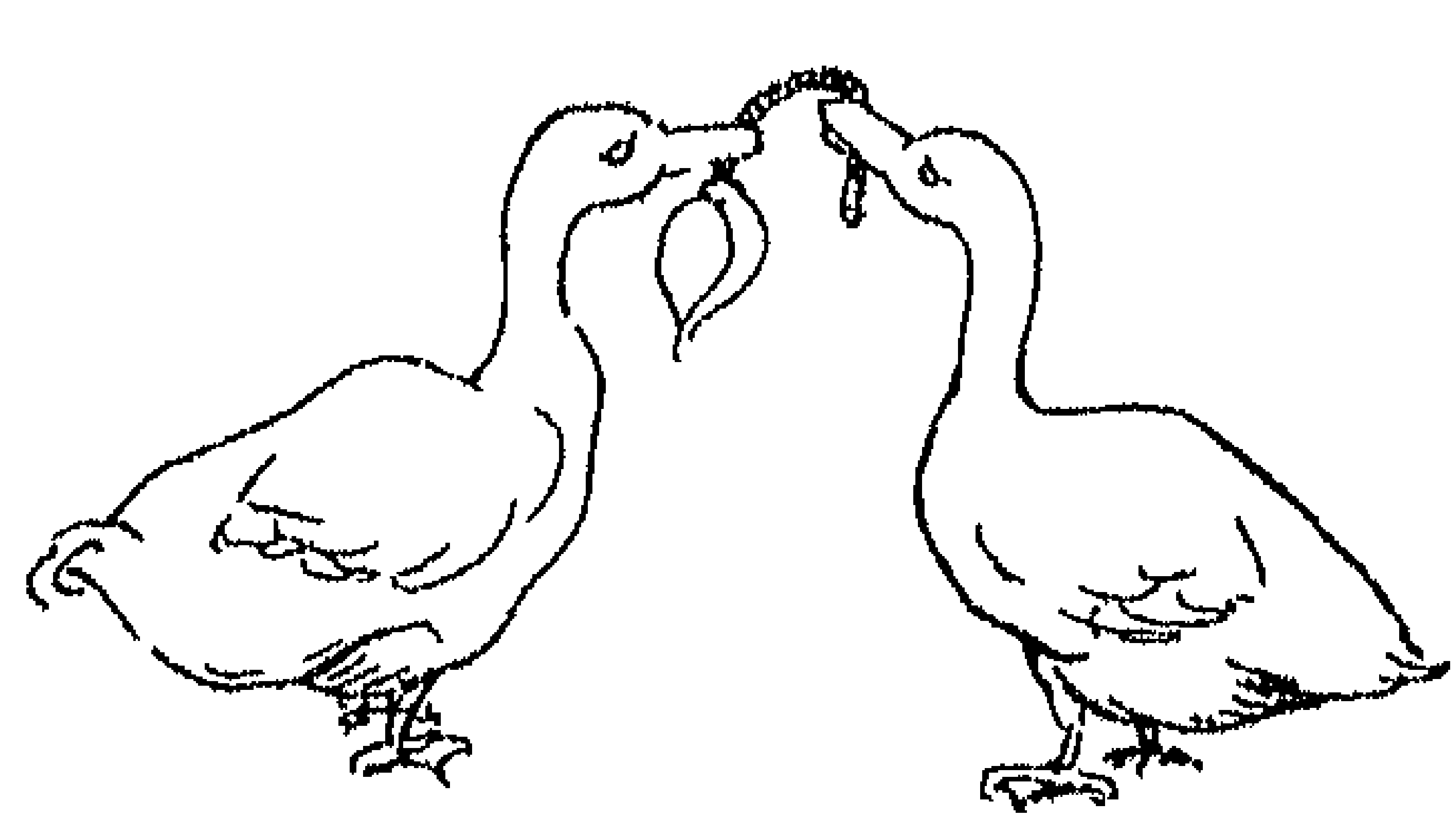
সেই সময় সেই সন্ন্যাসী আবার একদিন সেই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তিনি সাপটির অবস্থা দেখিয়া বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বন্ধু, তোমার এমন অস্থি চর্ম্ম সার অবস্থা কেমন করিয়া হইল ? তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে ?

সাপ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"প্রভু, আমার অসুখ বিসুখ কিছুই করে নাই। আপনার আদেশমত আমি আর মানুষকে কামড়াই না,—তাই মানুষে আমার এই হাল করিয়াছে সে দিন তাহারা আমার লেজ ধরিয়া এমন ঘোরান ঘুরাইয়াছে যে, আমার সর্ব্বাঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

সাপের এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী প্রাণে বড় বেদনা পাইলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভাই, আমি তোমাকে কামড়াইতেই নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ফোঁস করিতে তো নিষেধ করি নাই। তুমি ফোঁস কর নাই কেন ? তাহা হইলে তো তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না। লোকের অনিষ্ট করিও না, কিন্তু লোক তোমারও যাহাতে অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার জন্য তোমারও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। পরদিন রাখালের ছেলেরা সেই মাঠে আসিবামাত্র সাপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহারা ভাবিল সাপটার বুঝি আবার বিষ দাঁত গজাইয়াছে। তখন যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পালাইল সেই হইতে সাপটা আবার বেশ নিশ্চিন্তে বাস করিতে লাগিল।

'গল্পে রামকৃষ্ণ' হইতে



কুড়ানো ছেলের কাহিনী

(২)

এই আমার পিতা ? এতদিন পর দেখা, কই তিনি তো আমাকে একটুকুও আদর করিলেন না। বরং নমস্কার করিতে কেবল তিনি আমাকে লাঠি তুলিয়া মারিতে আসিলেন আমাকে দেখাইয়া মা-বারবেরেঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে ?"

"বিমি ?"

"বিমি ? কেন, তোমাকে না বলিয়াছিলাম· · · ·"

"তোমার কথা আমি পালন করিতে পারি নাই "

আমি দূরে দাঁড়াইয়া এই নবাগত ব্যক্তিটিকে দেখিতে লাগিলাম। এই আমার পিতা. এমন রুক্ষ চোয়াড়ে তাহার চেহারা ? তাহার প্রাণে কি দয়ামায়া নাই ? আমি কত আশা করিয়াছিলাম, আমার বাব আমাকে না জানি কত ভালবাসিবেন। আমি তাহাকে কত ভালবাসিব তামার এতদিনের আশা এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি যে তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছি ইহাও যেন তাহার সহ্য হইল না। চোখ রাঙাইয়া ছাতের চাতালায় আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমারও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল না—আমি অমনি বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। চোখ বুজিলে কত কথা মনে আসিতে লাগিল।

কতক্ষণ এই ভাবে গেল জানি না, হঠাৎ কাণের কাছে কার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। দুম্ দুম্ ভারি পায়ের শব্দ, শুনিয়াই বুঝিলাম জেরম্। পাছে আমি ঘুমাই নাই টের পান এই ভয়ে আমি ঘুমের ভান করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। জেরম্ উপুর হইয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া দেখিল আমি ঘুমাইয়াছি কি না, দুই তিন বার নাম ধরিয়া ডাকিল।

মা বারবেরেঁ বলিল—"রিমি এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে কখনও অতরাত্রি জাগিয়া থাকে না।"

আমার তখনই ইচ্ছা হইতেছিল মা বারবেরেঁকে বলি আমি ঘুমাই নাই। কিন্তু জেরমের ভয়ে বলিতে পারিলাম না।

আমাকে নিদ্রিত দেখিয়া কেবম মা-বাবরেবেকে বলিল,—"তুমি এই আপদটাকে এখনও দূর কর নাই ?"

"কে যায় ?"

"কেন, অনাথ আশ্রমে "

"তোমার প্রাণে কি একটুকুও মায় দয়া নাই আহ, দেখ দেখি কি সুন্দর ছেলেটি ; কোনপ্রাণে ইহাকে হ ত ধরিয় বিদায় করি ?"

"সুন্দর মুখে তে আর আমাদের পেট ভরিবে না ? আমি কালই ছেলেটাকে অনাথ-আশ্রমে দিয়া আসিব "

"না না, তুমি অমন কাজ কখনই করিতে পারিবে না আমার দিকে তাকাইয়াও তো তোমার মায় হওয় উচিৎ আমার আর কে আছে ? একটিমাত্র ছেলে ছিল, সেও তো আমাকে ফাঁকি দিয় চলিয় গিয়াছে নিকলাস আজ বাঁচিয়া থাকিলে রিমির মতই বড় হইত "

"আগে তো নিজের পেটের চিন্তা করিতে হইবে নিজে কি খাই তার ঠিকানা নাই আর কিনা পরের একটা ছেলেকে পুষিতে হইবে সে আমি পারিব না "

"পরের ছেলে আর কোথায়, রিমি তো এখন আমাদেরই ছেলে "

"আমাদের ছেলে বই কি একবার ছেলেটার হাত পায়ের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি। তুমি কি মনে কর আমাদের মত গরীবের ঘরে তার জন্ম ? সে আমাদের মত কোন দিনই খাটিয় খাইতে পারিবে না।"

"তা হউক, তবু উহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না পরের ছেলেকেও পালিলেও কি মায়া হয় তা তোমরা পুরুষ মানুষেরা বুঝিবেন আর তার মা বাপ যদি সত্য সত্যই বড়লোক হয় তা হ'লে তারা নিশ্চয়ই তাদের ছেলেকে খোঁজ করিতে আসিবে। আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখন তাদের কি বলিবে ?"

"তুমিও যেমন, তুমি কি মনে কর তারা এখনও বাঁচিয়া আছে ? আমি তো তাদের কথা মনে করিয়াই, ছেলেটাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম ভাবিয়াছিলাম ছেলেটাকে তার মা বাপের হাতে দিতে পারিলে কিছু লাভ হইবে। এতদিন ধরিয়া ছেলেটাকে নিজের ঘরের পয়সা খরচ করিয়া খাওয়ানই সার হইল "

দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল আমি তাহাদের কথা শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া শুইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে জেরম্ বলিল, "আমি একবার নিচে গিয়া জমাদারের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি, একটু পরেই ফিরিয়া আসিব, তুমি দরজা খুলিয়া রাখিও।"

জেরম চলিয়া যাইতেই আমি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া মা-বাবেবেকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিলাম, তার পর কোনো মতে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম,

"মা-বাবেবে তুমি আমার মা নও?"

মা বাবেবে দুইহাতে আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কে তোকে এ কথা বলিল?"

"কেন, এই যে জেরম্ বলিতেছিল।"

"তবে তুই সকলই শুনিয়াছিস?"

"হ্যাঁ মা, আমার কোন দোষ নাই, আমি ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না।"

"না না, তোর কেন দোষ হইবে? আমি জানি একদিন না একদিন তোকে বলিতে হইবে। রেমি তুই আমার পেটের ছেলে নস কিন্তু তবু নিজের পেটের ছেলের চেয়েও তুই আমার কত আপনার। এতদিন তোকে সব কথা বলি নাই, কেমন করিয়া বলিতে পারি নাই, পাছে তোকে হারাই। আজ যখন তুই সকলই জানিলি তখন তোর কাছে আর কিছুই লুকাইব না। সত্য সত্যই তুই আমার পেটের ছেলে নস্। আমার স্বামী তোকে প্যারি নগরীর রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। তখন তুই ছোট্ট শিশু মাত্র। একদিন শীতের সকালে জেরম্ কাজে বাহির হইয়াছিল, তখনও অন্ধকার ভালো করিয়া দূর হয় নাই—হঠাৎ শিশুর কান্না শুনিয়া কাছে গিয়া দেখে, তোকে কে রাস্তায় ফেলিয়া গিয়াছে। তোর গায়ে যে কাপড় জড়ান ছিল তাই দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন তুই বড়লোকের ছেলে। পুরস্কারের লোভে তোকে রাস্তায় ফেলিয়া না গিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। তখন আমার কোলেও তোর মতই ছোট একটি শিশু ছিল। তোদের দুজনকেই আমি বুকের দুধ দিয়া মানুষ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরেই জেরম্ নিজের কাজে প্যারি চলিয়া গেলেন। আমার শিশুটিও তিনমাসের মধ্যে মারা গেল। তখন তুই-ই আমার সমস্ত কোল জুড়িয়া বসিলি। প্যারি গিয়াও জেরম্ তোর কথা ভোলে নাই, সে অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিল কেউ তোকে খুঁজিতে আসে কিনা। এক বৎসর চলিয়া গেল তবু যখন কেউ তোকে খুঁজিতে আসিল না তখন জেরম্ তোকে অনাথআশ্রমে দিয়া আসিবার জন্য আমাকে প্যারি হইতে লিখিয়া

পাঠাইল কিন্তু আমি তাব কথা ন বাখিয তোকে তাি নিজেব ক ছেই রাখিলাম

আমি মা-বাবেবেব গলা জড় ইয ধবিয কঁ দিতে কঁ দিতে বলিলাম “, তোমরা অ মাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠ ইও ন, তোম কে ছাড়িয ত ি কে থ ও ব কিতে পাবিব ন ।”



মা-বারবেবেঁ আমাব মুখে চুমু খাইয় বলিয বলিল য, তুই এখন ঘুমা, তোব কোন ভয় নাই, আমাব কাছ হইতে কেউ তোকে কাড়িয়া নিতে পাবিবে ন। ” আমি চোখ বুঝিয়া শুইযা বহিলাম।

কিন্তু ঘুম আসিল না মা বারবেবেব মতই তিনি কি আমাকে ভালবাসিবেন ? জেবম্ ? এলোকটা যে আমাব কেউ নয এ কথা শুনিয আমি খুসীই হইল ম কিন্তু কাল যদি সে আমাকে জোব কবিযা অনাথ-আশমে লইযা যায ? মা-ব রবেবেঁ কি তাহাকে বাধ দিতে পাবিবেন ?

আমি অনাথ-আশ্রমেব ছেলেদেব দেখিয় ছি তাদেব গলায় টিকিট ঝোলান, সকলে তাদেব ঠাট্টা বিদ্রুপ কবে, বাস্তাব বাহিব হইলে কুকুর বিড়ালের ন্যায সকলে তাদেব তাড়া কবে অবশেষে আমাকেও কি তাদেবই মত হইতে হইবে ?

আমি ঘুমাইতে পাবিলাম না কিন্তু ভয হইতে লাগিল জেবম্ যদি তখনই আসিয পড়ে। আমি এখনও ঘুমাই নাই দেখিলে সে নিশ্চযই বাগ কবিবে। এপাশ ওপাশ ফিবেতে ফিবিতে কখন একসময় ঘুমাইযা পড়িলাম জানিতে পাবিলাম না

ক্রমশঃ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন



দেশ বিদেশের কথা

স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

বাংলা দেশের খ্যাতনামা পুরুষেরা একে একে বিদায় লইতেছেন। গত মাসে তোমাদের খবর দিয়াছি যে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেশভক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের মৃত্যু ঘটিয়াছে। আজ আর একজন দেশসেবকের মৃত্যুর খবর দিতে হইতেছে,—তাঁহার নাম ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। কি কারণে তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি হইল সেই কথাটি তোমাদের বলিব।

এমন অনেক রোগ আছে যাহা ঔষধে দিয়া সারে না, রোগের মূল অস্ত্রের সাহায্যে তুলিয়া ফেলিতে হয়। শরীর কাটিয়া ইহা করা কত শক্ত তাহা সকলেই বুঝিতে পার। ধর, পেটের ভিতর কোথাও একটা ফোঁড়া হইয়াছে, ঔষধপত্র দিয়া কিছুতেই যখন ফোঁড়াটাকে গলানো গেল না তখন পেট চিরিয়া ফোঁড়াটাকে কাটিতে হয়। ডাক্তারি বিদ্যার মধ্যে অস্ত্রবিদ্যাটি সর্বাপেক্ষা কঠিন। এই কাজ ইংরেজ সাহেবেরাই প্রায় একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছিল; অস্ত্রের প্রয়োজন হইলে আমরা "সাহেব-ডাক্তারকে" ডাকিতাম। সুরেশপ্রসাদ এই অস্ত্র-বিদ্যা এমন করিয়া শিখিয়াছিলেন যে আমাদের দেশে তাঁহার মতন সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসক আর কেহ ছিলেন না। সুরেশপ্রসাদ ইহা প্রমাণ করিলেন যে বাঙালী কোনো-কাজে পিছনে পড়িয়া থাকিবে না—একটু সুযোগ সুবিধা পাইলেই সে সকল বিষয়ে

কৃতিত্ব দেখাইতে পারে এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি বড় হইতে পারিয়াছিলেন ও এই কারণেই কোনো কাজে তিনি পিছপাও হন্ নাই

জর্মানির সহিত ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এদেশে নানা আয়োজন হইতে লাগিল ; সুরেশপ্রসাদ এইসুযোগে বাঙ্গালী যুবকদের লইয়া একদল সৈন্য গঠনে বিশেষ উৎসাহিত হইলেন তিনি জানিতেন যুদ্ধবিদ্যা না শিখিলে বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে স্থান পাইবে না ও বাঙ্গালীকে অপর জাতি শ্রদ্ধা করিবে না। সুরেশপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র লইয়া "য়ুনির্ভার্সিটি কোর" ও একদল বাঙ্গালী যুবক লইয়া "আম্বুলেন্স কোর" গঠন করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন তোমরা হয়ত এই নামের অর্থ জান না। যুদ্ধের সময় যাহারা অসুস্থ বা আহত হইয়া পড়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহাদের আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয় যাহারা এই ব্যবস্থা করে সেই দলের নাম "আম্বুলেন্স্ কোর"

দেশের ভাল হইবে এমন সকল কাজে সুরেশপ্রসাদ খুব আগ্রহের সহিত যোগ দিতেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঝড় বাদলে অনেক লোকের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায় ও বন্যায় ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয় ; সেই দুঃখের দিনে যাহারা টাকাকড়ি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, সুরেশপ্রসাদ তাহাদের মধ্যে একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তোমাদের বলিয়াছি তিনি বাংলাদেশের একজন নামজাদা চিকিৎসক ছিলেন ; অনেক টাকা কড়ি উপার্জ্জন করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না লোক সেবার কাজে চিকিৎসকের সাহায্য বিশেষ দরকার—তাই সুরেশপ্রসাদ নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই কাজে মন দিতেন লোক সেবার কাজে আজ আমরা তাঁহার অভাব বোধ করিতেছি।

বংলাদেশের ছেলেরা চিকিৎসা শাস্ত্র পড়িবার সুযোগ পাইবে এই জন্য সুরেশপ্রসাদ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে জোট বাঁধিয়া বেলগাছিয়াতে এক ডাক্তারি বিদ্যালয় খুলিয়া দিলেন। বাঙ্গালী নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতির পথ করিয়া লইতে পারে, বেলগাছিয়ার মেডিকেল কলেজ তাহার দৃষ্টান্ত

সুরেশ প্রসাদের পিতা একজন নামজাদা ডাক্তার ছিলেন—ডাক্তার সূর্য্যকুমার অধিকারী। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হুগলি জিলার অধীন বামুনপাড়া গ্রামে মামাবাড়ীতে তার জন্ম। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান—রাধানগরের এক পাঠশালায় সুরেশপ্রসাদের হাতে খড়ি আরম্ভ হয় তার পর কলিকাতায় আসিয় তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন কলিকাতার মেডিকেল কলেজের সেরা ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

বাংলা দেশের একজন মানুষের মতন মানুষ অল্পবয়সে বিদায় হইলেন—আজ তাঁহার জন্য আমরা শোক করিতেছি।

বাণিজ্যের কথা :—

আমাদের দেশ হইতে যে সকল জিনিষপত্র মালমশলা বিদেশে যায় তাহাকে বলে রপ্তানি দ্রব্য ; আর, বিদেশ হইতে যে সকল জিনিষপত্র আসে তাহাকে বলে আমদানী দ্রব্য। আমরা পাট, তুলা, ধান, গম, তিসি, তিল প্রভৃতি ফসল রপ্তানি করি। আর বিদেশ হইতে আমদানী করি কাপড়, কাগজ, চিনি, বিলাতী ঔষধ, মদ ইত্যাদি। তোমাদের কাছে আমদানীর কথা একটু খুলিয়া বলিতেছি। বাণিজ্যের পুঁথিপত্র পড়িলে দেখা যায়, যে সমস্ত জিনিষ বিদেশ হইতে আসে, তাহার মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ সুতার কাপড় ও সুতা, ৬ ভাগ মদ, বিলাতী ঔষধ, ষ্টেশনারী নানাপ্রকার জিনিষপত্র ৯ ভাগ চিনি, ৭ ভাগ লোহা লক্কড়, তিন ভাগ কল কব্জা, [illegible] ভাগ রেলগাড়ীর জিনিষপত্র, ২ ভাগ খনিজ তৈল, ৩ ভাগ রেশম ও ২ ভাগ বাসনপত্র আসে। এই হিসাব দেখিয়া তোমরা বুঝিতেছ—কেন ঘরে ঘরে চরকা চালাইবার কথা উঠিয়াছে। কাপড়ের প্রয়োজনটা যদি চরকায় সূতা কাটিয়া, তাতে সেই সূতা দিয়া কাপড় বুনিয়া মিটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে শতকরা ৩৬ ভাগ আমদানী রোধ করিতে পারি। তারপর, দেশের লোক যদি পণ করিয়া বসে যে মদ খাইবে না, তাহা হইলেও অনেক টাকার বিদেশী মদের আমদানী বন্ধ হয়। তাই দেশসেবকেরা বলিতেছেন, সূতার অভাব দূর কর, আর কোনোপ্রকার নেশা করিও না। এই দুইটি কাজ করিতে পারিলে অনেক টাকা বাঁচে ও দেশের শিল্প উদ্ধার হয়।

য়ুরোপে অশান্তি : —

তোমরা নিশ্চয়ই তুষের আগুন দেখিয়াছ। উহা নিভিতে নিভিতেও নিভে না ; একটু সুযোগ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। কয়েক বৎসর ধরিয়া য়ুরোপে জার্ম্মাণির সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লড়াই চলিতেছিল ; এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই অনেক ক্ষতি হইল, তারপর সন্ধির প্রস্তাব আসিলে ইহা লইয়া সভা সমিতি বসিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বলিল এই যুদ্ধের জন্য জার্ম্মাণি দায়ী, অতএব জার্ম্মাণিকেই ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে, রাজ্যের কোনো কোনো অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে আর ৪২ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বৎসর ৪৫০ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হইবে। এমন দাবি মিটাইতে গেলে জার্ম্মাণি বাঁচিবে কেমন করিয়া ? তাই সন্ধির শর্ত্ত লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইল। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স শুনিল না, তাহারা চোখ রাঙাইয়া ভয় দেখাইল। মনে হইতেছে আবার বুঝি অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, হয়ত আবার খুনাখুনি সুরু হইবে। য়ুরোপের স্বাধীনচেতা পুরুষেরা আক্ষেপ করিতেছেন যে এখনও বর্ব্বরতার এই কুৎসিৎ অভিনয় থামাইয়া দিবার কোনো পথ হইল না।

কলিকাতার লোকসংখ্যা ঃ—

তোমরা যাহারা গ্রামে কিংবা ছোট সহরে বাস কর, তাহারা জান না কলিকাতা সহরে লোক জনের বসতি কত, আর কেমন করিয়াই বা ইহারা বাস করে এমন কি কলিকাতার ভদ্রলোকেরাও খবর রাখে না গরীবেরা কোথায় থাকে এই বৎসর লোক সংখ্যার গণনা হইতেছে, তাই কিছু কিছু খবর পাওয়া গিয়াছে

পূর্ব্বে যতখানি জায়গায় যত লোক বাস করিতেছিল, সেই সব লোকই তাহা অপেক্ষা কম যায়গায় বাস করিতেছে ছোট একটি ঘর হয় ত দুই তিন পরিবার জিনিষপত্র লইয়া গাদাগাদি করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে আস্তাবলগুলি খোলার ঘর একটা একটা ঘরে দশ বারখানা ঠিকাগাড়ী ও ঘোড়া থাকে ইহার উপরে বাঁশের মাচাগুলি কাদা দিয়া পলস্তারা করা। এই মাচার উপর পঞ্চাশ ষাট জন করিয়া লোক থাকে। এইখানেই ইহাদের একমাত্র আশ্রয়!

হ্যারিসন রোডে বড়বাজারের কাছে এমন একটি ছোট বাড়ীতে পাঁচশত লোক পর্য্যন্ত বাস করে কেহ বা ঘরে, কেহ বা বারেন্দায়, কেহ বা উঠানে এমন কি বাড়ীর ছাদে লোকের বসতি খবর লইয়া জানা গিয়াছে এক বাড়ীতে ৯০ জন লোক ছাদের উপর বাস করে— ইহাদের মাথার উপর কোনো আচ্ছাদন নাই ইহারা জাতিতে কাহার—কলিকাতা সহরে পাল্কী বহন করাই ইহাদের কাজ। সারা দিন পরিশ্রমের পর খোলা ছাদে খোলা হাওয়ায় গাদাগাদি করিয়া ইহারা রাত কাটায় ঝড় বৃষ্টিতে আশ্রয় লইতে পারে এমন স্থান ইহাদের নাই।

হাবড়ার সেতু ও চিৎপুরের কাছাকাছি গঙ্গার ধারে রেলের লাইনের দুই পাশে যতটুকু স্থান আছে, কলিকাতার অনেক কুলী মজুর ও গাড়োয়ান এইখানে বাস করে নূতন বাজারের পশ্চিমে বারট্রাম ষ্ট্রীটে ফুটপাথের উপর রাত ১১টার পর বহু লোক শুইয়া থাকে বাজারের আশে-পাশে খানসামা, চাকর, বাবুর্চ্চি, কোনো রকমে রাত কাটাইয়া ভোর হইলেই কাজে যায়।

তোমরা ভাবিয়া দেখ যাহারা দিনরাত পরিশ্রম করে তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল? অথচ কোনো রকম পরিশ্রম করে না বা অতি অল্প পরিশ্রম করে এমন লোকের কেবল থাকিবার ও খাইবার ভাল ব্যবস্থা আছে তাহা নহে, বাবুগিরিতেও ইহারা অনেক টাকা খরচ করিতে পারে

তোমরা আরো ভাবিয়া দেখ কুলীমজুর কেন তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিতেছে? গুরুজনের কাছে কিংবা শিক্ষক মহাশয়ের কাছে তোমরা এই সকল প্রশ্ন করিবে ইচ্ছা কর ত তাঁহাদের উত্তর পাইয়া তোমরা কি বুঝিলে তাহা লিখিয়া 'আমার দেশের' সম্পাদকের কাছে পাঠাইতে পার

কিচ্ছু মিচ্ছু

[১

রাম কানায়ের ছেলে বেল ,
বাপ গেম্‌লো মরে,
ধরার কোলে বাড়লো রামু,
মায়ের আঁচল ধ'রে

[২]

ম ছাড় আর পৃথিবীতে,
কেউ ছিল না ত র ;
কুচ্‌কুচে তার রংটি ছিল,
অতি চমৎকার

[৩]

মার আদরে দুধে ভাতে,
ছিল রামু বেশ ,
ভাবনা চিন্তা ছিল নাকো ,
ছিল নাকো ক্লেশ

[৪]

রামুর মা ভাবতে এমন,
রামুর মত ছেলে ,
সচরাচর যায় কি দেখা ,
অনেক পুণ্যে মেলে

৫

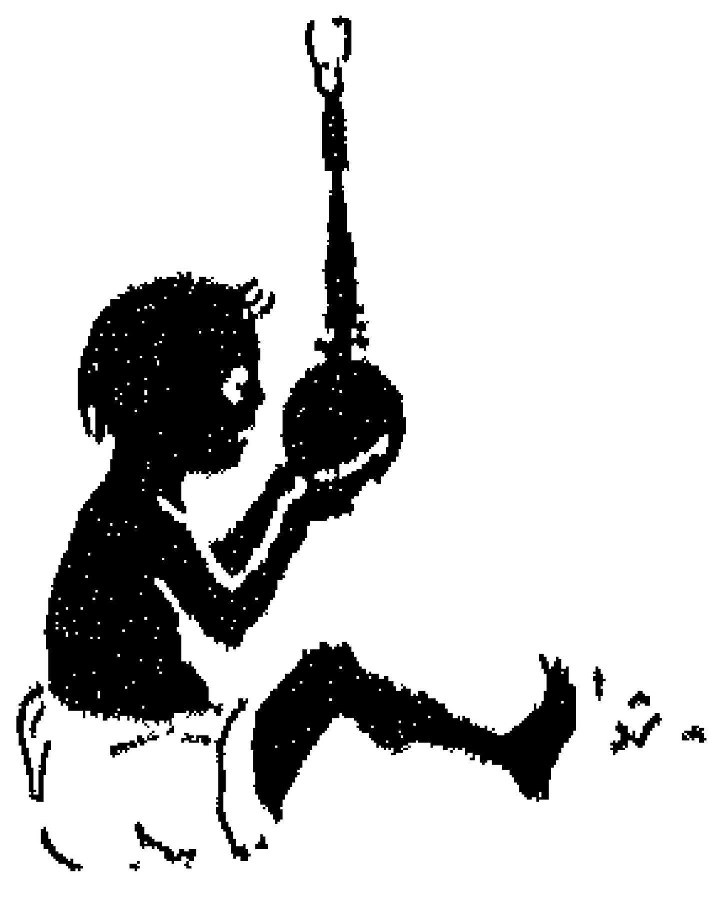
ম রের ভাড়ায় [illegible] ,
যেত রাম রোজ ,
কিন্তু র মুখ ছিল নাকো ,
[illegible]

৬

ক জেঠি র মুখ [illegible] ন,
টিপতে হলো [illegible] না ;
[illegible] উপরে ম রো মারো ,
ছিল তামাক সাজা

[৭]

এই ভাবেতে পাঠশালেতে,
নিত্য যেতে যেতে,
[illegible] হতে শিখলো রামু,



শুধু কটুকু খেতে

[৮

রামুর যখন বয়স হোল,
উঠল গোঁফের রেখা
চরম হলো রামুর তখন,
লেখা পড়া শেখা।

[৯]

রামুর মা ব্যস্ত হলো,
ছেলের বিয়ের তরে,
ও বলে এবার আনতে হবে,
বৌ একটি ঘরে।

(১০)

অনেক গ্রাম খুঁজে শেষে,
আড়াই কুড়ি পনে ;
রামুর মা রামুর জন্যে ;
স্থির কল্লে কনে

(১১)

ঘটা করে রামুর বিয়ে,
হ'লো ঢাক ঢোলে,
বিয়ের পর ক'নে গেল,
আপন বাড়ী চলে।

(১২)

বছর খানেক কেটে গেছে,
রামুর বিয়ের পর ;
বৌ আনতে চল্‌লো রামু,
সেজে শ্বশুর ঘর

(১৩)

শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে ছেলে,
রামুর মা কয়,
শুধু হাতে শ্বশুর বাড়ী,
যাওয়া উচিত নয়

(১৪)

টাকা দিলুম কিনে নিও,
কাছাকাছি গিয়ে ;



শ্বশুর বাড়ী ঢুক বাছা,
কিছুমিছু নিয়ে।

(১৫)

শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে রামু,
ফুলিয়ে দুটি গাল,
ক্রোশের পর যাচ্ছে ক্রোশ,
এমনি দ্রুত চাল

(১৬)

শ্বশুর বাড়ী বাকি কেবল,
একটী নদী পার ;
এমন সময় পড়লে মনে,
মায়ের কথা তার।

(১৭)

মা' বলেছে কিছুমিছু,
শ্বশুর বাড়ী দিতে ;
এই গাঁয়েতেই হবে আমায়,
কিছুমিছু নিতে

(১৮)

গাঁয়ের ভিতর ঢুকে রামু,
দোকান ঘরে যায়,
কিছুমিছু দাওগে বলে,
একটী টাকার চায়

(১৯)

কিছুমিছু শুনেই অবাক,
বোঝা কঠিন ভার,
কিছুমিছু সেকি জিনিস,
ভাবে দোকানদার।

(২০)

রামুর কথা শুনে সবাই,
হয়গে হেসে সারা ;
সবাই বলে কিছুমিছু,
সেটা কেমন ধারা

(২১)

কেউবা বলে ঠগ,
কেউবা দেয় গালি,
রামু কিন্তু খুঁজে বেড়ায়,
কিছুমিছু খালি,

(২২)

সে গ্রামেতে ছিল একটী,
দুষ্ট দোকানদার,
রামুকে সে ডেকে বসায়,
দোকানেতে তার

(২৩)

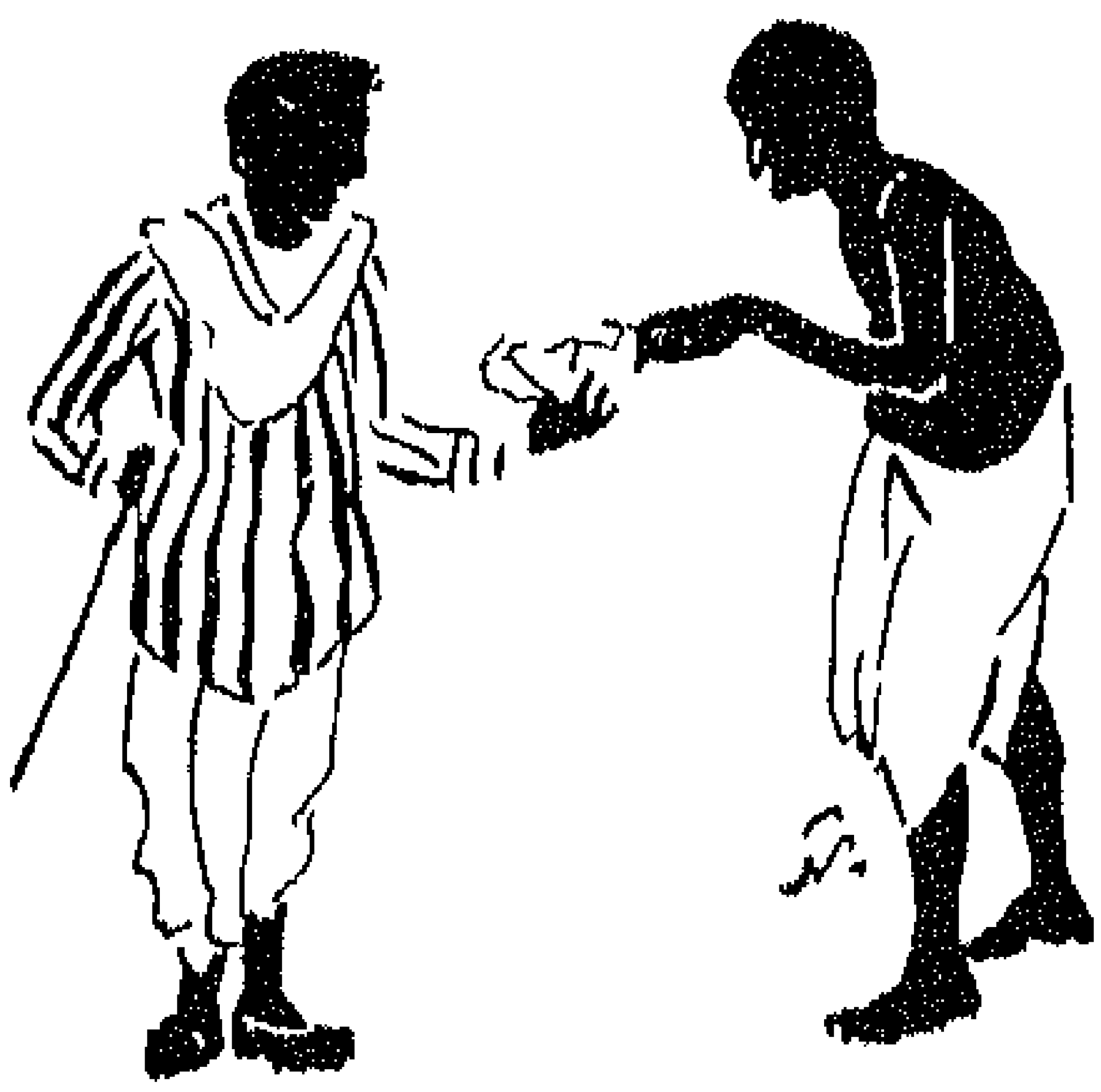
বলে ঠাকুর কিছুমিছু,
আছে আমার ঠাঁই ;
বলো হে মোর কত টাকার,
কিছুমিছু চাই

(২৪)

কিছুমিছু আছে শুনে,
রামু খুশী ভারী ;
ঠোঙ্গায় করে দাওগো মোরে
একটী টাকার ভারি।

(২৫)

একটি ছিল বুনো ওল,
দোকানির ঘরে ;



কুচি কুচি করে সেটা,
দেয়গো ঠোঙ্গা ভরে !

(২৬)

কিছুমিছু নিয়ে রামু,
দেখ্‌তে আপন জনে ;
হেলে দুলে চল্লো আবার,
বড্ড খুসী মনে

(২৭)

যেতে যেতে ভাবে রামু,
খায়নি কোন কালে ,
কিছুমিছু দেখি কেমন,
দিয়ে দুখান গালে

(২৮)

এই না ভেবে যেমনি রামু,
খেলে দুখান ওল ,
মুখখানা তার চিড়বিড়িয়ে,
হয় গো ফুলে ঢোল

(২৯)

বুনো ওলের বেজায় তেজ,
লাগায় কাণে তালা ,
চোখের জলে বুক যে ভাসে,
এমনি কঠিন জ্বালা

(৩০)

জিব বেরিয়ে পড়লো রামুর,
উঠলো চোখের তারা ;
ব্যাপার দেখে হয়গো কিন্তু,
সবাই হেসে সারা

(৩১)

হ'লো নাকো যাওয়া রামুর,
শ্বশুর বাড়ী আর ;
পয়সা দিয়ে এমন বিপদ,
হয় বলোগো কার !

(৩২)



পথের ধারে পড়ে রামু,
কাঁদছে ভেউ ভেউ ;
পৃথিবীতে ব্যাথার ব্যথি,
ছিল না তার কেউ

(৩৩)

বোকাপড় শোকেন যে,
বুদ্ধি মান নই,
নামের মত হবে সে জন
তেমন বাবা ভাই

শ্রী ... পাল

সুকুমারী

অন্যদিন হ'লে এ সময় সবাই সমস্বরে, "গুরু মহাশয় বোকা নান" বলে, তবে থামত— আজ তাঁরা ছিলেন না, নোমোস্কার ব'লে নিজেদের বই শ্লেটের উপর মাথা ঠুকে হাসতে হাসতে সবাই পালাল। পরের দিনও তখন খেলার উৎসাহ মেটেনি,—একটার ছুটি হ'তেই তাড়াতাড়ি জল খাবার সেরে বাড়ীর ভিতর ঢুকলে, সুকুমারী বল্লে আজ তোরা কেউ মইয়ে ব'স, আমি ধান বয়ে আনি। মইয়ে চড়তে রাজী হ'ল না, খেলা বন্ধ হয় দেখে অগত্যা সে উঠল। কিন্তু মনে মনে চটে গেল। ধান ঢালে আর ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে যায় গোলার ভিতরটা অন্ধকারে কতখানি ভরে উঠল, এক একবার ইচ্ছে হয়, টুপ করে নেমে একবার তলার নাগালটা নিয়ে আসে। পিসী ভাল মানুষ, ভীরু মানুষ, ভাইঝির এত লম্ফ ঝম্ফ তাকে সর্বদা ভয় দেখায়। বার বার মানা করে বলে ওকি করিস, পা হড়কে কখনও আটক করে, অঘটন কিছু ঘটতে দেয় না। কাজটা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে উঠল, সবাই বল্লে চল বাড়ী যাই। মুখে কিছু না বল্লেও বোঝা গেল, ও খেলার এখানেই ইতি, কাল আর এদিকে কেউ ঘেঁসবে না। পরদিন জলখাবার সেরে সবাই মিলে নতুন খেলার যোগাড় করছে। খেলার ভূমিকা, দলভাগ, খেলুড়ি বাছাই হচ্ছে। খেলা আজ ডাকাতী, সর্দার স্বয়ং সুকুমারী—ভালোমানুষ পিসি হয়েছেন গৃহস্থ, দরজা ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে যেন ছেলে পুলে নিয়ে শুতে যাবার ব্যবস্থা করছে—এমন সময় সর্দার সুকুমারীর দল "জয় মা কালী" বলে রা রা করে এসে লুট পাট সুরু করবে। খুব হৈ চৈ সোর গোল হবে—দেউড়ি ঘরের এপাশ হতে ওপাশ পর্যন্ত কম্প ঝম্প চলবে, কখনও বা একটা গাঁথনির উপর হতে ডিঙিয়ে অন্যটাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—"কালো চুল উড়িয়ে

আকাশে"—ইত্যাদি, সংক্ষেপে বলতে গেলে মনের সুখে চীৎকার আর হুড়োহুড়ি সর্দ্দার সুকুমারী কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাতে এক মস্ত লাঠি নিয়ে বসে বসে কবতে ব্যস্ত—তার বেটা ছেলের মত বাবরি কাটা চুল, (স্থির হয়ে বসে বিনুনি গাঁথাতে ধৈর্য্য থাকত না বলে, তার চুল বহুকাল ধরে বেটাছেলের মতই ছিল)—দলের আর সকলে ডাকাত সাজতে ব্যস্ত, কেউ মাখ্‌ছে মুখে ধূলো, কেউ বাঁধছে মাথায় পাগড়ী, কারো ঘাঘর হচ্ছে পাজামা, হাসির কল রোল কথায় ধড় ধরে যাচ্ছে, লাঠী হাতে সর্দ্দার তদারক করছেন, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে হ'তে তলব এল ধান পুঁততে কর্ত্তা ডাকছেন, সুকুমারী তখন ডাকাতের সর্দ্দার, চক্ষু রক্তবর্ণ করে লাঠী ঘোরাচ্ছে, ঝিকে একেবারে, "মার মার" করে তেড়ে যেতে, সেত ওগো মাগো গেলুম গো বলে দে দৌড় কর্ত্তার কাছে গিয়ে নালিশ করতে তিনিও তাড়া হেঁকে বল্লেন, "শীগীর তাদের আন্ এখানে"—কিন্তু সে কাকে আনে ? ঝি এগোয় সাধ্য কি ? দু প না বাড়াতেই সুকুমারী বল্লে "জানিস্ আমি বগো ডাকাত মাথা গুঁড়িয়ে চুর চুর করব, গোলায় ধান তুলতে হবে ? লুটে পেয়েছিস, গোলা ভেঙ্গে ভুঁয়ে ফেল্‌ব, সব ধান লুটে নিয়ে যাব দলের সবাই কথে বলে, গোলা ভাঙ্গব, ধান লুটব ধান সব মাটিতেই পড়ে রইল, গোলায় উঠলো না, মেয়ের মহা উৎসাহে খেলা সাঙ্গ করে স্কুল ঘরে গিয়ে দেখে, পণ্ডিত মহাশয় চলে গেছেন

সুকুমারীর মনে ধান তোল টা খেল, সেটায়ে অধিকারী মহাশয়ের মজুরের পয়সা বাঁচাবার ফিকির ত তখন বোঝেনি—যখন বুঝলে, তখন বল্‌লে, এ স্কুলে আর আস্‌চিনে, আমরা কুলি নাকি ?' "ওরে বল তোরা হরি বোল হরি বোল, স্কুলের গঙ্গাযাত্রা করাই" চৌকী টেবিল সব ওলটপালট করে ফেলে রেখে, সব বাড়ী চল্‌ল। পর দিন ফিরল না। স্কুলের ঝি বার বার গিয়ে গিয়ে ফিরে ফিরে আস্‌তে লাগল, ছাত্র ক'জন ফির্‌লেও স্কুল আর চললনা বিশেষতঃ সুকুমারী আর কমলা পিসি ছিল সেরা ছাত্রী, সেবারে ছাত্রবৃত্তি দেবে —স্কুল কাণা হয়ে গেল পূজার সময়, দাদা মহাশয় বাড়ী এলে, স্কুলের অধিকারী তাঁর কাছে ছাত্রীদের ফির্‌বার জন্যে অনেক বোঝাপড়া কর্‌লেন—বিফলে সুকু শুনেছিল আর একটি স্কুল আছে চাঁদ সড়কে—সেখানেও ছাত্রবৃত্তি দেওয়া যায় বিশেষতঃ ঐ চাঁদ সড়ক নামেই তার মন ভুলেছিল, আর পুরাণ স্কুলে কিছুতেই গেল না। এই নতুন স্কুলে যেতে হয়, অনেক আম বাগান পেরিয়ে—পথেই দুধারে বড় বড় দীঘি, তাতে কত পদ্ম ফুল ফোটে অতঃপর সেই পথেই যাত্রা করল ক্রমশঃ

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।

দাদাঠাকুরের গল্প।

(১)

বাচ্চাগুলিকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করিয়া বুড়ো ছাগলটা বুড়ীকে সঙ্গে লইয়া রোজ মাঠে চরিতে যায়। বুড়োর কাছে শত্রুদের অভাব নাই, তাই বুড়ো বাচ্চাদের বলিয়া যায় "কেউ দরজা ধাক্কা দিলেই অমনি খুলে দিস্‌নে, আমি এসে তোদের নাম ধরে ডাকলে দরজা খুলিস্‌।"

বুড়ো ছাগলের কথা একদিন শেয়াল কেমন করিয়া শুনিতে পাইল।

ছাগল মাঠে চলিয়া গেলে সে বুড়ী-ছাগলের গলার আওয়াজ নকল করিয়া বাচ্চাদের ডাকিতে লাগিল। বাচ্চারা কাণখাড়া করিয়া শুনিয়া ভাবিল, মা এখনই এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবে না। সন্দেহ হইল বলিয়া তাহারা দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া শিয়ালকে দেখিতে পাইল ও বলিল, "দরজা খুলি কেমন করে? মায়ের গলার আওয়াজটা তুমি বেশ নকল করেছ বটে, কিন্তু তোমার মুখটা যে দেখ্‌ছি শেয়ালের।"

বাচ্চাদের কথা শুনিয়া শিয়াল মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

(২)

শীতকালে ব্যাঙ আমাদের ঘরে অতিথি হইয়া থাকে। ঘরের কোণে, চৌকির নীচে ভাঁড়ার ঘরে ইহাদের আড্ডা। সেইখানে একটা বড় ব্যাঙের সঙ্গে একটা ইঁদুরের আলাপ পরিচয় হয়। শীতকালে ব্যাঙ ত কিছু খায় না—দিনরাত ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়, যখন ঘুম না আসে ইঁদুর ও তাহার ছেলেপুলের সঙ্গে গল্পগুজব করে।

শীত কাটিয়া গেল—এই বেলা ব্যাঙ আবার দীঘিতে ফিরিয়া আসিবে। বিদায় লইবার সময় সে ইঁদুরকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল।

একদিন ইঁদুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে দীঘির পারে উপস্থিত হইল। ব্যাঙ তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল, কিন্তু ইঁদুর পারে বসিয়াই আছে, দীঘিতে নামিবার সাহস তাহার নাই।

ব্যাঙ হাসিয়া উঠিল।

ইঁদুর তখন আস্তে আস্তে নামিল, আর পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল। সে ত আর সাঁতার জানে না। তাই হাবুডুবু খাইয়া তাড়াতাড়ি পারে উঠিয়া বলিল, "ব্যাঙ ভাই, অন্য জাতকে নকল করতে গেলেই বিপদে পড়তে হয়। আমরা মাটির জীব—মাটির গর্ত্তে আমাদের জন্ম, মাটির দেশেই আমাদের বসবাস। তোমার কথা শুনে জলের দেশে নেমে প্রাণটা হারিয়েছিলুম আর কি।

হিন্দি বর্ণ পরিচয়।

তোমাদের বলিয়াছিলাম 'আমার দেশ' পত্রিকার সাহায্যে তোমাদের হিন্দি ভাষা শিখাইবার চেষ্টা করিব। এ মাসে বর্ণ পরিচয় লিখিয়া দিলাম। অক্ষরগুলি লিখিতে শিখিবে। যাহারা সংস্কৃত পড়, তাহারা এ অক্ষরগুলির সহিত পরিচিত। সংস্কৃত হইতেই হিন্দি, বাংলা, মরাঠী প্রভৃতি ভাষার জন্ম।

স্বরবর্ণ

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ

ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ

ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ

म य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ।

ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ ত্র জ্ঞ।

অক্ষর শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ ঠিক হওয়া চাই। তাই তোমাদের কয়েকটি কথা মনে রাখিতে বলিতেছি। উপরের কোনো কোনো অক্ষরগুলির মধ্যে বাহিরের চেহারায় খুব সাদৃশ্য আছে। যেমন व ब, ध घ, ट ठ, ड ड़ ङ, ज ञ म भ। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণে পার্থক্য আছে। বাংলা বর্ণমালা দেখিয়া তোমরা উচ্চারণ ঠিক করিতে পারিবে।

কিন্তু ब আর वয়ের উচ্চারণ বলিয়া না দিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে না। बটির উচ্চারণ বাংলার মতন, পেটকাটা वয়ের উচ্চারণ "উয়"। বাংলার ন ও ণ আকারে প্রভেদ হইলেও উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নাই। হিন্দিতে 'ণ'র উচ্চারণ অণ।

এইবার তোমরা অক্ষরগুলি চেঁচাইয়া পড়। যদি মনে হয় ভুল হইতেছে তবে কাহারো নিকট জিজ্ঞাসা করিও। আগামী মাসে আমাদের পাঠ সুরু হইবে।

ন

ছেলেদের বাইবেল

(নূতন নিয়ম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[illegible] অনুসন্ধান [illegible] পণ্ডিতেরা বলিলেন যে তাহাদের দেশের আকাশে [illegible] তারা উদিত [illegible] ইহুদীদিগের নবভূপতির পূজার জন্য উক্ত দিগদর্শক তারা দেখিয়া তাঁহারা দূরদেশ হইতে জেরুসালেম নগরে আগমন করিয়াছেন।

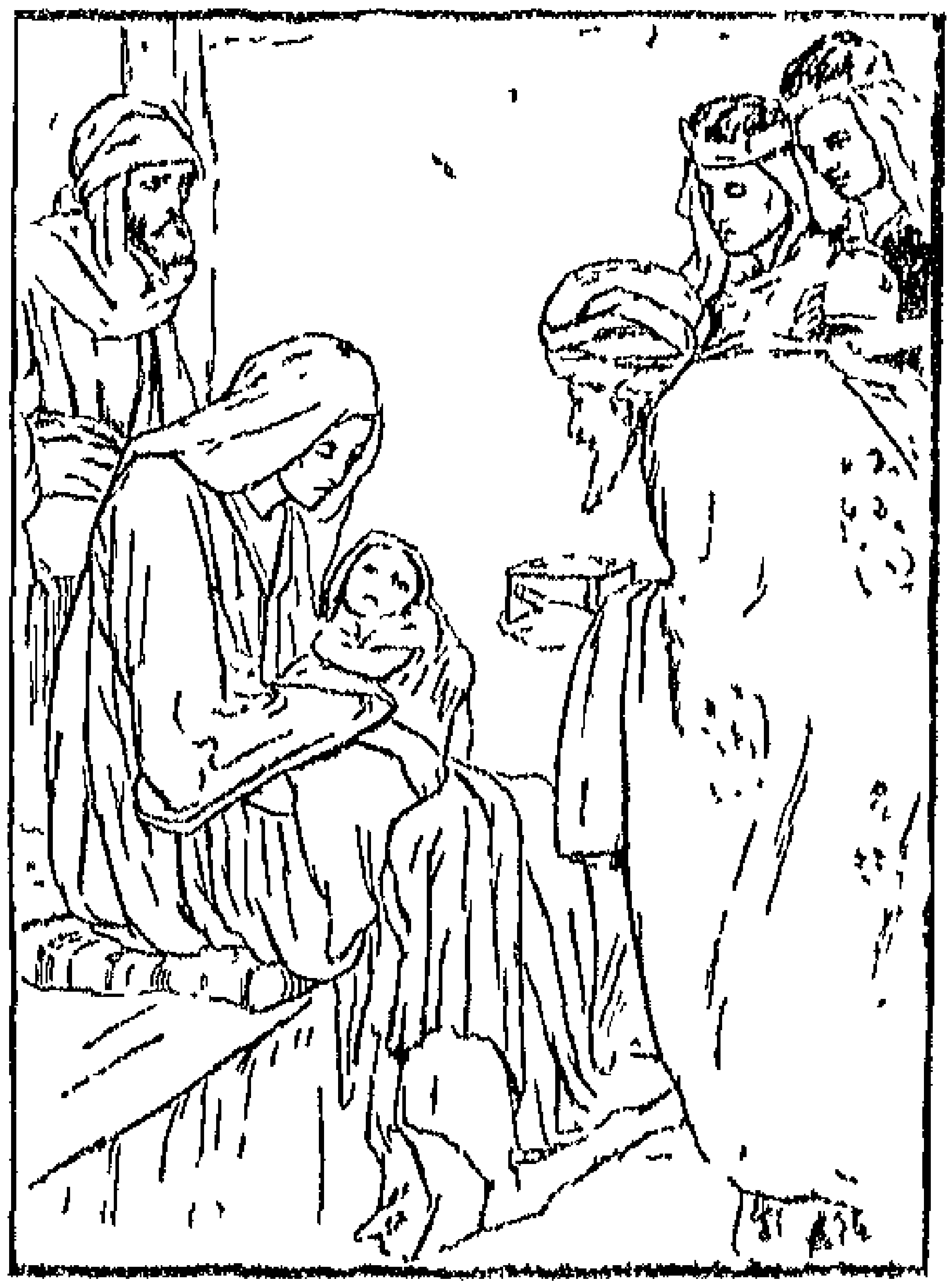
সেই সময়ে হেরড্ নামক এক অত্যাচারী রাজা জেরুসালেমে রাজত্ব করিতেন। লোকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। তাঁহার ভয় হইল যে এই নবজাত শিশু বড় হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইহুদীদিগের রাজা হইবেন। তিনি যাজক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন কথা আছে কি না, তাহার নির্দেশ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সকলেই বলিলেন যে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ইহুদীদিগের নবভূপতি যুডিয়ার অন্তঃপাতী বেথলেহেম্ নগরে জন্মগ্রহণ করিবেন।

তখন হেরড্ নিজ দুরভিসন্ধি গোপনে রাখিয়া পূর্বদেশ হইতে আগত উক্ত তিনজন মাগিয়ান পাণ্ডিতকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কোন্ সময়ে ইঁহারা প্রথমে উক্ত অদ্ভুত তারকা দর্শন করিয়াছেন, তাহা জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে তাঁহারা এখনই বেথলেহেম্ নগরে যাইয়া ঐ শিশুর অনুসন্ধান করুন। শিশুর সন্ধান মিলিলে তাঁহাকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিলেন, কেননা তিনিও তাঁহাদের মত ঐ অদ্ভুত শিশু নবভূপতিকে পূজা ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন।

তখন ঐ তিনজন মাগিক ব্যক্তি রাজাদেশে বেথলেহেম্ নগরে যাত্রার সময়ে আকাশে সেই পূর্বদৃষ্ট তারকা পুনরায় দেখিতে পাইলেন এবং উহার নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া যে গৃহে জোসেফ ও মেরী তাঁহাদের শিশু সন্তানকে লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত

হইলেন। তাঁহার মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত দেবকান্তি পরমবিজ্যোতির্ময় যীশুখৃষ্টকে দর্শন করিয়া বহুদূরদেশ হইতে আগমনের সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিলেন এবং আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য বহুমূল্য যে সকল উপঢৌকন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন সেই সকল দ্রব্য শিশুকে উপহার প্রদান করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা সম্পন্ন করিলেন। খৃষ্টের জনক জননী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং একজন মহাপুরুষ ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে যে তাঁহাদের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ রাত্রে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন দেবদূত আসিয়া এই শিশু সম্বন্ধে হেরড রাজাকে কোন সম্বাদ দিতে তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা জেরুসালেমে ফিরিয়া আসিয়া হেরড্ রাজার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজাকে কোন সম্বাদ না দিয়া অন্য পথে তাঁহারা সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন।



পণ্ডিতগণ যীশুখৃষ্টকে উপহার দিতেছেন

এদিকে হেরড্ পণ্ডিতদিগের আগমনের প্রতীক্ষায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতঃ হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদিগের পুনরাগমনের কোন আশা নাই, তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গকে আদেশ করিলেন যে বেথলেহেম্ নগরে দুই বৎসর ও তদনধিক বয়স্ক যত বালক আছে, তাহাদের সকলকে একদিনে হত্যা করা হউক। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড দ্বারা এই সমস্ত শিশুর মধ্যে যে শিশুটি ইহুদীদিগের নবজাত ভূপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেও ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইবে।

কিন্তু ভগবানের লীলা অতি আশ্চর্য্য, মানুষে তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। তিনি যাহাকে রক্ষা করিবেন, কেহই তাহাকে মারিতে সমর্থ হয় না। যোসেফ এই নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞা প্রচারের পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে, পত্নী ও শিশু পুত্র সমভিব্যাহারে, সেই রাত্রেই মিসর দেশে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন। ধার্ম্মিক যোসেফ দেবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভ্রমণের উপযোগী অতি প্রয়োজনীয় দুই চারিটী দ্রব্য সামগ্রী এবং মেরী ও শিশুখ্রীষ্টকে সঙ্গে লইয়া সাধারণের অজ্ঞাত অতি দুর্গম পথ দিয়া মিসর যাত্রা করিলেন। এইরূপে দুষ্টবুদ্ধি হেরডের দুরভিসন্ধি একেবারে ব্যর্থ হইল।

আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি দেশে অশ্বের ন্যায় গর্দ্দভও বাহনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল দেশে গাধায় চড়িতে লোকে লজ্জা বোধ করে না। মেরী শিশু খ্রীষ্টকে ক্রোড়ে লইয়া একটী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার স্বামী গর্দ্দভের লাগাম ধরিয়া পদব্রজে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।


[illegible] যাত্রার [illegible] হইতে [illegible]

পরদিন প্রাতে হেরডের সৈন্যগণ কঠিন রাজাদেশে তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা বেথলেহেম্ নিবাসী দুই বৎসর ও তদধিকবয়স্ক সবকীয় বালকের প্রাণবধ করিল। শিশুহারা জননীদিগের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল মথিত হইয়া উঠিল। ক্ষোভে শোকে এবং নিরাশায় নগরবাসীদিগের হৃদয় অভিভূত হইল। তাহারা নিরুপায় হইয়া রাজার প্রতি কেবল অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রিয় বালকবালিকাগণ, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও ঠিক এইরূপ একটী ঘটনার বর্ণনা আছে। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার মাতুল কংস মথুরার রাজা ছিলেন এবং তাঁহার পিতা বাসুদেব ও মাতা দেবকী কংসের

কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন জ্যোতিষীগণের নিকট হইতে কংস অবগত হইয়াছিলেন যে তাঁহার ভগিনী দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিবে। সেই জন্য তিনি দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া, তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মিত অবিলম্বে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতেন যেবার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেবার দেবাদেশে তাঁহার পিতা বসুদেব তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করেন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তীথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের নিকট ইহা অতি পবিত্র দিন। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের জীবনী আলোচনা করিলে কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, যোসেফ্ ও মেরী মিসরে আগমন করিয়া অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত খ্রীষ্টকে লালন পালন করিতে লাগিলেন

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু

আমার দেশ

গঙ্গা ও যমুনা

হিমালয়ের জন্ম কথা বলিতে গিয়া তোমাদিগকে "পামির" অধিত্যকার নাম বলিয়াছি এই পামির হইতেই ভারতবর্ষের ও চীনদেশের নদীগুলি জন্মলাভ করিয়াছে হিমালয়ের বরফ গ্রীষ্মকালে গলিয়া পর্ব্বতের গা বাহিয়া নামিতে থাকে এই বরফের নদীগুলি (Glacier) নানা পথ দিয়া নানা ধারায় ছুটিয়া চলে, কোথাও বরফের জল ঝির ঝির করিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা ক্ষীরধারাগুলি একস্থানে আসিয়া মিলিয়া পাহাড়ী নদীর সৃষ্টি করিতেছে, আবার কোথাও ধারাগুলির মিলনস্থান কোনো হ্রদে যাহা হউক, বরফের নদীর নানা ধারা হইতে নদীর জন্ম, তোমরা ইহা মনে রাখিও

পূর্ব্বে বলিয়াছি হিমালয়ের গাত্র হইতে তিনটি প্রধান নদী সমস্ত ভারতবর্ষকে

সুজলা সুফলা করিয়া তুলিয়াছে। এই নদীগুলিকে বলে সামুদ্রিক নদী, কেননা ইহারা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। এমন নদীও আছে যাহা বালির মধ্যে কিংবা পাহাড়ের মধ্যে লুকাইয়া যায় তাই ইহাদের বলে 'গুপ্ত নদী'। গঙ্গা সামুদ্রিক নদী। হিমালয় হইতে বাহির হইয়া ১৫০০ মাইল পথ চলিয়া বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে।

হিমালয় পর্বতের গায়ে গভীর খাদ কাটিয়া গঙ্গা উত্তর ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। শিবালিক নামক হিমালয়ের এক অংশ পর্বতের ভিতর দিয়া গঙ্গা দূন (Dun) উপত্যকায় নামিয়া আসে। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর স্রোত বড় বেশী। উপত্যকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার স্রোত কমিয়া আসে। দূন উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া চলিল। হরিদ্বারের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে— এইখানে আমরা গঙ্গার সহিত প্রথম পরিচিত হই। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ইহার জল ঠাণ্ডা, কোনো আবর্জনা নাই, স্নান করিলে যথার্থই মনে হয় পুণ্য হইল।

আমাদের দেশে যতগুলি নদ আছে গঙ্গাই তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান। এই নদী হইতেই অসংখ্য শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া সমস্ত দেশে জল যোগাইতেছে আর জলের সঙ্গে সঙ্গে মাটির কণা বহিয়া ভারতবর্ষের ক্ষেত্রকে সুফলা করিতেছে। এই নদীর তীরেই একদিন আর্যেরা আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। তাই যে প্রদেশের ভিতর দিয়া গঙ্গা বহিয়া আসিয়াছে তাহাকে বলে আর্যাবর্ত। এই নদীর তীরে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহর স্থাপিত এবং এই নদীপথ দিয়া মালবাহী নৌকা কলিকাতা হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত যাইতে পারে। প্রদীপের তেল ফুরাইলে যেমন ইহা নিভিয়া যায়, আজ যদি গঙ্গানদী শুকাইয়া যায় তাহা হইলে আমরা এদেশে বাঁচিতে পারি না। এই সব কারণেই গঙ্গা কল্যাণপ্রিয় ভারতবাসীর কাছে পবিত্র, গঙ্গার স্তব স্তুতিতে ভারতের সাহিত্য পরিপূর্ণ। আমাদের পৌরাণিক পুঁথিতে গঙ্গার স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন ইতিহাস লইয়া কত গল্প, কত কল্পনাই সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তোমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তোমরা গঙ্গার কথা পড়িও।

উত্তর ভারতে গঙ্গার প্রধান শাখাগুলির নাম— যমুনা, গোমতী, গোগ্রা, গণ্ডক। ইহা ছাড়া রামগঙ্গা, শারদা, রাপ্তী প্রভৃতি নদী যুক্তপ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিহারের প্রধান নদী কুশী, শোন্ ও গণ্ডক গঙ্গার শাখা। বাংলা দেশের প্রধান শাখা হুগলী— কলিকাতা সহর ইহারই তীরে স্থাপিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুইটী নদী মেঘনা নামে মিলিত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে।

আমাদের দেশ

গঙ্গাতীরে হরিদ্বার, কাণপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, গাজীপুর, বক্সার, কাশী, সহর আছে। ইহার মধ্যে কাণপুর ও কলিকাতা ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত

একটা প্রশ্ন তোমাদের মনে উসখুস্ করিতেছে জানি তোমরা বলিবে হরিদ্বারে গঙ্গার জল স্ফটিকের মতন পরিষ্কার আর কলিকাতায় ইহার জল এত ঘোলা যে একটা গেলাসে কিছুক্ষণ জল ধরিয়া রাখিয়া দিলেও ইহা পরিষ্কার হয় না ইহার কারণ কি?

তোমাদের বলিয়াছি নদী কেবল জল বহন করে না—ইহার সঙ্গে সঙ্গে মাটির কণা বহিয়া চলে পার্ব্বত্য পথে ছোট বড় পাথর-খণ্ডের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হয় তাই জল পরিষ্কার থাকে উপত্যকায় আসিয়া মাটির কণা জলের সহিত মিশিতে আরম্ভ করে এবং এই পলিমাটির কণা যত ছোট হয় নদীর জলের সহিত ইহা তত বেশী মিশিত হইয়া পড়ে

মাটির কণা বহিয়া বেড়াইবার কাজটি তোমরা সামান্য মনে করিওনা, ইহা নদীর একটি বিশেষ কাজ এই মাটী দিয়াই নদী সৃষ্টি করে সাগরে পড়িবার মুখে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ. এমন করিয়াই গঙ্গা সৃষ্টি করিয়াছে ইহাকে বলে "বদ্বীপ"—ইংরাজী নাম ডেল্টা (Delta)

গঙ্গানদীর নাম করিতে যমুনার নাম মনে আসে এলাহাবাদ সহরে যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে উত্তর ভারতে গড়োয়াল বলিয়া এক পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে, যমুনা ইহার ভিতর দিয়া বহিয়া দুনে(Dun)আসিয়া নামিয়াছে হিমালয়ের যে স্থান হইতে যমুনার প্রবাহটী আরম্ভ তাহার নাম যমুনোত্তরী শৃঙ্গ

দুন হইতে বাহির হইয়া যমুনা যে পথে চলিয়াছিল, মধ্য ভারতের চম্বল নদী ইহাকে জল না জোগাইলে সে পথে যমুনা নিজেকে হয়ত হারাইয়া ফেলিত বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে চম্বল নদীর উৎপত্তি। যমুনা ৭৬০ মাইল লম্বা

যমুনাতীরে প্রধান সহর আগ্রা। মোগল রাজত্বের অনেক চিহ্ন সেখানে আছে। ইতিহাসের কথা বলিবার সময় সে বিষয়ে বলিব।

আমাদের দেশের আর যে কয়েকটী প্রধান নদী আছে আগামীবারে তাহাদের কথা তোমাদের শোনাইব

ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মিহির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
কাগজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



[illegible]

[illegible]	[illegible]	ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ল্যাভেণ্ডার	[illegible]	[illegible]	[illegible]

এইচ বসু, পারফিউমার, ৬১।১, বহুবাজার, কলিকাতা

কেশের জন্য একমাত্র তৈল

I. B.

আমার দেশ



সম্পাদক—

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস, সি	প্রতি সংখ্যা
সডাক ষান্মাসিক মূল্য ১৷০	শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।	।১০

আমার দেশ

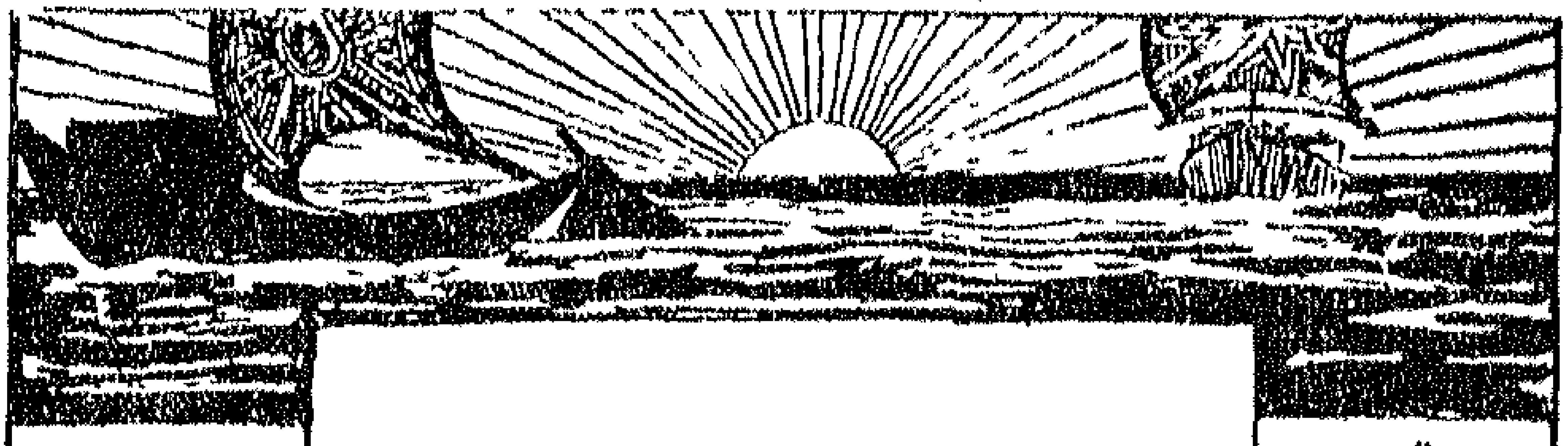
১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

[জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮



শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
কর্ত্তৃক অঙ্কিত

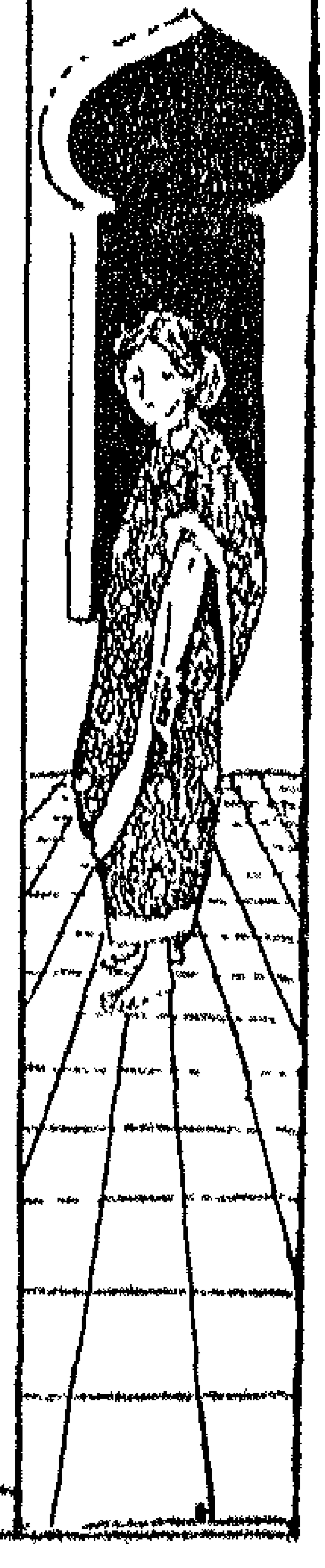
বিশ্রাম

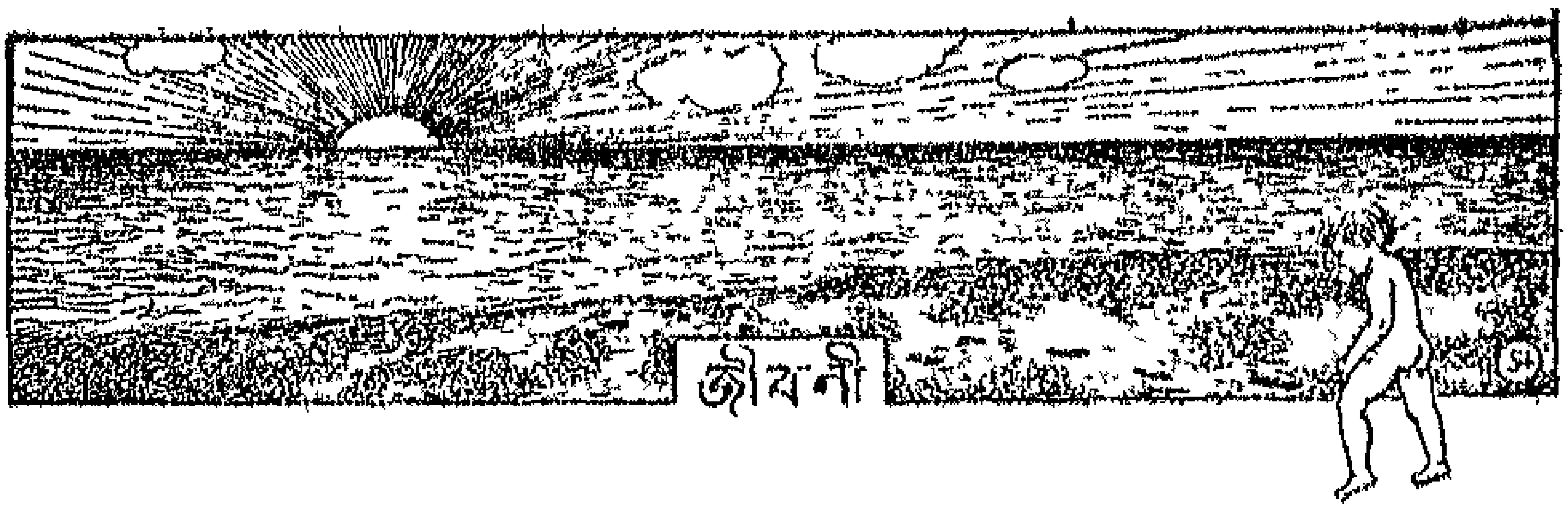




দাদার বিয়ে

এক নৌকা আলো চাল,
এক নৌকা ঘি,
দাদা গেছে বিয়ে কত্তে
সওদাগরের ঝি
নাড়া বনে কাড়া বাজে,
লোকে বল্‌বে কি,
সবা চাটা যে কর্‌লে,
শাল্‌সা চাটার ঝি ॥





পরমহংস রামকৃষ্ণ।

আমাদের দেশে কত বড় বড় সাধু মহাজন যে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই তোমরা বুদ্ধদেব, নানক, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অনেক ধার্ম্মিক মহাপুরুষের নাম শুনিয়াছ, আজ তোমাদের কাছে বাঙ্গলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও মহাপুরুষের কথা বলিতেছি—তাহার নামও বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়া থাকিবে কারণ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের নাম শুধু বাঙ্গলা দেশে নয়, ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

হুগলি জেলার কামারপুর নামে একখানা ছোট গ্রামে রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয় রামকৃষ্ণের পিতামাতা দুইজনেই খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁহারা দরিদ্র হইলেও মনে দরিদ্র ছিলেন না, নিজেরা কত সময়ে একবেলা খাইয়া গরীব দুঃখীকে খাওয়াইয়াছেন তোমরা জান পৃথিবীতে যত বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের পিতামাতারাও তেমনি মনে বড় ছিলেন। বাপ মা ভাল না হইলে কি সন্তান কখনও ভাল হয়?

রামকৃষ্ণকে ছেলেবেলা সকলে আদর করিয়া গদাই বলিয়া ডাকিত। সরল সুন্দর ছেলেটী, ছেলেবেলা হইতেই ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতে—সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশিতে—ঠাকুর দেবতার গান গাহিতে ভাল বাসিত একবার তাঁহার মা গদাইকে একখানা সুন্দর লাল পেড়ে নূতন কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন—খানিক পরে গদাই কৌপীন পরিয়া আসিয়া বাড়ীতে হাজির হইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"গদাই! নূতন কাপড়খানা কি করলে?"

গদাই হাসিয়া কহিল—"কেন, দেখতে মা, আমার সে কাপড় ছিঁড়ে, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমায় কেমন সাধু সাজিয়ে দিয়েছেন"

ম হাসিলেন—আর কোন কথা বলিলেন না।

যত বয়স বাড়িতে লাগিল—ততই বালকের মনের মধ্যে ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা বা কল্পনা বাড়িয়া গেল। কেমন করিয়া ঈশ্বর লাভ করা যায় কেমন করিয়া তাঁকে পাওয়া যায়—এই লোভে সে জন্মে সেই সকল দিকে তাহার মন টানিল। তাঁহার বড় দাদা কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পূজারি ছিলেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে সেখানে আসিয়া মায়ের পূজায় মন দিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেই তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটে। এখানেই তিনি মায়ের দর্শন লাভ করেন। এখানে তিনি শিশুর মত মায়ের সঙ্গে কত আদর আবদার করিতেন —কখনও বা মাকে গাল মন্দ দিতেন—বলিতেন, কেন তুই আমাকে সংসারের এই আবর্জ্জনার মধ্যে টেনে নিয়ে এলি। রামকৃষ্ণ স্কুল কলেজে কোনদিন পড়াশুনা করেন নাই—কিন্তু এ সময়ে তিনি ধর্ম্মের জটিল কথা এমন সরল ভাবে বলিতেন যে লোকে অবাক্ হইয়া যাইত। তাঁহার এই অসাধারণ সিদ্ধির কথা—জ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা—উপদেশের কথা শুনিয়া কলিকাতা হইতে বড় বড় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন—এবং তাঁহার সরল ব্যবহার—সোজা কথায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও উপদেশ শুনিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর-জানিত মহাপুরুষ। নরেন্দ্র দত্ত—পরে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যশঃ লাভ করিয়াছেন—তিনি এ সময়ে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণ উদার মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করিতেন না। এমনকি বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই—সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর লাভের পথ মাত্র, তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য তিনি একে একে মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মমতে সাধনা করিয়াছিলেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব অতি ছোট কথায়—সরল গল্পে—সকলকে উপদেশ দিতেন। দীন দুঃখীর ক্লেশ তিনি দেখিতে পারিতেন না। তাহাদিগকে 'দরিদ্র নারায়ণ' বলিয়া সেবা করিতেন। তিনি বলিতেন—"গরীব দুঃখীর ক্লেশ দূর করাই হচ্চে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। টাকা পয়সার লোভে যারা ঈশ্বরকে ভোলে তাদের মত অপদার্থ আর জগতে নাই।" ভারতবর্ষকে তিনি জগতের দেব-মন্দির মনে করিতেন। দেশের লোকেরা যাহাতে দেশ জননীর পূজা করে—সেজন্য তিনি সকলকে নানা উপদেশ দিতেন।

পরমহংস দেবের মহৎ আদর্শ—দরিদ্র নারায়ণ সেবা—দেশকে ভালবাসা—নিঃস্বার্থ

ভাবে পরোপকার করা এই সব ভাব গুলি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া পরমহংসদেবের ভাব ও চিন্তাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন।

সংসারে দেখা যায় ভাবের পুণ্যধারা একজন আনিয়া দেন—তার অন্য সকলে সর্ব্বত্র তাহার প্রচার করেন। পরমহংসদেবও জগতে যে শান্তির আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার শিষ্য তাহারই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে মহাপুরুষ পরমহংসদেবের নাম অক্ষয় অমর করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহার শত সহস্র ভক্ত, দরিদ্রের সেবা—কত পীড়িতের শুশ্রূষা—কত ভিক্ষুকের যে অন্ন যোগাইতেছেন তাহার সীমা নাই।

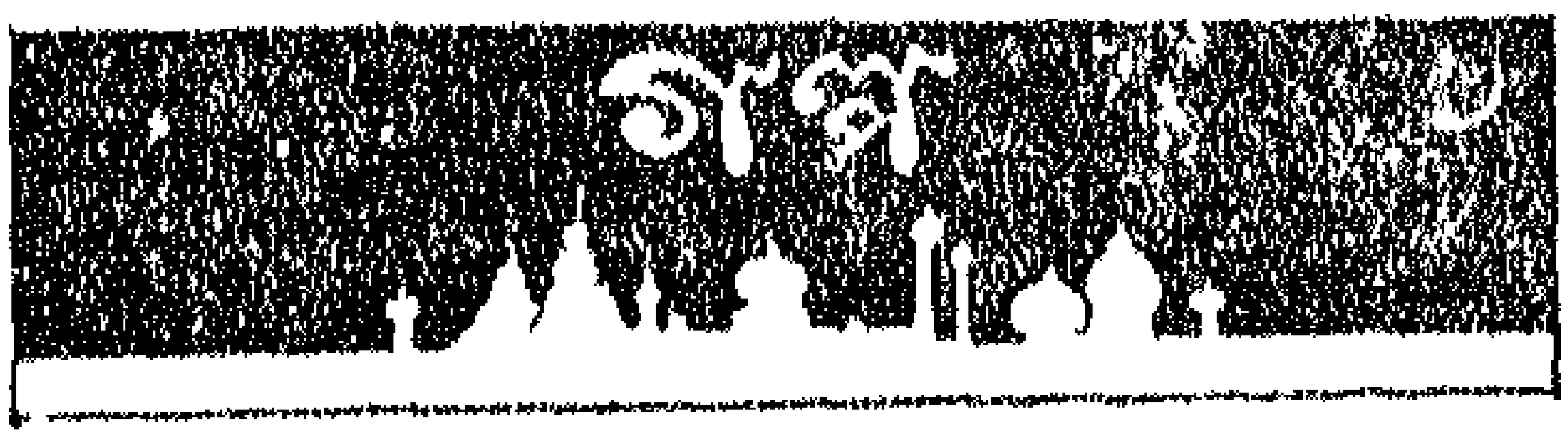
মহাদেবের জটা হইতে যেমন নদী নামিয়া আসিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছে তেমনি পরমহংসদেবের ভাব গঙ্গা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের দেশের বুকে—দরিদ্র নারায়ণের সেবার পুণ্য মন্দির গড়িয়া দিয়াছে।

বাঙ্গলা ১২৯৩ সালের ৩১ শে শ্রাবণ এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত









বিশ্বাসী লোক

একবার কোন এক রাজার খাজানা আদায়ের জন্য একজন খুব বিশ্বাসী লোকের দরকার হয়, রাজা কিছুতেই আর সে বিশ্বাসী লোক খুঁজিয়া পান না। শেষে প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,

“বন্ধু, লোক ত পাইতেছি না, এখন কি করি বলত!”

মন্ত্রী বলিলেন

“মহারাজ, ভাবনা কি, আপনি এক কাজ করুন। আপনি ঘোষণা করিয়া দিন, আপনার খুব একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার, আর যাহারা এই কাজ করিতে চাহিবে তাহাদের আগামী অমাবস্যা রাত্রে এইখানে আসিতে বলুন। তাহার মধ্য দিয়া আমি বিশ্বাসী লোককে খুঁজিয় বাহির করিব।”

মন্ত্রীর কথামত রাজা সব ব্যবস্থা করিলেন। সেই রাত্রে চাকুরীর উমেদার সব রাজার বাড়ীতে আসিয়া হাজির সেইখানে রাজার এক কর্ম্মচারী তাহাদের এক অন্ধকার পথের মধ্য দিয়া একে একে রাজার কাছে যাইতে বলিলেন সকলে আসিয়া রাজার কাছে উপস্থিত হইলে মন্ত্রী বলিলেন,

“নাচুন দেখি আপনারা একবার, মহারাজ দেখিবেন আপনারা কিরূপ নাচিতে পারেন।”

বেচারীরা এই অদ্ভুত আবদার শুনিয়া ভারী অপ্রস্তুত হইল সকলেই এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে লজ্জায় মাথা নীচু করিল। খালি একজন রাজি হইল।

মন্ত্রী তখন সেই লোকটির হাত ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া আসিয়া বলিলেন।

“মহারাজা এই আপনার বিশ্বাসী লোক”

সেই অন্ধকার পথের নানা যায়গায় মন্ত্রী অনেক টাকার তোড়া ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই সব চাকুরীর উমেদারেরা যাহার যত খুসি টাকা লইয়া পকেট ভর্ত্তি করিয়াছিল। এখন নাচিলেই বিপদ, পকেট ভরা টাকা, ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া বাজিয়া উঠিবে। বেচারীরা শেষে ধরা পড়িয়া গেল।

গাছ আর উলুঘাসের জন্ম।

(হো মুণ্ডাদের গল্প)

এক সময় এক গাঁয়ে এক ঘর হো-মুণ্ডা থাক্‌ত। এখন, একদিন তাদের একটি ছোট্ট দেওরকে তার বৌদিদিরা ঘরের উঠানে কুলায করে রোদে ধান শুকাতে দিয়ে পাহারা দিতে বলেচে। ছেলেমানুষ, সে ধান পাহারা দেবে কি, লাট্টু খেলায় মেতে গেল! এদিকে সব ধান গুলি তাদের পোষা মুরগী আর শূয়রে এসে কখন যে খেয়ে গেছে তা তার হুঁস নেই। শেষে সে ভয়েই মরে! তারপর আর কি, যা' ভয় করা তাই. বৌদিদিরা তো রেগে জ্বলে অস্থির! বেচারী মার খায আর কি! যাক, শেষে তার সাজা হ'ল খাওয়া বন্ধ। ছেলেটার কপালে যে খালি এই দুঃখটুকুই ছিল তা নয়—আরো অনেক দুঃখই তাকে এইরকম অমনোযোগিতার জন্য পেতে হয়েছিল কতদিন সে কাজ ভুলে গিয়ে বনের মধ্যে বসে বসে বাঁশী বাজিয়েই সময় কাটিয়ে দিয়েচে।

শেষকালে অনেক বকুনি খেয়ে খেয়ে আর সে বেচারা বৌদিদিদের অত্যাচার সইতে পারলে না। সে লুকিয়ে তার বাড়ী ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় পিট্টান দিলে। এদিকে তার দাদারা তাকে কিন্তু খুবই ভালবাসতো। তারা তাদের ছোট ভাইটি অভিমান করে কোথায় গেল সেই খোঁজে এগাঁ সেগাঁ করে বেড়াতে লাগল; কিন্তু কোথাও তার দেখা নেই। মহা ভাবনায় পড়ল তারা!

ছেলেটা এদিকে মনের দুঃখে ঘুরে ঘুরে শেষে একটা শুকনো ডোবার গর্ত্তের মধ্যে নেবে আর কি করে, গান ধরলে ঃ

নিদিঙবেন্, নিদিঙবেন নাগনেরাকিং।
নিদিঙবেন্ নিদিঙবেন বিন্দিনেরাকিং ॥
নিলিনের চেণ্টা নেকা চেণ্টা।
গাঙই নেরানিসিকা নেকানিসিকা ॥

মানে,
হে নাগ হে নাগিনী
হে বিন্দি হে বিন্দিনী
আমাকে তোমরা নাও
আমার বৌদিদির' আমায়
খেতে য় কষ্ট দিয়েচে ॥

যেই সে গানটা গাইলে অমনি কোথা থেকে যেন মন্ত্রের জোরে সেই শুকনো ডোবা ভ'রে কল কল ক'রে জল বের'তে লাগল। প্রথমে এক হাঁটু জল, শেষে এক কোমর—তারপর একগলা, এমনি করে বেচারা দেখতে দেখতে জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। জেগে রইল তার কেবল দুহাতের আঙুল কটা, আর মাথার খোঁচা খোঁচা চুল ক'গাছা।

এমন সময় তার ভায়েরা খোঁজ করতে করতে সেখানে হতাশ ভাবে এসে দেখে তাদের ভায়ের কেবল কগাছা চুল আর ক'টা আঙুল ডোবার জলের উপর জেগে আছে

অগত্যা মনের দুঃখে আর কি করে? সেই আঙুল আর চুল কগাছা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ী চল্লো। বাড়ীতে গিয়ে ঘরের পাশেই মাটিতে সেগুলো পুঁতে রাখলে।

তার পর হল' কি, দেখতে দেখতে হঠাৎ তারা দেখলে যে ঐ ভায়ের আঙুল গুলো থেকে চমৎকার বড় বড় ফুল ফল সমেত গাছ আর চুল থেকে লম্বা লম্বা উলুঘাস শুকনো পোড়া জমীটাতে ছেয়ে রয়েছে। সেই হ'ল আদ্যিকালে গাছের আর ঘাসের প্রথম জন্ম।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

কুড়ানো ছেলের কাহিনী

(৩)

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমেই চিন্তা হইল আমি কোথায় আছি রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম আমি যেন অনাথ-আশ্রমে আসিয়াছি। চারিদিকে তাকাইলাম। পরিচিত গৃহ ও শয্যা দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিন্তু তখনো আমার সম্পূর্ণ ভয় কাটে নাই। জেরম্‌কে দেখিলেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, এখনই বুঝি সে আমাকে অনাথ আশ্রমে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

সমস্ত সকাল বেলা কাটিয়া গেল। জেরম্‌ আমাকে কিছুই বলিল না। দুপুরে তাহার নিকট আমার ডাক পড়িল—আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাহার নিকটে গেলাম। জেরম্‌ কাপড় পড়িয়া টুপি মাথায় দিয়া আসিতে বলিল, আমাকে এখনই তাহার সহিত বাহিরে যাইতে হইবে,

সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? নিশ্চয়ই অনাথ-আশ্রমে। আমি হতাশ দৃষ্টিতে

মা-বাবেরে'র দিকে তাকাইলাম। তিনি জেরমের অলক্ষ্যে চোখের ইশারায় আমাকে ভয় করিতে নিষেধ করিলেন। তখন আমি আর কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম

কোথায় যাইতেছি কিছুই জানিনা জেরম্ আগে, আমি পিছনে পিছনে সে বারবার বারবার ফিরিয়া দেখিতেছিল আমি সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছি কি না। মা-বারবেরে আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন কিন্তু তবু কেমন আমার ভয় হইতে লাগিল। এই লোকটাকে দিয়া বিশ্বাস কি ? সে যদি এখনই আমাকে অনাথ-আশ্রমে লইয়া যায় ? আমি স্থির করিলাম তাহার অলক্ষ্যে পিছন হইতে আমি পলায়ন করিব।

কেন জানি না, ঠিক এই সময়ে জেরম্ দাঁড়াইয়া আমার হাত ধরিল। আমার পলাইবার আর উপায় রহিল না সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

পথের ধারে একটা সরাইখানা ছিল—তাহার অধিপতি দুয়ারেই দাঁড়াইয়াছিল জেরম্কে দেখিয়া সে তাহাকে ডাকিল তাহারা দুজনে সরাইখানায় ঢুকিল, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই জেরম বাহিরে আসিয়া আমার কাণ ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল। জেরম্ ও সরাইখানার অধিপতি একটা টেবিলের ধারে গিয়া বসিল।

নিকটেই আর একটা টেবিলের সামনে অন্য একজন লোক বসিয়াছিল। এমন লোক পূর্ব্বে আমি আর কখনো দেখি নাই। মুখ ভরা তার লম্বা দাড়ি—চেহারা সৌম্য-প্রশান্ত ; দৃষ্টি স্তব্ধ স্থির। কিন্তু তিনি পোষাক পরিয়াছেন অদ্ভুত-রকমের মাথায় একটা উঁচু লম্বা ধূসরবর্ণের টুপি—তাহাতে লাল লাল পালক গোঁজা, গায়ে একটা ভেড়ার চামড়ার কোর্ত্তা, তার কেঁচার দিকট ভিতর দিকে জোড়া, কোর্ত্তার দুটা হাতই কাটা—দুটা আল্গা সাটিনের হাত জোড়া দিয়া কোর্ত্তার হাত তৈরী করা হইয়াছে পেণ্টুলেনেরও পা দুটা হাটু পর্য্যন্ত কাটা, হাটুর নীচে পায়ে কতগুলি নানাবর্ণের ফিতা জড়ান। পায়ের কাছে তিনটা কুকুর শুইয়া আছে। একটার বর্ণ সাদা, একটার কালো ও অন্যটার ধূসর বর্ণের। সাদা কুকুরটার মাথায় একটা লম্বা টুপি—সেটা মুখের সঙ্গে বাঁধা

আমি বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখিতেছিলাম। জেরম ও সরাইখানার অধিপতি গল্প করিতেছিলেন। একবার কাণ পাতিয়া শুনিলাম কি কথা হইতেছে। দুই একটা কথা শুনিয়া বুঝিলাম আমারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

হঠাৎ সেই অদ্ভুত লোকটি তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল—"তোমরা কি ওই ছেলেটির সম্বন্ধে কথা বলিতেছ ?"

তার কথা শুনিয়াই বুঝিলাম তিনি বিদেশী

জেরম্ বলিল—"হা"

"তুমি এক কাজ করনা, তাহা হইলে তোমাকে ছেলেটি সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবিতে হইবে না।"

"কি করিতে হইবে ?"

"ছেলেটিকে কেন অনাথ-আশ্রমে পাঠাইবে ? ইহাতে তোমারও কিছু লাভ হইবে না, ছেলেটিরও কষ্ট হইবে। তোমাকে আমি কিছু দিতেছি, ছেলেটি আমাকে দিয়ে দাও আমি ছেলেটির সমস্ত ভার গ্রহণ করিব।"

"তুমি ছেলেটির সকল ভার গ্রহণ করিবে ?"

"হাঁ, তুমিত ছেলেটিকে নিজের কাছে আর রাখিতে চাও না ?"

"তাই বলিয়া এমন ছেলেটি তোমাকে দিয়া দিব ? দেখ দেখি ছেলেটি কেমন সুন্দর ?"

"দেখিয়াছি। সুন্দর বলিয়াই তো আমি নিতে চাই। তা না হইলে ইহা দ্বারা আর কি কাজ হইবে ?"

"কেন, এ খুব কাজের ছেলে।"

এই একদিন আগেই তাহার মুখে শুনিয়াছি আমি কোন কাজেরই নই।

বৃদ্ধটি বলিল—"না, ইহার হাত পা মোটেই শক্ত মজবুত নয়।"

মজবুত নয়। কি বল ? একবার হাত পা টিপিয়াই দেখ। আয়তো বাছা রেমি, এদিকে "

রজেটির কথা আমার মনে পড়িল। যে লোকটি তাহাকে কিনিতে আসিয়াছিল সেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল। তবে কি এই লোকটি আমায় কিনিবে ? মা-বারবেরে তুমি কোথায় ?

বৃদ্ধটি বলিল—"তা যেমনই হউক, আমি তোমাকে ২০৲ টাকা দিতেছি। আমি এখন ইহাকে কিনিব না, একবৎসরের জন্য ভাড়া লইতেছি।"

"মোটে ২০৲ টাকা ?"

"একবৎসরের জন্য ইহাই যথেষ্ট। আমি টাকা আগ্রিম দিতেছি।"

"কিন্তু তোমার তো বোঝা উচিত তাহার মা বাপের কাছ হইতেও কিছু আশা করি বস্তুতঃ সেই আশাতেই তাহাকে এতদিন পালন করিয়াছি। আমার এতদিনের অর্থ পরিশ্রম সমস্তই কি বৃথা যাইবে ?"

"আচ্ছা, তার দরুণ তোমাকে আরো ৩০৲ টাকা বেশী দিতেছি।"

"৩০৲ টাকায় হইবে না ৬০৲ টাকা।"

অনেক বাদানুবাদের পর ৪০৲ টাকায় নিষ্পত্তি হইল

জেরম্ জিজ্ঞাস করিল—"ছেলেটিকে দিয়া তুমি কি করিবে ?"

"বিশেষ কিছুই নয়, বুড়া হইয়াছি তাই একটি সঙ্গীর প্রয়োজন "

"সে তা খুবই পাড়িবে তাহা দ্বারা তোমার কাজও হইবে।"

"সে অংশ খুব কম। যে জন্য তাহাকে নিতেছি তার জন্য খুব শক্ত মজবুত হাড়ের প্রয়োজন। কারণ তাহাকে নাচিতে হইবে, গাহিতে হইবে, অনেক দৌড় ঝাঁপ লম্ফ ঝম্প দিতে হইবে। মোট কথা, ভিটেলিস্ কোম্পানির সার্কাসের দলের একজন তাহাকে হইতে হইবে "

"সে আবার কে ? সর্কাসের দলইবা কোথায় ?"

"আমি নিজেই ভিটেলিস্। আমার দলটিও এখনই তোমাকে দেখাইব।"

এই বলিয়া তিনি তাহার ভেড়ার চামড়ার কোর্ত্তার ভিতর হইতে একটি অদ্ভুত আকৃতির জীব বাহির করিলেন। তার নাকটা চেপ্টা, হাত পা অনেকটা মানুষেরই মত— সমস্ত শরীর কালো রোয়ায় ঢাকা; মাথাটা ছোট্ট গোলগাল। চোখ দুটী ছোট্ট পিটপিটে এমন উজ্জ্বল মনে হয় যেন দু টুকরা কাচ বসাইয়া রাখিয়াছে। গায়ে একটা হাতকাটা সাটিনের লাল কোর্ত্তা, তাহাতে জড়ির কাজ করা

জেরম্ মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল—"উঃ কি কদাকার একটা বানর "

এই বানর! আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এতদিন তাহাদের নাম আমি কত শুনিয়াছি, কতবার তাহাদের দেখবার ইচ্ছা হইত। এতদিন পর আমি বানরকে দেখিতে পাইলাম। দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভিটেলিস্ বলিল—"এই যে দেখিতেছেন, এটি আমার দলের সেরা রত্ন—নাম জলি।" তারপর বানরটার দিকে ফিরিয়া বলিল—"জলি" ভদ্রলোকদের সেলাম কর।"

বলিতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সে আমাদের সকলকে সেলাম করিল।

তারপর তার কুকুর তিনটাকেও আমাদের কাছে ডাকিয়া আনিলেন। ইহারা

আসিয়া ভিটেলিসের আদেশানুসারে প্রথমে আমাদের সঙ্গে 'সেক-হেণ্ড' করিল, পরে তিন পা পিছু হটিয়া আমাদের সকলকে সেলাম করিল।

বৃদ্ধ সাদা কুকুরটাকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে কুকুরটা দেখিতেছেন, এ আমার দলের সর্দ্দার, খুব বুদ্ধিমান, আমার আদেশানুসারে সকলকে চালায়।" কালো কুকুরটাকে দেখাইয়া বলিল—"ইহার নাম 'জারবিনো'—মানে কর্‌সৎ। আপনারা দেখিয়াই বুঝিতেছেন অপাত্রে আমি নাম অর্পণ করি নাই।" ধূসর বর্ণের কুকুরটাকে দেখাইয়া বলিল—ইনি মিস্ ডল্‌সি, বড় নম্র শিষ্ট শান্ত। ইহারা সকলেই এক একজন মস্ত বড় গুণী। আমি ইহাদের লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই—পয়সাও যথেষ্ট উপার্জ্জন করি, "কাপি—"

বলিতেই কাপি তার দুইপা উর্দ্ধে তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। ভিটেলিস বলিল—"কাপি, এই দেখ সব ভদ্রলোকেরা আসিয়াছে। তাহাদের সামনে বেয়াদবি করিও না। এখন কয়টা বাজিয়াছে বল।"

কাপি অমনি বৃদ্ধের জামার পকেটে একটা পা ঢুকাইয়া দিল। তাহার পকেটে একটা ঘড়ি ছিল। কাপি পা দিয়া সেটা টানিয়া বাহির করিয়া কতক্ষণ ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভেটেলিস বলিল—"বল কয়টা বাজিয়াছে?"

কাপি প্রথমে দুইবার জোরে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাক দিল। পুনরায় আস্তে আস্তে চারবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিল।

ঘড়িতে তখন তিনটা বাজিতে ১৫ মিনিট বাকি

"বেশ বেশ। এইবার ডল্‌সিঠাকুরাণীকে তার নাচের বিদ্যাটা দেখাইয়া দিতে বল।"

অমনি কাপি ভেটেলিসের জামার পকেট হইতে একটা দড়ি বাহির করিয়া মিস্ ডলসির সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সে জারবিনোকে কি ইযারা করিল, অমনি জারবিনো আসিয়া দড়ির একপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরিল। কাপি নিজে দড়ির অন্যপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরিল। দুইজনে দড়ির দুইপ্রান্ত কামড়াইয়া ধরিয়া দড়িটাকে নাচাইতে লাগিল, ডলসি তার ভিতর দিয়া গলিয়া গলিয়া পাড় হইতে লাগিল।

নাচ হইয়া গেলে বৃদ্ধ আমাদের সম্বোধন করিয়া বলিল—"দেখুন ইহাদের কেমন বুদ্ধি; এখন আমার বোকার প্রয়োজন। তাহা হইলে ইহাদের বুদ্ধি আরো খুলিবে। সেইজন্যই এই ছেলেটিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাই। একজন কাহাকেও নিতান্ত বোকা সাজাইতে পারিলে তুলনায় ইহাদের বুদ্ধি আরো বেশী বলিয়া মনে হইবে।"

"তুমি আমার এই ছেলেটিকে দিয়ে বোকার অভিনয় করাইবে।"

"হাঁ, কিন্তু বোকার অভিনয় করিতে হইলে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। রিমির কতটা বুদ্ধি আছে তখনি আমি তার পরিচয় পাইব তাহার বুদ্ধি থাকিলে সে আমার সঙ্গে যাইতে কখনই অমত প্রকাশ করিবে না। আমার সঙ্গে গেলে সে কত নূতন নূতন দেশ, নূতন নূতন জিনিষ দেখিবে, কত নূতন নূতন বিষয় শিখিতে পারিবে। তা না হইলে তাহাকে এই একই জায়গায় পড়িয়া থাকিয়া চিরজীবন কাটাইতে হইবে। অনাথ-আশ্রমে গিয়া সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হইবে—পেট ভরিয়া খাইতেও পাইবে না।"

এইটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার খুবই ছিল কুকুর গুলিকেও আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল—ইহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিলে আমার জীবন বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইবে সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ ছিল না কিন্তু মা-বারবেরে ? তাহাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে থাকিব ? কিন্তু বৃদ্ধের কথাও ঠিক, এখানে থাকিলেই যে আমি মা বারবেরের কাছে থাকিতে পারিব, জেরম্ যে আমাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দিবে না তারইবা নিশ্চয়তা কি ? হায়, আমি কি করিব! দুই চোখ আমার জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া ভিটেলিস্ আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জেরমকে বলিল—"প্রায় রাজি হইয়া আসিয়াছে—নিজের মনে সে ভাবিয়া দেখিতেছে। কাল আর—.."

তাহার কথা শেষ না হইতেই আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলাম—"না—মা বারবেরেকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইব না"

হঠাৎ কাপির গর্জ্জনে আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম। পিছন ফিরিতেই দেখি 'জলি' টেবিলের উপর চড়িয়া ভিটেলিসের মদের গ্লাশটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাপি তাহাকে দেখিয়া তাড়া না করিলে গ্লাশটি সে নিমেষেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিত।

ভিটেলিস্ তাহাকে দুই ধমক দিয়া, বলিল—"লোভী চোর যা ঐ কোণায় গিয়া বসিয়া থাক" জারবিনোকে বলিল—"তুই পা ছাড়া দে, একটু নড়িলেই গালে চড় কষাইয়া দিবি।" কাপির সঙ্গে সেক-হেণ্ড করিয়া বৃদ্ধ তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল।

ভিটেলিস্ জেরমকে বলিল—"এস এইবার আমাদের কাজ শেষ করিয়া ফেলি। এই নাও তোমার টাকা।"

"কত?"

"ত্রিশ।"

"না, চল্লিশের কমে হইবে না।"

দুইজনের মধ্যে আবার বাদানুবাদ আরম্ভ হইল।

আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভিটেলিস্ বলিল—"যাও, তুমি বাহিরে গিয়ে খেলা কর।"

আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম কিন্তু কোন খেলায় মন দিতে পারিলাম না—খেলিবার মত আমার মনের অবস্থাও ছিল না। আমি বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম—প্রায় একঘণ্টা পরে জেরম্ আসিয়া বলিল—"ওঠ, চল বাড়ী যাই।"

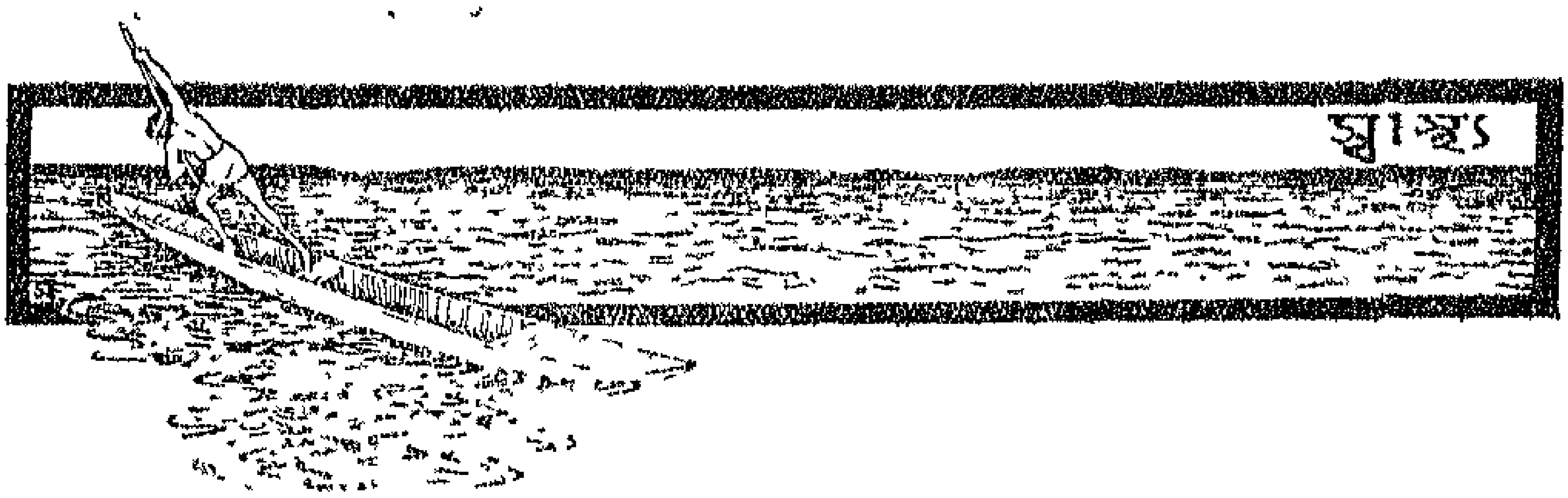
বাড়ী? তবে বৃদ্ধের সঙ্গে আমাকে আর যাইতে হইবে না? কি আনন্দ, মা বারবেরেঁর কাছেই আমি থাকিব।

বাড়ী ফিরিবার পথে আমাদের দুজনের মধ্যে কোন কথাই হইল না। আমিও ভয়ে তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। বাড়ির কাছাকাছি আসিলে জেরম্ আমার কাণ ধরিয়া বলিল—"দেখ বাপু, বাড়ি গিয়া তোমার মা বারবেরেঁর কাছে আজিকার কোন কথাই বলিতে পারিবে না। যদি টের পাই তাকে কোন কথা বলিয়াছ তাহা হইলে তোমার মাথা আস্ত রাখিব না।

ক্রমশঃ

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।





স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে।



সেদিনের কথা নয় কোন এক দেশে বীরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার মস্ত বড় রাজ্য ছিল অনেক প্রজা, লোকজন, সৈন্য সামন্ত; তাই তিনি কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না আশে পাশে যত রাজা ছিল সব তার নামে ভয়ে থরহরি কাঁপিত বৎসরের শেষে চারি পাশের সব রাজাকেই বীরসেনের নিকট খাজানা পাঠাইতে হইত যদি খাজানা পাঠাইতে কাহারও একদিন দেরী হইত, তবে আর তাঁহার রক্ষা থাকিত না বীরসেন যাইয়া তখনই তাহার রাজ্য কাড়িয়া লইত। আর এমনই বীরসেনের প্রতাপ যে তাহাকে বাধা দেয় এমন সাহসও কারুর ছিল না।

এখন রাজার একদিন মন গেল একটা বড় যজ্ঞ করিতে হইবে, আর সেই যজ্ঞে দেশ বিদেশের যত সব রাজা সবাইকে নিমন্ত্রণ করিবেন। যেমনি মতলব হওয়া অমনি কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। বৃহৎ যজ্ঞের সব আয়োজন হইতে লাগিল। রাজা বীরসেন যত দেশ বিদেশে যত সব রাজা, রাজড়া, বড় লোক ছিলেন সবাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা বীরসেনের নিমন্ত্রণ কে অগ্রাহ্য করিবে? সবাই যজ্ঞে আসিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল

যজ্ঞের শেষে মস্ত বড় এক সভা বসিল। চারিধারে রাজা রাজড়ারা বসিয়া আছেন। এমন সময় বীরসেন আসিয়া সভা মধ্যে দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিরাট বপু ও বিশাল বক্ষ দেখিয়া সভার সকলে সম্ভ্রমে মাথা নীচু করিল। বীরসেন তখন মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

“মাননীয় রাজা ও বীরপুরুষগণ, আপনারা সকলেই এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, সকলেই আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, তার জন্য আপনাদের আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা হয়ত জানেন না কি উদ্দেশ্যে আমি এই যজ্ঞ করিলাম। আমার এই যজ্ঞ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমি আজ দেশ বিদেশের যত সব নামী লোক আসিয়াছেন সকলের সম্মুখে বলিতে চাই যে পৃথিবীর কোথাও আমার কোন শত্রু নাই, পৃথিবীর যত সব বীরপুরুষ আমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছে। শুধু কি মানুষদের কথাই আমি বলিতেছি, হিংস্র পশুদের পর্য্যন্ত আমি রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। আজ আমি সগর্বেই অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, এ জগতে আমার কোন শত্রু নাই। আপনারা যদি সকলে এ কথায় অনুমোদন করেন তবে আমি ধন্য হইব, আর যিনি না করিবেন তিনি বলুন—তাঁহাকে দেখাইতে চাই, বীরসেন বাহুতে কত বল ধরে। আপনারা কি বলেন?”

সভা শুদ্ধ লোক স্তব্ধ হইয়া গেল। এত বড় অহঙ্কার, আত্মাভিমান এই লোকটার যে এতগুলি নিমন্ত্রিত বীরপুরুষের নিকট এমন দাম্ভিকের মত কথা বলিল। কিন্তু রাজা বীরসেনের মুখের উপর কথা বলে এমন সাহসও কাহারো ছিল না। বীরসেন তখন আবার বলিল,—

“আপনাদের সকলকেই নীরব দেখিতেছি, তবে আমি ঘোষণা করিতে পারি, এ জগতে এমন কোন জীব নাই যে আমার শত্রুতা করে।”

সভার সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু কাহারও মুখে কোন সাড়া নাই। কি করে সকলেই নীরবে বীরসেনের প্রভুত্ব মানিয়া লইল;—মানিল না শুধু একজন বালক।

বালক শিক্ষিত, বালক জ্ঞানী। সে ভাবিয়া পাইল না মানুষ এত বড় দাম্ভিক কি করিয়া হয়। জন কয়েক মানুষকে চোখ রাঙাইয়া, ভয় দেখাইয়া তিনি ভাবিয়াছেন, জগতে আর তাহার কোন শত্রু নাই। কতটুকু রাজার বিদ্যা, কতটুকু রাজার দৃষ্টি যে তিনি সমুদয় জগতের কথা বলিতে যান, যখন তাহার চারিধারে কি আছে তাহাই তিনি জানেন না।

সভার সকল লোক যখন নীরবে রাজার প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছে, অহঙ্কারের শেষ সীমায় উঠিয়া রাজা যখন সেই মত প্রকাশ করিতে যাইতেছেন, সেই সময় সেই বালক ধীর শান্ত স্বরে বলিল,—

“মহারাজ, সভার সকল লোক আপনার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, আমিও করি। কিন্তু

তাই বলিয়া আপনার যে কোন শত্রু নাই এ অহঙ্কার আপনার সাজে না। জগতের কথা ছাড়িয়া দিলাম, আপনার রাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, আপনার আশে পাশে কত অসংখ্য শত্রু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার কি কিছু খবর রাখেন ?"

মহারাজ চমকিয়া উঠিলেন, তাহার পরই কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—

"কে আমার শত্রু বালক ? এখনই বলিয়া দেও, আজ পৃথিবী হইতে আমি আমার শত্রুবংশ নির্ম্মূল করিব এখনই বল বালক কোথায় তাহারা থাকে "

বালক নির্ভয়ে উত্তর করিল,—

"এই যে মহারাজ, আপনারই চারিদিকে জগৎ জুড়িয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আপনার শরীরের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহারা অনেকদিন ধরিয়াই যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে প্রভুত্ব পায় নাই। তাহাদের বংশ নির্ম্মূল করার ক্ষমতা আপনার নাই, তবে তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন মাত্র "

মহারাজ সক্রোধে বলিলেন,—

"তুমি কি প্রলাপ বকিতেছ বালক "

একজন সভাসদ বলিয়া উঠিলেন,—

"আজ কালকার ছেলে, আবার বিদেশেও গিয়াছিল, দু'পাতা পড়িয়াই মাথা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে।"

সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাজা কিন্তু হাসিলেন না। বালকের কথায় কি যেন এক সত্যের ছাপ মারা ছিল, সে কথা অবিশ্বাস করিতে রাজার মন উঠিল না তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল কত শত্রুই না জানি তাহার শরীরের চারিদিকে ঘুরিতেছে, সুযোগ পাইলেই আক্রমণ করিবে। কিন্তু কে সে সব শত্রু, তাদের সংখ্যা কত, তাদের ক্ষমতা কি, সব না জানিয়াই বা তিনি কি করিবেন। তাই আবার তিনি বালককে বলিলেন,—

"বালক, যদি তুমি সবই জান ত শত্রুর পরিচয় আমায় দেও, দেখি তাদের বিক্রম বেশী না বীরসেনের বিক্রম বেশী।"

বালক তখন হাসিয়া বলিল,—

"মহারাজ, এ চর্ম্মচক্ষে তাহাদিগকে দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই। তাহারা সংখ্যায়

অনেক বটে, তবে আকারে তাহারা অতি ছোট। এই সব অদৃশ্য শত্রু দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নামে এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রের মধ্য দিয়া আপনি সবই দেখিতে পাইবেন।"

ভোলানাথ তখনই তাহার বাড়ী হইতে একটা খুব ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া আসিয়া রাজাকে বলিল —"মহারাজ, এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখুন দেখি। কি দেখিতেছেন?"

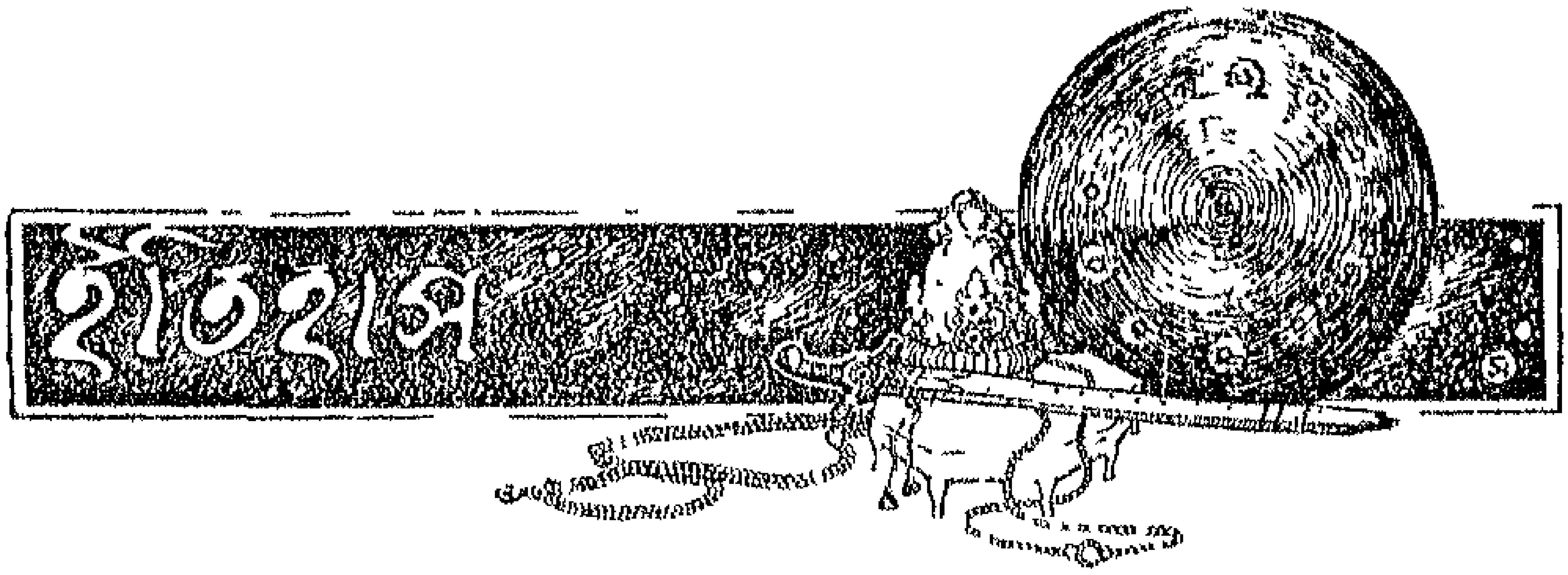
রাজা বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন।

বালক ভোলানাথ বলিল,—

"এরাই আপনার শত্রু মহারাজ।"



ক্রমশঃ
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।



ছেলেদের হিন্দুস্থান।

(১)



কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সেই অমর উক্তি

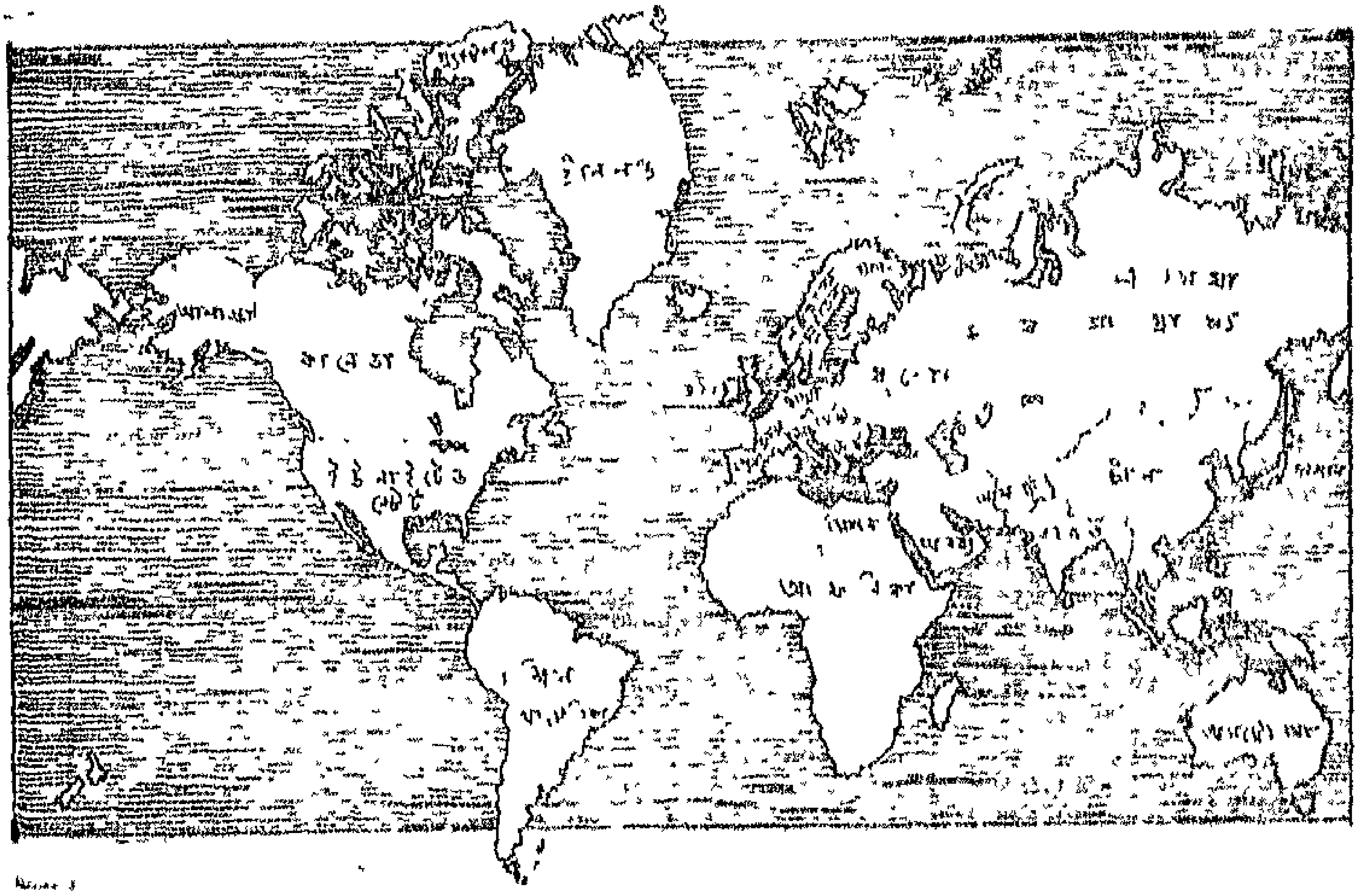
ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

* * * * *

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছ কিন্তু কেন আমাদের দেশ সকল দেশের সেরা, কেন এই দেশে ধন ধান্য পুষ্পের এত ছড়াছড়ি, আর কেন অধিকারেই বা আমাদের জন্মভূমি সকল দেশের রাণী হইল, এ সব খবর হয়ত তোমরা রাখ না আমি বলি, গান গাহিবার আগে, দেশের সম্বন্ধে কথা বলিবার আগে, তোমাদের এই দেশসম্বন্ধে সব কথা জানিয়া লইতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন দেশের সম্বন্ধে সব কথা জানিয়াছিলেন, দেশকে ঠিক চিনিয়াছিলেন, তোমরাও দেশকে সেই রকম জানিলে, সেই রকম চিনিলে তবে দ্বিজেন্দ্রলালের মত দেশকে ভালবাসিতে পারিবে, এবং তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতে পারিবে ;

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

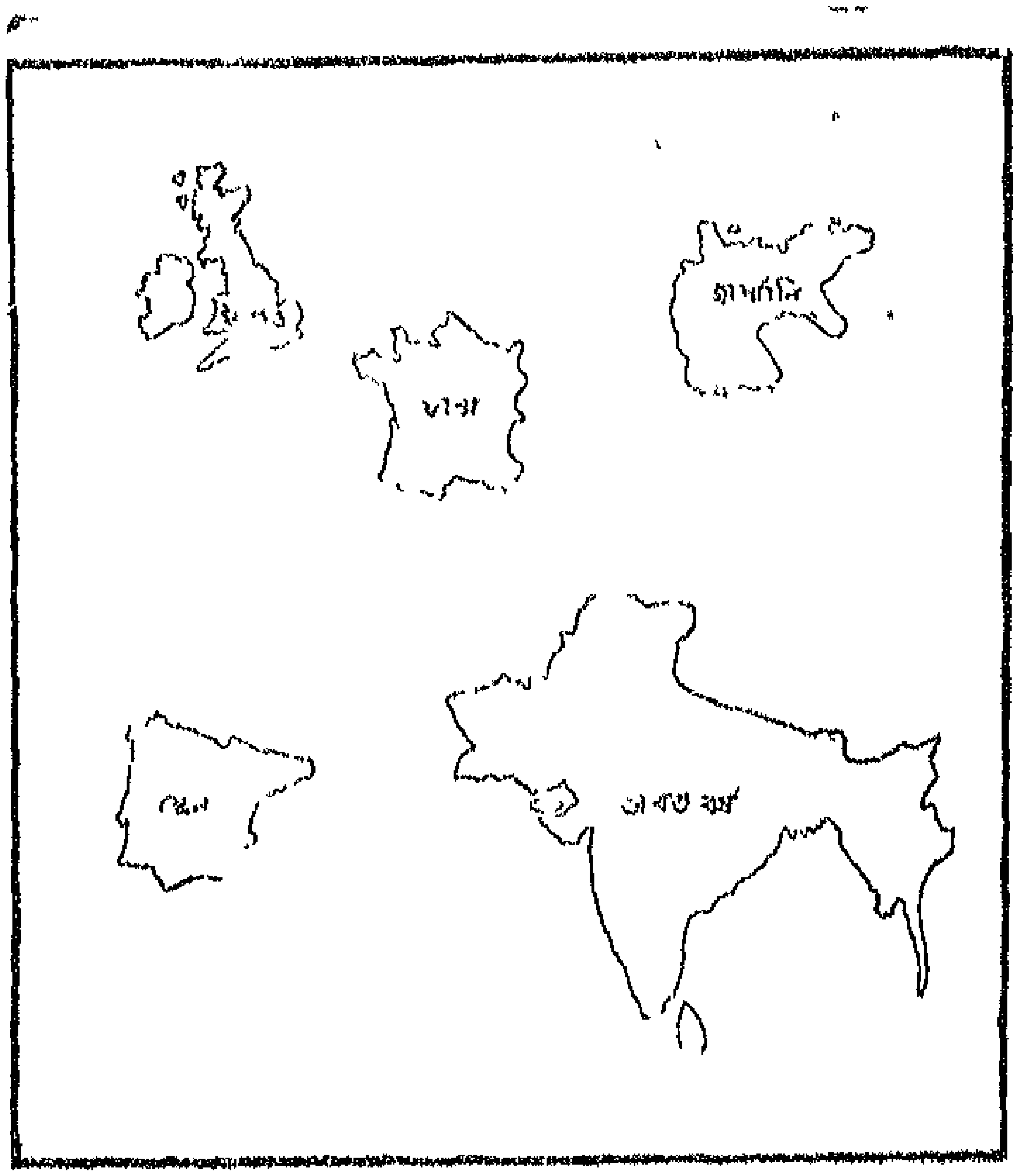


পৃথিবীর মানচিত্র।

তোমরা উপরে পৃথিবীর যে মানচিত্র দেখিতে পাইতেছ, উহারই দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া যে দেশটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে তাহারই নাম ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর তুলনায় ভারতবর্ষকে খুবই ছোট দেখাইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষকে একটি ছোট খাট পৃথিবী বলিলেও চলে। ইংরাজ আমাদের রাজা, আমাদের মত আরও অনেক দেশে তাহাদের রাজত্ব। তাহাদের নিজ দেশ হইল ইংলণ্ড। পল্লীগ্রামের সঙ্গে যেমন কলিকাতা সহরের আকারে তুলনা হয় না, ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষেরও তেমনি আকারে তুলনা হয় না। ইয়ুরোপের মধ্যে তিনটি খুব বড় দেশ আছে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণী। এই তিন দেশে যে সকল লোক থাকে তাহাদের কথা তোমরা কখনও না কখনও নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই সব দেশের প্রত্যেকটিই ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক ছোট। তোমরা ইহার পরের পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখ, তিনটি দেশ ও ভারতবর্ষ পাশাপাশি আঁকা হইয়াছে। ভারতবর্ষ উহাদের তুলনায় কত বড়!

শুধু আকারেই বড় নয় ; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে লোকও থাকে অনেক বেশী ভারতবর্ষে ৩৩ কোটী লোকের বাস, আর ইংলণ্ডে ৫ কোটী লোকও নেই। তোমরা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছ, কিন্তু সত্যই তাই,—এই ৫ কোটী ইংরাজই দুই হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ৩৩ কোটী ভারতবাসীর উপর প্রভুত্ব করিতেছে



ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী ও ইংলণ্ড।

তাই বলিয়া শুধু এই সব কারণেই ভারতবর্ষকে ছোট খাট পৃথিবী বলা হয় নাই ছোট খাট পৃথিবী হইতে গেলে, পৃথিবীর মতনই সেখানে নানা দেশের, নানা জাতির, নানা ধর্ম্মের লোক থাকা চাই, আর গোটা পৃথিবীতে যে সমস্ত জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত জিনিস অল্প বিস্তর সেই ছোট খাট পৃথিবীতেও থাকা দরকার। ইংলণ্ড, এমন কি ইয়ুরোপকেও আমরা ছোট খাট পৃথিবী বলিতে পারি না। কারণ ইয়ুরোপের অধিকাংশ লোকই এক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম মানে আরও অনেক কারণে ইয়ুরোপকে ছোট খাট পৃথিবী বলা চলে না। কিন্তু ভারতবর্ষকে বলা চলে।

আমাদের দেশ একটি ছোটখাট পৃথিবী নানা দেশের, নানা জাতির, নানা ধর্ম্মের লোক এই ভারতবর্ষে বাস করে,

"হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবীড় চীন,

শক হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হলো লীন"

* * *

"রণধারা বাহি, জয় গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি-পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তার বিচিত্র সুর।"

তাহা ছাড়া পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সবই এই ভারতবর্ষে আছে। সুদূর বিস্তৃত পর্ব্বতমালা, নদ, নদী, জলপ্রপাত, উপত্যকা, এই ভারতবর্ষে কিছুরই অভাব নাই। একই সময়ে কোথাও বা দারুন গ্রীষ্ম, আর কোথাও বা ভীষণ শীত। কোথাও বা শস্য শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, আর কোথাও বা ধূ ধূ করিতেছে মরুভূমি।

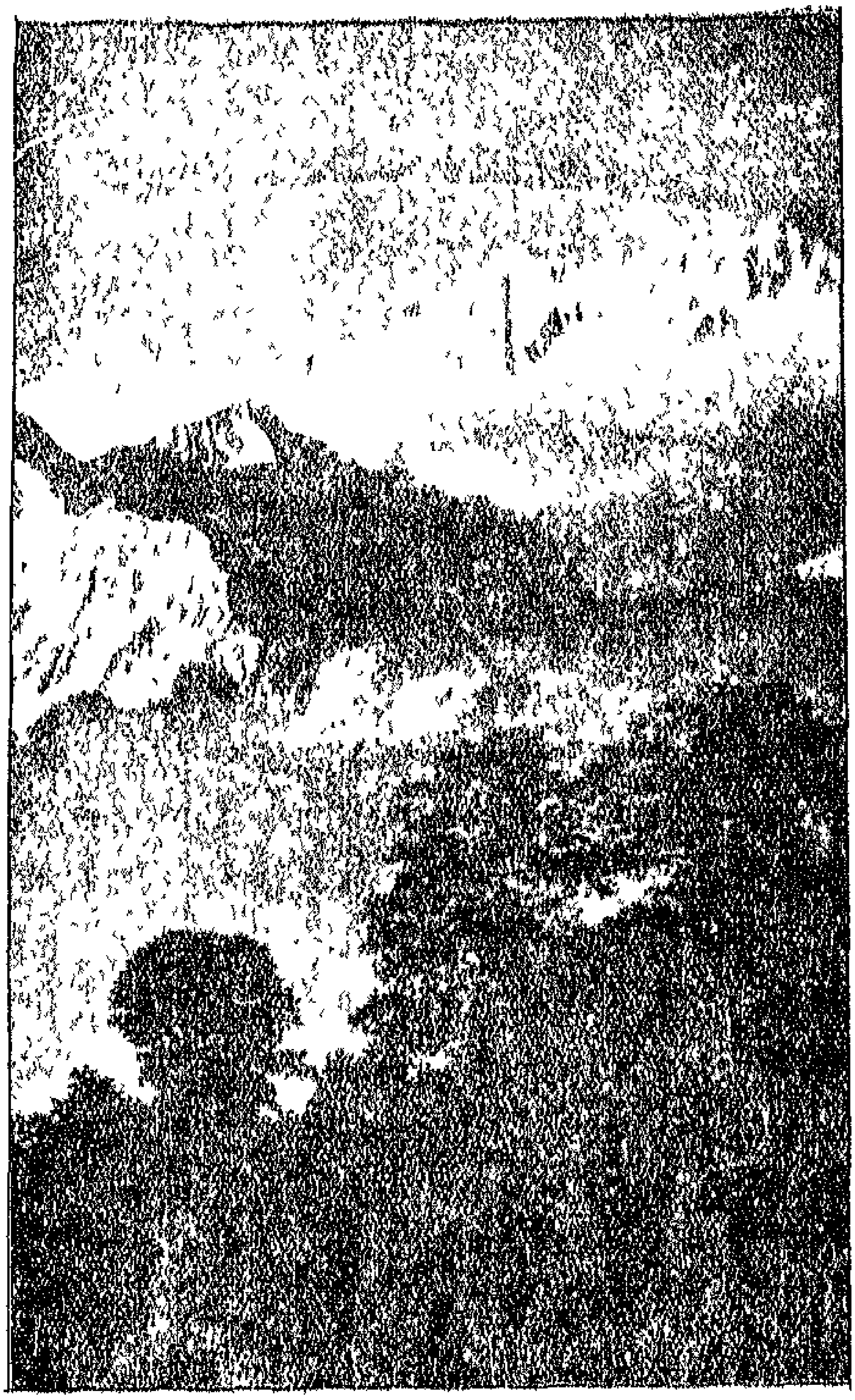
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা।
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা॥
কখনও মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে।
হাসিয়া কখনও লুটায়ে পড়িছ শস্য শ্যামল নিখিল বিশ্বে

পৃথিবীতে তরু গুল্ম, লতা পাতা, পশু পক্ষী যেখানে যাহা দেখা যায় ভারতে সবই আছে। এমন দেশটি আর কোথাও তুমি খুঁজিয়া পাইবে না।

তোমরা নিশ্চয়ই ইংরাজদের দেখিয়াছ, কলিকাতায় জুতা কিনিতে যাইয়া চীনাদেরও দেখিয়াছ। হয়ত তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে এই ইংরাজ, চীন প্রভৃতি জাতি হইতে আমাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সবই যেন কেমন একটু ভিন্ন রকমের। আচ্ছা, বল ত ইহার কারণ কি? তোমরা ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাইতেছ। এই হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত। পৃথিবীতে এত বড় পাহাড় আর নাই। আর ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে বিশাল সমুদ্র। ভারতবর্ষের চারিদিকে এত বড় পাহাড় ও সমুদ্র থাকার জন্যই অন্যান্য দেশের লোক সহসা ভারতে আসিতে

পারে না, এবং এই কারণেই ভারতবর্ষের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি সবই যেন তাহার নিজস্ব

ভারতভূমি চিরকালই সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা। তাহার জমি চিরকালই উর্ব্বরা। ভারতবর্ষকে কোন দিনই অন্ন বস্ত্রের জন্য হাহাকার করিতে হয় নাই তাই, সেকালে ভারতবাসী চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যে অতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতি যখন অর্দ্ধ সভ্য, গাছের বাকল পরিয় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটাইত তখন ভারতবাসী শিক্ষা ও সভ্যতায় জগতের আদর্শ-স্থানীয় ছিল। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সেকালের জ্ঞানী লোকেরা যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, আজিও লোকে শ্রদ্ধার সহিত সেই সব শুনিয়া থাকে তাহা ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহারা কত পাণ্ডিত্য দেখাইযাছেন—সে সব সম্বন্ধে তোমাদের পরে বলিতেছি



হিমালয়

ক্রমশঃ

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

বুঁদির গড়।

চিতোর রাজ্য থেকে বুঁদির-গড় বেশী দূর নয়। এই বুঁদির গড়ের রাজপুতরা বিখ্যাত হারাবংশীয় বীর, আর তাদের যে রাজা সে বীরদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বীর, ভয় কাকে বলে তা তিনি মোটেই জানতেন না। চিতোরের রাণা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে এসেছিলেন, তিনি সে দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না, কেবলই ভাবছিলেন কি করে বুঁদি-গড় জয় করে শোধ তুলতে পারেন।

একদিন রাণা সকালে উঠে মন্ত্রীদের বল্লেন —

"দেখ, যতক্ষণ না বুঁদির কেল্লা আমি নিজে হাতে ভাঙতে পারব ততক্ষণ আমি খাওয়া দাওয়া সব ত্যাগ করলুম, এক ফোঁটা জলও স্পর্শ করব না।"

মন্ত্রীরা এই কথা শুনে ত ভেবে অস্থির, তারা কত ক'রে বোঝাতে লাগল, বল্লে —

"দেখুন মহারাজ, যে প্রতিজ্ঞা আপনি করতে যাচ্ছেন, এ কাজ করতে গেলে মানুষের অসাধ্য। সেখানকার সকলেই হারাবান, সে বীরদের মধ্যে তাদের রাজা আবার বিখ্যাত বীর, মহারাজ এমন প্রতিজ্ঞা করবেন না।"

রাণা কিন্তু শুনলেন না। তিনি বল্লেন,

"বুঁদির কেল্লা ভাঙতে না পারি আমার প্রতিজ্ঞা তো রাখিতে পারি, না খেয়ে মরি সেও ভাল তবু হার মেনে বাঁচব না।"

তখন মন্ত্রীর মহা ভাবনা উপস্থিত হ'ল, রাজা শেষে শুধু একটা কথার জন্যে আত্মঘাতী হবেন। তখন মন্ত্রীরা সব নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে ব'সে গেল, অনেক পরামর্শের পর শেষে ঠিক করলে যে, মাটি দিয়ে একটা নকল বুঁদির-গড় সাজিয়ে রাজাকে দিয়ে তাই ভাঙিয়ে রাজার কথা একরকম ক'রে সত্যি করালেই, তাহলে রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে, তাঁকে আর না খেয়ে মরতে হবে না। এই যুক্তি ঠিক হ'বামাত্র মন্ত্রী হাজার লোক লাগিয়ে দিলেন। একরাতের মধ্যে নকল বুঁদির কেল্লা তৈরী হয়ে গেল। সকালে রাজার কাছে খবর দেওয়া হ'ল যে, আচ্ছা আমরা সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করেছি আপনি আসুন বুঁদির গড় জয় করবেন। রাজা তো মহা খুসী, সৈন্য সামন্ত লোকজন সব নিয়ে তিনি চল্লেন।

এখন হয়েছে কি, রাণার কাছে কুম্ভ নামে এক হারাবংশীয় রাজপুত চাকর ছিল, সে বনে হরিণ শিকার করতে গিয়েছিল। সে হরিণ মেরে, কাঁধে তীর ধনুক

ঝুলিয়ে, বাড়ী ফিরছিল। পথে নকল গড়ের সব কথা শুনতে পেল। কুম্ভ শাদাসিধে মানুষ—যেমন বীর সে তেমনি তার এ মোটেই ভাল লাগল না। সে ত বললে—আসল হোক, নকল হোক আমার জাত ভাইদের এ অপমান সহ্য করব না, আমি নকলগড় একাই রক্ষা করব। বলে সে তাড়াতাড়ি চলে নকল গড়ের কাছে গিয়ে, তীর ধনুক বাগিয়ে দাঁড়াল। ওদিকে রাজা লোক লস্কর সব নিয়ে ঘোর সমারোহে আকাশ ফাটিয়ে এসে উপস্থিত হলেন, তাতে কুম্ভ মোটেই ভয় না পেয়ে সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে বলে উঠলো।

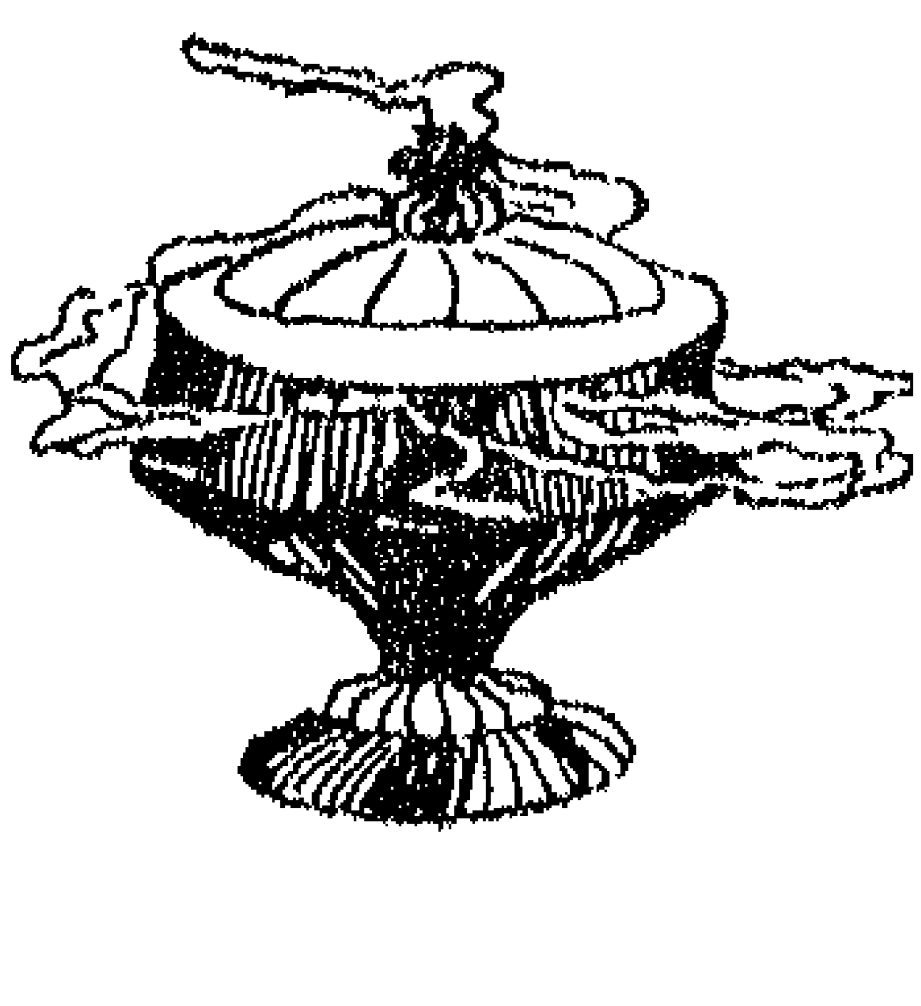
"মহারাজ, দূরে দাঁড়ান, বুঁদির নাম নিয়ে ছেলে খেলা করবেন না, হারাবংশের অপমান আমি বেঁচে থাকতে হতে দেব না। তাদের মান একাই রক্ষা করব।"

এদিকে চিতোর-রাজ আগেকার হারের শোধ আজ তুলবেন, সেই আনন্দে মেতে উঠেছেন। তার আর আসল-নকল জ্ঞান নেই। কুম্ভকে পেয়ে তিনি যেন স-সৈন্য হামু রাজাকেই পেলেন। সৈন্যদের নিয়ে এক লাফে নকল কেল্লার উপর পড়ে দরজা ভেঙ্গে, দেওয়াল ভেঙ্গে, সব লণ্ড ভণ্ড চুরমার করে, মনের ঝাল মেটালেন।

কুম্ভবেচারী একলা কি করবে? তবু সে নিজের দেশের মান বাঁচাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত মত্ত রাজা ও সৈন্যদলের আক্রমণ আটকাবার বৃথা চেষ্টায় লড়তে লড়তে মারা পড়ল। তখন তার মাথা কেটে নিয়ে রাণা মহা আস্ফালন করতে করতে মন্ত্রী ও সৈন্যদল নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

চিতোর-রাজ তো ভাবলেন তারই জয় জয়কার, হারাবংশের মাথা হেঁট। তোমরা কি বল?

শ্রীসংজ্ঞা দেবী





ছেলেদের বাইবেল্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিসর দেশে শিশু যীশুখ্রীষ্ট পিতামাতার স্নেহে ও যত্নে দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অজানা দেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে বাস করিবার হেতু স্নেহময়ী জননীর হৃদয়, পাছে পুত্রের কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিত এবং তিনি অহর্নিশি একান্ত মনে ঈশ্বরের নিকট পুত্রের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেন।


নিদ্রিত শিশু ক্রোড়ে লইয়া মেরীর প্রার্থনা।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর গত হইল। একদিন রাত্রে জোসেফ

স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। যাহার ভয়ে তাঁহাদিগকে নিজ দেশ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল, সেই দুষ্টমতি হেরড্ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে জোসেফ্ পত্নী ও পুত্র লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন

স্বপ্নে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জোসেফ্ ও মেরীর আনন্দের সীমা রহিল না। শীঘ্রই জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইয়া আত্মীয় স্বজন বর্গের সহিত পুনরায় সম্মিলিত হইতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল

জোসেফ্ মিসরের যে স্থানে বাস করিতেন, তথাকার অধিবাসীগণ এই পরিবারকে অত্যন্ত ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। তাঁহাদের সৌজন্য, পরহিতৈষণা ও ধর্মপ্রাণতার গুণে প্রতিবাসীগণ তাঁহাদের প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল অনিন্দ্য-সুন্দর শিশু খ্রীষ্টকে তাহারা নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিত। যে মহাপুরুষ উত্তর কালে আত্মপর বিচার না করিয়া সকল মানবকেই তাঁহার গভীর প্রেম অযাচিত ভাবে দান করিয়াছিলেন, তিনি এক বৎসর বয়স কালেও বিচার না করিয়া, যে তাঁহাকে লইবার জন্য হাত বাড়াইত, উল্লাস ও আগ্রহের সহিত তিনি তাহার ক্রোড়ে উঠিয়া তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন সেই হাস্যবদন ক্রীড়ানিরত শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহারা কি এক অননুভূত আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিত যিনি জগতের তাপিত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে বক্ষে ধারণ করিবে, তাহারই বক্ষ যে শীতল হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তদ্দেশবাসীরা যখন শুনিল যে জোসেফ ও মেরী একেবারে তাঁহাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে-ছেন, তখন তাহারা নিতান্ত দুঃখিত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আগমন করিল তাহারা দেখিল যে ফুল্লকান্তি এক বৎসরের বালক যীশু মাতার ক্রোড়ে বসিয়া বালসুলভ ক্রীড়া কৌতুকে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহার মুগ্ধনেত্রে এই কমনীয় দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মেরীকে বলিতে লাগিল যে তাঁহার ঐ সুন্দর শিশু তাহাদের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহাকে না দেখিয়া তাহাদের জীবন ধারণ করা সবিশেষ কষ্টকর হইবে। জোসেফ্ ও মেরী



মাতার ক্রোড়ে ক্রীড়মান যীশু।

প্রীতিপূর্ণ মধুর বচনে তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার আর তাঁহাদের শত্রু ভয়ে ভীত হইয়া দুর্গম পথে গোপন ভাবে যাইবার আবশ্যক ছিল না। তাঁহার পথের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রীর সুব্যবস্থা করিয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া নিজ গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হেরোদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আর্কীলিয়স্ পিতার স্থানে প্যালেষ্টাইনের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যোসেফ্ তাঁহার মৃত পিতার দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে হয়ত বর্ত্তমান রাজাও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। এইজন্য তিনি জেরুসালেমের নিকটবর্ত্তী বেথলেহেম্ নগরে না যাইয়া দূরস্থিত নাজারেথ্ নামক গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে বাস করিবার জন্য যীশুখ্রীষ্ট "নাজারীন্" অর্থাৎ নাজারেথ্বাসী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র গ্রামেই যীশুখ্রীষ্টের শৈশব ও বাল্যজীবন এবং যৌবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই স্থানে তিনি পিতামাতার তত্ত্বাবধানে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। অপূর্ব্ব প্রতিভা ও মনীষা বলে তিনি অল্পবয়সেই বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ও দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে জেরুসালেমের ধর্ম্ম-মন্দিরে তিনি বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি উত্তরকালে স্বজাতীয় ধর্ম্মযাজকমণ্ডলীর ঈর্ষা, বিরাগ ও ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিল এবং ইহার জন্য তাঁহাকে বিষম নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অবশেষে তিনি নিজ জীবনকে বলি দিয়াছিলেন। এ সকল কথা তোমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু

রেণু ও পারুল।

রেণুই বড়, পারুল ছোট,
দুইটী বোন তার,
সারাটী দিন কুটীরে মোর
ঢালে সুধার ধারা
দুইটী বোনে বড়ই ভাব,
বড়ই গলাগলি,
বোঁটায় এক ফুটল যেন
দুইটী ফুলকলি
খাওয়া খেলা চলা শোওয়া
একই সনে চাই,
রেণু যেথায় পারুল সেথা
ভুলটী কিছু নাই

হাসলে রেণু, পারুল হাসে,
কাঁদলে পারুল,— রেণু
যেন—সে বাঁধা একই সুরে
দু'টী মোহন বেণু.
ঠাকুরমার কোলটী নিয়ে
দোঁহার কাড়াকাড়ি,
সইতে তবু পারে না তারা
তিলেক ছাড়াছাড়ি.
রেণু পারুল দুটী বোন
দু'টী সোনার চাঁদ,
উঠল ফুটে কবির হবে
রচি' মায়ার ফাঁদ!

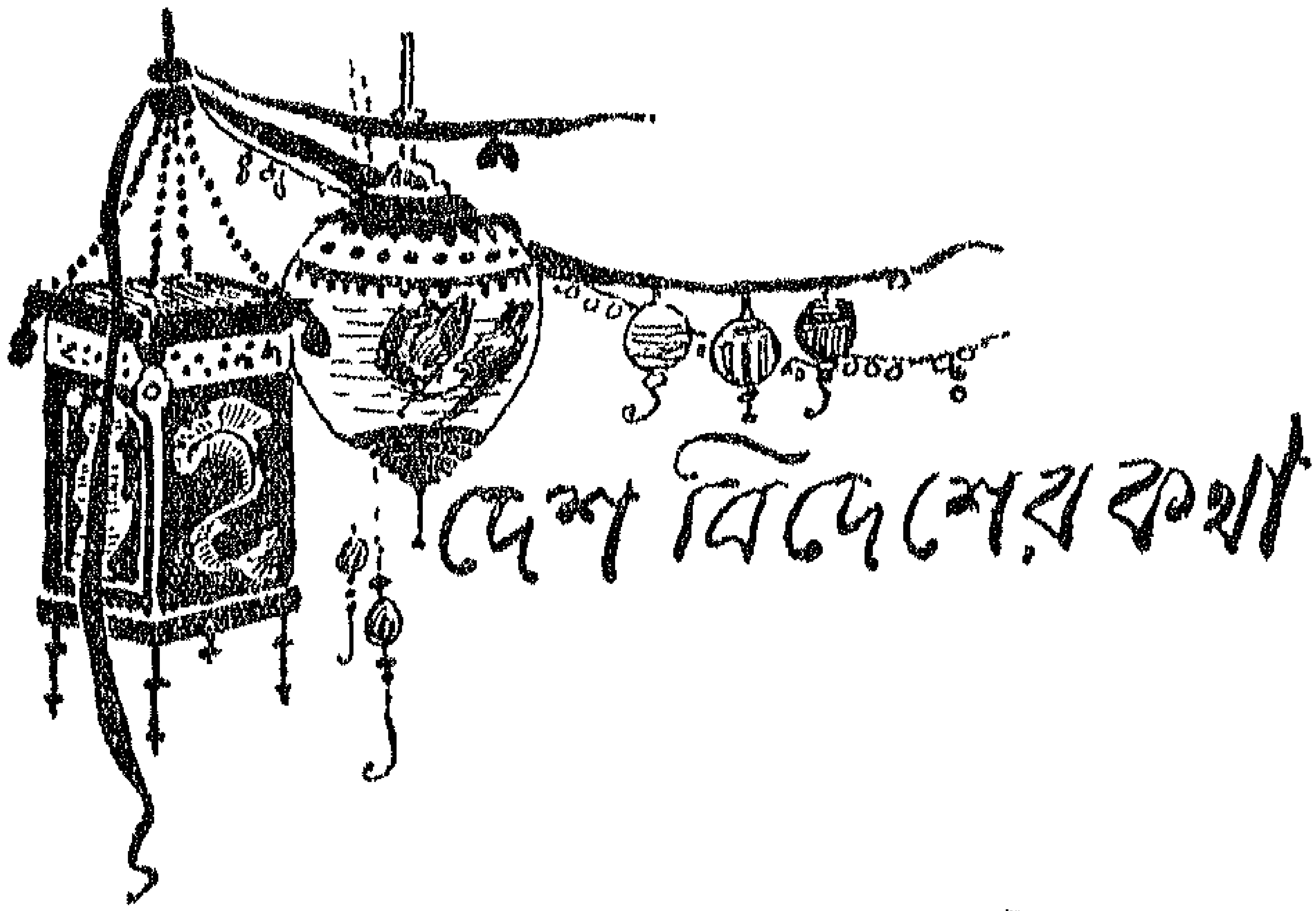
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

শিশুর হাসি।

নীল আকাশে চাঁদটী হাসে
ফুলটী হাসে বনে,—
মায়ের কোলে শিশুটী হাসে
ছাড়িয়ে সুধা চারিটী পাশে,
একটীবার হয় না তার
তুলনা কারো সনে!

চাঁদ তো ডোবে ফুল তো ঝরে
খেলা তাদের ক্ষণেক তরে—
শিশুর হাসি বাজায় বাঁশী
সদা সবার মনে.

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত



দেশ বিদেশের কথা

সেকাল ও একালের পৃথিবী।

দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী সম্বন্ধে লোকের ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল। তখন রেল, ষ্টীমার, জাহাজে যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না, তাই সেকালে লোকে যে পর্য্যন্ত যাইত সেই পর্য্যন্তই ভাবিত পৃথিবীর শেষ সীমা আর এই কারণেই তখনকার দিনে পৃথিবী জয় করাটা বেশ সহজ ছিল, কারণ দু'একখানি গ্রামের লোককে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াই, সেকালের রাজারা ভাবিত পৃথিবী জয় করা হইয়া গিয়াছে

কিন্তু সেকাল আর নাই এখন সকলে বুঝিয়াছে পৃথিবী বড় একটা ছোট খাট জিনিস নয়, এখানে যে কত রকম লোকের বাস তাহার ইয়ত্তা নাই, আর তাহাদের যে কত রকমের ভাষা, আর কত রকমের ধর্ম্ম তাহারই বা সংখ্যা করিবে কে? রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন খবরের কাগজের সাহায্যে এখন আমরা সব জিনিসই অবাক হইয়া দেখি, শুনি আর কত কি নূতন জিনিস শিখি আগে আমরা নিজের ধর্ম্ম, নিজের জাতকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হয়ত তা নয়, হয়ত সব ধর্ম্মে সব জাতিতেই কিছু না কিছু শিখিবার আছে

ভারতের বাহিরে ভারতবাসী।

মানুষ মাত্রেই দেশে বসিয়া কাজ করিতে ভালবাসে। কিন্তু ঠেকা না পড়িলে কেহ জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহে না। তবে যখন দেশে খাইবার, পড়িবার অসুবিধা হয়,

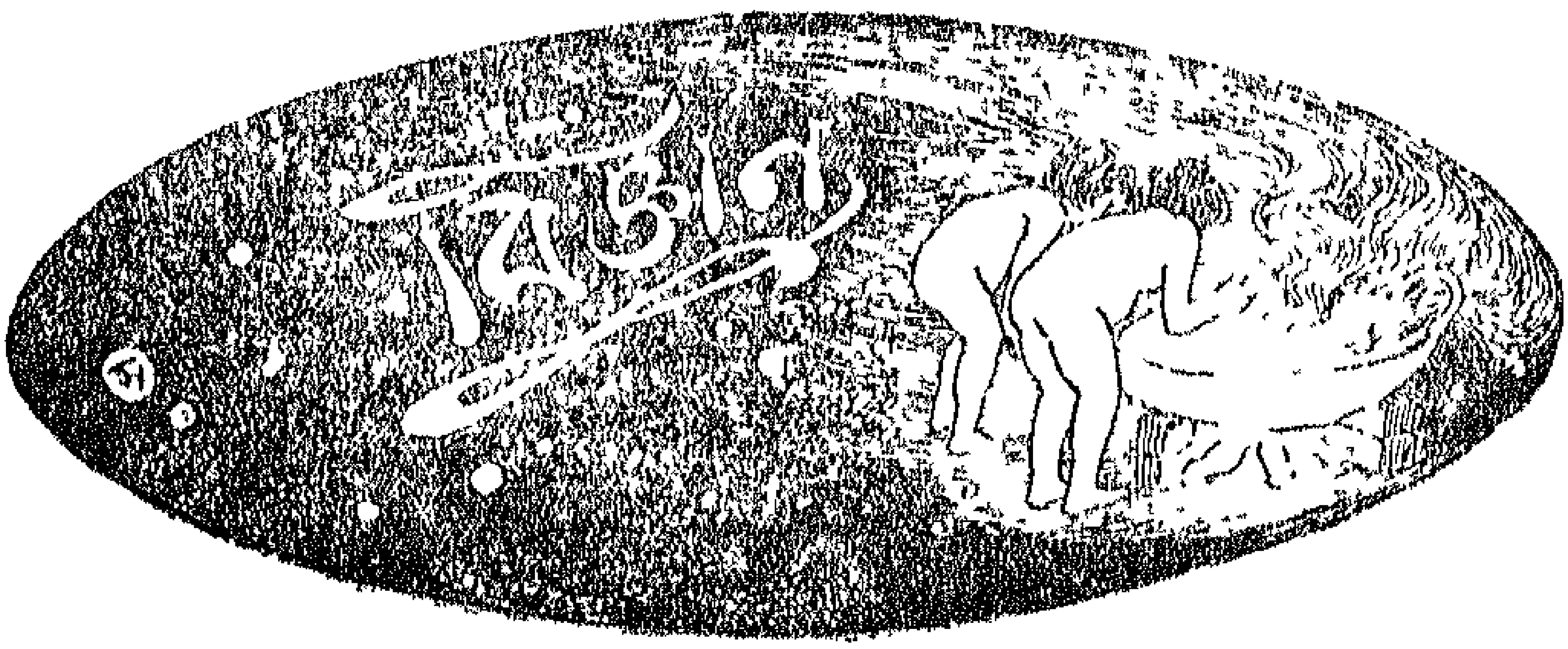
কিংবা বিদেশে প্রচুর রোজগারের সম্ভাবনা দেখে তখনই মানুষ বিদেশে যায়। আমাদের ভারতবর্ষেও যে সকল বিদেশী বাস করে সাধারণতঃ তাহাদেরও আসিবার এই দুই কারণ, হয় অন্ন বস্ত্রের অভাব, নয় অর্থের সন্ধান। যদিও ভারতবর্ষের অর্থে ভাগ বসাইতেই তাহাদের আগমন, তথাপি ভারতবাসী কোন দিনই তাহাদের হিংসার চক্ষে দেখে নাই। ভারতবাসী অতিথি সৎকার জানে।

এমনি অনেক ভারতবাসীও বিদেশে অর্থের সন্ধানে যাইয়া থাকে। তাহারা নিজের দেশে বসিয়া বিদেশীদের যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে, বিদেশীরাও নিজেদের দেশে বসিয়া তাহাদিগকে সেইরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিবে এ আশা করা অন্যায় নহে। কিন্তু কার্যে দেখা যায় বিদেশীরা এই সব ভারতবাসীদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখে না, বরং নিজেদের অধিকারে পাইয়া সময় অসময়ে তাহাদিগকে অপদস্থ করিয়া থাকে।

ভারতবাসীদিগকে জগতের অন্যান্য দেশের লোক এইরূপ যে অবহেলা করে তাহার একটি কারণ হইতেছে, ভারতবাসীরা অল্পেই সন্তুষ্ট, অতি অল্প খরচাতেই ভারতের লোক জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশের লোক ভারতবাসীর মত সাদাসিদে ধরণে থাকিতে পারে না। ভারতবাসীর অভাব খুব কম বলিয়াই তাহারা খুব অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে পারে, অন্যান্য দেশের লোক তাহা পারে না। কাজেই ঐ সব দেশের লোক চটিয়া যাইয়া ভারতের লোকদের উপর অত্যাচার করে। তাহারা বলে, তোমরা অসভ্য, অসভ্যের মত থাক, তোমরা আমাদের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিবার, থাকিবার যোগ্য নও।

ঐ সকল বিদেশী লোক যাহাই বলুক না কেন তোমরা কিন্তু মনে করিও না, তোমাদের সভ্যতা এতই হেয়। বরং বলিতে হইলে বলিতে হয়—আমাদের সভ্যতা অনেক উন্নত। আমরা যে এখনও সাদাসিদে রকমে থাকিতে পারি, বিলাসিতা আসিয়া যে এখনও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই এ ত আমাদের অতি সৌভাগ্যের কথা। তোমরা জানিয়া রাখিও অর্থ কিংবা বিলাসিতাই সভ্যতার মাপকাটি নহে, অর্থ কিংবা বিলাসের দ্বারা মনুষ্যত্বের পরিচয় হয় না। বরং ত্যাগের দ্বারাই বুঝা যায়, কাহার মনুষ্যত্ব কত বেশী।

ভারতের সভ্যতার সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার যখন এইরূপ একটা সংঘর্ষ বাধিয়াছে তখন আমরা যেন মনে না করি আমাদিগকে বিদেশীয় হাবভাব অনুকরণ করিতে হইবে। যখন দুই সভ্যতায় এইরূপ সংঘর্ষ বাধিয়াছে, তখন আমরা আমাদের দেশের আচার ব্যবহার, কিছুতেই ভুলিব না, সময় আসিলে যে সব বিদেশী আমাদিগের দেশের লোকদিগের উপর অবহেলা করিতেছে, তাহারাই আবার তাহাদিগকে প্রীতির চক্ষে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে।



রণ্ট্‌জেন লাইটের কাণ্ড।

"রণ্ট্‌জেন লাইট" অথবা "এক্স্‌রের" কল্যাণে বিজ্ঞান-জগতে দিন দিন কত অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে তার ইয়ত্তা নাই। আগে দেহের ভিতরে বন্দুকের গুলি ঢুকিলে সেই গুলি বাহির করিবার জন্য অস্ত্র করিতে অনেক বিপদের আশঙ্কা থাকিত; কারণ গুলিটা কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা সঠিক জানা যাইত না। তার এখন ত রণ্ট্‌জেন আলো প্রয়োগ করিয়া গুলির ঘরবাড়ী সব পরিষ্কার দেখা যায়। কাজেই অস্ত্র করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। এক সেকেণ্ডের একশ ভাগের একভাগ সময়ে মানুষের হৃদয়ের "এক্স্‌রে ফটোগ্রাফ" নেওয়া যায়। এমন কি বিশেষ রকম জোরালো এক্স্‌রে যন্ত্র ব্যবহার করিলে তিন ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের ভিতর দিয়া পর্য্যন্ত দেখা যায় এক একটা কামান মাঝে মাঝে বেশ গোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকে সাজসরঞ্জাম সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া তাহাকে ছাড়া হইল, অথচ সে রহিল চুপচাপ, ভিতরের শেলটা কিছুতেই ঠিকমত ছুটিয়া বাহির হইল না কেন এরকম হয় তাহা দেখিতে হইলে শেলের ভিতর হইতে "ফিউজ" বাহির করিয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু উহা করা ভয়ানক বিপজ্জনক। এক্স্‌রে এই কাজটাকে খুব সোজা করিয়া দিতে পারে। এক্স্‌রে যন্ত্র বসাইয়া লইলে ফিউজটা শেলের মধ্যে রাখিয়াই পরীক্ষা করা যায় এই উপায়ে জর্ম্মানদের তৈয়ারী নতুন রকমের ফিউজের চমৎকার ফটো তুলিয়া লওয়া যাইত। এক্স্‌রে ফটোগ্রাফী সব-চেয়ে

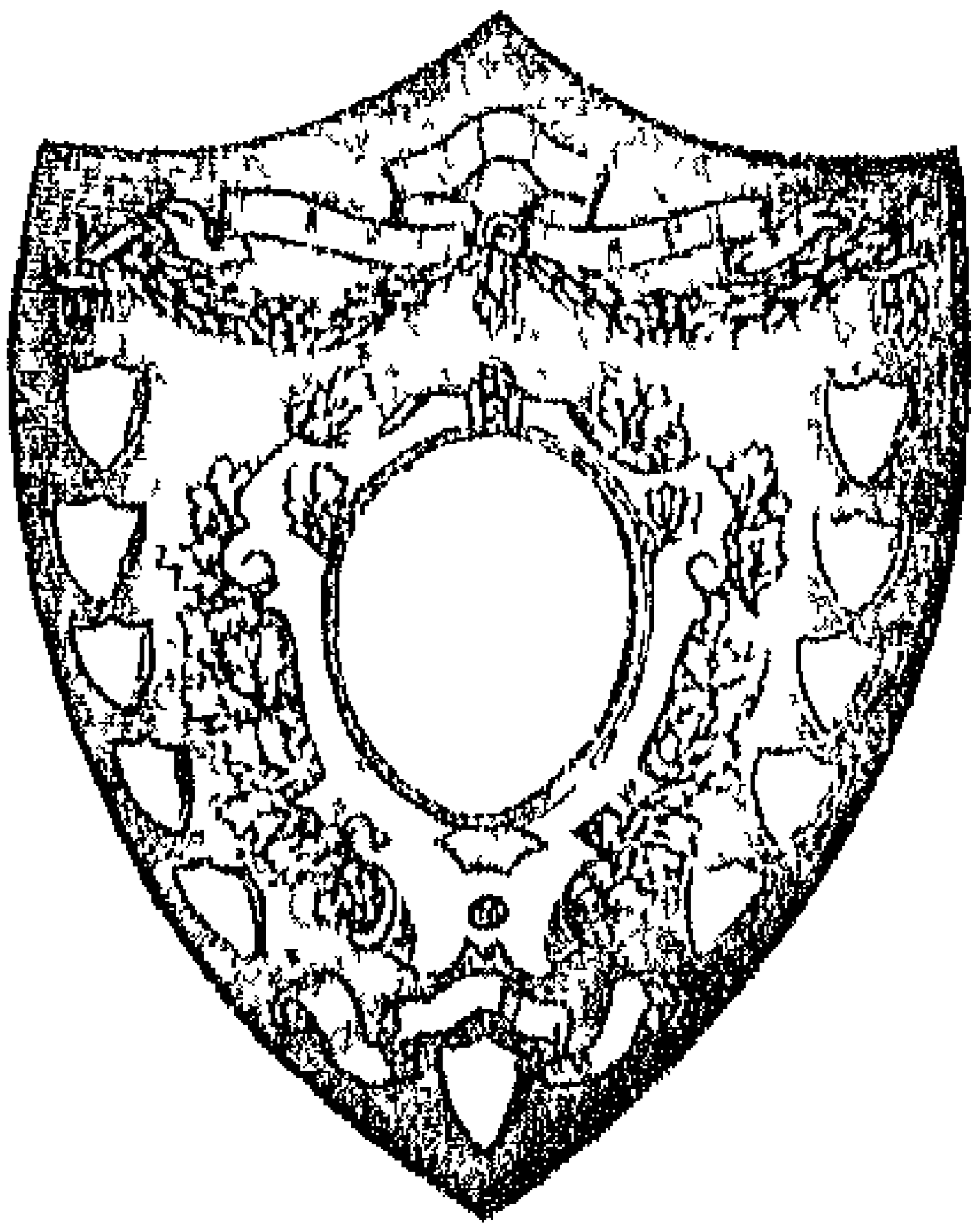
কাজে আসিবে যন্ত্রবিজ্ঞান শিখাইবার বেলায়। মনে করুন যে রেলগাড়ীর এঞ্জিন যখন পুরাদমে চলিতেছে তখন তার ভিতরের কলকব্জা কোনটা কি ভাবে থাকে তাহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে। আজকাল তো সব কলেজেই এসব শেখান হইয়া থাকে ছবি ইত্যাদির সাহায্যে। কিন্তু এক্সরেজের সাহায্য নিতে পারিলে ছাত্রেরা খালি চোখেই এঞ্জিনটাকে চলন্ত অবস্থায় দেখিয়াই শিখিতে পারিবে। আজকাল ভদ্রবেশী চোরদেরও কাপড়চোপড় খানাতল্লাসী না করিয়া কেবল মাত্র এক্সরে ফটোগ্রাফের দ্বারা বমাল ধরা হইতেছে। কেউ কেউ জুতার সুখতলার মধ্যে কিছু লুকাইয়া রাখিলেও আর নিস্তার নাই, এক্সরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়িবেই

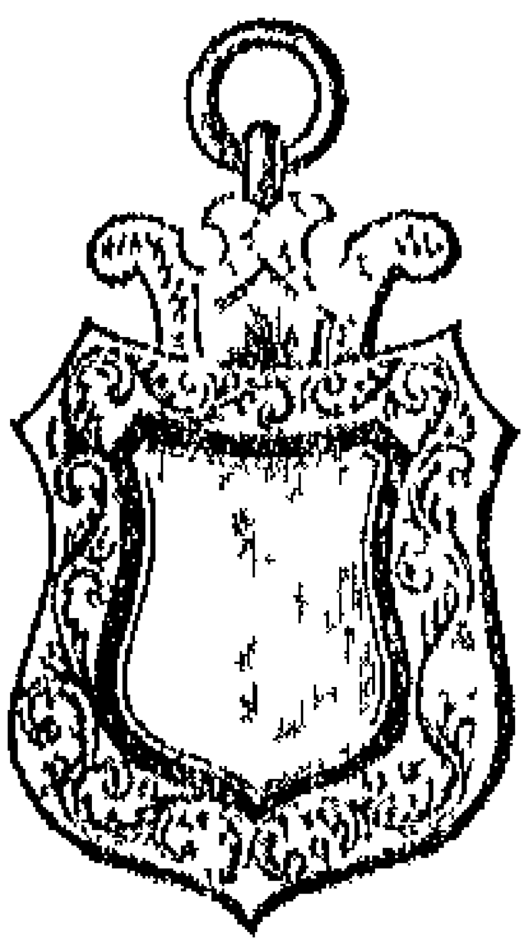
শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন রায়

সঙ্কলন—প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

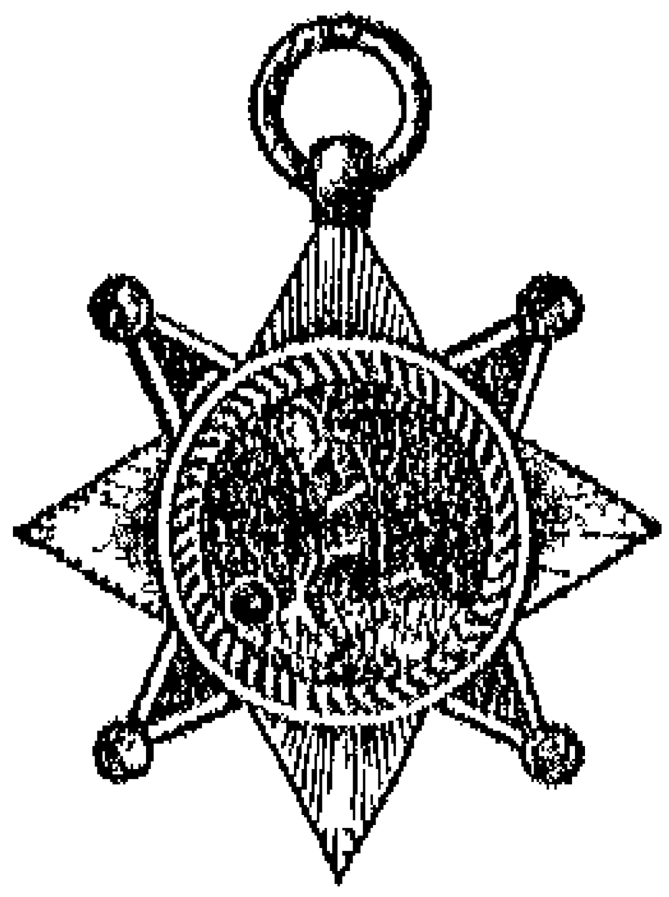
শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

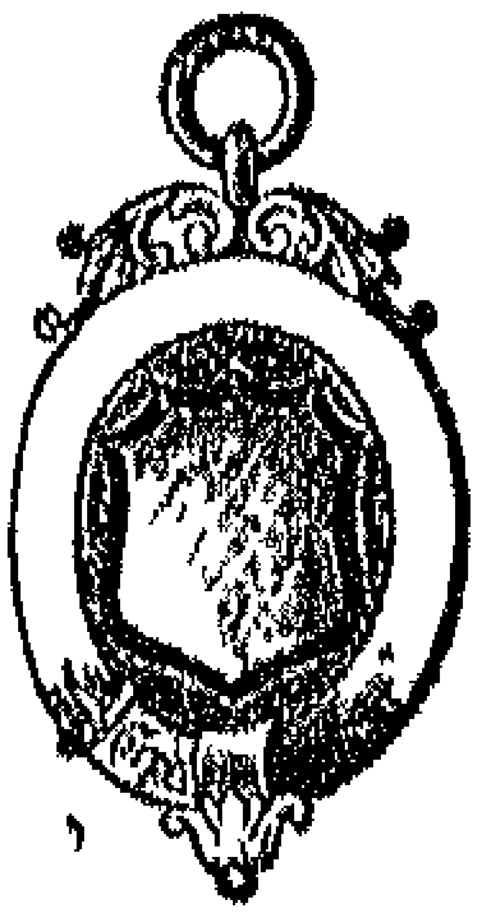




No. 31A Rs. 4-4



No 70A Rs 27-8.



No. 80A Rs 4.

ছেলে মেয়েদের উপযোগী কয়েকখানি বই

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মিত্র, বি, এস, সি (লণ্ডন), এফ, আর, এস, আই, (লণ্ডন) প্রণীত।

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে

বিজ্ঞান মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা কতটা বৃদ্ধি করিয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর আগে জগৎ কি ছিল তা আমরা ভাবিতেও পারিনা। বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে যত রকম গল্প প্রচলিত আছে তাহার সবগুলি 'বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে' আছে। অসংখ্য ছবি। ছেলে মেয়েদের পাঠোপযোগী এমন সুন্দর বই শীঘ্র প্রকাশিত হয় নাই। পুরু এণ্টিক রঙ বেরঙের কালিতে ছাপা, ইমিটেসন মরোক্কো বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

ঘুমের দেশে

রূপকথার বই—পাতায় পাতায় ছবি। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ও

বৈশাখী

গল্পের বই—অসংখ্য ছবি। সুন্দর বাঁধাই ও কাগজ। মূল্য ১।০ মাত্র

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এ প্রণীত।

রোমের গল্প

রোমের চিরনূতন ঐতিহাসিক গল্প। মূল্য ৵০ মাত্র।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত

ঠানদির থলে

রূপকথা—অনেক ছবি আছে। মূল্য ৵০ মাত্র।

ছেলেমেয়েদের একখানি বার্ষিক পত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

পার্ব্বণী

১৩২৭ সালের

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর	
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	
শ্রীমতী সীতাদেবী	প্রভৃতি 'গল্প' লিখিয়াছেন
শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু	'স্বাস্থ্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	'ভ্রমণ কাহিনী' লিখিয়াছেন
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত	
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	'কবিতা' লিখিয়াছেন
শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র	
সম্পাদক	প্রভৃতি 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের

দুইখানি তিন রঙা ছবি, ও অনেক এক রঙা ছবি আছে।

মূল্য—১৸৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শিশির পাবলিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।



এরূপ গন্ধদ্রব্য অতি অল্পই আছে যাহা
ামাদের দেলখোসের মত সৌরভের স্থায়ীত্ব
মাধুর্য্যের জন্য 'স্মৃতিতে জড়ায়ে থাকে, চির-
ন তরে।' যে সকল সুগন্ধি সর্ব্বোৎকৃষ্ট
ামে পরিচিত হই। বাজারে অনেক অধিক
ল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে গুণের তুলনায়
লখোসের সহিত তাহাদের আকাশ-পাতাল
প্রভেদ

সুমিষ্ট সৌরভের স্থায়ীত্বে এবং ব্যবহারের পর ইহার সৌরভ মাধুর্য্যের
প্রভাব যে ধারণা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয়,—তাহাই দেলখোসের
শেষত্ব দেলখোসের সৌরভ এরূপ মন-প্রাণমুগ্ধকর যে, তাহাকে
সুমের 'সুরভিশ্বাস বলিলে অত্যুক্তি হয় ন ইহার সৌরভের স্থায়ীত্বে
াপনি মুগ্ধ ও ইহার পক্ষপাতী হইবেন ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন
, দেলখোস উৎসবে ও আনন্দে উপহার দিয়াও সুখ উপহার পাইয়াও
খ

দেলখোস (ষ্টাণ্ডার্ড)—১০ দেলখোস (রয়েল)—৩০
দেলখোস (আতরিন) ১০

এইচ বসু, পারফিউমার, ৬১, বহুবাজার, কলিকাতা

কেশের জন্য একমাত্র তৈল

H.B.

আমাদের দেশ



সম্পাদক—

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ | শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস সি | প্রতি সংখ্যা
সডাক ষাণ্মাসিক মূল্য ১০ | শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ | ১০



১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩২৮

পুরুষ।

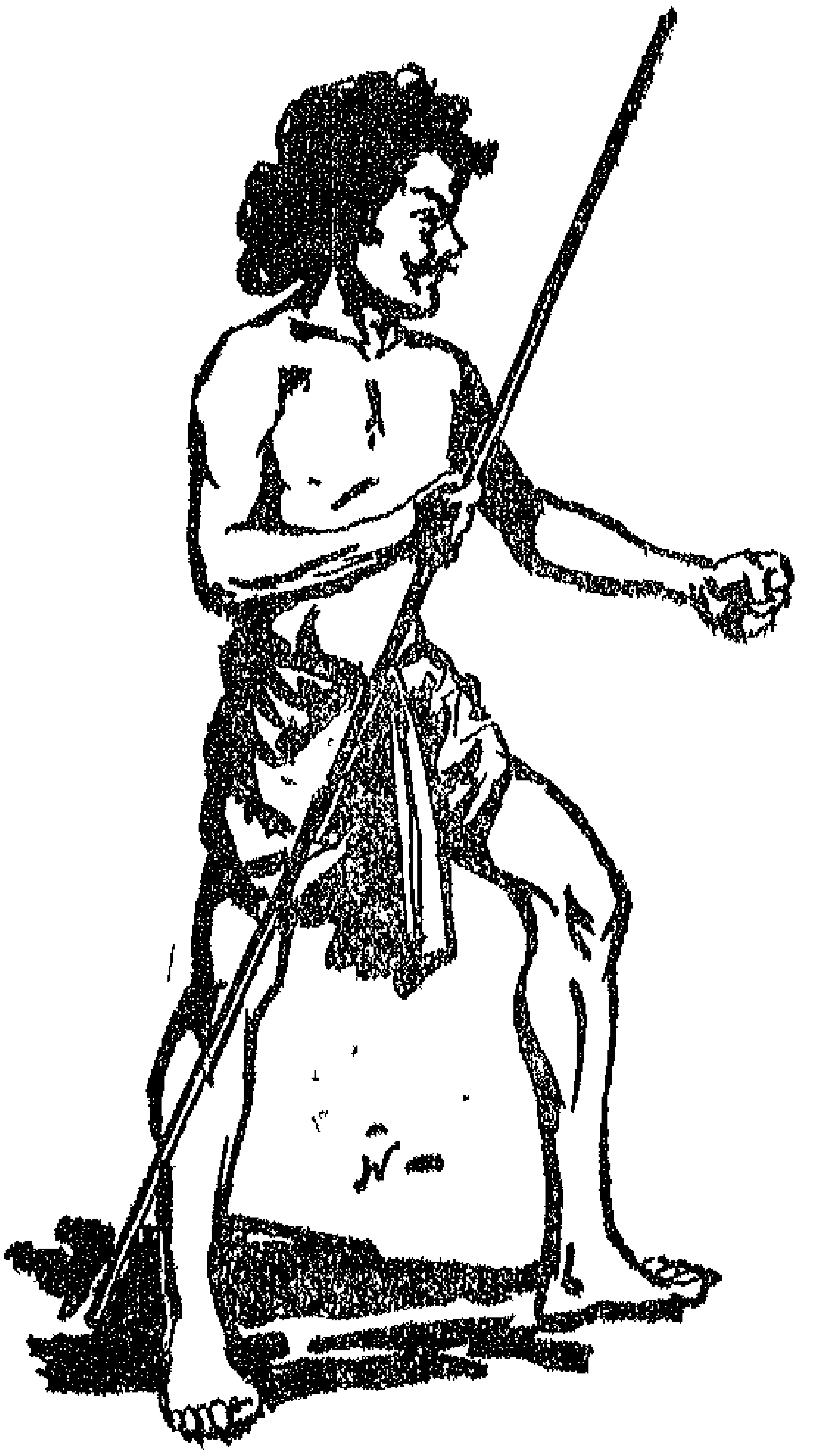


জোলার বাড়ী পড়্লো ডাকাত,
জোলার হল ভয়,—
কাঁপতে কাঁপ্তে জোলা ডেকে
জোলানীকে কয় —

"বাইরে গিয়ে, ডাক্ না মাগী
পাড়ার পুরুষ যত
দেখ্লে, ভয়ে ডাকাতগুলো
খাবে থতমত।

পালিয়ে যাবে এক নিমিষে
বাঁচবে মোদের প্রাণ।
ত্বরায় গিয়ে, পাড়া থেকে
পুরুষ ডেকে আন"

জোলানী তো উঠ্লো রেগে
চক্ষু করে লাল



হাত নেড়ে তার সখের কাছে
বল্লে দিয়ে গাল —

"ঘরেই বুঝি মরদ্দবাজি,
তুই কি পুরুষ ন'স ?
আমি যাব ডাকতে তাদের—
কোন্ মুখে তুই ক'স "

বল্লে জোলা ও র কথাতে
'হ্যা সে পুরুষ বটে'
উচিয়ে তখন মস্ত লাঠি
বেরিয়ে এলো ছুটে ।

লাঠি হাতে পুরুষ দেখে
ডাকাত পেলো ভয় ।
কাযের বেলা —এমন পুরুষ
ক'জন বল হয় ?



বুদ্ধির জয়

১

কর্ণাটরাজের সভাপণ্ডিতের জ্বালায় দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি তেমন ছিল না বটে, কিন্তু খোসামোদের শক্তি এমন ছিল যে তার জোরে তিনি আর কোন পণ্ডিতকে সেখানে ঘেঁসিতে দিতেন না।

রাজা যে না বুঝিতেন—এমন নয়, কিন্তু খোসামোদের এমন নেশা যে তিনি বশ না হইয়া পারিতেন না। আর রাজাকে মুঠার ভিতরে পাইয়া সভাপণ্ডিতও যা খুসী তা করিতেন। ক্রমে এমন হইল যে ব্রাহ্মণদের অন্ন করিয়া খাওয়া বন্ধ হয়।



কর্ণাট রাজের সভাপণ্ডিত।

সভাপণ্ডিত বলিতেন যে তাঁর জোড়া বিদ্বান বুদ্ধিমান—তাঁর সমান পণ্ডিত পৃথিবীতেই আর কেউ নাই! রাজা অবশ্য সে কথা বিশ্বাস করিতেন না, মনে মনে ভাবিতেন—আমার রাজ্য হইতে মা সরস্বতী কি চলিয়া গিয়াছেন, ইহাকে হারাইতে পারে এমন কি কেউ নাই? যে ইহার মিথ্যা অহঙ্কার ভাঙ্গিতে পারিবে, তাকে আমি একটা তালুক পুরস্কার দিব।

কিন্তু তেমন পণ্ডিত কেউ মিলিত না, সভাপণ্ডিতকে লোকে ঠিক বাঘ-ভালুকের মত

ভয় করিত বলিয়া, কোন যথার্থ পণ্ডিত সেদিকে ঘেঁসিতে চাহিতেন না। এমন কি, রাজার যে ভাঁড়—সেও খোসামোদী-বিদ্যায় সভাপণ্ডিতের কাছে হারিয়া গিয়া চাকরী যাইবার ভয়ে, রাজার চেয়ে তাঁরই বেশী মন জোগাইয়া চলিত। দেখিয়া শুনিয়া ক্রমেই রাজার মনে ধারণা হইতেছিল যে পৃথিবী হইতে যথার্থই বিদ্যার গৌরব লোপ পাইতে বসিয়াছে—দেশে আর তেমন বিদ্বান-বুদ্ধিমান পণ্ডিত জন্মায় না। এমন সময়ে একদিন এক কাণ্ড ঘটিল।

২

সকাল বেলায় রাজা সভা করিয়া বসিয়াছেন। মন্ত্রী, সভাসদ, পাত্র-মিত্র চারিদিকে ভিড় করিয়া ঘিরিয়াছে। সভাপণ্ডিত মহাশয় নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি জাহির করিয়া এমন সব শ্লোক আওড়াইতেছেন যে স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুরও তার মানে করিতে হারিয়া যান। কেহই বুঝিতেছে না, অথচ বাহবার উপর বাহবা দিয়া তাঁহাকে ফুলাইয়া দিতেছে। রাজা মনে মনে হাসিলেও মূর্খদের লইয়া বেশ একটু আমোদ বোধ করিতেছেন। এমন সময় সভার দোরগোড়ায় একটা গোলমাল উঠিল। প্রধান রক্ষী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—

"মহারাজ, এক অতি-বুড়ো বামুন এসেছে—একেবারে হাড়গোড় ভাঙা দ,—বলছে, সে আপনার ছোট মাসীর ছেলে—আপনার দাদা।"

সভাপণ্ডিত মহাশয়ের চোখ কপালে উঠিল, ভাবিলেন কোন চতুর ব্রাহ্মণ ছল করিয়া রাজার কাছে টাকা আদায় করিতে আসিয়াছে। হিংসায় জ্বলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি আদেশ করিলেন—"এখুনি গলা টিপে দূর করে দাও, ব্যাটা জোচ্চোর, আমরা থাকতে মহারাজকে ঠকাতে এসেছে, ব্যাটার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়?"

রক্ষী ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, কিছুতে যায় না, পাগল ভেবে আমরা তাড়াতে ঢের চেষ্টা করেছি, কেবল—বামুন বলে—গায়ে হাত তুলতে পারিনি। বলে যে মহারাজকে গিয়ে বল্লেই চিনতে পারবেন, আর যদি কেউ সভায় যথার্থ পণ্ডিত থাকেন তিনিও বিচার করে আমার কথা মিথ্যা বলতে পারবেন না।"

সভাপণ্ডিত মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বৃদ্ধ মন্ত্রীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"কি হে মন্ত্রী, তুমি তো মহারাজের ঠাকুরদাদার আমল থেকে আছ, মহারাজের কেউ মাসী আছেন বলে শুনেছ কি?"

"আজ্ঞে না।"

সভাসদেরাও সকলে এক বাক্যে বলিল,—"মহারাজের মাসী আছেন—একথা তো এতদিন কেউ কখন শুনিনি।"

"তবে বল দেখি—ব্যাটা জোচ্চোর নয়? আবার পণ্ডিতি ফলাতে চায়! তোমাদের বামুন—দিগে যা। ব্যাটাকে ঘাড় ধরে দিয়ে দূর করে।"

"বাপরে, বামুন যে—সর্ব্বনাশ হবে।"

বলিয়া রক্ষী ভয়ে ভয়ে রাজার মুখের পানে চাহিল। রাজাও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন—একটু ভাবিয়া বলিলেন—

"আপনার মত পণ্ডিতের চোখে ধুলো দিয়ে তো আর কেউ এসে আমাকে ঠকিয়ে যেতে পারবে না, দেখা যাক্‌না—ব্যাপারখানা কি?"

বলিয়া, রক্ষীকে আদেশ করিলেন—"নিয়ে এস ব্রাহ্মণকে, সাবধান—অসম্মান করোনা। হাজার হোক ব্রাহ্মণ, তার উপর অতিথি, অতিথির অসম্মান করলে ভগবান বিরূপ হন।"

৩



ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজসভায় দাঁড়াইল

ব্রাহ্মণ যখন রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। বয়স এত বেশী যে গণিয়া ঠিক করা কঠিন। সর্ব্বাঙ্গের চামড়া লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—দৃষ্টিশক্তি আছে বলিয়া বোধ হয়না। একটা লাঠির উপরে ভর দিয়া এমন ভাবে নুইয়া পড়িয়াছে যে একটা গোলাকার মাংসের তাল ভিন্ন তাহাকে মানুষ বলিয়া বুঝিবার জো নাই।

ব্রাহ্মণ ফোক্‌লা মুখে একগাল হাসিয়া বলিল—

"জয় হোক আমার রাজা ভাইটি! এ জীবনে যে কখনো তোমাকে দেখ্‌বো—সে আশা ছিল না, প্রহরীরা তো কেউ চিনতেই পারে না—পাগল ভেবে আমাকে দূর করে দিতে চায়—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—"

সভাপণ্ডিত মহাশয় ব্যাজার হইয়া ধমক দিয়া বলিলেন—

"কি বলবার আছে বলে শীগ্‌গির বিদায় হও, ও ফোক্‌লা দাঁতের হাসি দেখবার আমাদের সময় নেই।"

বুড়ো তাঁহার পানে ফিরিয়া জোর গলায় বলিল—

"কি আমি তোমাদের রাজার দাদা—তাকে চোখ রাঙিয়ে কথা কও? জান আমারও দিন ছিল, তখন আমার সুন্দর বাড়ীখানার দিকে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌তো। সে বাড়ীতে যে আলো জ্বল্‌তো সে আলোর দিকে চেয়ে তোমার মত কত পণ্ডিতের চোখ ঝল্‌সে গেছে। আজ সে বাড়ীখানা পুরাণো হয়ে পড়েছে—খর খর করে কাঁপছে, তার সে আলো নিবে গেছে বলে তুমি কষ্ট কইছো ?"

সভাপণ্ডিত ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"বটে, তুমি ত বড় লোক ছিলে, অমন বাড়ী-ঘর ছিল,—আর তোমার ছিল কি !"

বামুনের রাগ—খড়ের আগুনের মত, যেমন জ্বলিয়া উঠে পরক্ষণেই নিবিয়া যায়। সভাপণ্ডিতের কথায় ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া তোষামোদ করিয়া বলিল—"কি না ছিল তাই জিজ্ঞাসা কর, আরে ভাই সে সব আর কি পরিচয় দেব ?"

"তবু শুনি ?"

"আর শুনবে কি, আমার যণ্ডা-গুণ্ডা পাইকই ছিল—দু একটা নয়—একেবারে বত্রিশ জন, যাকে যখন পিষতে ইচ্ছা হত তারা অমনি চোখের পলকে ধরে তার হাড় পর্য্যন্ত গুঁড়িয়ে দিত। দু' ব্যাটা এমন প্রভুভক্ত পেয়াদা ছিল তারা দিনরাত ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুনিয়ার সকল খবর এনে দিত। এখন সে পাইক-পেয়াদা সবাই গেছে, আর কোন খবরও পাই না—কাউকে পিষতেও পারি না। দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরা আগে দূর থেকেই ভাল মন্দ সব চিনিয়ে দিতেন, এখন আমার দশা দেখে—কাছে থেকেও এমন অলস হয়ে পড়েছেন যে আর কিছু করতে চান না। কেবল দু' ব্যাটা খণ্ডা বেয়ারা ছিল, তারা আমায় এত ভালবাসত যে গাড়ী-পাল্কিতে চড়তে দিতনা, নিজেরাই বুক ফুলিয়ে দিনরাত আমায় কাঁধে বয়ে বেড়াত। সেই দু'জনই কেবল মায়ায় পড়ে আজও আমায় ছাড়তে পারেনি। কিন্তু বেচারারা এমন রোগা—দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে আর বইতে পারে না। তাই আর একটা ঠিকে বেয়ারা তাদের সাহায্য করবার জন্য দায়ে পড়ে বাহাল করতে হয়েছে। সেই আমি—আজ এই দশা রে ভাই ? তাই ভাবলুম যে আমার নিজের ভাই যখন রাজা হয়েছে—তখন একবার দেখাটা করে আসি—যদি একটা ছিল্লে লাগিয়ে দেয়— কত মূর্খকে তো পুষছে ?"

সভাপণ্ডিত রাগে আগুন হইয়া কহিলেন,—"তাই বুঝি জোচ্চুরি করে রাজার ভাই সেজে কায হাসিল করতে এয়েছ ! আমরা ওঁর বাপ-ঠাকুরদাদার আমল থেকে রয়েছি—কেউ কখন শুনলুম না—আজ এলেন মহারাজের মাসীর ছেলে !"

ব্রাহ্মণ তাঁহার কথায় আর কাণ না দিয়া রাজাকে বলিল,—

"কি ভাই, মূর্খের সঙ্গে থেকে থেকে তুমিও কি ওই রকম হয়ে গেছ নাকি—নিজের ভাইকে চিনতে পারলে না?"

এবার সকলেই তাহাকে পাগল মনে করিল। রাজা মাথা নাড়িয়া পথ দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন,—"এই পথ আগাধা দিলুম ভাই—এর বেশী আমার আর সাধ্য নেই।"

কিন্তু ব্রাহ্মণ তবুও নড়িল না, দুঃখ করিয়া বলিল—

"তা আগেই বুঝেছিলুম ভাই, আমি যখন এসেছি তখন তোমার রাজার ভাণ্ডারও খালি হয়ে যাবে। তা এক কাজ কর না কেন ভাই—লঙ্কায় তো সোনার ছড়াছড়ি, সেখানে গিয়ে বস্তা পুরে পুরে নিয়ে এস না কেন?"

এবার সকলেই হাসিয়া উঠিল। সভাপণ্ডিত কহিলেন—

"এঁ্যা তুমি বল কি? বুড়ো বামন হয়ে অধর্ম্ম করতে পরামর্শ দিচ্ছ? লঙ্কা কোথায়—জান কি, সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজে করে যেতে হয়। হিন্দু হয়ে জাহাজে চড়ে জাত দিতে যাবে নাকি?"

"আঃ মূর্খ।"

বলিয়া, এবার বেশ জোর গলায় কহিল—

'না, জাহাজে যাবার দরকার নেই। ওহে রাজাভাই, তুমি আমার পিছনে পিছনে এস, আমি—সমুদ্রের উপরে একটা পথ করে দিয়ে আগে আগে যাব। যত ইচ্ছে—গাড়ী বোঝাই করে সোনা আনতে পারবে।"

বুড়াকে এবার বদ্ধ পাগল ভাবিয়া সকলেই তাড়াইয়া দিবার জন্য হৈ হৈ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ নিরাশভাবে সভার চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া—বিদায় হইবার জন্য পা বাড়াইল।

রাজার ভাঁড় এতক্ষণ এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—একটা কথাও বলে নাই। সে এতক্ষণ পরে হঠাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া আসিয়া—বুড়ার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—

"দোহাই বড় মহারাজ—যাবেন না, আমি আপনাকে চিনেছি আপনি সত্যই মহারাজের মায়ের ছেলে বটে।"

সভাশুদ্ধ লোক অবাক—। ভাঁড় তখন রাজার সম্মুখে আসিয়া যোড়হাতে কহিল—

"মহারাজ, নিজের ভাইকে অপমান করবেন না, উনি সত্যই আপনার দাদা, আমি চিনেছি।"

বলিয়া ভাঁড় পরিচয় জানাইয়া দিল।

"সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য—দুটী বোন, মহারাজ বড়র ছেলে, আর উনি ছোট বোন 'দুর্ভাগ্যের' সন্তান। উনি যা যা বলেছেন—সকল সত্য কথাগুলি মিলিয়ে দেখুন।"

সকলেই চমকিয়া উঠিল—কথা তো মিথ্যা নয়! সভাপণ্ডিত অত্যন্ত ম্লানমুখে বলিলেন—"তুমিই মিলিয়ে দেও।"

"শুনুন, উনি যে বাড়ীর কথা বল্লেন—সে ওঁর যৌবনের দেহ, বত্রিশজন পাইক—বত্রিশটী দাঁত, পেয়াদা—কাণ, বন্ধু দুটী—দু চোখ, বেহারা দু'জন—দুটী পা, আর এখনকার ঠিকে বেহারা—ওই লাঠিগাছটি! আর কি বেশী বলবার দরকার আছে? কথায় বলে 'অভাগা যে দিকে চায়—সাগর শুকায়ে যায়' ভাগ্যহীনের দৃষ্টিতেই যখন এমন হয়, তখন সে আগে আগে গেলে সমুদ্র শুকিয়ে ডাঙা-পথ হবে না কেন?"

রাজার চোখ খুলিল—বড় চিনিলেন সেই দিন হইতে সভাপণ্ডিতের প্রতাপ গেল—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমাদর ও সম্মান আবার দিন দিন বাড়িতে লাগিল

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রণিপাত

সবাই বলে—তুমিই নাকি এই জগতের স্বামী—
সকল স্থানে বিরাজ কর সদাই দিবা-যামি।
কেউ জানে না—কেমনতর, কোথায় কখন থাক।
তবু নাকি ব্রহ্মাণ্ডকে চোখে চোখে রাখ।
আঁধার-আলোয়, মন্দে ভালোয়, চেতন কিবা জড়ে,
সমান ভাবে স্নেহ তোমার সবার উপর ঝরে।
স্থলে জলে—শূন্যদেশে বাদ পড়েনা কেউ।
ভাসায় সবায় তোমার স্নেহ পারাবারের ঢেউ।
নাই তোমার নাম—জাত্—ঠিকানা, যে যা বলে ডাকে—
তাতেই তুষ্ট—মিষ্ট হেসে লও হে কোলে তাকে
সেই ভরসায় ডাকি তোমায়, ওগো ধরার নাথ,
দয়া করে ধরার শিশুর লওগো প্রণিপাত।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী



পশু-পাখীর প্রাণের টান

বাড়ীর পোষা কুকুরের বাচ্চা হ'লে সে কেমন রাগী হয়ে যায় দেখেছ কি? গায়ে হাত বুলালে সে খুব খুসী হবে—লেজ নাড়বে, কিন্তু বাচ্চার গায়ে হাত দিতে গেলেই ক্ষেপে উঠবে। বাড়ীর যে ছেলের সঙ্গে তার খুব বেশী ভাব, কিম্বা যে চাকর তাকে রোজ খাবার দেয়, সে হয় তো দু'চারবার কুকুরের গায়ে হাত বুলায়ে, আস্তে আস্তে বাচ্চাকেও ধর্‌তে পারে —কিন্তু অন্য কেউ ধরলেই বিপদ।

পশু পাখীর মধ্যে নিজের বাচ্চার জন্য এ রকম প্রাণের টান খুবই বেশী দেখা যায়,—এমন কি, মানুষের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে পশু পাখীর ভালবাসা কোন অংশে কম হয় না। নিতান্ত নিরীহ যে ঘুঘু পাখী, সেও নিজের ডিম আর বাচ্চা'কে রক্ষা করবার সময় হিংস্রভাবে নখ আর ঠোঁটের ব্যবহার করে। অনেক সময় বাচ্চা কিম্বা ডিমকে রক্ষা করার জন্য পশু পাখীরা আশ্চর্য্য বুদ্ধি খাটায়।

উটপাখী সিংহের হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করিবার জন্য যে বুদ্ধি খাটায়, তার কথা শুনলে বড়ই আশ্চর্য্য মনে হবে। সিংহ দৌড়ে বড় উটপাখীর সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না; কিন্তু বাচ্চাদের তো আর দৌড়বার ক্ষমতা নাই; সে জন্য বড় উটপাখীরা করে কি, সিংহ আস্‌ছে দেখ্‌লেই নিজেরা একটু এগিয়ে যায়। সিংহও গুঁড়ি মেরে তাদের পিছন পিছন চলে;—তারাও এইভাবে নানা রাস্তা ঘুরিয়ে সিংহকে বাসা থেকে অনেক দূরে এনে পথ ভুলিয়ে দেয়; তারপর টেনে দৌড় মারে। সিংহ বোকা ব'নে শেষটায় ঘরে চ'লে যায়।

বাঘ সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদেরও বাচ্চার জন্য প্রাণের মায়া ছেড়ে দিতে দেখা গেছে। যদি কেউ তাদের ছানা চুরি করে তো হ'লে তাদের প্রাণে প্রতিশোধের ভাব জেগে ওঠে, আর

ভীষণ রাগের সঙ্গে চোরকে সাজা দেবার জন্য তারা নানা রকমে চেষ্টা করে সিংহের ছানা চুরি ক'রে কত লোক অনেক মাইল পথ চ'লে আসবার পরও সিংহী তাদের আক্রমণ করেছে ;—এতদূর সে লুকিয়ে পিছন পিছন এসেছে

হাতীর বাচ্ছাকে হাতী যেমন যত্ন করে, এমন কোন জন্তুতে পারে কিনা সন্দেহ নিজের যদি গুরুতর আঘাত লাগে কিম্বা অসুখ করে, তা' হ'লেও সে নিজের কথা ভুলে গিয়ে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাচ্ছার যত্ন করবে

বন-মহিষ নিজের বাচ্চাকে রক্ষা করবার জন্য সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ; কিন্তু যদি বাচ্ছা সঙ্গে না থাকে তা' হ'লে সিংহ দেখলেই সে দৌড় দেবে গণ্ডারও নিজের বাচ্ছাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণ দেবে আফ্রিকার হিপোপটেমাস্ সকলের চেয়ে বেশী হিংস্র হয় যখন সে আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজের বাচ্ছাকে রক্ষা করে

বিশাল দেহ তিমি পর্য্যন্ত তা'র বাচ্ছার জন্য প্রাণ দিতে পারে 'বাচ্ছা হচ্ছেন প্রায় ১২।১৩ হাত লম্বা—দেহ খানিও বিশাল তাকে তিমি-মা সঙ্গে ক'রে প্রায় এক বৎসর আগলিয়ে বেড়ান্ যদি কেউ বাচ্ছাকে বিরক্ত করে তা' হ'লে আর রক্ষা নেই,—তিমি-মা অমনি তাকে ভীষণ রেগে তাড়া করবে যদি বাচ্ছাকে কেউ মেরে ফেলে তবু সেই মরা বাচ্ছাকেই সে তার প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে

শীতের দেশে সিল আর সিন্ধুঘোটক নিজের বাচ্চাদের রক্ষা করবার জন্য দল বেঁধে যুদ্ধ করে নিজে গুরুতর আঘাত পেয়েও বাচ্চাকে তারা বাঁচায় প্রাণ থাকতে বাচ্চার কিছু করতে দেবে না

পশু-পাখীর মধ্যে কেবল যে নিজের বাচ্চার জন্য প্রাণের টান দেখা যায় তা' নয়,—নিজের জাতের জন্যও অনেক সময় টান দেখা যায় ছোট পাখীদের দেখ,—কোন বড় পাখী এসে তাদের আক্রমণ করলে তারা দল বেঁধে কেমন নিজেদের রক্ষা করবে। জঙ্গলে বানরেরা অনেক সময়ে দল বেঁধে থাকে। তাদের একটিকে কোন জন্তুতে আক্রমণ করলে সকলে মিলে জন্তুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করে

হাতী বন্দুকের আওয়াজকে বড় ভয় করে ; কিন্তু, যদি কেউ এক দল হাতীর একটিকে বন্দুকের গুলিতে জখম করে, তখন অন্য হাতীরা বন্দুকের কথা ভুলে গিয়ে তাদের সঙ্গীকে রক্ষা করবে। কয়েক জনে মিলে আহত হাতীকে ঘিরে দাঁড়ায় আর দুজনে তার দুপাশে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধরে তোলে হরিণের মধ্যেও নিজের দলকে রক্ষা করবার চেষ্টা দেখা যায়।

এ তো গেল পশু পক্ষীর নিজের জাতের প্রতি ভালবাসার কথা। মানুষের প্রতি যে তাদের ভালবাসা জন্মায় তাও বোধ হয় তোমরা জান এবং দেখেছ। এই ভালবাসা এক এক সময় এত আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ পায় যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

*   *   *   *   *   *

লণ্ডনের বিখ্যাত "টাওয়ার"এ এক সময় জেলের কয়েদীদের রাখা হ'তো। সেই "টাওয়ার" এর এক কয়েদীর একটা বেড়াল ছিল, সে রোজ তার প্রভুর জন্য একটা পায়রা মেরে নিয়ে আসত। স্কটল্যাণ্ডের এক শিকারীর একটি পোষা বেড়াল ছিল; সে অনেক দিন প্রভুর সঙ্গে শিকারে যেত। শেষটায় বেড়ালটার নিজেরই শিকার ধরার সখ গেল। প্রতিদিন সে তার প্রভুকে একটা ছোট খরগোস কিম্বা তিতির, কিম্বা অন্য পাখী মেরে এনে দিত। এ রকম আরও অনেক প্রভুভক্তির কথা শোনা যায়। কেবল যে মানুষের প্রাণে ভালবাসা, দয়া মায়া আছে, এমন যেন মনে করা উচিত নয়, সামান্য পশুপাখীরাও ভালবাসে; তাদের প্রাণেও দয়ামায়া থাকে।

সঙ্কলন—সন্দেশ

বৈশাখ—১৩২৮।

সুকুমারী

এর আগেই বলেছি, দাদামহাশয়ের বন্ধুদের সঙ্গে সুকুমারীর বড় ভাব ছিল—আত্মীয় হত থেকে থেকে এই বৃদ্ধদের মামুলি রসিকতা ছিল, বুড়ি, আমায় বে করবি; সে তো চটে আগুন হয়ে যেত, ওরি মধ্যে সমজদার বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ কটি ছিলেন, আগুনকে জল করতে হয় কি করে তা তাঁরা জানতেন। তাঁরা বিবাহের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে, ভাবী শিশু বধূটির মনোরঞ্জনের জন্য খেলনা পুতুল বাক্স শাড়ী ও মিষ্টান্ন সওগাত দিতে ভুলতেন না। তাঁদের দরখাস্ত সবদিন মঞ্জুর হত না, যখন রাজী হয়ে যেত, নগদ পাওনা বুঝে পড়ে নিয়ে ভবিষ্যতে কি পাওয়া যাবে, কত শাড়ী কত গহনা কত বড় বড় পুতুল কোলে বসে, পা দুলিয়ে দুলিয়ে—তারি গল্প শুনত। এরি মধ্যে এক বৃদ্ধ ছিলেন, বিয়ের আগ্রহ তাঁরই সবচেয়ে বেশী, কিন্তু তিনি একবারেই কঞ্জুস—তার হাত দিয়ে জল টুকুও

গলত না—পুতুলতে দূরের কথ খেলাপাতি ধরের এক পশু চির নামনও কোন দিন ... ঠাকুর তাঁকে আদরেই মনে ধরত। তবে এই ব্যক্তির উপদ্রব সবচেয়ে ... ছিল, হাত ধরে টানতেন, চুলের ফিতে খসিয়ে দিতেন, মেয়ে সাজ গোজ করলে বলতেন "আজ যে দেখছি বড় বাহার, মন বদল হবে নাকি ?" এম্নি একদিন, বিয়ে করবি বিয়ে করবি, বলে যখন বড্ড ধরে পড়েছেন, মেয়ে ভারী চটেছে যেই বলা, বিয়ে করবি অম্নি, এই যে করছি বলে, তার নধর উদরের উপর এম্নি খিমচে দিলে যে, তিনি উহু উহু করে, ককিয়ে উঠলেন, বিয়ের সাধ সেই দিন হতে মিটল

একজন ছিলেন তার দাদামহাশয়ের কুলপুরোহিত, পূর্ব্ব বঙ্গের ব্রাহ্মণ, কথ গুলি বাঁকা বাঁকা ন তিনের উপর তাঁর ভারী রোক, কত রঙ্গ তা সহ্য হত   এই রঙ্গ তামসা একদিন ভদ্রতার গণ্ডী পেরিয়ে গেল, এবার শোধ তোলা শুধু খিমচি কেটে হয় না, আরো কিছু করা চাই বুড়ো যা সহজে ভুলবে না এ সময়ের মধ্যে যা খুব খবর সেদ, পাকা চুলের মধ্যে কোষ্টায় পাকান দিগুনির মত ছটির তজট বলত   মস্ত কি একটা মানত করে, ব্রাহ্মণ এই জট ধারণ করেছিলেন এ জটার ভারী গৌরব বড় যত্ন ছিল দুষ্ট, মেয়েটি যদি কোন দিন, জটায় টান দিয়ে বলত—ঠাকুরমশায়, একি ছুঁচো তেঁতুল চড়ার মত ঝুলছে, কচ্ কচ্ করে কেটে দি, ব্রাহ্মণ একেবারে আঁতকে উঠে বলতেন বাম্যে—বামে জুযায়না জুযায়না (অর্থাৎ উচিত নয়) সে জানত এ জট গেলে ব্রাহ্মণের অবস্থা হবে মণিহারা ফণীর মত, তাই সে মনস্থ করলে ঐ জটাই কাটতে হবে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর যে যার ঘরে বিশ্রাম করছে, চারিদিকে নিষুতি, পুরোহিত ঠাকুর রামায়ণ পড়তে পড়তে গভীর নিদ্রামগ্ন. কুম্ভকর্ণের বাতাস গায়ে লেগেছে অবসর বুঝে সুকুমারী জট কটি কেটে, রামায়ণের মলাটের উপর দিব্যি করে সাজিয়ে রেখে পলায়ন দিলে বাড়ীর মধ্যে নিরাপদ মনে করলে না, বাগানে একটি ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল। সেখান হইতে চারিদিকের আসা যাওয়া সব দেখা যায়, কিন্তু সহসা ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম বেলা যখন ৪টে তখন ভারী একটা গোলযোগ শোনা যেতে লাগল—ঠাকুর মশায় হায় হায় করছেন, বাড়ীর চাকর দাসীরা বলছে, ওমা একি কাণ্ড; এ কাজ কে করলে ? মুখে যে যাই বলুন, এ কাজ কে করেছে, তা আর বুঝতে কারো বাকী রইল না, কিন্তু সে নাম কেউ উচ্চারণ করলে না, পাছে তার অকল্যাণ হয়. বৃদ্ধ অনেকক্ষণ হায় হায় হায় করে, তার পর গায়ে নামাবলি জড়িয়ে পায়ে খড়ম, মাথায় ছাতা, প্রাণাধিক জটা গঙ্গায় ভাসাতে নবদ্বীপ যাত্রা করলেন কলিকাতা সহরের যেমন নিমতলা

সে গ্রামের নবদ্বার হচ্ছে তাই ... তবে ছেলে ... সুকুমারী যখন দেখলো, ... কেউ ... যা না করছেন, তখন তার ভয় বা তাদ দ হ—... এখনো ... কাপ যাচ্ছে ... বেঁচে গেল। ঠিক বৈকালিক ভলয়ে গেল ... হতে ... এবং ভয় ছিল, হয়ত খুব শ মন হবে কিন্তু যখন দেখলে কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করছে না ... তখন সেও চুপে গেল। কেন যে শ মন হল না সে কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। তবে অনুমান করি অমঙ্গলের ভয়ে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয় নি।

পুতুল নিয়ে খেলতে কোন্ মেয়ে না ভালবাসে, সুকুমারীও বাসত, কিন্তু সে বিষম ভালবাসা—পুতুলকে "ওরে আমার সোনা যাদু চাঁদমণি, পুঁটিমণি ..." বলে ... এত চুমো খেত, এমনি জড়িয়ে ধরত যে সেই অচেতন মাটির খেলনাও ককিয়ে উঠত।

সে সময় পুতুলের এত রকমারি ছিল না ... জাপানী পুতুলেরি প্রাদুর্ভাব। তারা যে কোন্ জাতি কি বর্ণ, তা জানবার দরকার নেই কেন না, এ দেশ ছেড়ে তারা কবে চলে গেছে—এখন ... পুতুল উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাই তাদের একটু বর্ণনা ... তার ... স্বদেশী ... গদাধরের পিসির মত বড্ড কালো। তাদের মেয়ে পুরুষে তফাৎ ছিল না, সবারি মুখের মধ্যে মধ্যে নাকের কাছটা উঁচু করা, মাথার পিছনে খুঁটি, হাত যদি ... বালাই কারোরই ছিল না। দাঁড়াতে পারলেও গাঁট হয়ে বসে থাকা আর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়া, এ দুই কাজই তার রীতিমত সমাধা করত। বেচারীরা চলতে বলতে পারে না, দাঁড়াবার শক্তি নেই, এই জন্যে সুকুমারী যখন তাদের মা হয়ে বসত, তখন কেবলি কোলে বুকে করে রাখত। আর এ চঞ্চল মায়ের হাত পা সামলে ছিল না—বার বার কোল হতে খসে পড়ত, সেই জন্যে এদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু মরেও এদের নিস্তার ছিল না, মুক্তি কিছুতেই হত না। কারো মাথা উড়ে গেছে, নাক ... বালিশ পালিশ, কারো বা খুঁটির কাছটা পাহাড় থেকে গহ্বরে পরিণত হয়েছে, তবু মা কি তাদের ছাড়ে? এই অন্ধ খঞ্জ পঙ্গুর দলকে বুকে কোলে করে, খাইয়ে, নাইয়ে, শুইয়ে ... খেতে নিয়ে গিয়ে সে মনের সুখে থাকত।

তবে তার নিমির পুতুলের বাক্স একটা দেখবার মত জিনিষ ছিল। পুতুলদের কেমন রকমারি সাজ পোষাক! কেউ পড়েছে ঘাঘরা কুর্ত্তা মাথায় চুমকি বসান ওড়না, কেউবা পরত চুড়ি, কেউ সাজত কাশ্মীরী ... শাড়ীতে। হাতে মাথায় গলায় কত রাংতা, কত পুঁথি, কত মোতি ঝলমল করত। থাকে থাকে

সাজান থাকত তাদের লাড্ডু, সাড়া, অসমনি, জেলি, জবদ জাফরানি, পেয়াজি, সোণ পাপড়ী, কমলা, ছোট্ট বাক্সটির মধ্যে যেন ইন্দ্রভবন বসানো ছিল তার অসবাব পত্রই বা কত রকমের, পিতলের বাসন, চীনা মাটির চায়ের সরঞ্জাম গেলাস বড় কাঁসা কাঠের ঘটি বাটি এই সবের চলাচল হত, তাই পুতুলদের দিন, শুয়ে বসে কাটত, বড় জোর কোন দিন খুব সাজ গোজ নিমন্ত্রণ খেতে যেত। বেশী নড়া চড়া করবার হুকুম ছিল না, পাছে সাজ সজ্জা নষ্ট হয়। তারা শুধু বাক্সের ডালায় উঠে বসত, আর বাক্সের মধ্যে যদি আঁটা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, থাকত সারি সারি সোজা সোজা সাজান পাশ ফিরবার যোটি পর্যান্ত ছিল না আর তৈজসপত্রের খবরদারী এমি যে তাদের ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ হয়ে থাকতে হত সুকুর অত শত আসত না, এমন সব মনোহারী জিনিষ সেও পেত না তা নয়, তবে তার সবই হারাত পিসি যা যত্ন করে তুলে রাখতেন, লোকজন এলে খুলে দেখাতেন, সুকুমারী সে সব নিয়ে, কানা খোঁড়া ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করে, গাছের তলায়, রাস্তার ধারে পুকুর পাড়ে চড়ুই ভাতি করতে যেত কতক ভাঙত, কতক হারাত, আর কতক বা সেইখানেই পড়ে থাকত, চুরিও যে যেত না নয়, তবে যার জিনিষ তার সে বিষয়ে হুঁস ছিল না. জানইত সে লক্ষ্মী মেয়ে ছিল না, মাঝে মাঝে অভাব হলে, পিসি যখন তাঁর বেসাত খুলে বসে উৎসব করতেন, তখন চেয়ে নিতে ভরসা হত না, তার প্রধান কারণ চাইলে পায় ক'জনে তাই সে দৌড় দিয়ে এসে পড়ে, ছোঁ মেরে নিয়ে পলায়ন দিত তার পর ঝগড়া ঝাঁটি, কান্না কাটি, দেওয়ানি, ফৌজদারী একটা হৈচৈ হুলস্থুল ব্যাপার বাধত এ সব মামলার নিষ্পত্তি বড় একটা হত না, কেন না জোর যার মুল্লুক তার—আর তাদের বড়দের বিচার বিবেচনার অত ফুরসৎ ছিল না নালিস রুজুই হত না, তার আবার ফয়সালা হবে কি?

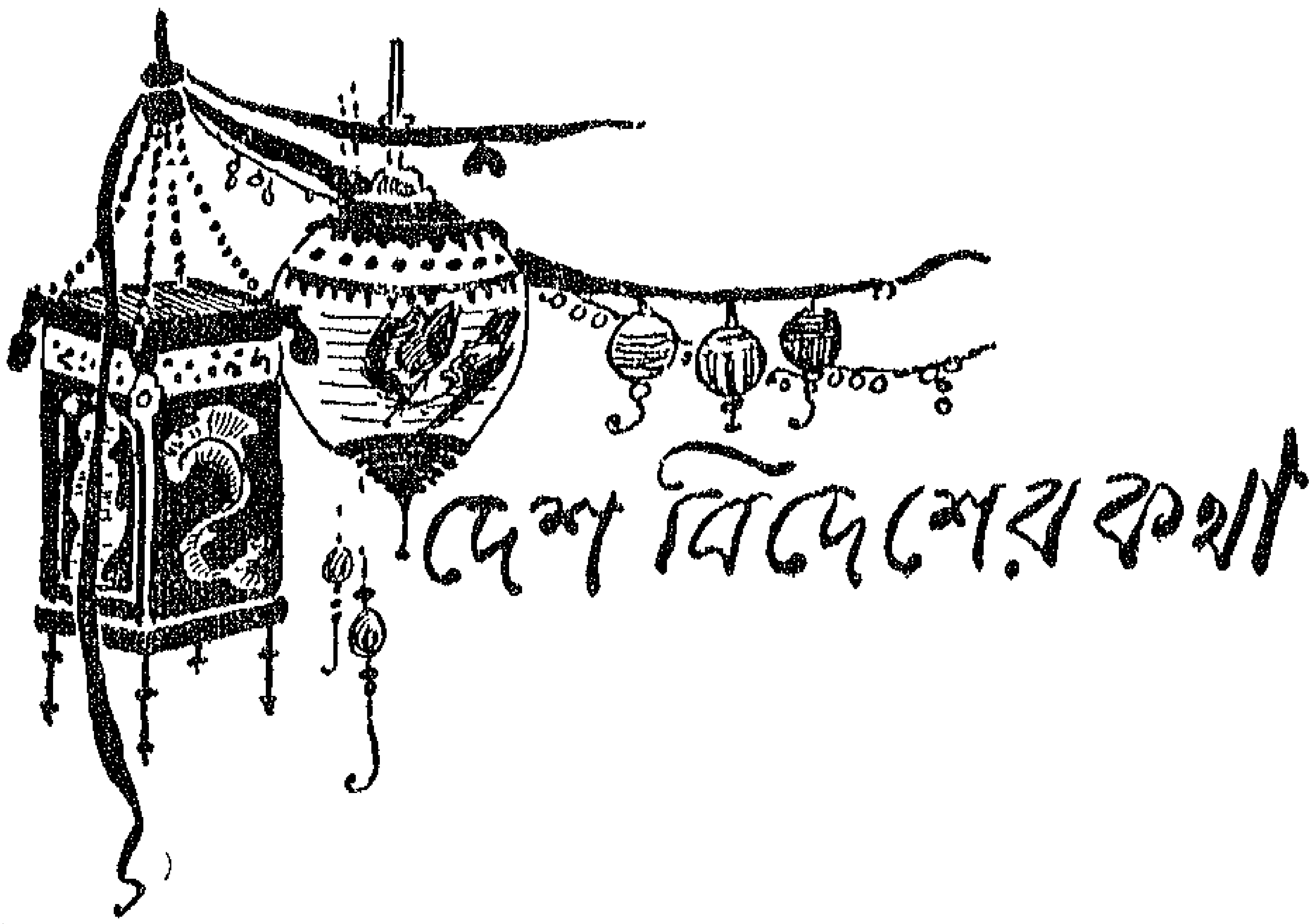
তবে সুকু মানুষটা একেবারেই "কু" ছিল না, মাঝে "সু" হত—জোর জুলুম করে পস্তাত, তখন জল খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে পিসির ক্ষতিপূরণ করে দিত পিসি ছিলেন কিছু হিসাবী মানুষ, তাই ভাঙ্গা চোরা পুতুল তার কাছে বেচে বেশ দুপয়সা আদায় করে নিতেন। সুকুমারীর বড় কাকা বাবু পরীক্ষায় পাশ করে জলপানি পেলেন বাড়ীর সব ছোট ছেলে মেয়েই এই ফাঁকে কে তাঁর কাছে খেলনা দাবী করে বসলে—দরখাস্ত না মঞ্জুর হল না সবারি মনোমত কিছু কিছু এল, আর দুই মেয়ের জন্যে এল দুটি মোমের পুতুল চুলগুলি সোনালি, চোখ দুটি নীল, ঠোঁট দুখানি রাঙা টুকটুকে, গালগুলি গোলাপী; আর এমি মোলায়েম হাত বুলিয়ে আদর

করতে আরামে চোখ বুজে আসে। আবার পুতুলগুলি শুয়ে চোখ বুজে ঘুমোয়, ওঠালে আস্তে আস্তে চোখ খুলে চায়, কল টিপলে আধ আধ কথা কয়, আহা সে কি চমৎকার! দেখেত কন্যাটী অবাক, ইচ্ছে দুটোই নিয়ে পালায়। কিন্তু সেত হল না। পিসি ওকে নি- দুজনে দুটী ছেলে মেয়ে পুতুলটিতে লোভ থাকলেও খুকু ভাল মানুষের মত ছেলেটি নিয়েই যত্ন করে তুলে রাখলে। সবাই ওর এমন বাধ্যতা দেখে খুসী হলেন, সেদিন সে অনেক সাধুবাদ পেলে। দু চার দিন যায়, একদিন কাকাবাবুকে ধরে বসলে—"কাকাবাবু আমরা পুতুলের বিয়ে দেব—কমলা পিসিকে বল ওর মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেয়—তুমি পুরোহিত হোয়ো" কেমন বাজনা বাজবে, কি রকম ভোজ হবে তার ফর্দ্দ বর্ণনা দিলে। কাকাবাবুও মেতে উঠলেন। কিন্তু যার মেয়ে সে রাজী হয় না। বল্লে "বাপ্‌রে অমন দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে পড়লে মেয়ে কি বাঁচবে? কাজ নেই আমার বিয়ের, জন্ম জন্ম মেয়ে থুবড়ো আইবুড় হয়ে থাক?" কিন্তু ভেবে দেখ, ছেলে তখন নেচে উঠেছে, বাজনার বায়না, সন্দেশের ফরমাস সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন ভোজের [illegible] বাকি আছে, তাও কি হয়? ওর পিসি ঠাকুরাণীকে নাকের জলে চোখের জলে করতে হল। বিয়ে না দিলে মেয়ে নষ্ট হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে তখন রাজী হয়ে বল্লে "আচ্ছা দেব—মেয়ে বরের ঘরে যাবে না—ছেলে এসে ঘর-জামাই হ'ক।" তখন মারমার কাটকাট পড়ে গেল। ছেলের দল সব রেগে আগুন—কি এত বড় অপমান, ছোট মুখে বড় কথা। এ কি বিয়ের ব্যবসা-ধর্ম মুখ্যু কুলীন যে বাপের ভিটে ছেড়ে আসবে? বল্লে, আমরা কিছু চাইনে গয়না-পত্তর খরচ-খরচা সব আমাদের, শুধু সুন্দরী বউ ঘরে আনব। সুন্দরী মেয়ের মা যেমন মৎলব করেছিলেন, মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলে পাবেন, আর দুটিকে বাক্সবন্দী করে জিনিষপত্র সব সুসজ্জিত করে, চুপি চুপি খেলা করবেন—বন্ধু-বান্ধব এলে বার ক'রে দেখাবেন। সুকুমারীরও মৎলব ছিল, ছেলে গিয়ে মেয়ে আনবে, সেও পাবে দুটি পুতুল। সেযে মেয়ে পুতুল পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও ছেলে পুতুলটি ভালমানুষের মত বিনা-বাক্য-ব্যয়ে নিয়েছিল, সেও এই ফন্দিতে। যেখানে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি সেখানে মীমাংসা সহজে হয় না।

ছেলের দল যখন বল্লে আমরা বরের হীরার আংটী, সোণার ঘড়ি ঘড়ির চেন কিছু চাইনে, শুধু মেয়ে দাও—তখন মেয়ের মা বল্লে "তবে তোমরা পণ দিয়ে নিয়ে যাও।" দুটাকা পণে বিয়ে ঠিক হল, কিন্তু কমলা পিসিত সহজ মানুষ ছিলেন না, তাঁর মনের কথাটা ছিল গোপনে—সাপ যেমন গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, সে বড় ভয়ানক। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী



হস্তীমূর্খ।

আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরাতন বই বেদ। বেদে হাতী সৃষ্টির গল্প আছে।

দেবতাদের জননী অদিতির আটটি ছেলে অদিতির ছেলে বলিয়া তাদের নাম আদিত্য। অষ্টম বা ছোট আদিত্যটি জন্মিয়াছিলেন একটি জড়পিণ্ড তাল-গোল পাকানো। এমন ছেলে দেখিয়া মার মন খারাপ হইয়া গেল। তিনি স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এই জড়পিণ্ডটাকে চাঁচিয়া ছুলিয়া একটা আকার গড়িয়া দাও

বিশ্বকর্ম্মা সেই জড়পিণ্ডটি চাঁচিয়া-ছুলিয়া গড়িয়া যাহা দাঁড় করাইলেন তিনিই হইলেন বিবস্বৎ বা সূর্য্য

সূর্য্যের দেহের যে সব তাল তাল চাঁচ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা হইতে জন্মিল যত সব হাতী জড়পিণ্ডের ছাচ থেকে জন্ম বলিয়া হাতীর দেহ এক-একটা জড়পিণ্ডের তাল, আর তাদের বুদ্ধিও জড়ের মতন

হাতী বনে যাইয়া গাছ-পালা ভাঙিয়া তসনস করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া এক খরগোশ ছুটিয়া আসিয়া তার লাল কাঁচের মতন চোখ পাকাইয়া গন্নাকাটা ঠোঁট কাঁপাইয়া গোঁপ ফুলাইয়া বলিল—কস্ত্বং? যুদ্ধং দেহি

অতটুকু পুঁচকে প্রাণীকে হাতী প্রথমে গ্রাহ্যই করিল না। খরগোশ হাতীকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া গালি দিল।

এতে হাতী ক্রুদ্ধ হইয়া শুঁড় পাকাইয়া লেজ উঁচাইয়া খরগোশকে ধরিতে গেল। দুষ্টগামী খরগোশ খুবখুব করিয়া হাতীর পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ছুটাছুটি করিয়া হাতীকে আরো রাগাইয়া তুলিল।

এইবার সর্দার হাতী মনে করিল খরগোশটা ঠিক তার পেটের তলায় দাঁড়াইয়া হিহি করিয়া হাসিতেছে। হাতী অমনি পেটের ভরে ধপাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া মাটির উপর চাপ দিতে লাগিল, চাপের উপর চাপ দেয় যেন সেই দুর্দম চাপে খরগোশের হাড়গোড় ছাতু হইয়া গুঁড়াইয়া যায়।

খরগোশ কিন্তু চাপা পড়ে নাই; সে ফস্‌ করিয়া পাশ কাটাইয়া লাফাইয়া উঠিল হাতীর পিঠের উপর। হাতীর অতবড় মোটা চামড়ার উপর অতটুকু হালকা প্রাণী খরগোশ যে বসিয়া আছে তা হাতী টেরও পাইল না—খরগোশ তার পেটের তলায় চাপা পড়িয়াছে মনে করিয়া হাতী ক্রমাগতই মাটিতে দমক আর চাপ দিতে লাগিল।

হাতীর দলের আর সব হাতীরা দেখিল তাদের সর্দার পড়ো-ও-কাবু হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, বারবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিতেছে না, আর খরগোশটা বিজয়ী বীরের মতন পতিত শত্রুকে চাপিয়া জব্দ করিয়া রাখিয়াছে। হাতীরা খরগোশের প্রতাপে ভয় পাইয়া সেই বন ছাড়িয়া দিল চোঁচাঁ দৌড়। তার সর্দার হাতী মাটিতে পড়িয়া হাপরের মতন হাঁপাইতেছিল, সেই নিশ্বাসের জোরালো হাওয়ার টানে এক ঝাঁক কাঠপিঁপড়ে ঢুকিয়া গিয়াছিল তার শুঁড়ের ভিতর। হাতী ত কাঠপিঁপড়ের কামড়ের বিষের জ্বালায় ছটফট করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তার দলের সবাইকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালাইতে দেখিয়া সেও ভয় পাইয়া কিছু বুঝিবার অপেক্ষা না করিয়াই তাদের পিছু পিছু প্রাণপণ বেগে ঊর্ধ্বশুঁড় করিয়া দৌড় দিল। —কথা-সরিৎ সাগর

সঙ্কলন—প্রবাসী - জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ৮৭।

আলুর চলন।

ছেলেদের মধ্যে অনেকে থাকে একেবারে একবগ্গা। এক করিতে বলিলে তারা করিয়া বসে আর। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছেলেবেলায় এইরকম একবগ্গা ছিলেন। তাঁর বাপ হয়ত বলিলেন—আজ ইহা করিও না, আর তিনি জিদ ধরিয়া তাহাই করিতেন। শেষে এমন হইয়াছিল যে, তার বাবা যাহা করিতে বারণ করিতেন তিনি তাহাই

করিতেন, তাই তাঁর বাবাকে উল্টা করিয়া কথা বলিতে হইত—কোনো কাজ করিতে বারণ করিলেই বিশ্বাসাগর তা করিতেন ও করতে অনুরোধ করিলে করিতেন না। এ রকম একবগ্‌গা স্বভাব ভাল নয়। কিন্তু এই স্বভাবেরও একটা মজার গুণ আছে।

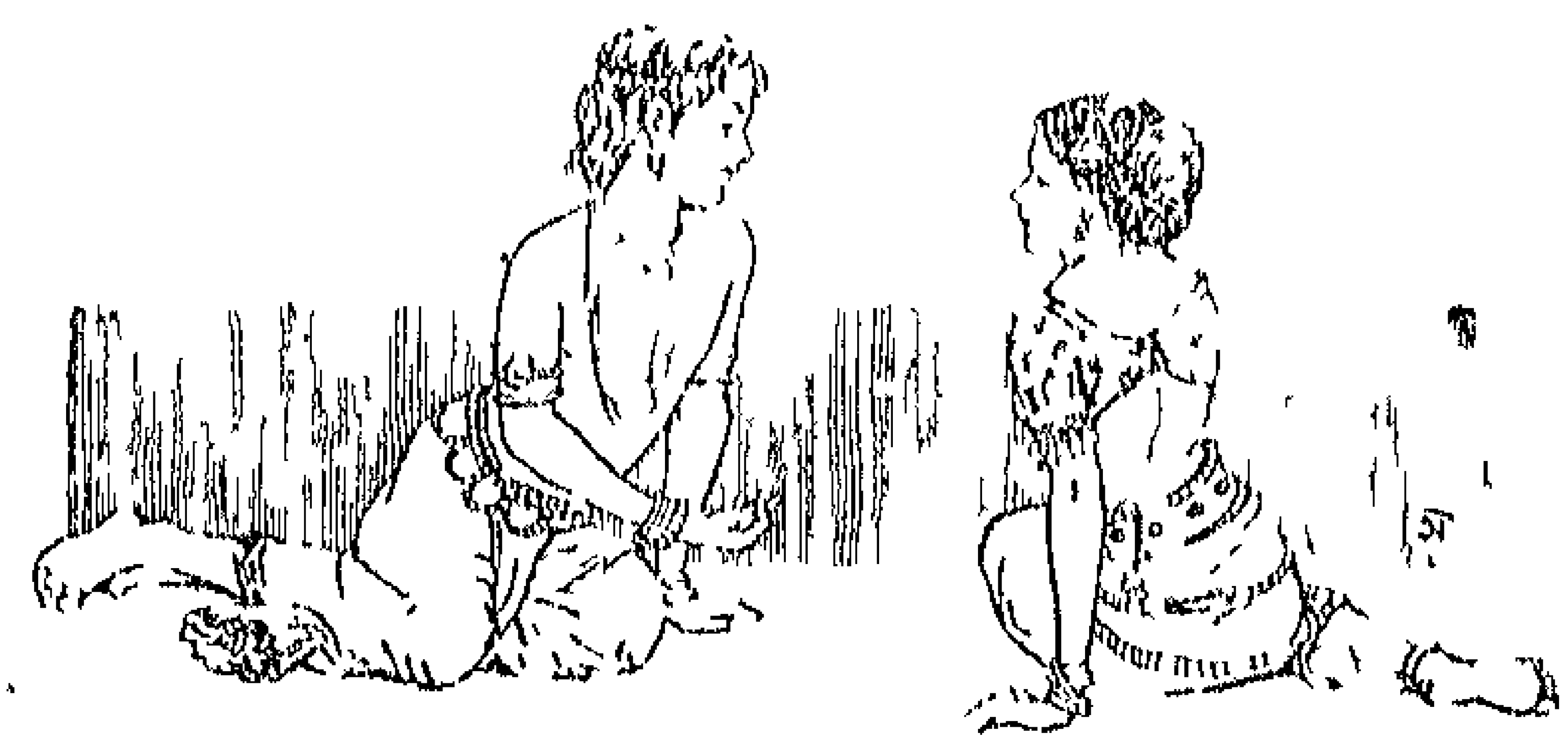
লোকে কিছু করিতে নিষেধ করিলে সেই কাজটি করিতে ছেলেদের ভারী ইচ্ছা হয়। শুধু ছেলেদের কেন, বুড়দেরও সে ইচ্ছা যে হয় না, এমন নয়। একজন লোকের এই রকম কৌতূহল থেকেই ফরাসী দেশে আলুর চলন হইয়া গিয়াছে।

লুই—ষোল যখন ফরাসীদেশের রাজা, সে সময় একবছর তাঁর দেশে শস্য ভাল হয় নাই। রাজা ত ভাবিয়া অস্থির—কি করিয়া শত শত প্রজার প্রাণ রক্ষা করিবেন। সে সময়ে য়ুরোপে অনেকে আলু খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু ফরাসী দেশে তখনও আলু খাওয়ার চলন হয় নাই। রাজা লুই ভাবিলেন—এই অজন্মার সময় লোককে আলু খাওয়াইতে পারিলে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচা যাইবে। কিন্তু লোককে জোর করিয়া নূতন জিনিস খাওয়াইতে গেলে হয়ত অনেকে চটিয়া বিদ্রোহও করিতে পারে। তাই মনে মনে এক মতলব ঠিক করিয়া তিনি খুব আলুর চাষ লাগাইয়া দিলেন। মাঠ হইতে আলু উঠাইয়া আনিয়া তিনি একটি জায়গায় রাখিতে বলিলেন, আর প্রহরীদের হুকুম করিলেন—তোমরা ঐ মাঠে পাহারা দাও; কোন লোক সেদিকে আসিলে মুখে খুব রাগের ভাব দেখাইবে, তার একটু পরেই মুখ ফিরাইয়া থাকিবে।

প্রহরীরা রাজার কথামত কাজ করিতে লাগিল। লোকে সে দিকে আসিয়া আলুর পাহাড় দেখে আর প্রহরীদের ব্যবহার দেখে। প্রহরীরা যখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় তখন কেহ কেহ ভাবে দুই একটা আলু সরাইয়া লইয়া দেখিলে হয়, কেমন জিনিস। সাহস আর কারও হয় না। শেষে একজন একটু সাহসী গোছের লোক, প্রহরীরা পিছন ফিরিয়া থাকিলে, চুপিচুপি কয়েকটি আলু লইয়া দে ছুট্। বাড়ী গিয়া আলুগুলি সে রাঁধিয়া খাইয়া দেখিল জিনিস মন্দ নয়। দু-চার জনকে আলুর খবরও দিল। তার কথা শুনিয়া কয়েকজন প্রহরীদের ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া আলু খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন সে পথে ভিড়িল। ক্রমে দেশময় আলু খাওয়া চলন হইয়া গেল।

তখন রাজা লুইর মতলব সকলে বুঝিতে পারিল। তিনি বারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আলু কেমন জিনিস তা দেখিতে লোকের কৌতূহল হইল। আর লোকের এই কৌতূহল বা একবগ্‌গা স্বভাবের গুণেই ফরাসীদেশে সে বারে অন্নকষ্ট কতকটা কমিয়া গেল।

সঙ্কলন—প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।



ছড়া

(১)

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার কালো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ ”
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ,
তার অধিক কালো কন্যে, তোমার মাথার কেশ।”

(২)

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ—
চার ধলো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ ”
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তার অধিক ধলো কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ ”

(৩)

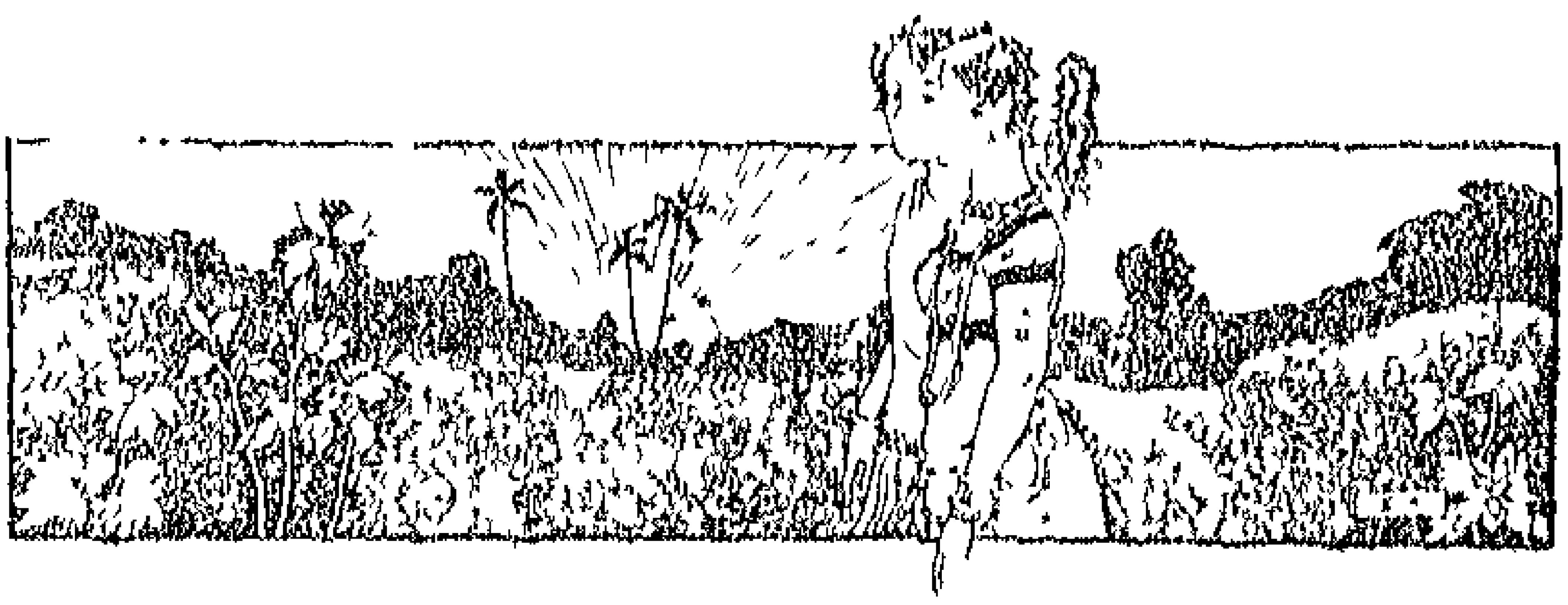
"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার রাঙা দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল,
তার অধিক রাঙা কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর।"

(৪)

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার তিতো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"নিম তিতে, নিসিন্দে তিতে, তিতো মাকাল ফল,
তার অধিক তিতো কন্যে, বোন সতীনের ঘর।"

(৫)

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার হিম দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি,
তার অধিক হিম কন্যে, তোমার বুকের ছাতি।"



লীলা

ফুটফুটে চেহারা, যেমন গড়ন তেমনি রূপ—একটি মেয়ে ছিল তার নাম লীলা। রূপের তার তুলনা ছিল না—যে দেখিত সেই ভালবাসিত। কিন্তু এই ভালবাসা যে কেবল রূপেরই জন্য—তা নয়, অন্য কারণ ছিল।

লীলা উঁচু গলায় কথা বলে না। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। যা পায় তাইতেই সন্তুষ্ট থাকে। আর অত ছোট মেয়ের আশ্চর্য্য দয়ার কথা শুনলে কে তাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? কারও দুঃখ কষ্ট সে দেখিতে পারে না। পুষা বিড়াল, অজয়া বাছুর, এসবকেও সে এত ভালবাসে যে সে ছাড়া আর কারও হাতে তারা খাইতে চাহে না। পাড়ার যত দুঃখী, অনাথ, তাদের কষ্টে লীলার মন গলিয়া যায়। সে তাদের সঙ্গে গল্প সল্প করিয়া নানা রকমে তাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে। এর বাড়া যেন আর জীবনে অন্য কাজ ছিল না। গরীব দুঃখীরা জানিত লীলা তাদেরই। এমনি করিয়া লীলার নাম রটিয়া ছিল 'দুঃখীদের লীলা'।

কিন্তু লীলার নিজের দুঃখও গরীব দুঃখীদের চেয়ে কম ছিল না। খুব অল্প বয়সে তার বাপ, মা, ভাই বোন মারা গিয়াছিল, তার উপর গরীবের মেয়ে সে—পয়সা কড়িও মোটেই ছিল না; তাই লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই তাকে দূর ছাই করিতে লাগিল। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও কোথাও আশ্রয় পাইল না। শেষে গ্রামের দশজনে যাইয়া তাকে তার মামার বাড়ীতে দিয়া আসিল।

কিন্তু গরীবের দুঃখ সব জায়গায়। মামার বাড়ীতেও তার ক্লেশের সীমা রহিল না। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর ঝাট দেওয়া, কাপড় কাচা, গরুকে খাবার দেওয়া, সবই তার নিজের ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িল। কিন্তু এমন উদয় অস্ত খাটিয়াও নিস্তার নাই। মামা মামী রাত্রে শুইলে লীলাকে তাদের মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে হইত, এতটুকু ছোট মেয়ের যে এত কাজ করিতে কষ্ট হইতে পারে সে কথা একবারও তারা ভাবিত না। কিন্তু লীলা কখন একটি কথাও বলিত না। মামা মামীর হুকুম মত সব কাজ হাসি মুখে করিত। কিন্তু এত দুঃখ কষ্টেও নিজের একটা কাজ সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না। গরীব দুঃখীদের সে লুকাইয়া আগের মতই সাহায্য করিত। অনাথ দুঃখীদের কষ্ট তার বুকে শেলের মত বিঁধিত। নিজে না খাইয়াও সে তাদের লুকাইয়া খাওয়াইত। যাদের আশ্রয় নাই—লুকাইয়া ডাকিয়া আনিয়া নিজের বিছানায় শোয়াইত। আর আপনি সমস্ত দিন খাটুনির পর রাত্রে মাটীতে শুইয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িত—এমনি দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন মামার মস্ত বড় এক ভোজ দিলেন। সে ভোজে গাঁয়ের লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে — ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সকলেই খাইতে বসিয়া গিয়াছে। চারিদিকে হৈ চৈ, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি।

লীলা খাবার [illegible] পাতে পাতে [illegible] দাঁড়াইয়া [illegible] স্বীকার করিতে পারেন না। [illegible] দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, [illegible] খাইবার জন্য।

একবার, দুইবার, তিনবার খাওয়া হইয়া গেল। লীলা পাত কুড়াইয়া রাস্তায় ফেলিতেছে, জায়গা পরিষ্কার করিতেছে—তার ছাড়িবার সময় নাই।

ক্রমে সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গেল, মামা মামী শুইতে গেলেন। বাকী রহিল খাইতে শুধু লীলা। সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া গা হাত ধুইয়া খাইতে বসিবে, হঠাৎ এক ভিখারিণী আসিয়া হাজির।

ভিখারিণী বুড়ী দেখিতে ভারী বিশ্রী, যেমন ময়লা ছেঁড়া কাপড়, তেমনি রুক্ষ, উস্কো-খুস্কো কটা চুল, তেমনি কালো মিস্ মিসে রঙ। যে দেখে সেই তাকে দূর দূর করে। সকলের কাছে তাড়া খাইয়া সে [illegible] শেষে লীলার কাছে আসিল।

ভিখারিণীকে দেখিয়া লীলার বড় দুঃখ হইল। সে আস্তে আস্তে বুড়ীকে আড়ালে লইয়া যাইয়া বলিল, "দেখ, আমার ঘরে তো তোমার খাবার নেই, আর আমি চাইলেও দেবে না। আমার যে খাবার আছে তাই নাও খাও।"

তখন সে ভিখারিণী মহা আরামে লীলার সব খাবার খাইয়া ফেলিল। তারপর লীলা তার আশ্রয় নাই শুনিয়া নিজের [illegible] যে ছেঁড়া বিছানা ছিল তাই পাতিয়া দিল বুড়ীকে শোবার জন্য। আর নিজে—খুদ কুঁড়ো যা কিছু এদিক ওদিক কুড়াইয়া পাইল তাহাই খাইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

পরদিন ভোরে লীলা না জাগিতেই বুড়ী চলিয়া গেল। তাকে বলিয়া পর্যন্ত গেল না।

রাত্রে আবার বুড়ী চুপি চুপি আসিয়া হাজির। লীলা আবার লুকাইয়া নিজের খাবার দিল, নিজের বিছানা দিল। বুড়ী মহা আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

বুড়ীর ভাব দেখিলে মনে হয় সে যেন ভাবে, ও খাবার, ও বিছানা তারই। লীলা যে খাইতে পায় না, শুইতে বিছানা পায় না সে তাহা দেখিয়াও দেখে না।

শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে আবার তম্বীও করে। বিছানা খারাপ, খাবার মোটেই ভাল নয়, এমনি আরও কত কি। লীলা কিন্তু হাসি মুখে বুড়ীর সব অত্যাচার সহ্য করে। লোকের দুঃখ দেখিলে তার ভারী কষ্ট হয়, দুঃখীর মুখে হাসি দেখিলে সে জগত সংসার সব ভুলিয়া যায়। এমনি দিন কাটে।

লীলা আধপেটা খাইয়া, মাটিতে শুইয়া দিন দিন রোগা হইতে লাগিল।

মামা বলে, "ও লীল, তোমার এমন চেহারা হইতেছে কেন? তুমি কি খেতে পাও না?"

মামী অমনি ফোঁস করিয়া উঠেন, "কি? আমি খেতে দিই না? তবে হাড়ী হাড়ী ভাত, কাঁড়ী কাঁড়ী ডাল যায় কোথা? বলুক না; ওই, বলুক না।"

মামীর ধমক খাইয়া লীলার মুখ শুকাইয়া যায়, তবু সে চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলে—"না, আমি বেশ আছি।"



হাসিতে হাসিতে বিড়ালটাকে কোলে করিয়া বলিল 'আচ্ছা'

লীলা সত্য সত্যই ভাবিত সে বেশ আছে। পরের দুঃখ দূর করিতে যে কত সুখ, যারা পরের দুঃখ দূর না করিয়া থাকে তারা জানে না, বলিলেও বুঝিবে না।

বুড়া এইরকম পনর দিন ধরিয়া ভাত খাইল আর সেই ক্রমে লীলার সঙ্গে কথা বলাও ছাড়িয়া দিল। ভাত তার হাতে খায়, খাইয়াই শুইয়া পড়ে।

শেষে এক রাত্রে একটা বিড়াল সঙ্গে আনিয়া বলিল—

"ও লীল, আমি কোন কদিনের জন্য বিদেশ যাব, তাই এই আমার বিড়ালটা রইল আমি যে ভাত খাই

আমার না আসা পর্য্যন্ত—ওই সে সব খাবে। আর যে বিছানায় শুই সেই খানেই ও শুইবে।"

বুড়ী এমনভাবে কথা বলিল যেন—তার নিজেরই সব ঘর-বাড়ী, খাবার, বিছানা।

লীলা কিন্তু একটুও আপত্তি করিল না. হাসিতে হাসিতে বিড়ালটাকে কোলে করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা"

বুড়ী চলিয়া গেলে লীলা আগের মতই তাহার নিজের সব খাবার দাবার বিড়ালটাকে ধরিয়া দিল। বিড়ালটাও ম্যাও মেও টুঁ টাঁ কিছু না করিয়া সমস্তই খাইয়া ফেলিল। খাবার পর লীলা বিছানা দেখাইয়া দিল। বিড়াল শুইল।

ক্রমে না খাইয়া খাইয়া লীলার উপোস করা অভ্যাস হইয়া গেল। শীতের রাত্রি—লীলা আড়ষ্ট হইয়া বিড়ালের পাশে বিছানার এক কোণে পড়িয়া থাকে। সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রে আর তাহার হুঁস থাকে না।

এদিকে মামা মামী রোজ রাত্রে শুনিতে পায় লীলার ঘরের ভিতরে যেন কিসের শব্দ হয়। একদিন দুজনে উঠিয়া, চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে গেল—লীলা করে কি? দোরের কাছে গিয়াই দুজনে অবাক,—এদিকে গন্ধ ওদিকে গন্ধ, যেন হাজার হাজার ফুল ফুটিয়াছে। লীলার ঘরের চারিদিকের বাতাস পর্য্যন্ত যেন গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে ভাবাভাবি হইল, এত গন্ধ কোথা হইতে আসে? ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখে লীলা শুইয়া আছে রূপার খাটে, সোনার পাটীর উপর। আর তার পাশেই একটা বিড়াল। কি সুন্দর তাহার চেহারা—রঙ যেন তাহার জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। আর চাঁদের আলোর মত একটা কিসের স্নিগ্ধ আলো যেন তার সমস্ত গা ফাটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তারই পাশে বসিয়া এক ভিখারিণী বুড়ী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে।

মামা মামী আশ্চর্য্য হইয়া কান পাতিয়া শুনিল, বুড়ী বিড়ালটাকে বলিতেছে—

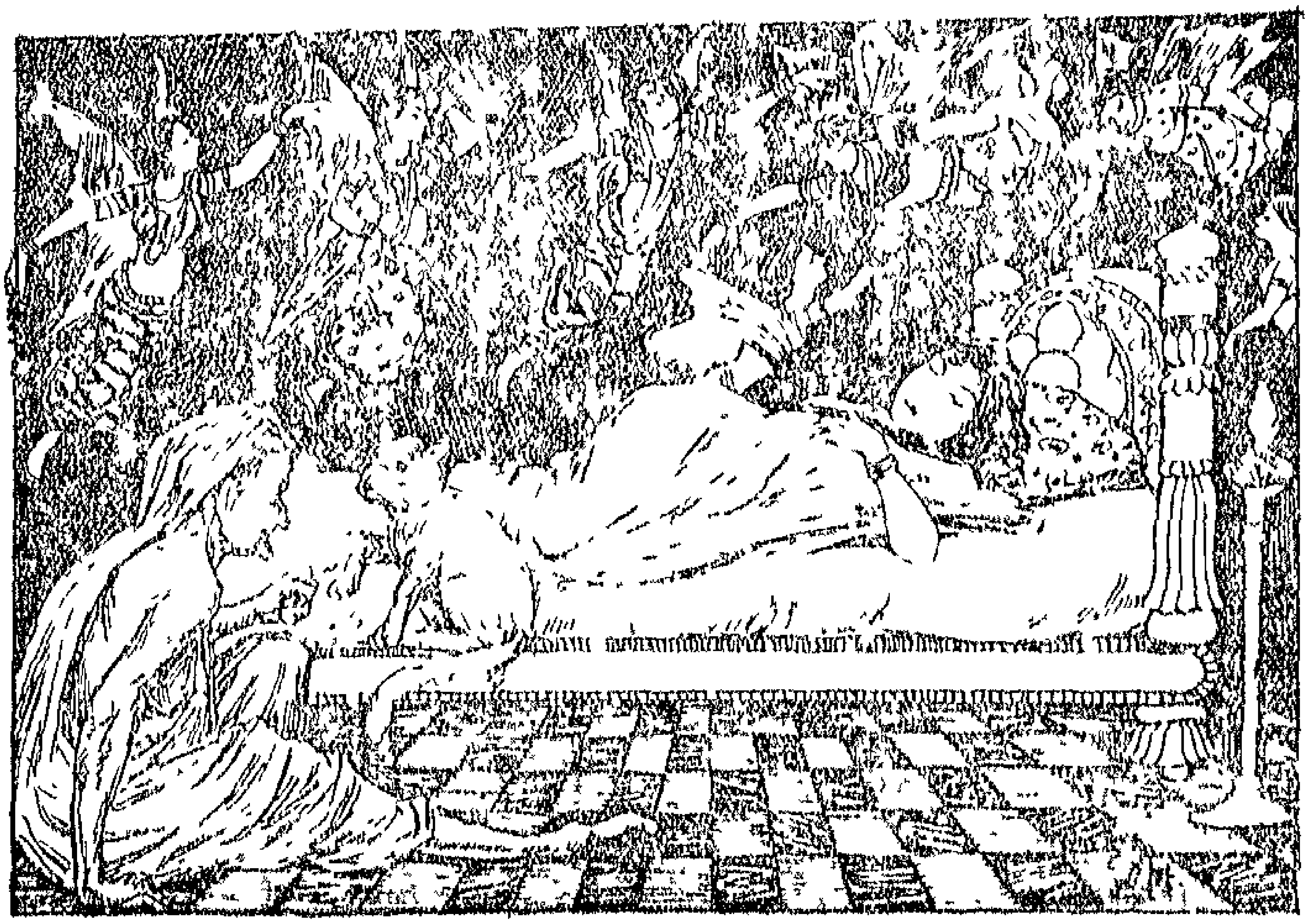
"ও গরীব দেশের রাজা, এখন ত তোমার সন্দ মিটিয়াছে, এখন বল পৃথিবীতে ভাল লোক আছে কি না?"

"তাইত দেখছি রাণী, পৃথিবীতেও ভাল লোক আছে।"

"তবে আমি বাজিতে জিতিয়াছি।"

কথাও শেষ হইল, আর কোথা হইতে গান বাজনা দূরে দূরে স্বপ্নের রাজ্য হইতে

যেন ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন পরী আসিয়া হাজির, সকলের বড় যে, সে বিড়ালকে প্রণাম করিয়া বলিল --



[illegible]

"কি হুকুম?"

বিড়াল বলিল,

"ওগো সখি, বাজিতে রাণীই জিতিয়াছে—পৃথিবীতে এখনও ভাল লোক আছে। তোমরা এখন যাও, আনন্দের লহর ছুটাইয়া দাও—কাল আমাদের ঘরে এক নূতন অতিথি আসিবে।"

পরীর দল আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

তখন বুড়ী বলিল বিড়ালকে,—

"তুমি আমাকে কি দেবে?"

"সাগর ছেঁচা মাণিক দেবো।" "আর কি দেবে?"

"কলসি কলসি সোনা দেবো।" "আর কি?"

"সোনার চাঁদ দেব।" "আর?"

"পৃথিবীর রাণী করবো।"

শুনিয়া মা-মাসী হিংসায় ফাটিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

শ্রী শিশিরকুমার মিত্র



লক্ষ্মী।

আমাদের দেশের শেষ কথা।

শিকড়ের জোরে যেমন গাছ দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি সংসার খাড়া হয়ে আছে শুধু মেয়েমানুষের জোরে। পুরুষ যত বিদ্বান, যত বুদ্ধিমান—যতই যাই কেন হোন্ না, মেয়েমানুষের ধারেও ঘেঁস্‌তে পারেন না। মেয়েমানুষ জগৎ প্রসব করেন—পালন করেন—রক্ষা করেন, তাঁরা—জগদ্ধাত্রী—মায়ের অবতার। তাই, তাঁদের কায, কর্ত্তব্য এবং ঝক্কিও পুরুষের চেয়ে একশো গুণ বেশী।

সেই জন্যই তাঁদের পুরুষের মত, শুধু লেখা পড়া, আর গান-বাজনা-আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে বসে থাকলে চলে না। তাঁদের শিক্ষার জিনিষেরও যেমন অন্ত নেই—তেমনি শিখ্‌তেও হয় ঢের বেশী। এই সকল শিক্ষায় যিনি যত পাকা হতে পারেন, তিনি সংসারেও তেমনি পাকা গিন্নী হয়ে শান্তি আর আনন্দ ঢেলে দিতে পারেন। লোকে তাঁকেই 'লক্ষ্মী' বলে ভক্তিভরে প্রণাম করে—তাঁর যশে ও গৌরবে পৃথিবী ভরে যায়।

আমাদের এই হিন্দুর দেশে তেমন 'লক্ষ্মী মায়ের' অভাব নেই। সেই সেকালের 'সীতা' 'সাবিত্রী' 'দময়ন্তী' থেকে আরম্ভ করে—একালেরও 'সরলা' 'প্রফুল্ল' 'কমলমণি' প্রভৃতি মেয়েদের গৌরবে হিন্দুর সংসার ঝল্‌মল্ করছে, আর তাঁদের মত 'লক্ষ্মী-মেয়ের' গুণেই হিন্দুদের—সব গিয়েও—আজও যা আছে, তা বোধ করি পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন জাতির নেই।

কিন্তু এই সব লক্ষ্মী-মেয়েরা সবাই ছেলেবেলা থেকে শিখে তবে বয়সকালে পাকা হয়েছিলেন। সে সব শেখবার জন্য তাঁদের ইস্কুলেও যেতে হয় নি—আর পড়াও মুখস্থ করতে হয়নি। আমাদের দেশে সেই সত্যযুগের আমল থেকেই—মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য, হিন্দুর ঘরে ঘরে, যে সকল সুন্দর ব্যবস্থা চলে আসছে তেমন আর কোন দেশেই নেই।

দিন-রাত বই নিয়ে বসে, মাথা ঘামিয়ে, মনের স্ফূর্তি, চোখের দৃষ্টি, ও দেহের বল নষ্ট করে ইস্কুলের পড়া তোয়ের করে, পাশ দিয়েও যে শিক্ষা হয় না, মেয়েদের তার চেয়েও কঠিন শিক্ষার অতি সহজ সোজা উপায় রয়েছে আমাদেরই ঘরে ঘরে আমরা যদি চোখ চেয়ে একটু ভাল করে দেখি, তা হলে দেখা যায় যে, হিন্দুর মেয়েদের জন্য যে সকল ব্রত নিয়ম করবার ব্যবস্থা সেই সেকাল থেকে চলে আসছে আমাদের ছোট ছোট মেয়ের ছেলেবেলা থেকে যদি সেই গুলি করতে শিখেন তাহলে তাদের আর অন্য কোন বকম শিক্ষার তেমন দরকার হয় না।

সীতা-সাবিত্রী" প্রভৃতি মেয়েরা—বড বড় রাজার মেয়ে হয়েও ছেলেবেলা থেকে সেই সব বার-ব্রত করেই ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর আসন জুড়ে বসে আছেন। হিন্দুর সেই বার ব্রত কি সামান্য ব্যপার -অবহেলার জিনিস?

কিন্তু আজকাল আমরা অনেকেই সে সব—হিন্দুদের ধর্ম্মের গোঁড়ামি, ভুল বিশ্বাস, মূর্খতা প্রভৃতি মনে করে অগ্রাহ্য করি—হেসে উড়িয়ে দিই মেয়েদের সে দিকে ঘেসতে না দিয়ে—পুরুষের মত—বই বগলে স্কুলে-কলেজে পাঠিয়ে দিই কিন্তু এ কথাটা মনে হয় না যে—সেকালের মেয়েরা ছেলেবেলা থেকে এই সকল ব্রত-নিয়ম করতে শিখেই সংসার যেমন সুখ, শান্তি ও আনন্দে ভরিয়ে দিয়ে যেতেন, একালের মেয়েরা পুরুষের মত, কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েও সংসারে তেমন সুখ-শান্তির কথা মনেও ভেবে ঠিক করতে পারেন না। এইটেই আমাদের মস্ত ভুল।

বাস্তবিকই এই সব ছোট-বড় বার-ব্রতের সকল গুলির ভিতরেই—মেয়েদের জন্য—স্বাস্থ্যের কথা, কর্ত্তব্যের কথা, সংসারের কথা, ধর্ম্মের কথা, পুরাণ ইতিহাসের কথা, চরিত্র গঠনের কথা,—মায় গৃহস্থালীর কথা পর্য্যন্ত এমন সরল—সহজ—সুন্দরভাবে শিক্ষা কোন স্কুল-কলেজে হয় নি ছেলেবেলা থেকে যে সব মেয়েরা শুধু এই গুলি শিখে বরে যেতে পারেন, তাঁদের আর কোন কিছু শিখবার দরকার হয় না

লেখাপড়া শিখতে মানা নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা ছেলেবেলা থেকে এই সব বার-ব্রত করতে শিখেন তাঁরাই কালে 'লক্ষ্মী-বৌ' 'লক্ষ্মী গিন্নী' হয়ে—গরীবের ঘরেও চঞ্চলা মা-লক্ষ্মীকে অচলা করে বেঁধে রাখতে পারেন তাদের গায়ের বাতাসে রোগ শোক-দুঃখ-জ্বালা দূরে পালায়ে, সংসারে আনন্দের ঢেউ খেলে—শান্তির আলো ঝল্‌মল্ করে আর সবাই তাঁদের কথা শুনে অবাক্ হয়ে ভাবে—এঁরাই সাক্ষাত—লক্ষ্মী।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।



ছেলেদের বাইবেল্।

খ্রীষ্টের বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন তিনি পিতামাতার সমভিব্যাহারে নাজারেথ্ হইতে জেরুসালেম নগরে প্রথম আগমন করেন। জেরুসালেম নগরে "পাসোভার্" নামক ইহুদীদিগের একটী জাতীয় মহোৎসব প্রত্যেক বৎসরে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। বহুদূর দূরান্তর হইতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ইহুদী পরিবারবর্গ জেরুসালেমে সম্মিলিত হইয়া সপ্তাহব্যাপী এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া সবিশেষ আনন্দ উপভোগ করিত।

"পাসোভার" ইহুদী জাতির এক অতি প্রাচীন উৎসব। ইহার ইতিহাস সংক্ষেপে তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিব। ইহুদী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে এক সময়ে মিসরদেশে বন্দীভাবে বাস করিত। মিসরের রাজা সাধারণতঃ "ফেরো" নামে অভিহিত হইতেন। সেই সময়ে যে "ফেরো" মিসরে রাজত্ব করিতেন, তিনি বন্দী ইহুদীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না, তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেন। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহারা তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা করিলে তিনি কিছুতেই তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন না। ইহুদীদিগের ধর্ম্মগুরু মোজেস্ তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য রাজাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াও সফল মনোরথ হন নাই। মোজেস্ দৈবশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য দৈববলে রাজ্যমধ্যে নানা বিপদ ও বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া রাজাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন

সর্ব্বশেষে তিনি রাজাকে ভয় দেখাইলেন যে যদি একটী নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাহার স্বজাতিগণকে দেশে ফিরিবার যাইবার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেবতার ক্রোধে এক রাত্রির মধ্যে নগরের সমস্ত লোকের জ্যেষ্ঠপুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। রাজা হুকুম্ দিবার পরেও তাহার এই কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন মোজেস্ যে সকল গৃহে তাহার স্বজাতিগণ বাস করিত, সেই সকল গৃহের দ্বারে রক্তের দ্বারা একপ্রকার চিহ্ন প্রদান করিয়া মৃত্যু দেবতাকে চিহ্নিত গৃহ ব্যতীত নগরের অপর সকল গৃহে যাইয়া প্রবেশ করিয়া তত্তৎ গৃহবাসীগণের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিধন সাধন করিতে আদেশ করিলেন। মরণ-দেবতা গভীর রাত্রে নগরে আগমন পূর্ব্বক শোণিত চিহ্নিত গৃহসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়া মোজেসের নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিলেন। চিহ্নিত গৃহগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহুদীদিগের কাহারও জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। তাহাদের প্রতি দেবতার এই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ইহুদীজাতি আজিও এই "পাস্ ওভার" (Passover) বা "ছাড়" উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে মিসরের রাজা এই ভীষণ দৈব দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত হইয়া বন্দী ইহুদীগণকে মোজেসের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

বালক খৃষ্ট পিতামাতার সহিত উৎসব দেখিবার জন্য জেরুসালেমে আগমন করিয়া নগরের সমৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। জেরুসালেম্ নগর পাহাড়ের উপর উচ্চভূমিতে অবস্থিত। অগণিত চূড়া ও তোরণ সমন্বিত প্রাসাদরাজি, প্রশস্ত জনাকীর্ণ রাজপথ, মনোরম বিচিত্র পণ্য বিভূষিত বিপণি, ফলভারাবনত কুসুমিত বৃক্ষরাজি শোভিত উদ্যানসমূহ এই নগরের শোভাবর্দ্ধন করিত। সাধারণের উপাসনার জন্য এই নগরে যে ধর্ম্মমন্দির ছিল, তাহা তৎকালে উচ্চতায়, পরিসরে, সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যের গরিমায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই মন্দিরে উপাসনার জন্য সম্মিলিত হওয়া ইহুদীমাত্রেই একটী বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করিত। তাহারা স্ব স্ব অথবা আত্মীয়বর্গের মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট যাহা "মানত" করিত, তাহা যথাসময়ে এই মন্দিরে লইয়া আসিয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করিত। ধর্ম্মযাজকমণ্ডলী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এই মন্দিরে বসিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। অপরন্তু এস্থানে এত অধিক লোক সমাগম হইত বলিয়া স্বার্থপর ব্যবসায়ীগণ এই দেবমন্দিরকে প্রতারণাপূর্ণ ব্যবসাস্থলে পরিণত করিয়াছিল।

যোসেফ্ ও মেরী একসপ্তাহকাল জেরুসালেমে অবস্থিতি করিয়া উৎসবান্তে নিজ

গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহারা বহুসংখ্যক যাত্রী সমভিব্যাহারে জেরুসালেম্ পরিত্যাগ করিয়া নাজারেথের পথে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর পুত্রকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে যীশু হয়ত কোন পরিচিত আত্মীয়ের সহিত পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু বহুক্ষণ পরেও যখন পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া যীশুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন না পাইয়া অতিশয় চিন্তাকুলহৃদয়ে জেরুসালেম্ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, যীশুখৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রাচীন ধর্ম্মযাজক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সূক্ষ্ম শাস্ত্রবিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নানা দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একজন দ্বাদশবর্ষীয় গ্রাম্য বালক এত অল্পবয়সে কিরূপে



দ্বাদশ বর্ষীয় বালক যীশু পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিতেছেন

এরূপ গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছে, ইহা তাঁহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

মেরী স্নেহের ভৎসনা করিয়া, পুত্রের অদর্শনে তাঁহারা কিরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানাইলে যীশু উত্তর করিলেন—"মা, তুমি কি জান না যে আমি আমার পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছি, সুতরাং তাহাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য।" মেরী এই কথার গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পুত্রকে তাঁহাদের অনুগামী হইতে আদেশ করিলেন। যীশু বিনা বাক্যব্যয়ে পিতামাতার সঙ্গে জেরুসালেম্ হইতে নাজারাথে প্রত্যাগমন করিলেন।

যিনি জগতের লোককে শিক্ষা দিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি

যে বালক বয়সে এইরূপ অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

নাজারেথ অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ছিল। বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ফল পুষ্পশোভিত নয়নাভিরাম হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতাপূর্ণ বনভূমি, উত্তুঙ্গ সুনীল শৈলরাজি, রবিকর প্রদীপ্ত নীলাকাশে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র রূপধারী মেঘমালা, মৃদুকলনাদিনী রজতকান্তি নির্ম্মলনির্ঝরিণী এবং বিচিত্র পক্ষধারী সুকণ্ঠ বিহঙ্গমদল সর্ব্বদা এই স্থানের শোভা সম্পাদন করিত। এই কমনীয় প্রকৃতির লীলাভূমিতে সরল স্বভাব পবিত্র হৃদয় কৃষক বালকদিগের সহবাসে খ্রীষ্টের মধুর জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। যে অমূল্য জীবন তিনি মানবের হিতের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে সাধুপ্রকৃতি দরিদ্র মানবমণ্ডলীর সহবাসে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

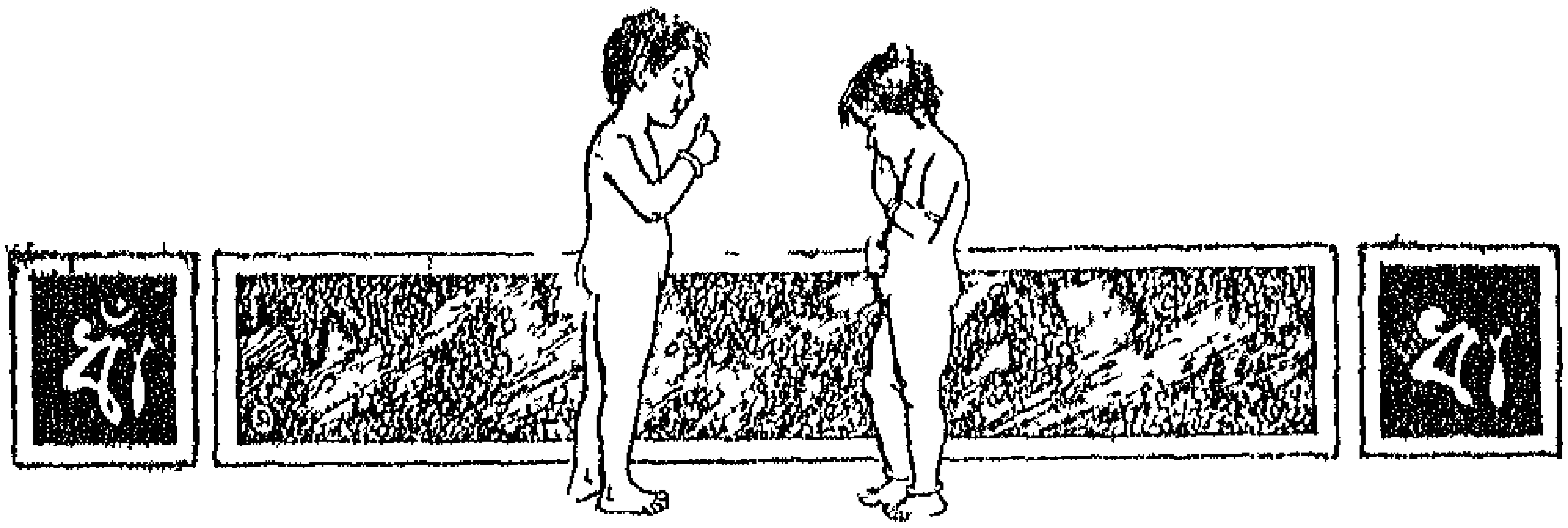
তোমরা অবশ্য শুনিয়াছ যে শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মলসলিলা কলনাদিনী সুন্দর যমুনার তটে অবস্থিত প্রকৃতির লীলাভূমি মধুর বৃন্দাবনে সরল-প্রকৃতি শুদ্ধ-চিত্ত গোপবালকগণের সহবাসে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যীশুখ্রীষ্ট ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত নাজারেথে অবস্থিতি করিয়া পরে প্রচার কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ তোমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু

এই আষাঢ় মাসে আমার দেশের প্রথম ছয় মাস শেষ হইল। যাঁহারা ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হইয়াছিলেন তাহারা আর ছয় মাসের মূল্য ১॥০ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ৩০শে তারিখের মধ্যে মনিঅর্ডার না পঁহুছিলে আমরা শ্রাবণ মাসের আমার দেশ যাণ্মাষিক মূল্য চার্জ্জ করিয়া ভি, পি করিব। কিন্তু ভি, পিতে লইতে গেলে রেজিষ্ট্রেসন বাবদ ৵০ অতিরিক্ত লাগিবে। সেইজন্য টাকা মনিঅর্ডার করাই সুবিধা।



ধাঁ ধাঁ

১। তিন অক্ষরে নাম মোর মানুষের অঙ্গ
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে বধিরের বঙ্গ
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে দূত হয়ে যাই
কি নাম আমার হবে বল দেখি ভাই

শ্রী সুদেব মুখোপাধ্যায়

২ তিন অক্ষরে নাম মোর পাঙ্ড়িয় জাতি
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে ক্ষীণ হই অতি
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে দেবী হয়ে উঠি
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে তোমার মুখে রটি

শ্রী নিত্যধন চক্রবর্ত্তী

৩। তিন অক্ষরে নাম মোর কি যাহার মাঝে
লোক বলে করনা কথা কেহ উহার সাথে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে শ্বশুড় বাড়ী যাই।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে আতঙ্কে পলাই

শ্রী জ্যোতির্ম্ময় বন্দোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা মাসের ২৫শের মধ্যে যে সকল গ্রাহক কিম্বা গ্রাহিকার নিকট হইতে ধাঁ ধাঁর উত্তর আসিবে, তাহাদের নাম শ্রাবণ মাসে আমার দেশে ছাপা হইবে। উত্তর পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে হইবে। গ্রাহক নম্বর লেখা না থাকিলে সে নাম ছাপা হইবে না। খামের উপর এক কোণায় স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

ধাঁ ধাঁর উত্তর

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিণ্টার শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৮।২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলে মেয়েদের আশা ও তৃপ্তি

শিশুতোষ সিরিজ

অশ্বিন (১৩২৭) হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

এত সস্তায় ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী এমন সুন্দর সুন্দর বই প্রকাশ করিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হয় নাই

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲, ষাণ্মাসিক ২৲, প্রতি সংখ্যা।৶০ মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে—

১	পৃথিবীর জন্ম	(বিজ্ঞান)
২।	প্রকৃতির পরাভব	(বিজ্ঞান)
৩	কানুর কীর্ত্তি	(গল্প)
৪	আর্য্য ও অনার্য্য	(ঐতিহাসিক গল্প)
৫	আজগুবি জন্মকথা	(রূপকথা)
৬	ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ	(পুরাণ)
৭।	গল্পে রামকৃষ্ণ	(উপদেশমূলক গল্প)
৮	সত্যযুগের কথা	(ঐতিহাসিক গল্প)
৯।	উদোল বুড়োর সাঁওতালী গল্প	(রূপ কথা)
১০	রামকৃষ্ণের আলো গল্প	(উপদেশ মূলক গল্প)
১১	সতী	(জীবনী)

প্রকাশক—

শিশির পাবলিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ছেলে মেয়েদের আশা ও তৃপ্তি

শিশুতোষ সিরিজ

আশ্বিন (১৩২৭) হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

এত সস্তায় ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী এমন সুন্দর সুন্দর বই প্রকাশ করিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হয় নাই।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲, যাণ্মাসিক ২৲, প্রতি সংখ্যা ।৵০ মাত্র।

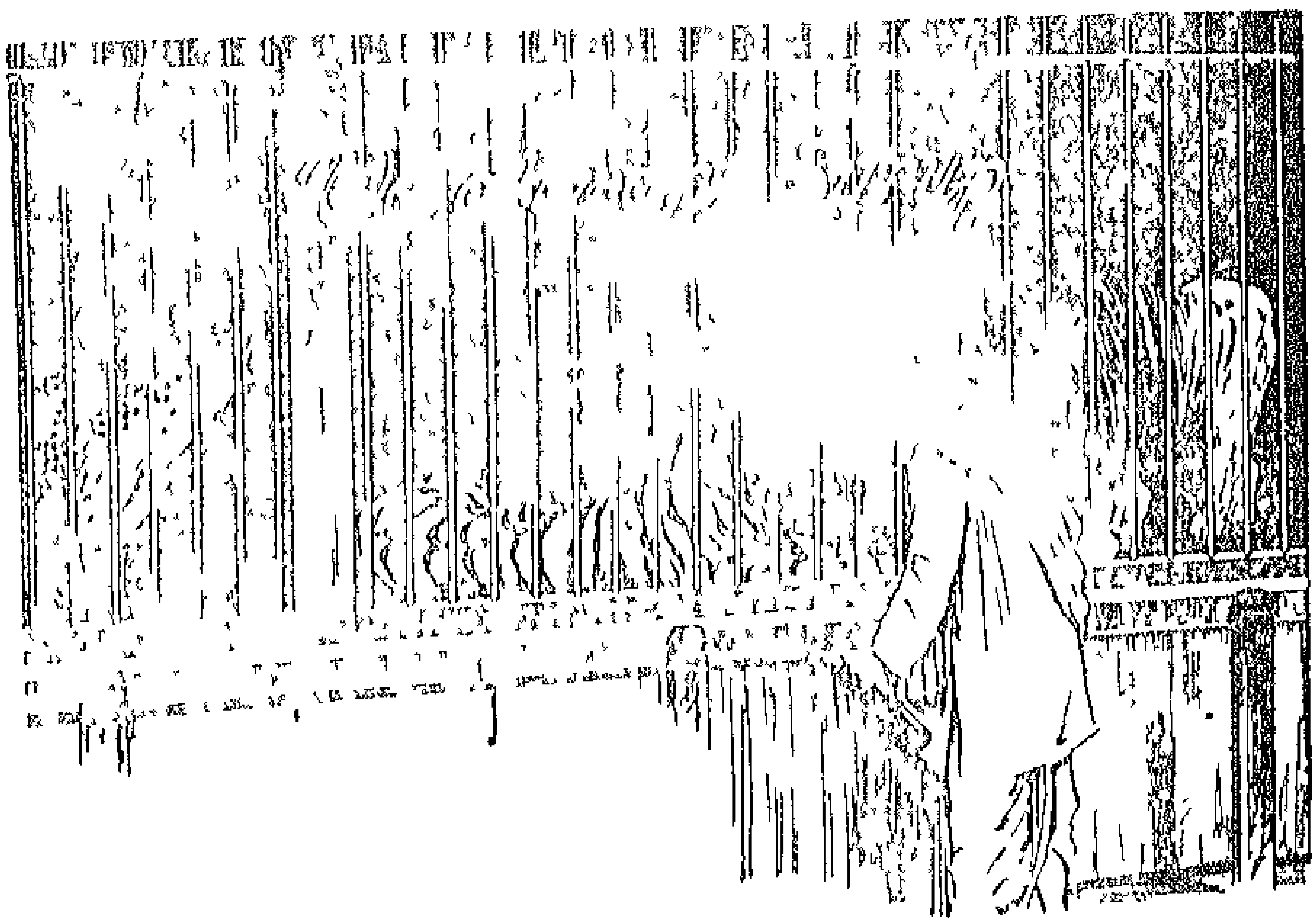
প্রকাশিত হইয়াছে—

১ পৃথিবীর জন্ম (বিজ্ঞান)
২ প্রকৃতির পরাভব (বিজ্ঞান)
৩। কালের কীর্ত্তি (গল্প)
৪। আর্য্য ও অনার্য্য (ঐতিহাসিক গল্প)
৫। আজগুবি জন্তু কথা (রূপকথা)
৬। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ (পুরাণ)
৭ গল্পে রামকৃষ্ণ (উপদেশমূলক গল্প)
৮ সত্যযুগের কথা (ঐতিহাসিক গল্প)
৯। উদোর বুড়োর সাঁওতালী গল্প (রূপকথা)

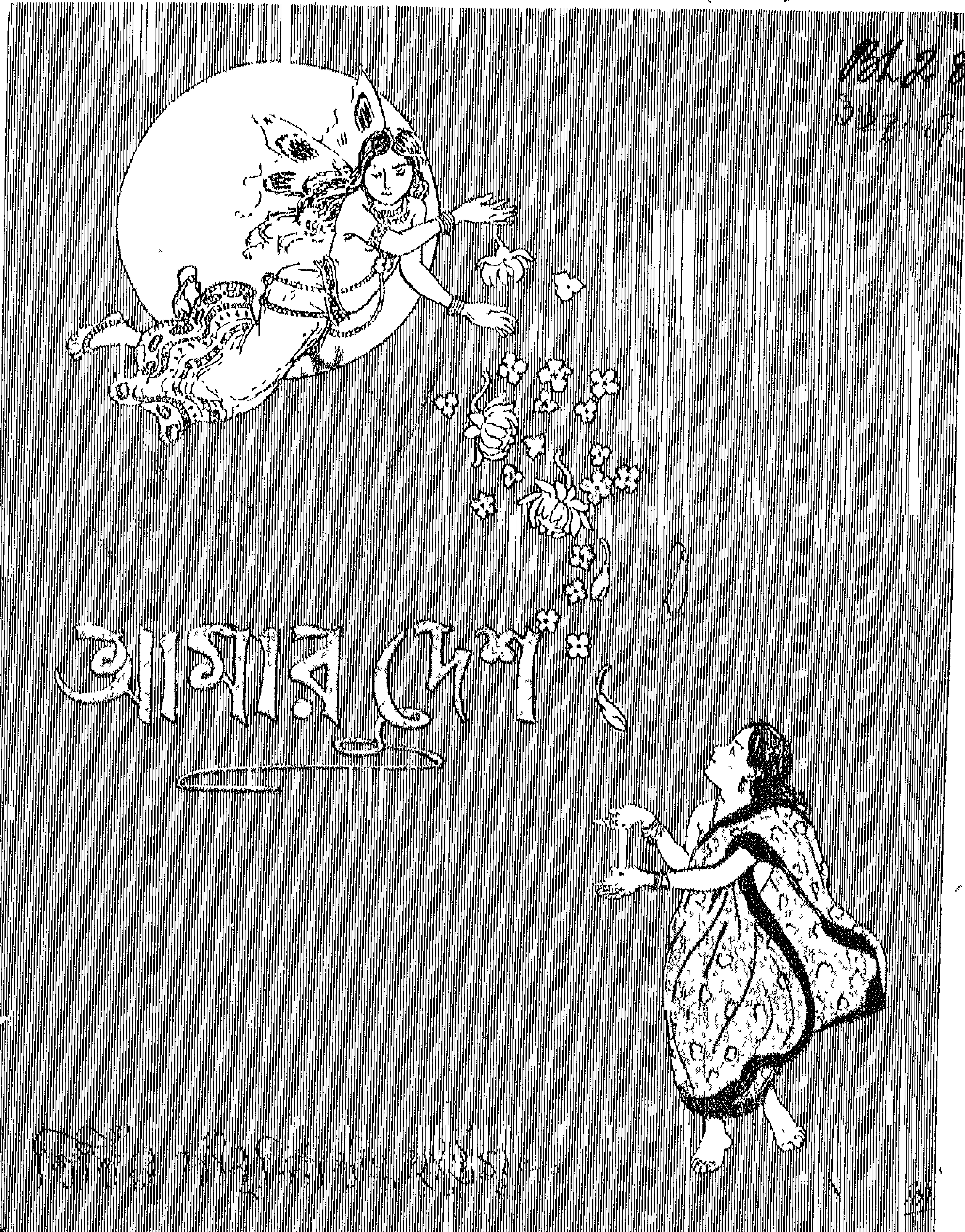
প্রকাশক—

শিশির পাবলিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।



১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩২৮



সম্পাদক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস সি

শ্রী[illegible]

ক বার্ষিক মূল্য ৩৲
াক যান্মাসিক মূল্য ১॥০
প্রতি সংখ্যা



শচি মা !

আমার দেশ

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২৮ ।

কচি-মা

দেখ্‌ছি ভাবি বিপদ আমার হ'ল তোরে নিয়ে
দুধ খেতে যে কান্না এত ছি ছি কেমন মেয়ে !
কেউ দেখেনি এমন ছেলে নেইকো কারুর ঘরে
ছিঁচ্‌কাঁদুনে বলে সবাই নিন্দা যে স করে
আমি যত 'লক্ষ্মী' বলি, 'দুষ্টু'—বলে তার —
'নইলে পরে দুধ্‌ খেতে কি কাঁদে এমন ধারা ?'
নেইকো কাপড়, নেই গয়ন—লোকের ছেলে-মেয়ে,
তবু তারা ঠাণ্ডা কেমন—থাকে সুবোধ হয়ে .
দুধ খেতে গো কেউ করেনা মাকে জ্বালাতন
চাঁদপানা মুখ হাসি লেগে আছে সকল ক্ষণ
তুই কি কেবল ছিষ্টি ছাড়া আমার কপাল গুণে —
বল দেখি মা নিন্দে কত করবে লোকে শুনে ?
লাল টুক্‌ টুক্‌ পুতি কিনে গয়না দিছি করে
রুপোলি যে হার গড়া—তায় চাঁদের কিরণ ঝরে
সাটিন্‌, জরি, রেশমেতে দেহ দিচ্ছি ঢেকে ।
ওড়্‌না —নেটের, অবাক হয়ে সবাই চেয়ে দেখে

উলের টুপি, গলাবন্ধ —এমন আছে কার ?
সোনার যাদু চুক্ চুক্ করে দুধ খাওতো ? এইবার
ফুরিয়ে গেছে, আর একটা নেই—এক চামচে মোটে
চুক্ করে খাও, নইলে যে ধন থাকবে খিদে পেটে
ঝি চাকর নেই—বেলা হল—সময় কি মা আর দেরী
রাঁধতে হবে গুছিয়ে এক ভাত ব্যাঞ্জনের কাঁড়ি
কাছে বসে দেখে দেখে এখন থেকে শেখে
ঘরের লক্ষ্মী হিঁদুর মেয়ে—এইটি মনে রেখে

রেণুর পুসি।

১

আজকে রেণু নাইক কাছে
রেণুর পুসি আজ,
কাটায় শুধু আমার সনে
সারা সকাল সাঁঝ

২

দুপুর বেলা আমার ঘরে
রেণুর কেদারায়,
রেণুর পুসি চুপটি করে
আজকে ঘুম যায়.

৩

কখন ভুলে ঘুমায় ঘোরে
আধেক মেলে আঁখি,
দেখছে বুঝি রেণু আবার
করল কোলে নাকি ।

৪

রেণু যে তায় আদর বড়
করত অবিরাম,
তার সাথেই খাওয়া শোওয়া
হাসি খেলা গান

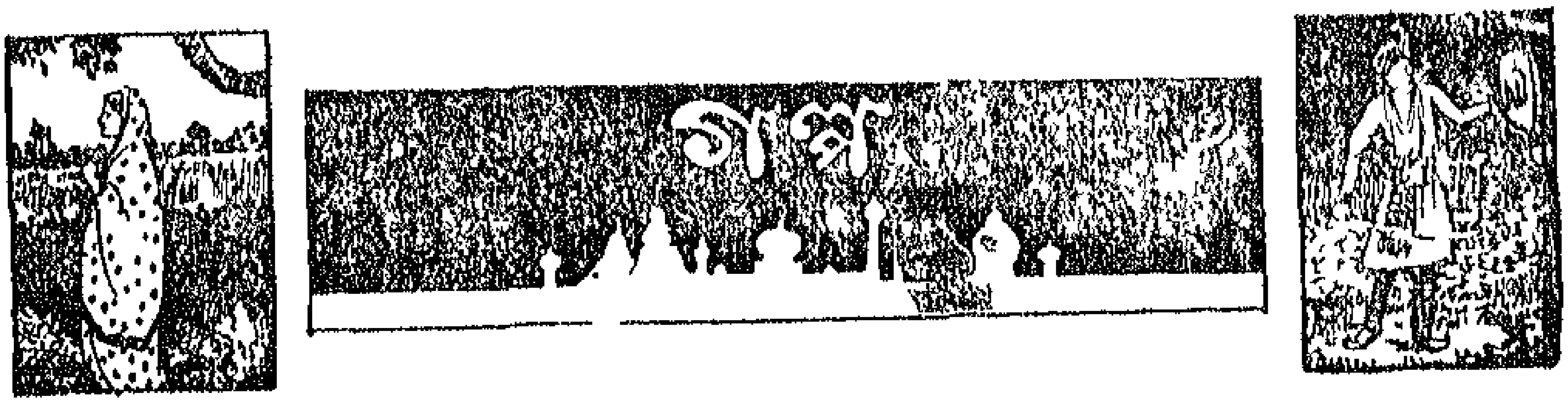
৫

আয়রে পুসি রেণুর পুসি
আয়রে বুকে আয়,
আমার মত তুইও দুখী
রেণুর তরে হায়

৬

আজ যে রেণু মামার বাড়ী
গেছে সুমধুর,
ডাকিস কেন ? শুনবে না সে,
সে যে অনেকদূর .

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত



বিদ্যার গৌরব

১

'নবরত্নের সভার জন্য উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নামে যেমন ভারত জুড়িয়া 'ধন্য ধন্য' রব পড়িয়া গিয়াছিল, তেমন আর কোন রাজার ভাগ্যে ঘটে নাই। সকল শাস্ত্রের সব চেয়ে যিনি বড় পণ্ডিত তেমনই নয়জনকে বাছিয়া বাছিয়া দেশ দেশান্তর হইতে বহু যত্নে আনাইয়া রাজা সেই সভা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তার নাম হইয়াছিল নবরত্নের সভা। আর সেই সভার প্রধান রত্ন—সবচেয়ে বড় পণ্ডিত—ছিলেন কালিদাস।

কালিদাসের নাম জানিত না এমন লোক ভারতে ছিল না, সকল দেশের বড় বড় নামজাদা পণ্ডিতেরাও তাহার কাছে হারিয়া মুখ কাল করিয়া চলিয়া যাইতেন। সেই জন্য রাজাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন—প্রাণের সমান। কালিদাস না হইলে রাজার একদণ্ডও চলিত না। সকাল বেলা সভায় আসিয়া তাড়াতাড়ি রাজকার্য্য সারিয়া লইয়া সেই যে বিদ্যার আলোচনা, শাস্ত্রের তর্ক, শ্লোক আর কবিতার বিচার লইয়া পড়িতেন আর নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকিত না। সেই সময়ে 'নবরত্নের' সকল পণ্ডিতের চাইতে কালিদাস বেশী বাহবা পাইয়া রাজাকে দিন দিন বেশী মুগ্ধ করিয়া দিতেন। সকলেই মনে মনে জানিত যে কালিদাস যাই করুন না কেন—রাজার কাছে সাত-খুন-মাপ।

এমনি দিন কাটে। হঠাৎ একদিন রাজা সভায় আসিয়া বলিলেন—"এখনি কালিদাসকে হাজির কর।"

কালিদাসের সম্বন্ধে আর কখনও তিনি তেমন করিয়া হুকুম জারি করেন নাই। তাঁর মুখের বিরক্ত ভাব দেখিয়া আর গলার কড়া ধমক শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। কালিদাসের উপর যে রাজা রাগ করিয়াছেন তা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকিল না। দূত তখনি ছুটিয়া কালিদাসকে আনিতে গেল। ব্যাপারটা কি ঘটে দেখিবার জন্য সভাশুদ্ধ লোক অধীর হইয়া পথ চাহিয়া রহিল।

১

কালিদাস আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ আমাকে তলব করেছেন ?"

সভাশুদ্ধ সকলেই নীরবে চাহিয়া রহিল। রাজা একবার তাঁহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে জবাব করিলেন—"হুঁ ম্।"

কালিদাস রাজার গম্ভীর মুখ দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন, সভাসদগণের মুখের পানে চাহিয়া বুঝিলেন যে কি ঘটিয়াছে তা কেউ জানে না। মনে মনে একটুখানি ভাবিয়া শেষে বলিলেন—

"এখনো রাজকার্য্য শেষ হয়নি মহারাজ, এরই মধ্যে আমাকে।"

বন্দীরা মাথা নীচু করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল. কোটাল ও প্রহরীরা তাহাদিগকে ঘিরিয়া নীরবে পাহারা দিতেছিল, মন্ত্রী ও সভাসদেরা—কাঠের পুতুলের মত—নিসাড় হইয়া বসিয়াছিল। সমস্ত সভা নীরব, ছুঁচটি পড়িলেও শব্দ শুনা যায়। রাজা কালিদাসের কথায় বাধা দিয়া জোর গলায় বলিলেন।

"হ্যাঁ—তোমাকেই আগে দরকার। তা হলেই ত আবার রাজকার্য্য সুরু হয়।"

"আজ্ঞা করুন।"

"করছি, আগে একটা প্রশ্নের জবাব দাও,—যে লোক বড়ো বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করে তার শাস্তি কি ?"

"প্রাণদণ্ড।"

"যদি ব্রাহ্মণ হয় ?"

"তবে—নির্ব্বাসন, ব্রাহ্মণ কিম্বা নারীজাতি—অবধ্য, তারা যদি বিদ্রোহ করে তবে চিরদিনের মত রাজ্য হইতে দূর করে দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

"উত্তম, তা'হলে তুমি দোষ স্বীকার ক'রছো ?—"

"আমি।"

কালিদাস একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, সভাশুদ্ধ লোকেরাও তেমনি হতভম্ব হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন কি—বন্দীরা পর্য্যন্ত নিজেদের কথা ভুলিয়া অবাক হইয়া চাহিল। কালিদাস বিদ্রোহ করিয়াছেন—একথাটা সকলের কাছেই ঠিক যেন স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। রাজা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—

"হ্যাঁ তুমি, তোমার ছাত্রদের কাছে বিদ্রোহ প্রচার করনি? তাদের মন থেকে রাজার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালবাসা দূর করে দেবার চেষ্টা করনি?"

"কেমন করে জানলেন মহারাজ?"

"তোমার বাড়ীর পাশ দিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসবার সময় আমি যে স্বকর্ণে শুনে এলেম"

"কি শুনলেন?"

"তুমি ছাত্রদের কি শ্লোক শিখাচ্ছিলে?"

এতক্ষণ পরে কালিদাস ব্যাপারটা বুঝিলেন, তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মনে মনে হাসিয়া বলিলেন

"নৃপতি ও বিদ্বানেতে তুলনা না হয়
স্বদেশে রাজার পূজা, তার বিশ্বময়"

রাজা ভয়ানক রাগিয়া কহিলেন—

"কি! প্রকাশ্য সভায়—আমার মুখের উপর তুমি এমন কথা বলতে সাহস কর?"

কালিদাস এবার হাসিয়া জবাব করিলেন—

"যা সত্য কথা—তা বলতে ভয় করবো কেন মহারাজ?"

"কি সত্য কথা?"

"ওই যে—নৃপতি ও বিদ্বানেতে তুলনা না হয়
স্বদেশে রাজার পূজা, তার বিশ্বময়"

"আবার?"

"একবার কেন—শতবার—সহস্রবার, এ যে ধ্রুব সত্য"

"প্রমাণ করে দিতে পার?"

"নিশ্চয়"

"উত্তম, কিন্তু যতদিন না এ কথার প্রমাণ দিতে পার ততদিন আমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, এ রাজ্য হতে তুমি নির্ব্বাসিত হলে—এখনি বিদায় হও"

"যে আজ্ঞা মহারাজ।" বলিয়া কালিদাস বীরদর্পে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেলেন

৩

মাসখানেক পরে কর্ণাটরাজ্যে, রাজার সভাপণ্ডিতের বাহির বাড়ীর দোরগোড়ায় এক মলিনবেশধারী দরিদ্র যুবক চুপ করিয়া বসিয়াছিল কাপড়-চোপড় যেমন ছেঁড়া—ময়লা, মাথার

চুলও তেমনি রুক্ষ, চোখমুখও তেমনি শুষ্ক। বিদ্যাবুদ্ধির চিহ্নটুকু পর্যন্ত নাই — ব্রাহ্মণের ছেলে হইলেও সে যে গণ্ডমূর্খ এবং ভিক্ষুক, তার দিকে একবার চোখ পড়িলেই কারও বুঝিতে বাকী থাকে না।

তখনও সকাল হয় নাই, পূর্ব আকাশে প্রকাণ্ড শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সমস্ত রাজধানী নিস্তব্ধ, কেবল দু একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভুঁড়ি নাচাইয়া মোটা টিকি দোলাইয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে নদীতে স্নান করিতে চলিয়াছিলেন। যুবক তাহাই দেখিতে দেখিতে বার বার সেই বাড়ীর বন্ধ দরজার পানে চাহিতেছিল।

বাড়ীর সদরে সভাপণ্ডিত মহাশয়ের বিখ্যাত টোল, সেখানে অনেকগুলি ছাত্র বাস করে, আর তিনি নিজে থাকেন ভিতর বাড়ীতে। ছাত্রেরা খুব ভোরে উঠিয়া—সব ঝাঁট-পাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সারি সারি পড়িতে বসে। আর পণ্ডিতমহাশয় নদী হইতে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া আসিয়া তাহাদের পড়া বলিয়া দিয়া রাজসভায় চলিয়া যান। সেই সময়ে যত উমেদার, ভিক্ষুক, প্রভৃতি লোক জড় হইয়া তাঁহার নাম ও যশে আকাশ বাতাস ভরাইয়া দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে যায়। তাঁর অনুগ্রহ না হইলে কেহই রাজসভায় ঢুকিতেও পারে না—তা রাজার কাছে দুঃখের আবেদন জানাইবে কি করিয়া?

সদোর দরজা খুলিয়া গেল। একটি ছাত্র একঘটী জল হাতে লইয়া ছিটাইতে ছিটাইতে বাহির হইয়া ভিক্ষুক যুবককে দেখিয়াই বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—

'আ মরণ, ভোর না হতেই আজ আবার এসে জুটেছিস্? বলেছি তো—মূর্খের জায়গা এটা নয়, লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা করে খেগে যা—পণ্ডিতমশাই মূর্খের সঙ্গে কথাও কন না।"

'কি করবো বলুন—মূর্খ হয়েছি বলে পেট তো মানেন, আজ দু'দিন—"

বাধা দিয়া ছাত্র বলিল—"দু দিন কি, মূর্খের দুঃখ চিরদিন, যখন লেখাপড়া শিখিসনি তখন উপোস করাটাও অভ্যাস করে রাখতে হয়। আমরা মূর্খের জন্য তাকে বলতে পারবো না।"

"আপনারা না বলুন, দয়া করে একবার দেখা করিয়ে দিন, আজ দু দিন থেকে চেষ্টা করেও পারছি না।"

"বড় বড় বিদ্বান মহামহোপাধ্যায়েরা পারেন না—তা তুই বেটা তো খাজা মূর্খ, যা—যা—দূর হ! এ কি যে সে পণ্ডিত পেয়েছিস? উজ্জয়িনীর কালিদাসের নাম শুনেছিস? —তিনিও এঁর কাছে ঘেঁসতে ভয়ে কেঁপে মরেন—তাই না ইনি রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়েছেন? রাজা তো এঁর হাতের পুতুল—যা করেন তাই হয়—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাস্ তুই, তো আস্পর্দ্ধা তো কম নয়—সাহসকে তোর বলিহারি।"

"আজ্ঞে, মূর্খ বলেই সাহসটা একটু বেশী রকম আছে—দুঃখ যা হজম করবার ক্ষমতা আছে কি না ?"

"তা তোমার কথাতে আজ তাই আছে দেখছি। ভাল কথা, তো শুনি না। যা ওইখানে বসে থাকগে। এখনি তিনি স্নান করতে বেরোবেন, কিন্তু সদ্যস্নাত চমকটা অভ্যাস আছে তো? নইলে এই বেলা সরে পড়। উঃ, ওই যে এসে পড়েছেন।"

বলিতে বলিতে ছেলেটি চোখের পলকে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সভাপণ্ডিত মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন।



সভা হোল পণ্ডিত মহারাজ

"জয় হোক পণ্ডিত মহারাজ। আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বড় উজ্জয়িনীর কালিদাসেরও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের দর্শন পেয়ে জীবন সার্থক হল।"

বলিয়াই ভিক্ষুক যুবক এমন ভাবে অভিবাদন করিল যে সভাপণ্ডিত মহাশয় একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইয়া খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। যুবক পুনরায় বলিল,

"শুনেছি দেবগুরু বৃহস্পতির বড় আর পণ্ডিত নেই, কিন্তু যা চোখের সামনে দেখছি তাতে বড় গলা করে বলতে পারি যে সে কথা মিথ্যা! উঃ কি ললাট—যেন মা সরস্বতীর

সিংহাসন এ কি স্বপ্ন দেখছি না সত্য, মানুষে কি সম্ভব ? আমি তো নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াই কিন্তু এ কি দেখছি এমন তো আর জগতে কোথাও দেখিনি ধন্য কর্ণাটরাজ—এমন পণ্ডিত যাঁর সভা উজ্জ্বল করেছেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়েও ভাগ্যবান ”

সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মনটা বোধ করি সে দিন ভাল ছিল তার উপর যুবকের এমন নির্জলা তোষামোদে একেবারে গলিয়া গেলেন। কিন্তু সে ভাব মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কে তুমি—কি চাও ?”

“আমি মূর্খ ভিখারী ব্রাহ্মণ, নরলোকে আজ যে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির দর্শন লাভ করলুম—এই আমার সাতজন্মের পুণ্যের ফল তার উপর এমন কি তপস্যা করেছি যে আপনার কাছে বর প্রার্থনা করবো—আমি মূর্খ বলে কি এমনই মূর্খ ? আমি কিছুই চাই না—আজ সকালে যে আমার জন্ম সার্থক হল—এই আমার যথেষ্ট।”

বলিয়া যুবক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সভাপণ্ডিত মহাশয় ঠিক যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—এমনই মনে হইল দেশশুদ্ধ সকলে যে নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইবার জন্য তাঁহার খোসামোদ করে তা তিনি মনে মনে বেশ বুঝিতেন কিন্তু যুবক তো কিছুই চাহিল না সে শুধু তাঁহাকে দেখিয়াই নিঃস্বার্থভাবে যেন কবিয়া স্বর্গে তুলিয়া দিল এমন তো যাহারা স্বার্থের জন্য খোসামোদ করে, তাদের কাছেও কখনো শুনেন নাই ! খোসামোদের নেশা তাঁহাকে একেবারে মাতাইয়া দিল তিনি আহ্লাদে অধীর হইয়া বলিলেন—

“না না তা কি হতে পারে—হাজার হোক ব্রাহ্মণ তুমি, তোমাকে শুধু শুধু বিদায় করলে আমার পাপ হবে বল তুমি কি চাও—আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করবো ”

“আজ্ঞে বলছি ত আমার কোন কামনা নেই ভিখারী মানুষ-একটা পেট ভিক্ষায় যা পাই আমার তাতেই হয়। আপনার যে দর্শন পেয়েছি তাতেই আমার জীবন সার্থক—জন্ম ধন্য হয়েছে, আর কিছু চাই না ”

পণ্ডিত মহাশয়ের যুবককে মাথায় করিয়া নাচিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল,—এমন ভক্ত সংসারে তাঁর আর কে আছে ? আনন্দে গদ গদ হইয়া বলিলেন—

“না, তা কিছুতেই হবেনা, তোমাকে অমনি যেতে দেব না অর্থ সম্পদ, ঘর, বাড়ী, জায়গা, জমী য চাও তাই রাজাকে বলে দেওয়াব যা প্রাণ চায় প্রার্থনা কর।”

‘ও সব নিয়ে কি করব ঠাকুর ; তবে—তবে ”

"বল—বল—যা সাধ হয় বল, এখনি তা পূর্ণ করবো "

যদি সদয় হয়ে বর দেন তবে এই চাই যে সর্ব্বদা যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পাই, আমার বিদ্যা শিক্ষার বড় সাধ "

পণ্ডিত মহাশয়ের আর আহ্লাদ রাখিবার জায়গা রহিল না, বলিলেন—"এ আর বেশী কথা কি আমি তোমাকে পুত্রের মত পালন করবো, আমার সমান পণ্ডিত করে দেব, আমার ঘরে থাক।"

"কিন্তু আপনি সারাদিন রাজসভায় থাকেন, আপনার কাছে সর্ব্বদা থাকতে না পেলে যে আমার সব বিফল মনে হবে যদি রাজসভাতে আপনার ছায়ার মত সঙ্গে রাখেন "

সভাপণ্ডিত একটুখানি কি ভাবিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা, কিন্তু প্রথম দিন তো সভায় গিয়ে রাজাকে শ্লোক শুনাতে হবে তুমি পড়েছ কতদূর ?"

"সামান্য—সে কিছুই নয় কিন্তু আপনার দয় থাকলে—"

"আচ্ছা কবিতা-টবিতা রচনা করতে পার ?"

"আপনি শিখিয়ে দিলেই পারবো "

"আচ্ছা শোন, রাজার গুণ বর্ণনা করে একটি ছোট কবিতা রচনা কর, প্রতি ছত্রে চোদ্দটি করে অক্ষর থাকবে আর প্রত্যেক দুটি ছত্রের শেষের অক্ষরে মিল থাকবে আর গানের যেমন তাল পড়ে তেমনি ছত্রের গোড়া থেকে প্রত্যেক দ্বিতীয় চতুর্থ অক্ষরে তাল পড়বে—তার নাম 'যতি' শেষের দিকে তিন-তিন করে ছ অক্ষরেও যদি দিতে পার

"আর, সব ছত্রের শেষ অক্ষরে যদি না মিলে ?"

"যেখানে মিলাতে পারবে না সেই খানে 'চ-ব-তু-হি'এর একটা লাগিয়ে দিও "

"যে আজ্ঞে ব'ল্‌ব—শুনবেন ?"

"এর মধ্যেই পারবে ?"

"নইলে আর আপনার দর্শন লাভের ফল কি ?"

"বেশ-বেশ বেঁচে থাক, বল শুনি "

"হে রাজন, তব গুণ শতমুখে কহি।

"চবতুহি—চবতুহি—চবতুহি—তুহি "

"প্রথমটা বেশ হয়েছে, কিন্তু শেষটা শুধু 'চবতুহি' হবে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে-চিন্তে মিলিয়ে নিও।"

"যে আজ্ঞে, আমি ঠিক করে আনি গে "

"বেশ গৃহে আমার সাক্ষাৎ না পাও, বরাবর রাজবাড়ীতে যেও আমি প্রতিহারীকে আদেশ দিয়ে রাখবো— তোমাকে সভায় নিয়ে যাবে ভাল কথা তোমার নামটি কি ?"

"আজ্ঞে, শ্যাম-সেবক বাব্য-ভুডভুডি "

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"বেশ তা হলে তুমি শীঘ্র এস, আজ হতে আমার গৃহেই থাকবে "

যুবক আবার অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। পণ্ডিতমহাশয় কেবল এই কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে স্নানে চলিয়া গেলেন যে এমন একটি ভক্তকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতে পারিলে, সে শতমুখে ঢাক বাজাইয়া তাঁহার গৌরব পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিবে। আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহার বুক দশ হাত ফুলিয়া উঠিল তিনি যে কালিদাসের চেয়েও বিদ্বান ও বড় পণ্ডিত সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির সমান—এমন কথা তো তাকে কেউ কখনো বলে নাই. যুবক মূর্খ হইলে কি হয়,—সে যথার্থ জ্ঞানী এবং গুণী বটে !

৪

কিন্তু, যুবক যখন যথাসময়ে রাজসভায় গিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁর কথা তো দূরে থাকুক—ক্ষুদ্র প্রহরীটি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত—সভাশুদ্ধ সবলেই একেবারে অবাক হইয়া তাহার পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল

এ কি উজ্জ্বল—অপরূপ—তেজস্বী দেব-মূর্ত্তি ! সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন সূর্য্যের আলোর মত উজ্জ্বল আভা ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, উঁচু প্রশস্ত ললাটে যেন মা-সরস্বতী মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন, চোখ দুটীর চাহনিতে যেন কোন্ স্বপ্ন-জগতের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে কে ইনি ছলনা করিতে আসিলেন ?

পণ্ডিত মহাশয় তো একেবারে ভ্যাবাচেকা মারিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন —এ কি ভোরবেলার সেই গণ্ডমূর্খ ভিখরী যুবক ! এ তিনি কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিলেন,—কার ছলনায় ভুলিয়া, নিজের হাতে খাল কাটিয়া এ কুমীরকে ডাকিয়া আনিলেন ! এই বার তাঁর মান সম্ভ্রম-ইজ্জত-পশার-প্রতিপত্তি এমন কি অন্ন অবধি বুঝিবা মারা যায় .

যুবক তাঁহার পানে চাহিয়া মনে মনে একটু হাসিল, তারপরে আটটী অপূর্ব্ব শ্লোকে এমন ভাবে রাজার গুণ বর্ণনা করিল যে তাহা শুনিয়া সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কাণে কবিতার ঝঙ্কার গানের মত বাজিতে লাগিল প্রাণে যেন অমৃতের স্রোত বহিয়া চলিল সকলেই যেন কি এক নেশার ঘোরে বিভোর হইয়া পড়িল।

রাজাও মুগ্ধ—বিহ্বল এমন কবিতা জীবনে কখনো শুনেন নাই কেবল সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া বুক ভয়ে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল রাজা বহুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি—নাম কি !"

"আমার নাম শ্যামা-সেবক কাব্য ভুড়ভুড়ি, আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত মহাশয়ের ছাত্র, রাজদর্শন কামনায় এসেছি"

রাজা পণ্ডিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আপনার এমন ছাত্র আছে এতদিন বলেন নি ? ওঁকে আজ হতে সভায় উচ্চ স্থান দিন"

সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আবেগে যুবককে বুকে চাপিয়া ধরিয়া গদগদস্বরে বলিলেন —

"তুমি আজ হতে আমার পুত্রের অধিক হলে, তোমার মহত্ত্বে ও গৌরবে আমার মুখ শতগুণ উজ্জ্বল হল।"

সেইদিন হইতে কাব্য ভুড়্ভুড়ি যুবক পরম আদরে রাজসভায় স্থান পাইল

৫

এদিকে উজ্জয়িনীর রাজসভা যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে আর লোকজন আসে না, বিদ্যার চর্চ্চা হয় না, কবিতা শুনা যায় না, শ্লোকের তরঙ্গ ছুটে না—সব যেন নিসাড়—নিস্পন্দ—প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে। 'নবরত্নের সভা'র নাম পর্য্যন্ত বুঝি লোপ পায়। একা কালিদাসের অভাবে সমস্ত রাজধানী অন্ধকার।

রাজা মনে মনে বুঝিয়া বড় কষ্ট পাইতেছেন কালিদাসকে তিনি প্রাণের মত ভালবাসিতেন। হঠাৎ ঝোঁকের বশে যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন তার জন্য তাঁর দুঃখ ও অনুতাপের সীমা নাই। হায়—এখন যদি কালিদাসকে কেউ খুঁজিয়া আনিতে পারিত ?

কিন্তু কে তা পারিবে, ক্ষুদ্র বুদ্ধি দূত ও অনুচরদের তে সে শক্তি—সে বুদ্ধি নাই। অনেক ভাবিয়া, শেষে—আর থাকিতে না পারিয়া—আপনিই ছদ্মবেশে বাহির হইয়া পড়িলেন

কিন্তু হায়রে কপাল!—দিন গেল, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, শেষে বছরও

চলিয়া যায়,—কোথাও কালিদাসের সন্ধান মিলিল না। এদিকে নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে রাজার চেহারা শুকাইয়া গেল, পোষাক-পরিচ্ছদ ময়লা হইয়া আসিল, সমস্ত টাকাকড়ি ফুরাইল—হাতে আর একটা কপর্দ্দক পর্য্যন্ত রহিল না। নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিবার পথে, কাছেই কর্ণাট সহর পড়িল, ভাবিলেন, এইখানেই শেষ খোঁজ করিয়া যাই। রাজা সেই রুক্ষ মলিন বেশে সামান্য গরীবের মত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু থাকিবেন কোথা—খাইবেন কি, হাতে যে আর একটা কানাকড়িও নাই। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ নিজের হাতের উপর নজর পড়িল। তখনো তাঁর আঙ্গুলে একটা প্রকাণ্ড হীরার আংটী ঝল্‌মল্ করিতেছিল। তিনি উৎসাহে মাতিয়া বেচিবার জন্য বাজারে এক পোদ্দারের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পোদ্দার আংটীটা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে চম্‌কাইয়া উঠিল, তারপরে রাজার পানে চাহিয়া বলিল—

"এ ঝুঁটো নয় তো? এত বড় হীরে!"

রাজার ভারি রাগ হইল, কিন্তু উপায় কি?—বিদেশ-বিভুঁই, সেখানে কে তাঁহাকে চিনিবে? কে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবে? মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিলেন—"সন্দেহ হয় যাচিয়ে দেখ্‌তে পার।"

পোদ্দার খুসী হইয়া কহিল—"বেশ, তা হলে আপনি একটুক্ষণ দোকানে বসুন, আমি দু'এক জায়গায় যাচাই করে দেখে নিই।"

বলিয়াই আংটী লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে আর শীঘ্র ফিরিল না। বহুক্ষণ বসিয়া বসিয়া রাজা যখন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন তখন হঠাৎ চম্‌কাইয়া দেখিলেন যে পোদ্দার সহরকোটাল ও কতকগুলি প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া বুক ফুলাইয়া হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। দোকানে আসিয়াই পোদ্দার তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া কোটালকে বলিল—

"এই ব্যাটা চোর—রাজা বিক্রমাদিত্যের আংটী চুরি করে পালিয়ে এই সহরে বেচতে এয়েছে, আংটীর ভিতরে এই দেখ মহারাজের নাম খোদা আছে। বাঁধ ব্যাটাকে তার পর দরবারে নিয়ে যাও।"

রাজা—অবাক! কি প্রমাণ দিবেন—কে বিশ্বাস করিবে? নিজের ময়লা ছদ্মবেশের দিকে চাহিয়া কেবলমাত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কোটাল ও প্রহরীরা মিলিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া গলায় ধাক্কা দিতে দিতে রাজসভায় লইয়া চলিল। পথের দু'পাশে লোকে

সার দিয়া দাঁড়াইয়া চোরকে য ইচ্ছ কটু বলিতে লাগিল তিনি সকল নীরবে সহিয়া নতমুখে বন্দী হইয়া রাজসভায় চলিলেন হায়রে ভাগ্য!

৬

বেলা হইয়াছে—দরবার ভাঙ্গে ভাঙ্গে। কাব্য-ভুড়ভুড়ি ঠাকুর নূতন শ্লোক শুনাইয়া সবে মাত্র থামিয়াছেন। ছাত্রের গৌরবে সভাপণ্ডিত মহাশয় অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া রাজাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ সহরকোটাল আসিয়া ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করিয বলিল—

"ভয়ানক চুরি মহারাজ- এই দেখুন চোরাই আংটী, গঙ্গারাম পোদ্দারের দোকানে বেচতে এসেছিল, সে বুদ্ধি করে তাকে বসিয়ে রেখে আমাদের খবর দিতেই আমরা গিযে গেরেপ্তার করেছি"

রাজা আংটী নাড়িয়া দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন—

"এখনি বদমায়েসকে হাজির কর"

কোটাল ছুটিয়া চলিল হঠাৎ এই ব্যাপারে সভাশুদ্ধ সকলেই নীরব হইয়া গেল পরক্ষণেই শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দে সেইদিকে চাহিয় দেখিল, এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ বন্দী হইয়া নতমুখে সভায় প্রবেশ করিতেছে।

'কাব্য-ভুড়ভুড়ি'-ঠাকুরও সেইদিকে চাহিয়াছিলেন, বন্দীকে দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ভাব সামলাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন প্রহরীরা বন্দীকে আনিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

চোরের পানে চাহিয়া রাজাও চমকাইয়া উঠিলেন,—এমন চেহারা যার সে কি চোর হইতে পারে? মনে মনে চিন্তা করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ বন্দী মুখ তুলিয়া একবার সভার চারিদিকে চাহিয়াই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—"একি স্বপ্ন? তুমি—তুমি এখানে? জয় জগদীশ্বর!"

কাব্য-ভুড়ভুড়ি-ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে—বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া—আশ্চর্য্যভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"একি? আপনি—মহারাজ বিক্রমাদিত্য. এখানে এ অবস্থায় কেন"

সভাশুদ্ধ লোক একেবারে পুতুলের মত নির্ব্বাক! বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"কালিদাস

মার্জ্জনা কর, আমার শিক্ষা হয়েছে তোমার কথাই সত্য—আমি নিজেই তার প্রমাণ। তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েই আজ আমার এ দশা।"

কর্ণাটরাজ শশব্যস্তে সিংহাসন হইতে নামিয়া নিজের হাতে রাজার শিকল খুলিয়া দিয়া মার্জ্জনা চাহিলেন, তারপরে তাঁহাকে সমাদরে সিংহাসনে বসাইয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—

"আজ ধন্য আমি—আমার সভায় দুই সম্রাটের একসঙ্গে আবির্ভাব হয়েছে। কবিসম্রাট কালিদাস আর ভারতসম্রাট বিক্রমাদিত্য। কিন্তু এ অঘটন ঘটলো কেমন করে মহারাজ ?"

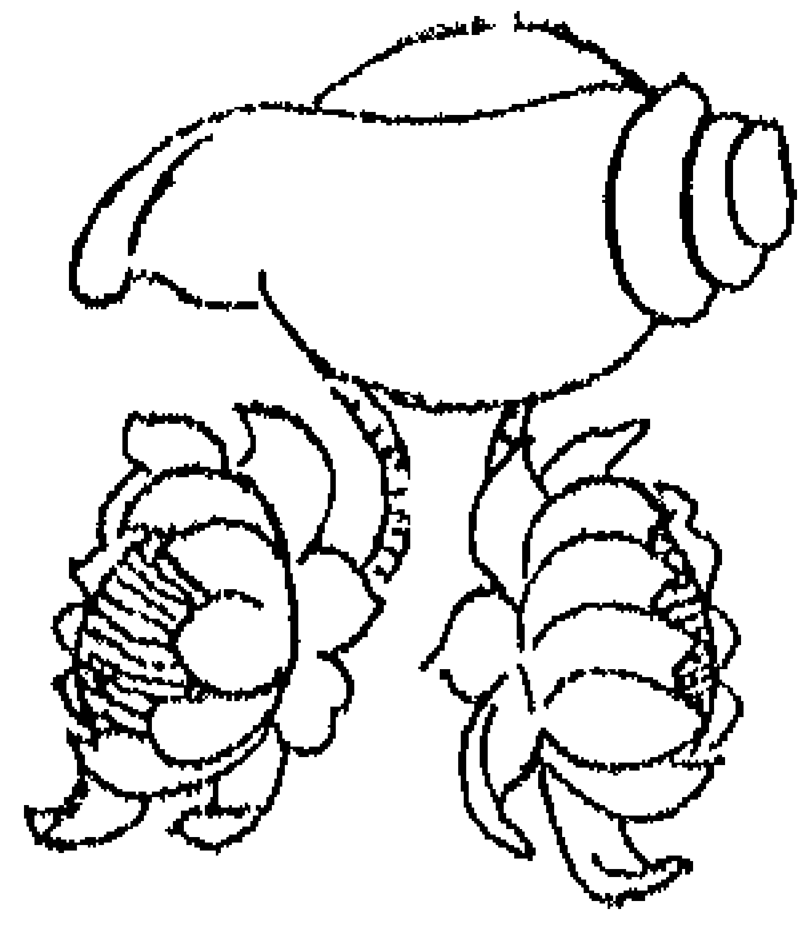
তখন বিক্রমাদিত্য সকলের সাক্ষাতে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া সকলেই যেমন আশ্চর্য্য তেমনি আনন্দিত হইল। সভাপণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় বলিলেন—

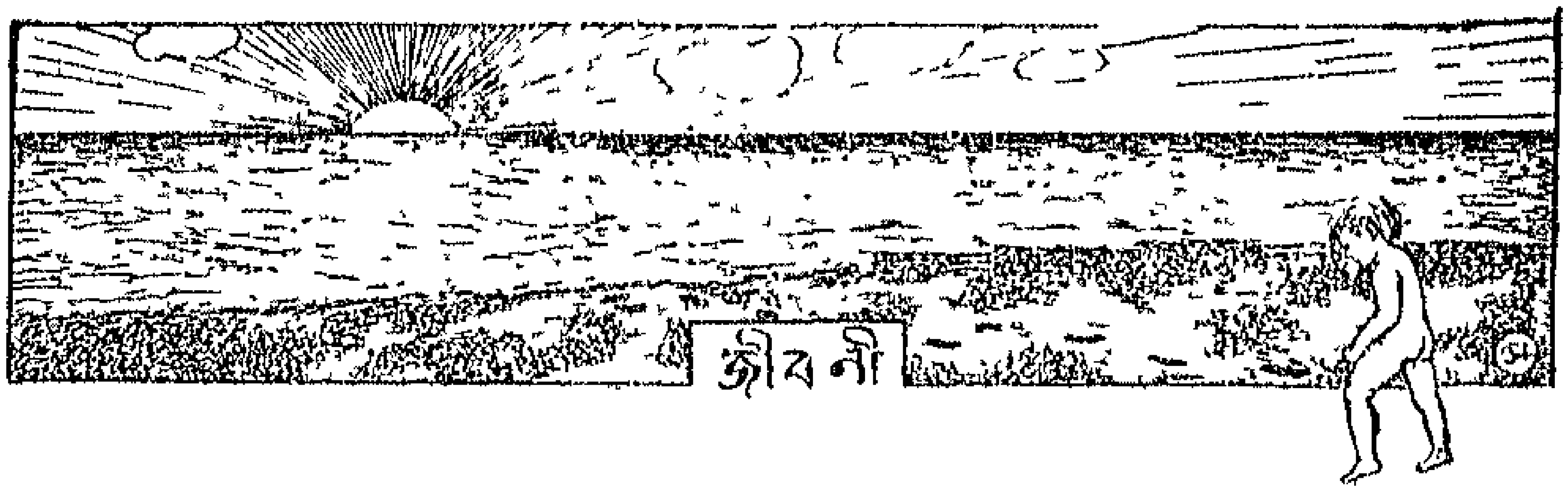
"সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশী আমার। জীবন ধন্য, জন্ম সার্থক হল। আমি কবিসম্রাট কালিদাসের গুরু—পিতার সমান, আমার চেয়ে পৃথিবীতে বড় কে ?"

"আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।"

বলিয়া যুবক কালিদাস বৃদ্ধ সভাপণ্ডিতের পদধূলি লইলেন। বৃদ্ধ আনন্দে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সকলেরই চোখ আনন্দের অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।





মা ও ছেলে।

(১)

মার গুণে ছেলে ভাল হয়, সন্তানকে সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান মা যতটা করিতে পারেন এমন আর কেহই পারেন না। দয়া দাক্ষিণ্যে, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে অমর হইয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী, দেবী ভগবতীর মতই দয়ালু ছিলেন। ভগবতী দেবীর মত মা না পাইলে বাল্যের সেই দরিদ্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর করুণার সাগর হইতে পারিতেন না। ভগবতী দেবীর করুণার একটি গল্প আজ তোমাদিগকে বলিব—

মাঘ মাসের সকাল বেলা, সেদিন ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। ভগবতী দেবী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় একটি দরিদ্রা নারী শিশুসন্তান কোলে লইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল 'মা, মা ঘরে আছেন?' নারীর পরণে একখানি শতছিন্ন, তালি দেওয়া মলিন বসন। কাপড় খানি এত ছোট যে তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা পড়িতেছে না। কোনরূপে সে লজ্জা নিবারণ করিয়া আছে মাত্র। শিশু সন্তানটির গায় এক টুকরা ছেঁড়া নেকড়া। নারী ও শিশু উভয়েই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

ভগবতী দেবী 'মা' ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। নারী বলিল "মা' শীতের জ্বালায় এই কচি ছেলেটাকে নিয়ে আর বাঁচি না। একখানা পুরাণ কাপড় যদি —"

ছেলেটির অবস্থা দেখিয়া ভগবতীদেবীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর গিয়া একখানি নূতন সেলাই করা দোলাই আনিয়া মেয়েটির হাতে দিয়া বলিলেন— "কাপড়ের চেয়ে এতেই বোধ হয় শীত ভাল মানাবে, তুমি এইটাই নাও।"

মেয়েটি 'তোমার ছেলে রাজা হোক মা,—রাজা হোক, তার সোনার দোয়াত কলম হোক' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ভগবতী দেবীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল

ভগবতী দেবীর কিন্তু সেবারকার শীত কাটাইবার সম্বল ওই একখানি মাত্র দোলাই ছিল। দেবী অপর নারীর শীতের কষ্ট দেখিয়া নিজে শীতে কত কষ্ট পাইবেন তাহা একবারও না ভাবিয়া একমাত্র শীতের কম্বল খানি দান করিলেন, আর শিশু ছেলেটি ও তার মার শীতের কষ্ট নিবারণ করিতে পারিলেন বলিয়া মনে মনে কত সুখী হইলেন।

এমন মার ছেলে না হইলে, এমন মার স্তনা রস ধরা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে না পরিলে কি বিদ্যাসাগরের প্রাণ পরের দুঃখে এমন গলিয়া যাইত! নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও কি পরের কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত! বিদ্যাসাগর ভগবতী দেবীর মত মা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন ভগবতী দেবীও বিদ্যাসাগরের মত ছেলে গর্ভে ধরিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া মা নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

(২)

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নাম বোধ হয় তোমরা সকলেই শুনিয়াছ ভারতে ঈশ্বর চন্দ্রের মত পণ্ডিত আরও অনেক জন্মিয়াছেন বিদ্যাসাগর উপাধিও আরও অনেকেই পাইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর বলিতেই আমাদিগের মনে সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নাম জাগে ঈশ্বর চন্দ্রের দয়ার ও দানের তুলনা ছিল না বিদ্যাসাগরের বহু কাহিনী বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। আজ তোমাদিগকে তাঁহার দয়ার আর একটি গল্প বলিব।

একদিন বিদ্যাসাগর তাহার এক ধনীবন্ধুর বাড়ীতে বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময় পশ্চিম দেশীয় একজন ব্রাহ্মণ চাকর তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও বিদ্যাসাগরের হাতে একখানি জরুরী চিঠি দিয়া উত্তরের অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল বিদ্যাসাগর দেখিলেন লোকটা এত দূর পথ রৌদ্রে পুড়িয়া আসিয়াছে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঘর্ম্ম ধারা পড়িতেছে। মুখ চোখ লাল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে লোকটার অবস্থা দেখিয়া বিদ্যাসাগর তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া কার্পেটের এক ধারে বসাইলেন সেখানে টানা পাখার হাওয়া চলিতেছিল। বিদ্যাসাগর হাত ধরিয়া আনিয়া সমান আসনে তাহাকে বসাইলেন। লোকটি সঙ্কোচে মাথা নামাইয়া রহিল বিদ্যাসাগর চিঠি খানি পড়িয়া তাহার উত্তর লিখিয়া লোকটির হাতে দিলেন ও তাহাকে জল খাইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া বিদায় দিলেন।

বৈঠকখানায় আরও চারি পাঁচ জন বড লোক বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর একটা সামান্য চাকরকে তাহাদের সমান আসনে বসাইয়াছেন ইহাতে মনে মনে তাহারা মহা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। লোকটি উঠিয়া গেলে বিদ্যাসাগর তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন "দেখুন, ওকে আমাদের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়েছিলেম বলে আপনারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু ও কনৌজী ব্রাহ্মণ, ওরা আমাদের হাতে বা আমাদের ছোঁয়া জিনিষ পর্য্যন্ত খায় না সামাজিক হিসাবে ওরা আমাদের নীচে নয় তবে এক কথা—ও আট বা দশ টাকা মাহিনার চাকর, কিন্তু মশায় আমি বলতে একটুও লজ্জিত হই না যে আমার পিতাও ঐরূপ মাহিনার চাকর ছিলেন আপনারা যে ভাবে ভদ্রতার জ্ঞান বিচার করেন সে ভাবে ভদ্রতা বজায় রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা অধোবদনে রহিলেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শান্তা

শান্তার বয়স ছিল ন' বৎসর, কিন্তু তবু শান্তাকে সবাই চিনিত তার স্বভাবটা এমনই যে সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিত না—এর গোয়াল ঘরে, ওর উঠানে, তার রান্না ঘরে সব যায়গাতেই শান্তা যাইয়া ছুটোপুটি করিত রামধন পোদ্দারের গাছে কটা লাউ হইয়াছে, শ্যামা কলুর কোন্ বাছুরটা আজ কোন দিকে চরিতেছিল, এ সব খবর আর কেউ না রাখিলেও শান্তা রাখিত গ্রামের গরীব দুঃখীদের পাড়ায়—যেখানে কেউ যায় না—সেইখানে শান্তা যাইয়া তাদের বাড়ী ঘর ওলোট পালোট করিয়া আসিত—তাই দেশের যত লোক তাকে ডাকিত 'শান্ত দিদি'। তা ছাড়া, তার একটা বাতিক ছিল গাছে চড়িয়া কোথায় কি আছে দেখা। একবার মস্ত উঁচু একটা গাছে চড়িয়া দেখে একটা রাস্তা অনেক দূর গিয়াছে, কিন্তু সবটা দেখা যায় না আর যায় কোথা, শান্ত সেই রাস্তা ধরিয়া সরাসর দে ছুট্, রাস্তার শেষে যাইয়া তবে নিশ্চিন্ত এমনি অস্থির, চঞ্চল ছিল শান্তা

কিন্তু একটা বিষয় শান্ত এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই ঐ যে সমুদ্রের পাশ দিয়া একটা মস্ত বড় পাহাড় উঠিয়াছে, তার একটা দিকে যে কি করিয়া যাওয়া যায়—

কুল কিনারা করিয়া তাহার সে কিছুতেই উঠিতে পারিল না। পাহাড়ের গাটা সেখানটায় এমন ঢালু হইয়া উঠিয়াছে যে, শান্তার মত ছোট্ট মেয়ের কথা থাকুক, বড়র পর্যন্ত হার মানিয়া যায় কিন্তু তবু ত সেখানে যাইতে হইবে শান্তা রোজ বিছানায় শুইয়া ভাবে, সব যায়গায় গিয়াছি, ওখানে যাই নাই, ওখানটা না জানি কি সুন্দর।

এমনি ভাবিতে ভাবিতে শান্তা একদিন বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল, এবং পোষাক না পাড়িয়াই দে ছুট সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের উপরের সেই যায়গাটায় না যাইয়া কি সে স্থির থাকিতে পারে?

শান্তা গাছের উপর উঠিয়া, লম্ফ ঝম্প করিয়া অনেক চেষ্টাতেও সেখানে যাইতে পারিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল আর তাহার পা চলে না—ক্ষুধা তৃষ্ণায় সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল

এমন সময়ে দেখে কি—একটি ছোট্টখাট্ট দু' আঙুল লম্বা মানুষ একটা ইন্দুরের গর্তে ঢুকিয়া গেল। দেখিয়া ত শান্তা অবাক, বলে কি? সত্য সত্যই দু আঙুলে মানুষ হয়। তাড়াতাড়ি শান্তা উঠিয়া বসিল উঠিয়া বসিয়া দেখে যাইবার সময় দু আঙুলের মুখ হইতে খানিকটা সন্দেশ পড়িয়া গিয়াছে শান্তার তখন ভারী ক্ষিদে, তাড়াতাড়ি সে সন্দেশ খাইয়া ফেলিল

আ নি হরি! হরি এ কি কার্য্য!—

দেখিতে দেখিতে সে দু আঙুলের চাইতেও ছোট দেড় আঙুলে হইয়া গেল

শান্তা ভাবিল, ভারী মজা হইয়াছে, এইবার ঐ গর্তের মধ্যে যাইতে হইবে। গর্তের মধ্য দিয়া একেবারে পাহাড়ের সেই যায়গাটায় হাজির শান্তা আজ ভারী খুসী, এতদিন পরে তবে সে সেখানে আসিতে পারিয়াছে

কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার!

শান্তা দেখে আশে পাশে চারিদিকে অসংখ্য হীরা মুক্তা, মণি, মাণিক্য, আরও কত কি দামী দামী পাথর। শান্তা দেখে—আরও দেখে—দেখিয়া আর সাধ মেটে না। কি সুন্দর সে গুলি দেখিতে! যত পারিল সে কাপড়ের আঁচলে ভরিয়া লইল

তারপর আর পারে না সেই সব পাথরের ভারে, আর হাটিতে হাটিতে হায়রাণ হইয়া সে তখন ফিরিয়া যাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল কিন্তু কোথায় গেল পথ? অনেক দৌড়াদৌড়ির পরও শান্তা সে পথ খুঁজিয়া পাইল না

তখন তাহার মুখ কাঁদ কাঁদ হইয়াছে, আর একটু হইলেই কাঁদিয়া ফেলে, এই সময়ে দূরে দেখে সেই দু আঙুলে মানুষটি তখনি যাইয়া দু আঙুলের কাছে বলিল,

"মশাই, বাড়ী যাব কোন পথ দিয়ে বলুন না"



ছু আঙুলে তখন শান্তাকে দেখিয়া অবাক্।

ছু আঙুলে ত শান্তাকে দেখিয়া অবাক, রাগে গর-গর করিতে করিতে বলিল,

"অরে মলো এখানে কেমন করে এলি? তোদের পরীদের হাত থেকে কি কোথাও গিয়ে নিস্তার পাব না? পাঁজি, ছুঁচো গাধা…"

শান্তা তারা ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল,

"আমি তারে মুক্তো চাই না, আমার খিদে পেয়েছে।"

"এ দেখছি একটা মানুষ, পরী নয় তা তোরা এত ছেট্ট হলি কবে হ'তে?"

পরী নয় জানিয়া ছু আঙুলের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সে তখন শান্তাকে কোলে করিয়া কত আদর সোহাগ করিল তারপর বলিল,

"খাবার খাবে, তার ভাবনা কি? কি খাবে বল" এই বলিয়া কতকগুলি পাথরে ফু দিতেই সেগুলি সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম, কচুরী, মিহিদানা, আরও কত কি সুন্দর সুন্দর খাবার হইয়া গেল

শান্তা তখন মহা আরামে সেগুলি টপাটপ পেটের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিল

আর ছু আঙুলে—সে তখন যত সব দামী দামী পাথর কুড়াইয়া কোঁচা ভরিতে ছিল।

শান্তার খাওয়া হইয়া গেলে বলিল, এখন তবে বাড়ী যাব। ছু আঙুলে আবার তাহাকে কোলে করিয়া চুমো খাইয়া বলিল,

"তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি হয়ত আমাকে খুব বদরাগী ভেবেছ, ঐ সব পাজী পরীরাই আমাকে বদরাগী করে তুলেছে। বেটাদের কাছ হতে কি কোথাও গিয়ে নিস্তার পা'বার যো নাই। যেখানে যাই সেখানেও এসে তাহারা আমার পাথর চুরী করে। তাই আমি আমার সব পাথর আজ এখান হইতে লইয়া যাইব।"

শান্তা দু আঙুলের কোল হইতে এতক্ষণে দু আঙুলের কাঁধে চড়িয়া বসিয়াছিল। বলিল,

"কোথায় নিয়ে যাবে চলো।

দু আঙুলে কোন জবাব দিল না, খালি গম্ভীর ভাবে বলিল, "হুঁ",

শান্তার খুব বুদ্ধি কিনা, সে বুঝিল দু আঙুলে সে কথা তাকে বলিবে না।

হঠাৎ শান্তার মনে হইল তাহার আঁচলেও অনেকগুলি পাথর আছে। তাই সে দু আঙুলেকে ডাকিয়া বলিল,

"ওগো মশাই, আমাকে বুঝি তুমি খুব ভাল ভেবেছ—না? আমি কিন্তু তা মোটেই নয়। আমিও তোমার অনেক পাথর চুরী করেছিলুম। মাপ করো বন্ধু।"

এই না বলিয়া সে আঁচল হইতে কত রকমের হীরা মুক্তা পাথর সব বাহির করিয়া দু আঙুলিকে দেখাইল।

দু আঙুলে তখন শান্তার উপর ভারী খুসী। সে বলিল,

"তুমি ত খুব লক্ষ্মী মেয়ে। এ গুলি সব তোমাকেই আমি দিলুম। কিন্তু খবরদার, কোথা কোথা হতে এ পেলে সে সব কথা কিন্তু কাউকে বলো না।"

শান্তা বলিল—না সে কথা সে কাউকে বলিবে না।

শান্তা তখন দু আঙুলের কথামত সেইখানেই শুইয়া পড়িল। শুইতেই যেন তাহার কি রকম ঘুম আসিল। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে সে তাহার বিছানায় শুইয়া।

শান্তা বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ভাবিল,

"ভারী মজার স্বপ্ন ত!"

তার পরই আঁচলে হাত দিয়া দেখে—কি যেন শক্ত পাথরের মত, সে গুলি তুলিয়া দেখে হীরা, মণি, মুক্তা, মাণিক্য, সব জ্বল জ্বল করিতেছে। শান্তা যখন মা, বাবার কাছে যাইয়া সব দেখাইল, তাহারা ভাবিল তাহার কি স্বপ্ন দেখিতেছে—সাতরাজার ধন এত হীরা মাণিক কোথা হইতে আসিল?

তার পর মা বলে, বাবা বলে,

"এত ধন রত্ন কোথা হ'তে আসল?"

শান্তা বলিল, সে কথা দিয়াছে সে কথা সে কিছুতেই বলিতে পারিবে না মা তখন চুমোতে চুমোতে শান্তার গাল ভরিয়া দিয়া বলিল,

"ঠিকই ত সত্যকি ভাঙ্গা যায়"

তার পর মা জিজ্ঞাসা করিল,

"এত ধোন দৌলত দিয়া কি করবি শান্তা ?"

"একটা বড় বাড়ী আর বাগান কিনব।"

"আর ?"

"সেখানে রাজ্যের যত গরীব ছেলেমেয়েদের এনে ভাল খাওয়াবে, পড়াবে, আর নিয়ে তাদের আমি সেখানে থাকব—আমি যে তাদেরই "

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

কুড়ানো ছেলের কাহিনী

(৪)

জেরম্ আমাকে ভয় দেখাইলেও মা বারবেরেঁকে আমি সব কথাই বলিতাম। কিন্তু সে সমস্ত দিনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল করিল না কাজেই সেদিন মা বারবেরেঁকে আমি কোন কথাই বলিতে পারিলাম না

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয় দেখি মা বারবেরেঁ বাড়ী নাই এদিক-ওদিকে কত খুঁজিলাম; অত সকালে কখনও তিনি বাগানে কাজ করেন না, সেখানে তাঁহার খোঁজ করিলাম সেখানেও তিনি নাই। জেরম্ আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকাইতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হইল না অবশেষে কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজেই বলিলেন—"কাহাকে খুঁজিতেছ ? মা বারবেরেঁকে ? তিনি গ্রামে গিয়াছেন ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরেবেন না "

আমার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। অত সকালে তো তিনি কখনও বাহিরে যান্ না। গেলেও, তিনি তো আমাকে একবার বলিয়া যাইতে পারিতেন। জেরমের দিকে

তাকাইলাম, তাহার চোখে কেমন একটা বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টি, আমি তাহার সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া আমাদের বাগানটিতে চলিয়া গেলাম।

বাগানটি খুবই ছোট ; গাছ, শাক সবজি তাহাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। তবু আমরা ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম। ইহার যা কিছু কাজ আমরা নিজের হাতেই করিতাম। আমার নিজের আলাদা একটুকরা জমি ছিল। সেখানে আমি আমার ইচ্ছামত গাছ রোপন করিতাম। আমার নিজের গাছগুলিতে যখন ফুল ফুটিত, কুঁড়ি ধরিত তখন আমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানটিতে আসিতাম, ফলগুলির উপর উপুর হইয়া থাকিতাম। সেগুলিকে ছাড়িয়া আমার কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না।

আজও আমি বাগানটিতে প্রবেশ করিয়া উপুড় হইয়া আমার গাছগুলি দেখিতেছিলাম। হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে চিৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। জেরম্ আমাকে ডাকিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি বাগান ছাড়িয়া উঠিলাম। ঘরে ঢুকিয়াই দেখি কল্যকার সেই বৃদ্ধটি, আর তার কুকুরগুলি।

আমার বুঝিতে বাকি রহিল না, বৃদ্ধ আমাকে লইতে আসিয়াছে। আর তার জন্যই জেরম্ আজ মা বারবেরঁকে বাড়ী ছাড়িয়া দূরে পাঠাইয়া দিয়াছে। জেরমের নিকট কান্নাকাটি করা বৃথা, তাহার মনে দয়ামায়া নাই সে আমি খুবই জানি, একবার যদি বৃদ্ধের দয়া হয়, ইহাই মনে করিয়া তাহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

ভিটোলিস্ (বৃদ্ধের নাম) সস্নেহে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—"কেন তুমি কাঁদিতেছ, আমি কখনও কাহাকে কষ্ট দিই না, আমার নিকট তুমি সুখেই থাকিবে," কুকুরগুলিকে দেখাইয়া বলিল—"আর আমার এই দলটি দেখিতেছ, ইহাদের সঙ্গে তোমার শীঘ্রই ভাব হইয়া যাইবে, ইহাদের স্নেহ ভালবাসা যখন পাইবে তখন তোমার মনে কোন খেদ, কোন দুঃখই থাকিবে না।"

হায়, মা বারবেরঁ! তুমি এখন কোথা ? আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

জেরম্ আমার কাণ ধরিয়া কয়েকবার বেশ জোরে জোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, 'মা' 'মা' করিয়া চ্যাচাইলেই কি না আমি তোকে বাড়ী রাখিব। ভাল চাস্ এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে যা, তা না হইলে কালই আমি তোকে অনাথ আশ্রমে ফেলিয়া দিয়া আসিব।"

তবু আমার কান্না থামিল না। তেমনি আমি 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

এইবার জেরম্ লাঠি তুলিয়া বলিল "ভাল চাস্ চুপ কর, তা না হ'লে এই লাঠির ঘায়ে তোর মাথা গুঁড়া করিয়া দিব।"

বৃদ্ধ ভিটোলিস তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"আহ, কেন তুমি ইহাকে শক্ত কথা বলিতেছ ? বেচারা মাকে ছাড়িয়া যাইতেছে, দুঃখ হইবে না ?"

"না জান না, এ বড় আবদারে, কয়েক ঘা পিঠে না পড়িলে কান্না থামিবে না "

"তুমি একবার এদিকে এস আমাদের কাজটা শেষ করিয়া ফেলি। এই নাও তোমার টাকা" বলিয়া চল্লিশটা টাকা বৃদ্ধ টেবিলের উপর রাখিল। "ছেলেটির কাপড় চোপড় কি আছে দাও।"

জেরম্ ঘরে ঢুকিয়া একটি পুটলি হাতে করিয়া আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—"এই সব ?"

"হাঁ, দুইটা কামিজ একটা পাজামা ইহার ভিতর আছে "

"আর কিছুই নাই ?"

"না "



বৃদ্ধ আমার হাত ধরিয়া বলিল চল

"ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার মিথ্যা কথা ধরা পড়িবে। যাক্, আমি আর গোলমাল করিতে চাই না বাছা এদিকে এস তো তোমার নাম ?"

"রিমি।"

"রিমি, এই তোমার পুটলীটী উঠাও "

শেষবারের মত আর একবার আমি তাহাদের দয়া ভিক্ষা করিলাম, তাহাদের নিকট হাত জোড় করিলাম, তাহাদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিলাম, জেরম্ আমার দিকে চোখ লাল করিয়া লাঠী উঠাইল, বৃদ্ধ আমার হাত ধরিয়া বলিল—"চল "

তা কি করি, আমি তাহার সঙ্গে চলিলাম। আমি এক পা দুই পা অগ্রসর হই আর ফিরিয়া ফিরিয়া ঘরটীকে দেখি এই ছোট্ট ঘরটীতেই বর্দ্ধিত হইয়াছি, কত সুখ দুঃখের স্মৃতি ইহার সহিত

জড়িত। আজ অপরের মত ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আর কি কখনো এখানে ফিরিয়া আসিতে পারিব? একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, চীৎকার করিলেও কেহ শুনিবে না, মা-বারবেরঁ এখন কোথায় কে জানে?

রাস্তা পাহাড়ের পাশ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুদূর পর্য্যন্ত এই পথে আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। কাজেই ইহা আমার পরিচিত। আমি পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে বার বার পিছনে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলাম। উপর হইতে নীচে অনেকদূর হইতে আমাদের বাড়ীটি দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু আর কতক্ষণ। একটু পরেই পাহাড়ের একটা মোড় ফিরিলেই আর দেখিতে পাইব না। ঐ যে ঘরটী এখনই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। হায়, কোন অজানা ভবিষ্যতের দিকে আমি চলিয়াছি, আমার সুখ-স্মৃতি পূর্ণ আনন্দময় অতীত পশ্চাতে পড়িয়া রহিল!

পাহাড়ের মাথার উপর আসিয়া যখন উঠিলাম তখন আমার আর পা চলে না। ভিটোলিসকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "বসিয়া একটু বিশ্রাম করিব কি?" তিনি খুব আনন্দের সঙ্গেই সম্মতি দান করিল। আমি একটু দূরে উঁচুতে একটা পাথরের উপর গিয়া বসিলাম। ভিটোলিস্ আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন বটে কিন্তু কাপিকে আমার পাশে বসাইয়া রাখিলেন—আমি পলাইতে পারি ইহা মনে করিয়াই তাহার এত সতর্কতা।

আমি বসিলাম কিন্তু দৃষ্টি আমাদের ছোট্ট ঘরটীর দিকে। ঐ যে তখনও ঘরটী দেখা যাইতেছে, কিন্তু কত ছোট। ঘরের পিছনের গাছগুলি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। আমাদের বড় মুরগীটাকে ছাইয়ের গাদার পাশে খুঁটিয়া খাইতে দেখিলাম। বাড়ির পিছনের ছোট ঝরণাটী কত সরু হইয়া গিয়াছে। দুপুরে ইহার ধারে বসিয়া আমি কত খেলা খেলিয়াছি। আর ঐ তো আমার ছোট্ট বাগানটী, ইহার যত্ন এখন আর কে করিবে?

হঠাৎ দূরে সাদা মতন কি একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম। এ যে একটা টুপি। এ নিশ্চয় বারবেরঁ। ঐ যে তিনি দ্রুত বাড়ির দিকে চলিয়াছেন, আমি একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিলেন। একটু পরেই আবার বাহিরে আসিলেন। ঐ যে তিনি বাগানের দিকে কি খুঁজিতেছেন।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। কাপী যে আমাকে পাহারা দিতেছে সে কথা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেও উঠিয়া তাড়াতাড়ি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা-বারবেরঁ কাকে খুঁজিতে খুঁজিতে আবার ঘরে গেলেন, আবার তখনি বাহির

হইয়া আসিলেন। আমি পাহাড়ের গায় লুকিয়া মা মা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম

আমার চীৎকারে ভিটেলিস্ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল আমার ব্যস্ত ব্যস্ত ভাব দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? কাকে ডাকিতেছ?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না, তেমনি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া এক দৃষ্টিতে ম বারবেরেঁর দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন না—এতদূর হইতে কিরূপেই বা দেখিবেন। তেমনি তিনি আমাকে খুঁজিতে লাগিলেন—কখনও বাগানে, কখনও ঘরে কখনও ঝরণার ধারে তিনি আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন আমি জোরে মা মা করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম ভিটালিস্ শক্ত করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া আমি যে দিকে তাকাইয় ছিলাম সেই দিকে তাকাইলেন এইবার তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন ছলছল চোখে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"বেচারা"

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম—"আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে ছাড়িয়া দাও"

তিনি কিছু বলিলেন না। আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"চল"

আমি জোর করিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম কত টানাটানি করিতে লাগিলাম আমার হাতে ব্যথা হইয়া গেল কিন্তু হাত খুলিল না। ভিটেলিসের চোখের ইসারায় কাপি ও জ বিনো আমার অগ্রে ও পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল

এইবার রাস্তা পাহাড়ের ধার দিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে ভিটেলিসের হাতে বন্দী হইয়া দুই কুকুরের মধ্যে পাহাড়ের মধ্যে খুটখুট করিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম একটা মোড় ফিরিতেই পাহাড়ের আড়ালে আমাদের ছোট ঘরটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীতেজেশ চন্দ্র সেন

সুকুমারী

সেদিন আকাশে আবীরের স্রোত বইয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন, আকাশ রাঙা হয়েই রইল। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ, অনেক বেলার পরে আকাশ বাতাস পৃথিবী ভরে উঠেছিল, থেকে থেকে কোকিল ডাকছিল, আর একটা পাখী বউ কথা কও বল্তে বল্তে যেন ক্ষেপে গিয়েছিল। স্নেহের সুকুমারীর আনন্দ আজ দেখে কে! পরনে দিদিমার বেনারসী শাড়ী, ওঁরি সব গয়না সুতো দিয়ে বেঁধে ছোট করে নিয়ে পরেছে, সাতনরি হার বুক ছাড়িয়ে হাঁটুর কাছে নামছে—পান খেয়ে ঠোঁট দুখানি রাঙা, কপালের উপর মস্ত এক রাঙা কাচের টিপ, ঝাঁকড়া চুল, খোঁপার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়াছে, আঁচলের খুঁটে বাড়ীর সব চাবী ঝন্ঝন্ করে বাজছে, পা দুখানি আলতায় টুকটুকে। ইচ্ছে ছিল দিদিমার মত চুড়িগুলো পরে, কিন্তু সে কেবলি খসে যায় দেখে নিজে ঘুঙুর দেওয়া মলই পরেছে, রাজার বাড়ী গুলজার। সাঁঝের প্রদীপ জ্বলবার আগে গোধূলি লগ্নেই বরযাত্রা, মা ছেলেকে বরণ করলে। কাকাবাবু যা তা মন্ত্র পড়লেন, বরের চতুর্দোলা নিয়ে ছেলেরা চল্লো, সাহানাতে নহবতের বাঁশী বাজল, আর খ্যাংরা মুড়ি নেচে নেচে ঢোল বাজালো তো আর বল্বার নয়। ছেলের মায়ের মুখে হাসি আর ধরে না, তবু চোখ ছল ছল করে এল। বরযাত্রা বাড়ীর বাগান ঘুরে এক সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বাড়ীর রাস্তার সম্মুখের গোল বারান্দায় এলো। সেই মেয়ের বাড়ী সেখানেও আজ ভারী ধুমধাম লণ্ঠন মোমবাতি, ফুলের মালা, কলাগাছ মঙ্গলঘট আর আমপাতার ছড়ায়, যেন সত্যিকার বিয়ের বাড়ী। উঠানে ছাঁদনা তলায় কেমন সুন্দর আলপনা, দিদিমা নিজে দিয়েছিলেন। মায়ের তো বিয়ে বিয়ে দেখতে নেই, পাছে অকল্যাণ হয়, ভেবে সুকুমারী সেখানে গেল না, জানলা তুলে লুকিয়ে দেখতে লাগল। কন্যাপক্ষের পুরোহিত হয়েছিলেন একজন প্রতিবেশী, সম্প্রদান করলেন মেজ কাকাবাবু, তিনি ছিলেন রাশভারী মানুষ। সাদা গরদের জোড় পরে গম্ভীর হয়ে যখন মন্ত্র পড়তে লাগলেন, তার এক বর্ণও বোঝা গেল না, গোটাকত অং বং শুনেই ছেলের মা স্থির সিদ্ধান্ত করলে সে বেদবাক্য না হয়ে যায় না। ব্যাপারটা যে খেলা, আর বিয়েটা যে পুতুলের, একথা ভুলেই গেল। তখন তার বাড়ী নিস্তব্ধ, ওদের বাড়ীতে সোর গোল। আলো বাতির গোলাপ জলের আর মণ্ডা মেঠাইএর ছড়াছড়ি—বিয়ে হলে বরকনেকে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে যখন অন্দরে নিয়ে চলে গেল,

সেখানে তার দৃষ্টি চলে না, সে মস্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে, দিদিমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বরযাত্রী সব বাড়ী ফিরেছে—তাদের খুব উৎসাহ, খাবার জোগাড় ছিল ভাল, আদর অভ্যর্থনা করেছে খুব, তারা ভারী খুসী, কণের মায়ের প্রশংসা সবারি মুখে মুখে। সুকুমারী ভাবছে কেবল সকাল কথা, যখন সে ভাল ভাল শাড়ী সুন্দর সুন্দর গয়না নিয়ে বউ আনতে যাবে। তার পর ফুলশয্যা, বউভাত কত কি হবে, কল্পনাতে যা মনের মধ্যে দেখছে মুখে তাই দিদিমার কাছে গল্ গল্ করে বকে যাচ্ছে। কথার স্রোত থেকে থেকে বাধা পেতে লাগল, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, এমন সময় হঠাৎ কণের বাড়ীর দিক্ হতে একটা কান্নার আওয়াজে তার বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠে ঘুম যে কোথায় পালাল তার আর ঠিক নেই। সে একলাফে বিছানা হতে নেমে দৌড়ে সেইদিকে গেল। গিয়ে যা শুনল, তাতে তার চক্ষু স্থির, গা ঝিম ঝিম করতে লাগল। কমলা পিসি উপুড় হয়ে পড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদছে—"হায় আমার সোণার মেয়ে বিয়ের রাতে বিধবা হল, সাপের কামড়ে বর মরেছে" একটা সাপও দেখালে, বল্লে "রোজা ডাকিয়ে সব করিয়েছি, কিছুতেই কিছু হ'ল না—মাথায় কালসাপ কেটেছে—ঝাড় ফুঁকতে আর কি হবে?"

সুকুমারী জ্যান্ত মানুষ মলে তাকে পুড়িয়ে ফেলে, তার সাধের পুতুলের—সেই দশা হবে মনে করে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে দিদিমার কাছে ফিরে এল। তার পর চারিদিকের গোলমালের মধ্যে কি যে হয়েছিল সে কথা কিছু মনে নেই। সেদিন হতে পুতুল খেলার সখ তার মিটে গেছে। পরে অনেক দিন পরে সে শুনেছিল পুতুল মরেও নি পোড়ানও নি, কে নাকি বিধান দিয়েছিল, সাপে কাটলে পোড়াতে নেই ফেলে দিতে হয়, আর এই ফেলে দেওয়াটা কমলা পিসির একটা বাক্সের মধ্যেই সমাধা হয়। সে সুযোগ বুঝে সেটিকে বার করে খেলত, তার সখীবৃন্দকে দেখাত, আর নিজের বুদ্ধির বড়াই করতেও ছাড়ত না।

সুকু বেচারী এই ব্যাপারে মনে এম্নি কষ্ট পেয়েছিল, আর খেলাধুলো দুষ্টামি সব ছেড়ে ছুড়ে এম্নি মুসড়ে থাকত যে বাড়ীর সবারি ভয় হয়েছিল, মেয়েটা শক্ত ব্যামোয় পড়বে। পড়তও বোধ হয়, যদি না ইতিমধ্যে তার জীবনে মস্ত একটা পরিবর্ত্তন ঘটত। তার কাকাবাবু বিলেত চলে গেলেন, তারা মফস্বল ছেড়ে কলকাতায় এল, ছেলেরা স্কুল কলেজে ভর্ত্তি হল, আর মেয়েদের করলেন বোর্ডার বেথুন স্কুলে। এখনকার মেয়েরা, অনেকেই এ জীবনের সঙ্গে পরিচিত, তাই কথা আজ এই পর্য্যন্তই রইল। তবে কথা ফুরোল না, নটে গাছটিও মুড়ল না, আবার গজিয়ে ওঠা আশ্চর্য্যি নয়।

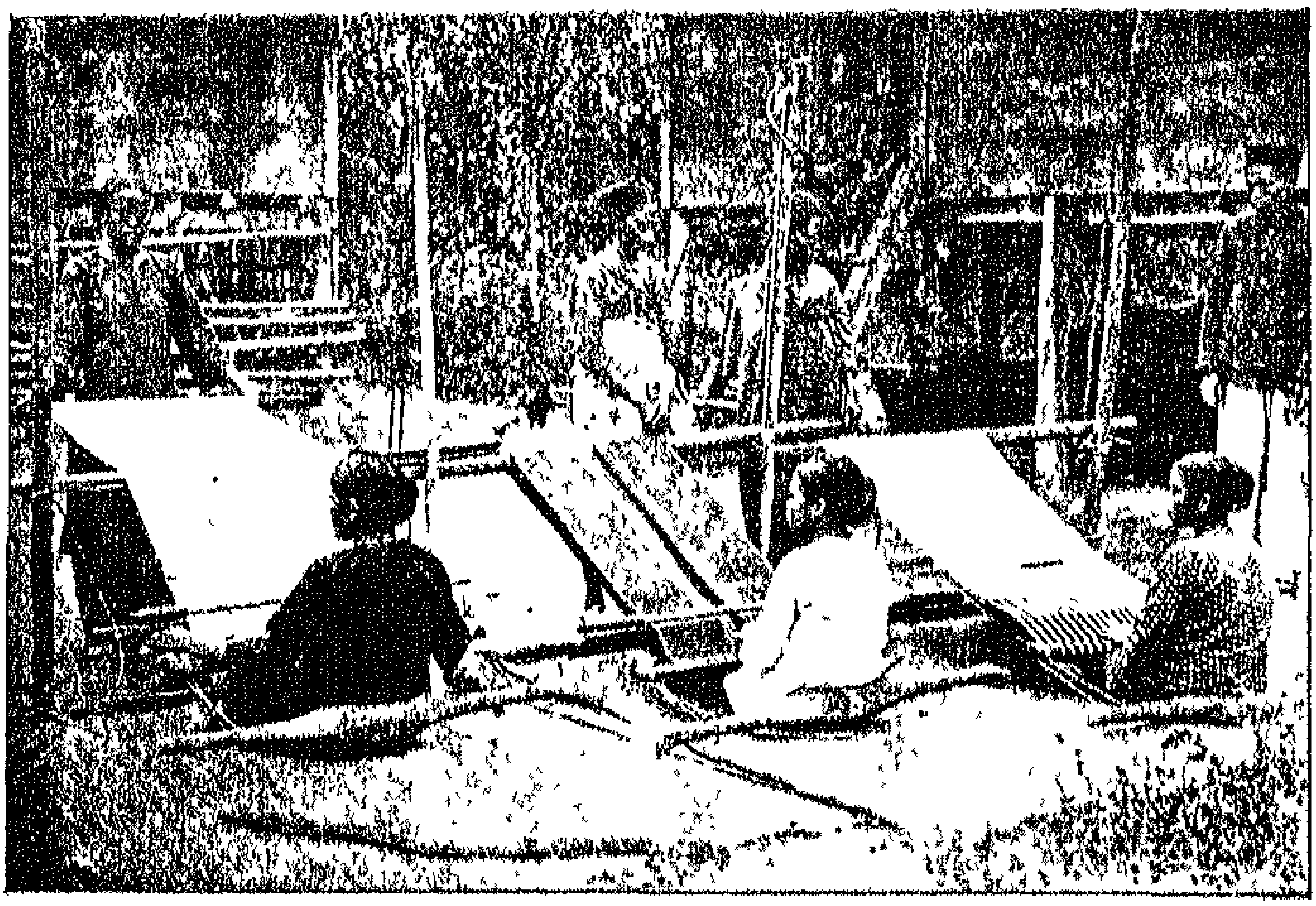
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মেয়ে মানুষ ও পুরুষ মানুষ

সমাজ, পরিবার সব মেয়েমানুষ ও পুরুষমানুষ লইয়া একের অভাবে অন্যের চলে না। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। এই হইল প্রকৃতির নিয়ম এবং এই নিয়মেই সকলের চলা উচিত।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে মেয়েমানুষই বা পুরুষমানুষকে কতটা সাহায্য করে, এবং পুরুষমানুষই বা মেয়েমানুষকে কতটা সাহায্য করে। সময়ে সময়ে পুরুষমানুষেরা বলে মেয়েমানুষেরা কোন কাজের নয় এটা কিন্তু মেয়েমানুষদের কিছুতেই সহ্য করা উচিত নয়। প্রত্যেক মেয়েমানুষের কাজ দেখাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহারা কত কাজের

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমাদের দেশের মেয়ে ও পুরুষেরা কি করে পুরুষেরা সাধারণতঃ টাকা রোজগার করে, আর মেয়েরা সাধারণতঃ সংসারের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়, অর্থের অপব্যয় না হয় এই সব দেখে সুতরাং দেখা যাইতেছে পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের জন্য যতটা করে, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষের জন্য তাহার চাইতে কিছু কম করে না।



এখন এই নিয়মের ফলে দাঁড়াইয়াছে গড়ে একজন পুরুষ রোজগার করে, আর সেই রোজগারে নিজে, নিজের স্ত্রী, নিজের ছেলে মেয়ে আর অন্যান্য আত্মীয়—আত্মীয়াদের সব খাওয়া দাওয়া চলে স্ত্রী, ছেলে, কিম্বা আত্মীয়া ইহারা পুরুষদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিলেও, পুরুষের রোজগারের কিছু সাহায্য করিতে পারে না

যাহারা বেশ দু' পয়সা রোজগার করিতে পারে, তাহাদের এ নিয়মে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই—কারণ সে যে যথেষ্ট রোজগার করিতেছে তাহার পরিবর্তে সংসারের ৩।৪টি প্রাণী দিবারাত্র তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তথাপি পরিবারের অন্যান্য সবলোক যদি তাহার রোজগারে কিছু সাহায্য করে তবে হয়ত তাহার অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু যে বেশী রোজগার করিতে পারে না যাহার একার রোজগারে পরিবারের লোকের খাওয়া দাওয়াসব ভাল ভাবে চলিতে পারে না, তাহাদের কি ব্যবস্থা করা যায় বলত। অবশ্য পরিবারের সকল লোকই ঘরে বসিয়া যতটা পারে সাহায্য করে, কিন্তু মেয়েরা ত আর বাহিরে যাইয়া রোজগার করিয়া আনিতে পারে না কাজে কাজেই টাকা রোজগারের দিক দিয়া দেখিতে তাহারা কোন কাজেই থাকে না। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে বলিয়াই অনেক লোক ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর আধপেট খাইয়া দিন কাটায়। ক্ষুধার তাড়নায় অনেক মেয়েদের রোজগার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সহসা কোন রোজগার করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না

পৃথিবীর সর্বত্রেই এই সমস্যা উঠিয়াছে দুইশত বৎসর আগে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মেয়েদেরও কোন রোজগারের পথ ছিল না কিন্তু বাধ্য হইয়া সে সব দেশে এখন মেয়েদের রোজগার করিতে বাহির হইতে হইতেছে কতকগুলি কাজ আছে যাহা মেয়েরা পুরুষদেরই মত করিতে পারে সে কাজের জন্য সে সব দেশে মেয়েদেরই রাখা হয় পুরুষদের রাখা হয় না। এই কলিকাতা সহরেই এমন অনেক বিলাতী অফিস আছে যেখানে টাইপ-রাইটিং, কেরাণী, সেলাই, প্রভৃতির কাজ শুধু মেয়েরাই করে অনেক স্থলে অনেক কম মাহিনাতে পুরুষেরা কাজ করিতে চাহিলেও তাহারা মেয়েদের বেশী মাহিনা দিয়া রাখে কেন? এইরকমে তাহারা মেয়েদের রোজগার করিতে সাহায্য করে।

মেয়েরা অফিসে যাইয়া টাকা রোজগার করিয়া আনিবে—আমাদের সমাজে এ প্রকার চলন এখন হয় নাই দিন কাটাইতে হয় একা পুরুষদের রোজগারে সংসার চালান ভার হইয়া পড়ে। অনেকে সে সবের প্রচলন সমাজে চানও না অথচ মেয়েরা কোন রকম কিছু রোজগার না করিলে অনেক সময়ে তাহাদের অনাহারে; এই অনাহারের হাত হইতে বাঁচাইবার

জন্য দেশের গরীবদের মহাত্মা গান্ধী ছেলে বুড়ো সকলকে চরকায় সূতা কাটিতে ও তাঁত চালাইতে বলিতেছেন। চরকায় সূতা কাটিতে কাহাকেও ঘর ছাড়িয়া পরের দরজায় চাকরীর জন্য উমেদারী করিতে হইবে না। অথচ ঘরে বসিয়া সব মেয়েরাই বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতে পারিবে। সকলেই যদি আলস্য ছাড়িয়া এই রকম ভাল কাজে মন দেয়, তবে কাজের অভাবে কাহাকেও অনাহারে মরিতে হয় না।

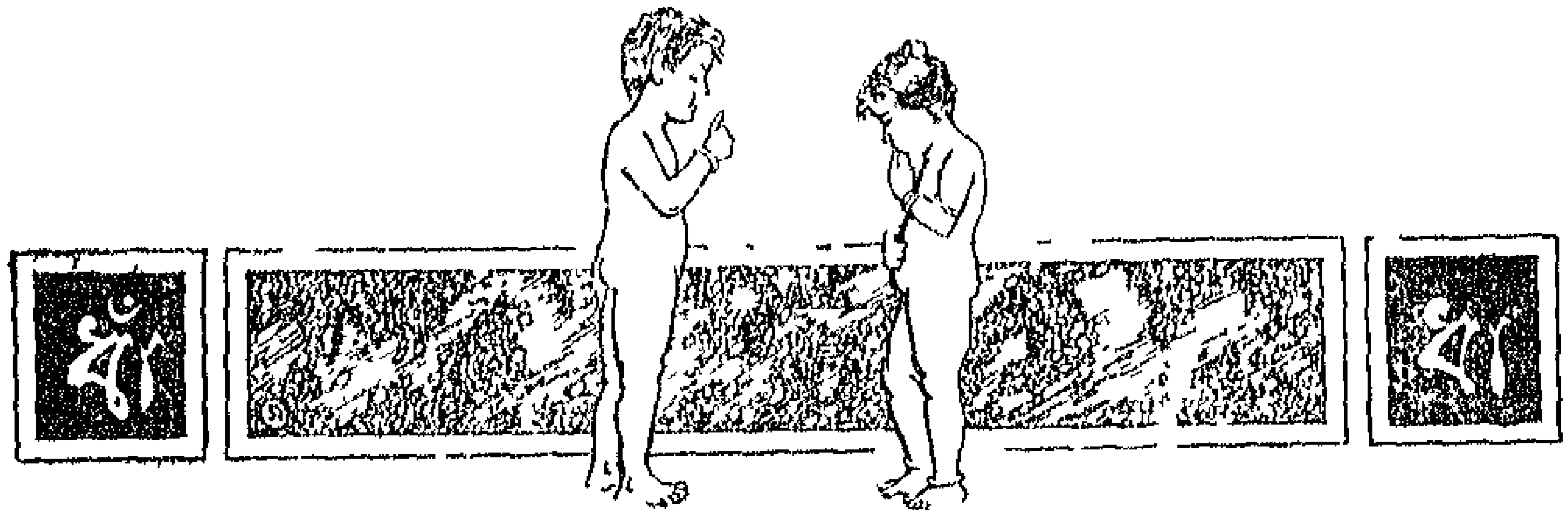
আজকাল কলে সূতা কাটা হয়—কিন্তু সেত সেদিনকার কথা। তাহার আগে সকলেই চরকায় সূতা কাটিত, ও তাঁত দিয়া কাপড় বুনিত। তখনকার কালে চরকায় সূতা কাটা মেয়েদেরই একচেটিয়া ছিল। এবং এই এক কাজ করিয়া তাহারা যে কত কোটি টাকা রোজগার করিত তাহা তোমাদের আগেই বলিয়াছি। তোমরা হয়ত জান না এখনও এমন অনেক দেশ আছে যেখানে মেয়েরাই সূতা কাটে কাপড় বোনে। ভারতের পশ্চিম দিকে কয়েকটি দ্বীপ আছে—যেমন জাভা, সুমাত্রা। সেখানকার মেয়েরা আজও পর্য্যন্ত চরকায় সূতা কাটে, তাঁত দিয়া কাপড় বোনে। পুরুষদের এ কাজে হাত দিবার যো নাই। সাহেবরা মিলের কাপড় সেখানে লইয়া গিয়া দেখিয়াছে—দেশের মেয়েদের এই কাজে এত উৎসাহ যে মিলের কাপড় সে দেশে চলে না। সকাল হইতে তাহারা ৫। ৬ জনে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করে। নিজেদের যাহা দরকার রাখিয়া বাকি সব হাটে পাঠাইয়া দেয় বিক্রী করিতে। এইরকমে তাহারা পুরুষদের সাহায্য করে।

আরও অনেক উপায়ে আজকাল মেয়েরা ঘরে বসিয়াই রোজগার করিতে পারে। আজকাল বাজারে সেলাইয়ের কল, মোজা গেঞ্জি বুনিবার কল উঠিয়াছে। অনেক মেয়েরা এইসব কাজে ১৫।২০৲ টাকা রোজগার করিয়া থাকে। এই কাজটি মেয়েদের একচেটিয়া করিয়া লওয়া উচিত।

জাপানের অনেক কাজই মেয়েরা হাতে করে। তোমরা জাপানের তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর রঙ করা কাঠের বাক্স দেখিয়াছ—সেসব বাক্সের উপর মেয়েরা তুলি ধরিয়া রঙ ফলাইয়াছে।

ঘরের কাজে পুরুষদের যাহাতে মন দিতে না হয়, মেয়েদের তাহাই সকলের আগে দেখা চাই। ঘরের কাজ শেষ করিয়া আরও দশরকমে যাহাতে তাহারা পুরুষদের সাহায্য করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই করিলেই ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রী শি—



ধাঁধা

১। মস্ত বড় একটি নগর নানান লোকের বাস।
হরেক রকম কাজ কারবার চলছে বারমাস ॥
গ্রীষ্মে গরম, শীতে শীত, বর্ষায় বর্ষণ
কিন্তু সে নগর জুড়ে আছে আবরণ

২ জলজন্তু নহে, কিন্তু বাস করে জলে।
তাড়না করিলে তাপে পঞ্চভবে চলে।
অজগর সম শ্বাসে কাঁপে সব প্রাণী
জঠরে ভীষণ অগ্নি করে হানাহানি
ভয় পেয়ে কাঁদে শিশু হুঙ্কারে তাহার।
কিন্তু মানবের করে শত উপকার

ধাঁধাঁর উত্তর

(১) চরণ (২) কাবুলী (৩) গোবর

গত মাসের তিনটী ধাঁধাঁর যাঁহারা উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রীমতী হাসিরাণী মিত্র কলিকাতা

শ্রীমান অর্দ্ধেন্দু বসু—বাঁসি, শ্রীমান শিবদাস রায় শ্রীমতী সুধারাণী বিশ্বাস ও শ্রীমান দেবব্রত বিশ্বাস—কলিকাতা, শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত—ডুমডুমা, শ্রীমান অশ্রুবিন্দু দত্ত—

সাহেবগঞ্জ, শ্রীমান বিভূতিভূষণ মিত্র—বর্দ্ধমান, শ্রীমতী হিমাংশুকণা দেবী—রাজপুর, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী—নৈহাটী, শ্রীমতী গিরিরাণী দাসী—নগর, শ্রীমতী পাতিবালি মিত্র—

যাঁহারা কেবলমাত্র দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রীমান বিজয়মোহন ও শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শিলং, শ্রীমান সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—কাণপুর, শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত—ঢাকা, শ্রীমান কামাক্ষ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, শ্রীমান সুধাংশুশেখর গুপ্ত—ঢাকা, শ্রীমান সুধীরকুমার বসু—কলিকাতা, শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী—কলিকাতা, শ্রীমতী তরুবালা দেবী—জয়নগর, শ্রীমান শশাঙ্কমোহন চৌধুরী—গৌহাটী, শ্রীমান বীরেন্দ্রচন্দ্র শেঠ—মুর্শিদাবাদ, শ্রীমতী হেমপ্রভা দাসগুপ্ত—সীলেট শ্রীমতী সুবর্ণনলিনী মুখোপাধ্যায়—দিল্লী, শ্রীমান বিভোরকুমার রায়—ময়মনসিংহ

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিদ্যোদয় প্রেস,
প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা



সম্পাদক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস, সি

শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲
সডাক ষান্মাসিক ১।০
প্রতি সংখ্যা। ১০

শিশুতোষ সিরিজের অষ্টম বই—বৈশাখ সংখ্যা

সত্যযুগের কথা

'আর্য্য ও অনার্য্যে' বৈদিক যুগের দেবতাদের গল্প, ধর্ম্মের গল্প করা হইয়াছে, 'সত্যযুগের কথায়,' সে যুগের মানুষদের গল্প করা হইয়াছে। ঠাকু'মা, দিদিমারা সত্যযুগের কথা বলিতে যাইয়া সেকালের কথা স্মরণ করিয়া প্রায়ই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। কিন্তু সে সময়কার সুখ দুঃখের কথা নিশ্চয়ই তোমরা তাঁহাদের কাছ হইতে শোন নাই। এই বইতে সেই সত্যযুগ বা বৈদিক যুগের লোকেরা কি ভাবে থাকিতেন তাহাই বলা হইয়াছে।

শিশুতোষ সিরিজের নবম বই—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

উদোলবুড়োর সাঁওতালী গল্প

সাঁওতালদের সভ্যতা, তাঁদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রূপকথা বলার ভার প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক নগেন্দ্র বাবু উদোল বুড়োর উপর দিয়াছেন ভাষার মাধুর্য্যে ও বলার ভঙ্গীতে উদোল বুড়োর গল্প গল্পসাহিত্যে অতুলনীয়।

শিশুতোষ সিরিজের দশম বই—আষাঢ় সংখ্যা।

রামকৃষ্ণের আরো গল্প

'গল্পে রামকৃষ্ণ' ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগিয়াছে, সেইজন্য রামকৃষ্ণের আরও কতকগুলি উপদেশমূলক নূতন গল্প প্রকাশিত হইল, গল্পগুলি পড়িয়া তাহারা তেমনি সন্তুষ্ট হইবে।

শিশুতোষ সিরিজের একাদশ বই—শ্রাবণ সংখ্যা।

সতী

ভারতের সেই আদর্শস্থানীয়া পতিপ্রাণা সতীদেবীর নাম বাঙ্গালার এমন মেয়ে নাই যে জানে না। আজিও দেশের মেয়েরা সতীর মত হইবার জন্য ব্রত পার্ব্বণ করিয়া থাকে। আজ বাঙালী সতী বলিতে আদর্শস্থানীয়া নারী বুঝে। সেই সতীর জীবন কথা প্রত্যেক বালকবালিকার পড়িয়া দেখা উচিত।

শিশুতোষ সিরিজের দ্বাদশ বই—ভাদ্র সংখ্যা।

উদোলবুড়োর আরো গল্প

উদোলবুড়ো ইহারই মধ্যে শিশুরাজ্যে স্থান পাইয়াছে। উদোলবুড়োর আরো গল্প শুনিবার জন্য আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকারা ব্যগ্র তাই উদোলবুড়োর আরও কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইল।

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা।

বাপ্পাবীর

রাজস্থানের প্রথম গল্প—অপূর্ব্ব ভাষায় রাজস্থানের বীরত্ব কাহিনী। পড়িতে পড়িতে ছেলেদের চিন্তার ধারা ফিরিয়া যাইবে—তাহারা এক নূতন সত্যের জ্যোতির আলোক দেখিতে পাইবে। ক্রমশঃ রাজস্থানের অন্যান্য গল্পগুলি বাহির হইবে।

সূচী



পুরুষ ও নারী অনন্তের পথে চলিয়াছে। পুরুষের অদম্য তেজোব্যঞ্জক নয়ন ও কণ্ঠের [illegible] বলিতেছে "চল"

[illegible] পৃথিবীর [illegible], [illegible] উঠিয়াছে। পৃথিবী হইতে [illegible] বিশ্বজোড়া [illegible] হইতেছে। [illegible] প্রাণ [illegible] [illegible] পথে [illegible] যাইতে [illegible] হইয়াছে — [illegible] দৃশ্য [illegible] দেখিতে পারে না। তাহার সমস্ত নারী অদম্য আজ [illegible] আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

আমার দেশ

১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩২৮

চোরের আদর

১

কনক গাঁয়ে গোপাল নামে ছিলেন দ্বিজবর,
যেমন জ্ঞানী, তেমনি মানী, তেমনি মনোহর
বহির বিশ্ব, তাহার শিষ্য, সবাই ধনবান,—
তাইতে ঘরে তিলেক তরে ছিল না অকুলান
পত্নী বিনে রাত্রি দিনে নাইকো সাথী আর,
বৃদ্ধ দোঁহে, সবার স্নেহে জীবন গুলজার

২

অমানিশার অন্ধকার ভুবন আছে ছেয়ে,
বিশাল ভবে ঘুমায় সবে আশ হারা হয়ে
দ্বিজ মশায় সুপ্ত হায়, স্বপন দেখেন কিরে,—
হেথায় চোর, আঁধারে ঘোর কাটছে সিঁধ ধীরে।
হঠাৎ জেগে, জাগান বেগে, "বামনী উঠ, উঠ,
এসেছে চোর, শমন মোর, হবে যে আজ লুট"
বামনী কয়, "নাইক ভয়, থাক চুপটী করে,
চোরের দফ করব রফা, ঢুকুক আগে ঘরে।"

ভিতর হইতে কত রকমের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম—কখনও বা ভীষণ কোলাহল, আবার কখনও বাতাসের শব্দের ন্যায় কল্লোল যেন কোন দূর বন হইতে আসিতেছে আমরা অবাক হইয়া এ-ওর মুখের দিকে তাকাইলাম

কাকাবাবু বলিলেন, "কিসের শব্দ বলিতে পার ?"

আমরা ত কিছুই জানিতাম না, কি বলিব ?

তখন কাকাবাবু তাঁহার সেই শান্ত ধীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"বাবা এই যে শব্দ শুনিলে এ কিসের শব্দ তা কি তোমরা জান ? তোমাদের মাথায়, বুকে, পিঠে সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত ছুটাছুটি করিতেছে এ তাহারই শব্দ কোথাও বা সে রক্ত ক্ষুদ্র ঝরণার মত কুলকুল শব্দে চলিয়াছে, আবার কোথাও বা জলপ্রপাতের ন্যায় গুরুরবে ছুটিয়াছে ; আবার নির্ঝরের ন্যায় কখনও বা অতি ধীরে চলে, আবার কখনও বা বড় বড় নদীর মত ভীষণ শব্দ করিতে করিতে ছোটে যেমন বৃষ্টির জল আসিয়া পৃথিবীকে বাঁচাইয়া রাখে, তেমনি এই রক্তও আমাদের দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে সজীব রাখে—ইহার গতি সর্ব্বত্র, চুলের ডগাটি হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের নখাগ্র পর্য্যন্ত। তোমরা ত পর্ব্বত গহ্বরে গান কিংবা চীৎকার করিয়া যে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়াছ এ শঙ্খের ভিতরও ঠিক তেমনি তোমার ভিতরে যে কাণ্ড চলিতেছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছ। কিন্তু, শঙ্খটি একবার খুব কাণের কাছে আনিয়া ধর দেখি, তখনও প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। কিন্তু সে প্রতিধ্বনি তোমার অন্তরের চিন্তা ও ভাবনার প্রতিধ্বনি—মনে হইবে আকাশ পৃথিবীর যত স্বর আছে সব স্বরই যেন সেখানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে আমরা প্রত্যেকেই যে এক একটি ছোট খাট পৃথিবী তাহরে মানুষ এক মুহূর্ত্তে চিন্তা ও ভাবনার রাজ্য ঐ মাথাটার মধ্যে কত যে সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার মাত্র একটা দূর আভাস পাও ঐ শঙ্খটার মধ্যে, কিন্তু তাহার শতাংশের একাংশের খবরও যদি জানিতে পারিতে তবে পরমেশ্বরের অসীম অনুগ্রহের কথা মনে না করিয়া থাকতে পারিতে না"

এই বলিয়া কাকাবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"এখন তোমরা হয়ত আমার সব কথা বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু যখন মানুষ হইবে—যখন বড় হইবে, তখন বুঝিবে আমার প্রত্যেক কথাটি কিরূপ সত্য। আর ততদিন তোমরা, বাবা, পাপের পথ হইতে দূরে থাকিও, নিজের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বশে রাখিও তোমাদের প্রত্যেকের দেহ ও মন এক একটি ছোটখাট পৃথিবী ঈশ্বর যেমন সূর্য্যকে পাঠাইয়াছেন আমাদের

এই পৃথিবী আলোকিত করিতে, তেমনি সুপ্রবৃত্তিকে পাঠাইয়াছেন আমাদের প্রত্যেকের এই ছোটখাট পৃথিবীকে আলোকিত করিতে। আলস্য করিও না, লোভ করিও না, অন্যায় করিও না, মিথ্যা বলিও না। এ সব বিশ্রী জিনিস মেঘের ন্যায় নীচ হইতে উঠিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত সুপ্রবৃত্তির আলোকের পথে ছায়া দেয়, আলোককে ঢাকিয়া রাখে। যদি তুমি তোমার প্রবৃত্তিকে এই সব মেঘের উপরে রাখিতে পার তবেই তোমাদের প্রবৃত্তি সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে এবং তাহা হইলেই তোমরা সুখী হইবে।”

কাকাবাবু চুপ করিলেন। আমরাও সেই দিন হইতে স্থির করিলাম মেঘকে কিছুতেই আর সূর্য্যের কাছে আসিতে দেওয়া হইবে না।

আজও আমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে,—কত দিন, কত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, কত কি ঘটনা তাহার পর ঘটিয়াছে কিন্তু একদিনের জন্যও শঙ্খটি পুরাণ হয় নাই। কত দিন সারা সকাল ধরিয়া শঙ্খের ভিতরের কলকল শব্দ শুনিয়াছি। তখন ভাবিতাম কি জানি? ভাবিতাম আমাদের এই ছোটখাট পৃথিবীটার কথা, যদি একটা গর্ত্ত থাকিত এবং তাহার মধ্য দিয়া সব জিনিস দেখা যাইত— কি চমৎকারই না হইত!

এমনি শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইত বুঝিবা আমার মনের সব কথাও শঙ্খের ভিতর দিয়া শুনিতে পাইতেছি, আমার চিন্তার ধারাও বুঝি বা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে ধ্বনি কখনও আনন্দের, কখনও দুঃখের।

একদিন শঙ্খটা ভারী বেসুরো বাজিতে লাগিল। সে কি কর্কশ ধ্বনি! আমি ভারি ভয় পাইলাম। কিন্তু আমার ত কিছু বলিবার ছিল না। দোষ যে আমারই। সেই কথাই বলিব।

আমি ও আমার বন্ধু একদিন মাঠে বেড়াইতেছি, এই সময়ে বন্ধু বলিল, “ঐ দেখ পাখীর বাসা, ওখানে পাখীর ছানা আছে—আমি দেখিয়াছি। কালকেই তাদের পালক গজাইবে—সুতরাং আজই কায শেষ করা চাই।”

কোথা হইতে রাজ্যের শয়তান আসিয়া আমার মাথায় চাপিয়া বসিল। দেহ মন তখন আমার মেঘে ঢাকা। কোন কথা বলিতে পারিলাম না। শয়তান আমাকে সেই গাছের তলায় ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

গাছটি ছিল খুব উঁচু তাই পাশের একটি ছোট গাছে উঠিয়া, সেখান হইতে বড় গাছে উঠিলাম। একটা ডালে পা দিয়া পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য হাত বাড়াইলাম। সেদিনকার কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই মর্দ্দ ও মাদী পাখী দুটার সে যে কি চীৎকার! আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই

তারি শব্দে কাঁদিতে লাগিলাম। যে ডালে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আর একটা ডাল কোন রকমে ধরিয়া সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

গাছ হইতে নীচে নামিয়া দেখি, পাখীর বাসা নীচের একটা খালে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে, আর পাখী দুটির করুণ, আর্ত্ত ক্রন্দনে আকাশ পাতাল কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাকে সুস্থ দেখিয়া সে ভারী খুসী। আমার তখন পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না। অতি কষ্টে বলিলাম, "কাউকে কিছু বলিও না।" বন্ধু আমার কাধ চাপড়াইয়া বলিল, "সে বিষয়ে ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"



কি হইয়াছে বল। রাত্র দুপুরে এখানে কেন?'

সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শঙ্খটি কাণের কাছে আনিয়া ধরিলাম। হরি! হরি! একি শব্দ! যেন স্রোতস্বিনী, জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন, তার মধ্যে মধ্যে পাখী দুটার সেই আর্ত্তনাদ, আর গাছ নড়ার সেই সোঁ সোঁ শব্দ। সব কথা আমার মনে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কি ভয়ানক! ভয়ে তখনও আমি কাঁপিতেছিলাম। অত চেষ্টা করিয়াও তাই ঘুম আসিল না।

এই রকম কতক্ষণ কাটিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। যতই রাত্রি হইতেছিল ততই মনে হইতে লাগিল আমার সমস্ত মনটা কাল কাল চিন্তাতে ছাইয়া যাইতেছে। কান্না আমার

গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কি জানি কেন গলায় আটকাইয়া গিয়াছিল আমি ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম

রাত দুপুরে এই যন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে কাকাবাবুর বিছানার পাশে যাইয়া দাড়াইলাম। কাকাবাবু শব্দ শুনিয়া ধরফরিয়া উঠিয়া পড়িলেন আমি তাহার শিয়রের কাছে যাইয়া দাড়াইয়াছিলাম তামাকে দেখিয়া তিনিও তেমনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, বলিলেন

"কি হইয়াছে বাবা, রাতদুপুরে এখানে কেন ?

আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কাকাবাবু, মাপ করুন আমায়, আমি ভয়ানক অন্যায় করিয়াছি।"

"কেন, কি করিয়াছ তুমি ?"

"গাছের ডালে উঠিয়া পাখীর বাসা চুরী করিতে যাইতেছি, এই সময় ডালটি ভাঙ্গিয়া পড়ে "

"কি সর্ব্বনাশ। একদম ভাঙ্গিয়া গেল "

এ যাত্রা ভগবান আমায় রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেই পাখী দুটা তাদের ছানার জন্য আমাকে ক্রমাগত শাসাইতেছে, ক্রমাগত আমার চারিদিকে তারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আমাকে ঘুমাইতে দিবে না "

কাকাবাবু গম্ভীর হইয়া আমার কথা শুনিতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না চোখের জলে তখন আমার সমস্ত বুক ভাসিয়া গিয়াছিল আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম

"কাকাবাবু, শঙ্খের ভিতর আজ কান দিয়া শুনি সেখানকার সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, হয়ত তেমনটি আর শুনাইবে না। "

কাকাবাবু তখন আমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

"এবার তোমায় মাপ করিলাম এখন শান্ত হও কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ইহাতেই যেন তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হয় একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, ঈশ্বর না করুন, যদি তোমারই এইরূপ মৃত্যু ঘটিত তবে আমার কত কষ্ট হইত। সেই শিশু পাখীর মা বাপদের ত ইহা অপেক্ষা কিছু কম দুঃখ হইবার কথা নহে তোমার আর এ কথা তখন নিশ্চয়ই মনে আসে নাই তবে এখন যখন তুমি অনুতপ্ত তখন তোমায় আমরা সবাই মাপ করিলাম।

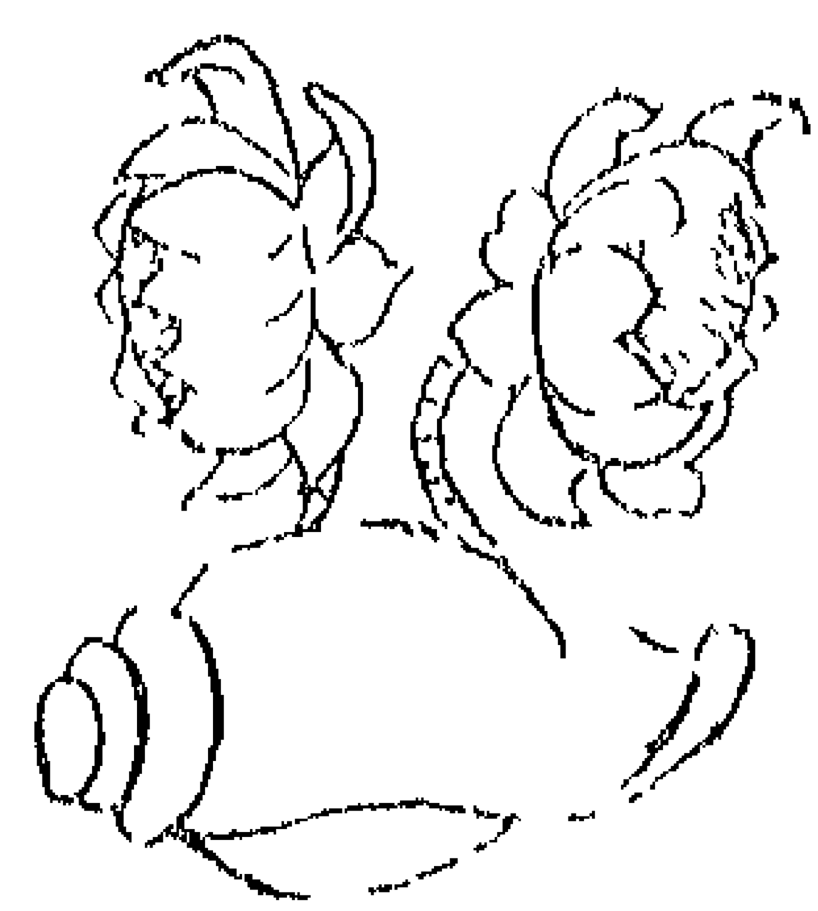
তারপর এক গ্লাস সরবৎ দিয়া আমাকে বলিলেন, "এইটুকু খাইয়া ঘুমাইয়া পড

সে বেচারী পাখীরা আর তোমার কাছে আসিবে না। পাপের জন্য যখন তুমি অনুতাপ করিয়াছ তখনই ঈশ্বর তোমায় মাপ করিয়াছেন। এখন তুমি শান্তিতে ঘুম যেতে পারিবে।"

তাহার পর আমি অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছি, বড় হইয়াছি। এখনও আমি সময়ে সময়ে শঙ্খের ভিতর কাণ দিয়া শুনি। সব সময়েই যে এখন উহাতে আনন্দের সুর শোনা যায় তাহা নয়, দুঃখের সময়, দুঃখের করুণ স্বরও শঙ্খে প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনি, কিন্তু সে দিনকার সেই পাখীর বাসা ভাঙ্গিবার পর যে ভীষণ কোলাহল শুনিয়াছিলাম, তেমনটি আর শঙ্খে কোনও দিনও শুনি নাই।

ভাই সব, মনে রাখিও, ধন থাকুক কি নাই থাকুক বিবেকের জোরায় যে ভয় পায় না সেই এ জগতে প্রকৃত সুখী।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র





বিশ্ব সম্বন্ধে নূতন কথা

বিশ্ব কত বড় এ প্রশ্ন আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল জ্যোতির্ব্বিদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে প্রত্যেকেই এক একটি মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে শেষ কথা আজও কেহ বলিতে পারেন নাই

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদ ডাক্তার হারলো শ্যাপলি (Dr. Harlow Shapley) এ সম্বন্ধে নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন হার্ভার্ডে আসিবার পূর্ব্বে মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিয়া ডাক্তার শ্যাপলি মনে করেন তিনি এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি জোর গলায় বলিতে পারেন যে আজ পর্য্যন্ত কোন জ্যোতির্বিদ সাহস করিয়া বিশ্বকে যতটা বড় বলিয়াছেন, বিশ্ব তাহার চেয়ে ন্যূনকল্পে শতগুণ বৃহত্তর

তাঁহার এ উক্তির ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় পৃথিবী নামে অভিহিত এই ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণাটিকে যত বড় অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে শতগুণ ছোট প্রমাণ হইয়া গেল

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মত এই যে পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ডনামে অভিহিত, গ্রহ, নক্ষত্র, মণ্ডল, ও জগৎসমূহের কেন্দ্রস্থল হইতে বেশী দূর নহে কিন্তু ডাঃ শ্যাপলি গণনা করিয়াছেন যে সে কেন্দ্র হইতে আমরা প্রায় ৩৬০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে এটি যে কতদূর তাহা আন্দাজ করাও সুকঠিন। একটি উদাহরণ দিয়া বলি কোন উড়ো জাহাজ যদি দিনে এক কোটি মাইল বেগে একটুও না থামিয়া চলে, তাহা হইলে বিশ্ব-কেন্দ্রে পঁহুছিতে তাহার দশ কোটি বৎসর লাগিবে।

ইহাও তাহার এক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে অদ্যাবধি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের বৃহত্তম দূরবীক্ষণ সহযোগে যত কিছু গ্রহ, নক্ষত্র, মণ্ডল ও নীহারিকা (নেবুলী) দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সেই গুলি লইয়াই এই ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ঐগুলিই যে সব, আর নাই তাহা কে বলিতে পারে ? ভগবানের সৃষ্ট জগত এইরূপ কত শত সহস্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, নক্ষত্রপুঞ্জ, মণ্ডল প্রভৃতি আছে মনুষ্যে যাহা দেখিতে পাইতেছে তাহা হয়ত ঐ অসংখ্যের অন্যতম

বিরাটপুরুষের বিরাট সৃষ্টি অতীব বিচিত্র ও জ্ঞানের অতীত মানুষ অহঙ্কারে নিজেকে কতই না বড় ভাবে, কিন্তু এক একবার তাহার এই সকলের বিরাটত্ব চিন্তা করা ভাল, তাহা হইলে সে যে ক্ষুদ্রাদপি কত ক্ষুদ্র তাহ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহার উদ্ধত হৃদয় আপনা হইতেই নম্রতায় নত হইয়া আসিবে

ডাঃ শ্যাপলি বলেন, "ব্যক্তিগত হিসাবে বলিতে গেলে, মানবের এইরূপ নৈসর্গিক নগণ্যতা প্রতিপন্ন হওয়ায় আমি আনন্দিতই হইয়াছি। বিশ্বের মধ্যে মানুষ তৃণাদপি তৃণ তাহা বুঝা তাহার পক্ষে পরম হিতকর "

শ্রীধানি লঙ্কা

তোমরা যদি পার ত একদিন ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া "Book of [illegible]" নামে একখানি বই পড়িও। বইখানি প্রাচীন মিশর ভাষা হইতে অনূদিত ইহার রচনাকাল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৭৩৩ বৎসর পূর্ব্বে এই বইখানিতে এক জায়গায় লেখা আছে—ভগবান অসিরিস বিচারাসনে উপবেশন করিয়া আছেন এক মৃত মানবের আত্মা অসিরিসের বিচারাসনের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ভগবান, আমি আলস্য করি নাই। আমি পানাসক্ত হই নাই আমি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেই নাই। আমি মিথ্যা কথা বলি নাই আমি প্রতারণা করি নাই আমি পরনিন্দা করি নাই। আমি অশ্রুপাত করাই নাই আমি ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য, তৃষ্ণার্ত্তকে বারি, ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান করিয়াছি।" কি বল ? তোমরা অসিরিসের সম্মুখে হাজির হইয়া,—সত্যভঙ্গ না করিয়া উল্লিখিত এজাহার দিতে পারিবে ?

শ্রীধানি লঙ্কা

আপন-বুঝা

সে এক কাল গিয়াছে যখন বর্গীর উৎপাতে সমস্ত বাংলাদেশ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল

'খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে
বুল বুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে

আমাদের বাংলাদেশে আজও এই গান গাহিয়া দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়াইতে দেখা যায় যে মারাঠি বর্গীর ভয়ে বাংলা কাঁপিত আজ সেই বর্গীদেরই একটি কাহিনী তোমাদের শুনাইব।

মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বর্গীরা বাঙ্গাল লুট করিতে আসিয়াছে প্রায় প্রতিবৎসরই ধন লোভে তাহারা বাঙ্গলায় আসে ও লুট তরাজ করিয়া যাহা পায় লইয়া স্বদেশে চলিয়া যায় বাংলার মুসলমান নবাবের তখন শক্তিহীন দুর্বল হিন্দুদেরও নিজেদের মধ্যে একতা নাই, তাই মারাঠাদের বাংলা লুটিবার পক্ষে ভয় বা বাধা বিশেষ কিছুই ছিল না। তাহারা ঘোড়া ছুটাইয়া পঙ্গপালের মত বংলায় আসিত বাংলার অধিবাসীগণের ধন রত্ন যাহা থাকিত, কেহ তাহা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত,—কেহ পুকুরে লুকাইয়া রাখিত গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানের মত পড়িয়া থাকিত,—বর্গী আসিতেছে শুনিলেই গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামের লোকজন সব ভিন্ন গ্রামে আশ্রয় লইত। যতদিন বর্গী এদেশে থাকিত ততদিন আর কাহারও শান্তিতে আহার নিদ্রা করিবার উপায় ছিল না

একবার বর্গী বাংলা দেশে আসিয়াছে গ্রামবাসীরা সব গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। মারাঠা সেনাপতি দেখিলেন ভারী বিপদ—দেশে খাদ্য দ্রব্য কিছুই মেলে না গ্রামের পর গ্রাম সব শ্মশানের মত পড়িয়া আছে সৈন্য সামন্তের জন্য খাদ্য নাই, অশ্বদলের জন্য কোন খাদ্য নাই—সেনাপতি মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যোদ্ধাদের খাদ্য দ্রব্যের সংগ্রহই আগে করিতে হয় পেটে খাবার না পাইলে সৈন্যদের বল-বুদ্ধি সবই চলিয়া যায় এই জন্যই বিচক্ষণ সেনাপতিরা পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার জোগাড় রাখিয়া পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পেশোয়া সেনাপতি তাহার সৈন্যদলের মধ্যে পাঁচ সাতটি ভাগ করিয়া কতক নিজেদের আহারের সন্ধানে কতক অশ্বের খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে পাঠাইলেন। অশ্বের আহারের

সন্ধানে যে দল গিয়াছিল তাহারা বহুদূর চলিয়াও একখানি সবুজ মাঠ কিম্বা বসতি গ্রাম দেখিতে পাইল না। এই ভাবে চলিতে চলিতে তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় সৈন্যেরা দেখিতে পাইল একটি বৃদ্ধ গ্রামবাসী গ্রামের পথে ধীরে ধীরে যাইতেছে। বৃদ্ধকে দেখিয়াই দলপতি তাহার নিকট ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বুড়ো, সামনে কোন শস্যের ক্ষেত আছে কি? আমাদের ঘোড়ার জন্য খাবার দরকার।"

গ্রাম্য বৃদ্ধ সেই লোকটির পরিচ্ছদ ও কথাবার্তা শুনিয়াই বুঝিল যে এ বর্গীর দল। বৃদ্ধ কহিল "আজ্ঞে হাঁ—সামনে ক্ষেত আছে বটে।"

দলপতি কহিলেন "চল্‌, আমাদের সেখানে নিয়ে চল্‌।"

দলপতি দলের আর আর সৈন্যদের লইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে একখানি সুন্দর শস্যক্ষেত্র দেখিয়া দলপতি বৃদ্ধকে বলিলেন, "বাঃ বেশ ক্ষেত, এতেই আমাদের হবে।" এই বলিয়া সৈন্যদের বলিলেন "তোমরা এই ক্ষেতের শস্য কাটতে আরম্ভ কর।"

দলপতির আদেশ শুনিয়া বৃদ্ধ করজোড়ে কহিল "আজ্ঞে, এখানে না, সামনে আরও ভাল ক্ষেত আছে—চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দলপতি বৃদ্ধের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, সম্মুখে বোধ হয় আরও ভাল ক্ষেত আছে। তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন, "বেশ, এখানে দরকার নেই, সেই ক্ষেতেই চল।"

সৈন্যরা অগ্রসর হইতে লাগিল, অনেকক্ষণ চলিবার পর আর একটি শস্যক্ষেত্র দেখা গেল। বৃদ্ধ বলিল, "সেনাপতি মহাশয়, এই ক্ষেত হতে আপনার সৈন্যরা যত ইচ্ছা ঘোড়ার খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।"

দলপতি দেখিলেন, পূর্ব্বে যে ক্ষেত দেখিয়াছিলেন, এ ক্ষেত তাহা অপেক্ষা বিশেষ ভাল কিছুই নহে, বরঞ্চ ইহাতে শস্য অনেক কম ফলিয়াছে, তবে ক্ষেতখানি একটু বড় বটে। ইহা দেখিয়া দলপতি বলিলেন, "বাপু, আমাদের এতদূর হাঁটিয়ে কষ্ট দেবার কি প্রয়োজন ছিল? আগে যে ক্ষেত দেখেছিলেম সেই ক্ষেত থেকেই তো শস্য নিতে পারতেম। এখানে তো তার চেয়ে বেশী কিছু দেখছি না।" দলপতির কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল, "সেনাপতি মহাশয়, আগে যে ক্ষেতখানি দেখেছিলেন, সেখানি আমার নয়—অপরের, আর এই যে ক্ষেতখানি এখানি আমার নিজের। এ ক্ষেত থেকে যত ইচ্ছা শস্য নেবার কথা বলবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু অপরের ক্ষেত থেকে শস্য নেবার কথা আমি কিরূপে বলি।"

বর্গী দলপতি বৃদ্ধের কথায় বিস্মিত হইলেন। এতদূর পথ বৃথা লইয়া আসার জন্য বৃদ্ধকে যে শাস্তি দেওয়ার কথা মনে মনে কল্পনা করিতেছিলেন, বৃদ্ধকে আর সে শাস্তি দিতে

তাহার মন উঠিল না। অবশেষে সসম্রমে সে একবার বৃদ্ধের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন সেনাপতি দেখিলেন, বৃদ্ধের শীর্ণ মুখে চোখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি

পরের জিনিস লুট করাই যাহাদের ব্যবসায় সেই সৈন্যরা পরের জিনিস লুট করিতে আসিয়া পরের জিনিসের উপর বৃদ্ধের শ্রদ্ধা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়ে ও পুলকে আত্মহারা হইল

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

খামকা ভিজাইল

এক ভদ্রলোক এক খালের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একটি ছেলে দাঁড়াইয়া কঁদিতেছে দয়াপরবশ হইয়া তিনি বালককে সুধাইলেন, "কি হয়েছে খোকা কাঁদছ কেন?"

ছেলেটি খালের মাঝখানে উল্টিত পতিত এক জোড়া জুতা দেখাইয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, "দাদা—

পলকমধ্যে ভদ্রলোকটি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও খানিক পরে, শুধু জুতাটি হাতে করিয়া জল ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠিলেন। চেঁচাইয়া কহিলেন, তোমার দাদাকে ত খুঁজে পাচ্ছি না খোকা, জলে পড়বার আগে সে কোথায় দাঁড়িয়েছিল বল দেখি?"

খোকা তখন বলিল, "সে জলে পড়ে নি। সে ত ঐ পালাচ্ছে। আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছিলুম যে সে আমার জুতাটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আপনি যে আমায় কথা শেষ করতেই দিলেন না"

শ্রীধানি লঙ্কা

সরল বাঙ্গালা সাহিত্য

(রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, কবিশেখর)

প্রথম পরিচ্ছেদ

১ রাজসভায় বাঙ্গালা ভাষার অনাদর

আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্ব্বে লেখা-পড়া জানা লোকেরা গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁরা ছিলেন মস্ত বড় সংস্কৃতের পণ্ডিত তাঁরা রাজসভায় টিকি নাড়িয়া বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। বল্লালসেন নামে বাঙ্গালা দেশের বড় এক রাজা ছিলেন—তিনি 'দানসাগর' নামে মস্ত এক সংস্কৃত বই রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভায় গোবর্দ্ধন নামে এক কবি ছিলেন, তিনি সংস্কৃতে যে সকল বই লিখিতেন তাহাতে এত লম্বা লম্বা সমাস থাকিত ও তার শব্দগুলি এত বড় হইত যে যাঁহাদের খুব বেশী ব্যাকরণ ও অভিধানের বিদ্যা না থাকিত, তাঁহারা সেই লেখার অর্থ বুঝিতে পারিতেন না এই লক্ষ্মণসেনের প্রিয় কবি ছিলেন জয়দেব, তিনিও সংস্কৃতে লিখিতেন, কিন্তু সে সংস্কৃত ছিল সহজ ও মধুর, তাঁহার গীত গোবিন্দের নাম কি তোমরা শোন নাই? এই পুস্তকে রাধা-কৃষ্ণের নানা আলাপ কথা আছে, বৈষ্ণবেরা এই বই খানি তাদের ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন গীত-গোবিন্দের সংস্কৃত এত সহজ যে তাহার কথা এক এক সময় বাঙ্গলার মত শোনায় "চল সখি কুঞ্জং" এই কথায় "কুঞ্জং" শব্দটির স্থানে যদি "কুঞ্জে" লিখ, তবেই ত খাটি বাঙ্গালা হইল। লক্ষ্মণসেন কখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জান? এখন ১৯২১ ইংরেজী সন ১১৬৯ ইংরেজী সনে লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং ৭৫২ বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গলা দেশের রাজা হন এই সময় ভারতবর্ষের উত্তরদিকটা, যাহাকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলা যায় তাহার প্রায় সমস্তটা মুসলমানেরা আসিয়া দখল করিয়া লইয়াছিলেন লক্ষ্মণসেনের দাড়ি গোঁপ সমস্ত যখন পাকিয়া সাদা ধবধবে হইয়া গিয়াছিল—সেই সময় বক্তিয়ার খিলিজি নামে এক মুসলমান বীর আসিয়া বাঙ্গালা দেশে যুদ্ধের জন্য হাঁক দিলেন। বুড়ো বয়সে লক্ষ্মণ রাজা আর মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া করিলেন না তাহার রাজধানী ছিল নদিয়াতে। তিনি সে জায়গা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন

জয়দেবের গীত গোবিন্দ সহজ ভাষায় লেখা হইলেও সেও সংস্কৃত ভাষা। বাঙ্গালা ভাষায় তখন কেউ বই লিখিলে রাজ-সভায় তার আদর হওয়া দূরের কথা—পণ্ডিতেরা তাহা

ঘৃণা করিতেন বাঙলা ভাষা ছিল তখন ইতরের ভাষা—তাহার স্থান ছিল পাড়াগেঁয়ে ছোটলোকদের মধ্যে এবং এবং মেয়েদের মহলে

২ মনস দেবীর গান

মেয়েরা ও ছোট লোকেরা পূজা করিত মনসা দেবীকে, পণ্ডিতেরা সেদিক দিয়া যাইতেন না তথাপি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকের তাহাদের গ্রাম্য ভাষায় গান বাঁধিয়া মনসা দেবীর পূজার দালানে উৎসব আমোদ করিত, এই গ নগুলির নাম ছিল "ভাসান গান" যদিও গ্রাম্য ভাষায় এগুলি লিখিত ছিল,—এই গানের মধ্যে তবুও খুব প্রাণের কথা থাকিত কখন কখন এই গান শুনিয়া লোকেরা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না।

ভাসান গানে দুইজনের কথা খুব চমৎকার করিয়া লেখা আছে, একজনের নাম চাঁদ সদাগর মনসা দেবী সমস্ত সাপের দেবতা কিন্তু চাঁদ সদাগর ছিলেন শিবঠাকুরের ভক্ত, তিনি কিছুতেই মনসাদেবীকে পূজা করিবেন না, এই ছিল তাহার পণ এদিকে শিবের আজ্ঞা ছিল যে চাঁদ সদাগর আগে পূজা না দিলে মনসা দেবীর পূজা জগতে প্রচারিত হইবে না মনসা দেবী চাঁদ সদাগরকে পূজায় মত লওয়াইতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু চাঁদ কিছুতেই রাজি হইলেন না দেবী রাগিয়া গিয়া চাঁদের সখের বাগানটি সাপের বিষ দিয়া পোড়াইয়া দিলেন, তার পর একে একে সদাগরের ছয়টি পুত্রকে বধ করিলেন কিন্তু তবুও চাঁদ তাঁহাকে পূজা করিতে স্বীকার করিলেন না, তাঁহার একটি হেঁতাল গাছের লাঠি ছিল, তিনি সেইটি হাতে লইয়া দেবীকে মারিবার জন্য তাড় করিয়া যাইতেন একবার চাঁদ সাত ডিঙ্গা নানা বহুমূল্য সামগ্রীতে বোঝাই করিয়া বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, দেবী ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ডিঙ্গাগুলি কালীদহের হ্রদে ডুবাইয়া দিলেন চাঁদ সদাগর জলে ডুবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু চাঁদ মরিয়া গেলে দেবীর পূজা ত জগতে প্রচার হইবে না, এই জন্য দেবী তাঁহার সিংহাসন হইতে মস্ত বড় একটা পদ্মফুল জলে ফেলিয়া দিলেন, সেই বড় পদ্মটার উপর ভর করিয়া যেন চাঁদ জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারে, এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা মনসা দেবীর এক নাম পদ্মা। চাঁদ সেই পদ্মটা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতে যাইয়া তাঁহার মনে পড়িল মনসা দেবীর নাম পদ্মা, সুতরাং পদ্ম ফুলের নামের সঙ্গে দেবীর নামের একটু মিল আছে তখন চাঁদ ঘৃণায় হাত ফিরাইয়া লইলেন, এবং জলে ডুবিয়া মরিবেন স্থির করিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলেন। এত বড় ছিল তাঁহার তেজ এবং দেবীর উপর রাগ

তিনি মরিলেন না তাঁহার আর একটি পরম সুন্দর পুত্র হইল দৈবজ্ঞের গণিয়া বলিল, বিবাহের রাত্রে মনসাদেবীর সাপে পুত্রটিকে কামড়াইয়া মারিবে চাঁদ পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু কোনরূপে সাপ বাসরঘরে ঢুকিতে না পারে এই জন্য লোহা দিয়া সাতালী

পর্বতের উপর ঘর নির্মাণ করিলেন। চারিদিকে অনেক সেপাই সান্ত্রী ঘরটি ঘিরিয়া রহিল। শত শত ওঝা নানারূপ ঔষধ সেই বাসরঘরের চারিদিকে পুঁতিয়া রাখিল, যাহাতে সাপ সেই গন্ধে ঘরের কাছে না আসিতে পারে। তোমরা হয়ত জান বেজী ও ময়ূর সাপ মারিতে পারে। সদাগর শত শত বেজী ও ময়ূর বাসর ঘরের আশে পাশে ছাড়িয়া দিলেন, বেজীগুলি থাবা তুলিয়া বসিয়া রহিল ও ময়ূরেরা পেখম ধরিয়া সাপ মারিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিন্তু তবুও চাঁদ তাঁহার প্রিয়তম ছেলেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। দেবতার সঙ্গে মানুষের লড়াই, এতে কি কখন জয় হইতে পারে? দেবীর সাপ কালনাগিনী একটা ছিদ্র পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া চাঁদ বেনের ছেলে লখীন্দরকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিল।

আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছি ভাসান গানের দুইটি লোক বড় চমৎকার। চাঁদ সদাগর তার প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয়টি বেহুলা,—চাঁদের পুত্রবধূ।

বেহুলা লাল চেলী পরিয়াছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর সে থান কাপড় পরিল না, সে তার কপালের সিন্দূর মুছিয়া ফেলিল না, সে হাতের শাঁখা ভাঙ্গিল না, তার খোঁপা হইতে মালতী ফুলের মালা খুলিয়া ফেলিল না, এবং গলার হীরার হার, হাতের অনন্ত ও কঙ্কণ এবং পায়ের নূপুর খুলিয়া সে বিধবা সাজিল না। সে একটা কলাগাছের ভেলা তৈরী করাইয়া মৃত স্বামীকে লইয়া তার উপরে উঠিল এবং গাঙুড় নদীর কালো ঢেউএর উপর বিদ্যুতের মত ভেলা চালাইয়া



বেহুলা ও লখীন্দর—ভেলার উপর ভাসিয়া চলিয়াছে

দিয়া স্বামীকে প্রাণ দেবে—এই সংকল্প করিয়া চলিয়া গেল। নদীর দুই পারে দাঁড়াইয়া লোকেরা দেখিল যেন সাক্ষাৎ সাবিত্রী যমরাজের সঙ্গে যুবাপড় করিতে ছুটিয়াছেন।

মনসাদেবীর কৃপায় বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, সে তাহার ছয়টি মৃত ভাসুরকেও বাঁচাইয়াছিল। তাহা ছাড়া দেবীর কৃপায় চাঁদ সদাগরের সাত ডিঙ্গা সমস্ত দ্রব্যাদি সমেত কালিদহের জল হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু তাহার আসল বাহাদুরী, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ তাহার শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়া সে মনসা দেবীর পূজা করাইয়াছিল। এই হইল মনসাদেবীর গানের বিষয়। সেই পুরাণকালের ভাষা, তাহার কোন শ্রী নাই, কথার লালিত্য নাই, কিন্তু তবুও যদি বেহুলার দুঃখের কথা পড়, তবে তোমারও চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িবে। কোন সময় হইতে যে মনসা দেবীর গান রচনা হইয়া আসিতেছে তাহা বলা যায় না—আমরা এই গানের যতজন লেখকের নাম পাইতেছি, তাঁদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা পুরাতন হরিদত্ত—ইঁহার বাড়ী ছিল সম্ভবত বাখরগঞ্জ জেলায়। ইনি ইং ১২০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়,—সুতরাং তিনি ৭০০ বছর আগেকার লোক। ইঁহার লেখার কতক কতক নমুনা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার প্রায় ২৫০ বছর পরে ঐ জেলায়ই ফুলশ্রী গ্রামে বৈদ্য সনাতনের পুত্র বিজয়গুপ্ত খুব বড় একখানি ভাসান গান রচনা করেন। যখন ইনি পুস্তক লেখেন তখন বাঙ্গালার সম্রাট ছিলেন 'হুসেন সা'। তখন ফুলশ্রী গ্রামের উত্তরে এক মহা প্রতাপশালী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার নাম ছিল অর্জ্জুন।

বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল এতটা আদর ও সম্মান পাইয়াছিল যে ৪০০ বছর আগে রচিত হইলেও এই বই এখনও বাঙ্গালা দেশে শত শত লোক পড়িয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন ঘরে ঘরে মনসাদেবীর পূজা হয়। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় মনসাদেবীর পূজার মণ্ডপে মেয়ে পুরুষেরা একত্র হইয়া এই বই গানের ছন্দে পড়িয়া থাকেন। বইখানির আকার নেহাৎ ছোট নয়। তোমরা কাশীদাসী মহাভারত দেখিয়াছ, বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলের আকার প্রায় তার অর্দ্ধেক হইবে। ভদ্র ঘরের পুরুষ ও মেয়েরা দুইটা পৃথক জায়গায় বসিয়া যান। ইতর লোকের পুরুষ মেয়েরাও তাঁহাদিগের কাছেই বসিতে পায়। স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে একজন বুড়া ভাল গায়ক এক ছত্র গাহিয়া দেন,—পুরুষের দল এবং পরে মেয়েরা একত্র হইয়া সেই গানের দোহারী করেন, এই ভাবে গান জমিয়া উঠে। যখন বেহুলা স্বামীর মরা দেহ লইয়া গাঙুড়ে ভাসিয়া যান,—তখন স্ত্রীলোক পুরুষ একত্রে কাঁদিয়া গাহিতে থাকেন। যাঁহারা

গান করেন তাঁহারা কাঁদেন, এবং যাঁহারা শোনেন তাঁহাদেরও চোখের জল শুকাইতে পায় না। বেহুলা স্বামীর জন্য কত উপবাস করিয়াছেন, কত ভয়ানক দুর্গম পথে চলিয়াছেন, কত দুষ্ট লোকের হাত হইতে নিজকে রক্ষা করিয়াছেন, মেয়েরা তাহা শুনিয়া এমন একটি পবিত্র দৃষ্টান্ত পায় যাঁহার মত হইতে তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হয়। শত শত শ্লোক মুখস্থ করিয়া যে শিক্ষা হয় না, এই গানের ভিতর দিয়া তাহা হয়। বাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ের মায়ের প্রাণে যে কত মমতা, তাহা এই গান শুনিলে বেশ বুঝা যায়। একটা জায়গা মনে কর। বেহুলা যে ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, তাহার মা বাপ নিছনি নগরে থাকেন, কেহ সে সংবাদ ভয়ে তাঁহাদিগকে জানায় নাই, পাছে শোকে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া যায়। পুরুষ দলের এক ভদ্র গায়ক গাহিলেন—

"ছয় মাসের দূরে যদি পুত্র মরি যায়"

তখন প্রথমে অপরাপর পুরুষেরা তার পর মেয়েরা এই ছত্রটী দোহারী করিয়া গাহিল, তার পর পুরুষদের প্রধান গায়ক আবার গাহিলেন—

"সকলে জানিবার আগে—আগে জানে মায়"

এই ছত্রেরও আবার দোহারী চলিল। ছেলে যদি ছয় মাসের দূর পথে গিয়াও মারা পড়ে—তবে মায়ের মন তা টের পায়। তোমরা তোমাদের মায়েদের কথা মনে করিয়া এই ছত্র দুইটী পড়, তোমাদের প্রাণে মায়ের স্নেহের বেদনা একটা সাড়া দিয়া উঠিবে।

বিজয় গুপ্ত যখন বাখরগঞ্জের গৈলা গ্রামে বসিয়া বাঁশের কলম দিয়া তুলট কাগজের উপর এই কাব্য রচনা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে ময়মনসিংহ জেলায় বোর গ্রামে নারায়ণ দেব আর একখানি মনসা মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবের জন্মস্থান ছিল মগধ এবং তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। প্রায় ৪৫০ বৎসর হইল তাঁহার কাব্যখানি লেখা হইয়াছিল। বেহুলার কথা তিনিও লিখিয়াছেন। তিনি চোখের জল বাম হাতে মুছিতে মুছিতে ডান হাত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—বেহুলা স্বামীকে মৃত দেখিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,

"অমৃত সমান রে প্রভু তোমার মুখের বাণী
পুনরপি না শুনিলুম মুই অভাগিনী।
হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিমু চুর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সিঁথির সিন্দুর
এ হেন সুন্দর রূপ প্রভু রে প্রকাশিত রজনী
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া রূপ হরিল নাগিনী।

চাঁপার কলিকা সম প্রভু রে তোমার কোমল অঙ্গুলি
তুমি আমার প্রভু রে, অভাগী বেহুলা ডাকে, চাহ চক্ষু মেলি ”

এই লেখার ভাষা আর পাড়াগাঁয়ের ভাষার মত এলোমেলো নহে সংস্কৃতের দীপ্তি পড়িয়া এই ভাষাকে বেশ ঝক্ ঝকে করিয়াছে

কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে, মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলি কেবলই কান্নার সুরে লেখা। মেয়ে পুরুষদের পাশে কাহারও কোঁচা ধরিয়া কাহারও আঁচল ধরিয়া যে সকল ছোট ছোট শ্রোতারা ঘুমের সঙ্গে লড়াই করিয়া রাত্রি জাগিতেছিল, তাহাদের জন্য লেখকেরা কি কিছুই দিয়া যান নাই। অবশ্যই দিয়াছেন? বাঘ, শেয়াল, কুমীর প্রভৃতি জন্তুরা যখন লখীন্দরের মড়া দেহটা খাইতে আসিয়াছে, তখন তাহাদের গায়ের লোম, চোখের কটা রং ও ল্যাজ আছড়ানোর কথা শুনিয়া ছেলেরা ভারি মজা পাইয়াছে—যেখানে গোদা, গলায় রামকড়ির মালা দোলাইয়া, সাঁচি পান মুখ লাল করিয়া বেহুলাকে বিয়ে করিবার প্রস্তাব করিতেছে, তখন হঠাৎ কান্না থামিয়া গিয়া হাসির রোল পড়িয়া যাইত

ময়মনসিংহে ইহার কিছু পরে আরও দুইজন মস্ত বড় মনসা মঙ্গলের কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন বংশী দাস, এবং অপরা বংশীর কন্যা চন্দ্রাবতী ইঁহারা ব্রাহ্মণ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বংশীদাসের বাড়ী ছিল পাটোয়ারী গ্রামে, ফুলেশ্বরী নদীর পারে। ইঁহার জীবনের একটি ঘটনা তোমাদের কাছে বলিব,—একটা বড় দুর্ভাগ্য কিরূপে একটা খুব বড় রকমের সৌভাগ্যে পরিণত হইল—এটা তাহারই কথা—চাক্ষুষ ঘটনা তাঁহার মেয়ে চন্দ্রাবতী নিজে লিখিয়াছেন

বংশীদাস ভাসান গান গাহিয়া যে রকম নাম করিয়াছিলেন, সে রকম টাকা পয়সা করিতে পারেন নাই, বরং দীনদরিদ্র ছিলেন। একদিন তিনি দলের লোক লইয়া একখানে গান গাহিতে চলিয়াছিলেন—পথের মাঝখানে একটা বড়—নল খাগড়ার বন প্রায় একদিনের পথ জুড়িয়া সেই জায়গাটা, তার নাম জালিয় হাওড় কিশোরগঞ্জে এখনও সেটি আছে সে সময় লোকে টাকা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিত, বড়ই ডাকাতের ভয় ছিল বংশীদাস দলবলের সঙ্গে সেই নল খাগড়ার বন দিয়া যাইতে যাইতে অস্ত্র-শস্ত্র হাতে একদল ডাকাতের হাতে পড়েন, ডাকাতের সর্দ্দার ছিল কেনারাম এই কেনারাম এরূপ ভয়ানক লোক ছিল যে, তাহার নাম শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। বংশীদাস ও তাহার দলের লোকদের যা কিছু ছিল—তাহা কেনারাম খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল, কিছু পাইল না, “তবু তোমাকে মারিব” বলিয়া কেনারাম বংশীদাসের কাছে খড়্গ লইয়া যমের দূতের মত দাঁড়াইল বংশী পৈতা

দেখাইলেন। কেনারাম বলিল, "চের চের বামুন মারিয়াছি, দৈবতার ভয় রাখি না।" বংশীদাস বলিলেন "আমি নিরীহ বামুন, গান গাহিয়া বেড়াই আমাকে মারিয়া কি লাভ করিবে, বল ?" কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?" "আমার নাম 'বংশী' আমি দেবীর ভাসান গাহিয়া কিঞ্চিৎ রোজগার করিয়া কষ্টে সৃষ্টে পরিবার প্রতিপালন করি" কেনারাম বলিল, "তুমি কি সেই বংশী যার ভাসান গান শুনে পাষাণ গলে যায় ? কিন্তু পাষাণ গলাতে পার, ঠাকুর, আমার প্রাণ গলানো শক্ত, বিশেষ তুমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াও, আমাকে দেখে রাখলে, কোন দিন ধরিয়ে দেবে ঠিক কি ? সুতরাং জীবনের কোন আশা নাই, এখন প্রস্তুত হও" বংশী অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী" কিছুতেই ডাকাতের প্রাণ গলিল না তখন বংশী শেষ এই প্রার্থনা জানাইলেন— "আমরা শেষবার মায়ের নাম গান করিব—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই ভিক্ষা দাও" কেনারাম গাহিতে অনুমতি দিল চারিদিকে নল খাগড়ার বন সেই "হাওর" হইল আসর, আকাশটা যেন একটা চান্দোয়ার মত কেউ খাটাইয়া গায়কদলের মাথার উপর রাখিয়া দিয়াছে সম্মুখে শ্রোতারা যমদূতের ন্যায় মৃত্যু সম্মুখে করিয়া বংশীদাস একান্ত ভক্তির সঙ্গে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে গান আরম্ভ করিয়া দিল সে গান এমনই চমৎকার হইল যে, যে সকল পাখীরা আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল তাহারা যেন গানে মগ্ন হইয়া মাটীতে আসিয়া বসিল, কেনারাম স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ক্রমে লখীন্দরের জন্ম লোহার বাসর—এই সমস্ত পর পর গাওয়া হইল। কিন্তু যখন বেহুলা রাঁড়ী হইল, গানের সেই অংশ শুনিয়া ডাকাতরা স্তব্ধ হইয়া গেল। কেনারাম নিজেও যেন কেমন হইয়া গেল, বাঘ যেন মানুষ হইল ইহার পরে মড়া স্বামীকে বুকে লইয়া বেহুলা ভাসিয়া যাইতেছে তখন কেনারাম আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিল না। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী লিখিতেছেন

> "যখন গাহিল পিতা বেহুলা ভাসান,
> হাতের খাণ্ডা ভূমে ফেলি কাঁদে কেনারাম"

যে বিধাতা কেনারামের মনটি পাষাণের মত শক্ত করিয়াছিলেন, তিনি আবার তাহা ফুলের মত কোমল করিয়া ফেলিলেন এর পর আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা—যে যার গলা খড়্গ দিয়া কাটিবে সে তার পা ধরিয়া বসিয়া আছে কেনারামের বিপুল সম্পত্তি সে বংশীকে দিতে ইচ্ছুক হইল, কিন্তু বংশী বলিলেন, "তুমি মানুষের রক্ত দিয়া হাত রাঙ্গাইয়া যাহা পাইয়াছ, আমি তাহার ভাগী হইতে চাই না।" কেনারাম সে সকল সঞ্চিত টাকার আর খোঁজ লইল না, —সে খড়্গ ফেলিয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া বংশীদাসের পিছু পিছু গেল কেনারামের

গলাটা ছিল ভারি মিষ্ট, দস্যুর গলার মত আদবেই নয়—বরং কোকিলের মত বংশী যখন বুড় হইলেন, তখন কেনারামই তাহার দলের প্রধান গায়ক হইল। সে মনসা মঙ্গল এমন মধুর ভাবে এমন মন-ভুলানো ব্যথার সুরে গাহিত যে সে আসরে দাঁড়াইবামাত্র আসর জমিয়া যাইত।

সুতরাং ভাসান গান কেবল পুরুষ ও মেয়েদের মন মহৎভাব দিয়া ভরিয়া দিত না, শুধু শিশুদিগকে হাসাইয়া, আমোদ দিয়া সুনীতি শিখাইত না, শুধু কাব্য-কথায় করুণ রস বুঝাইয়া ক্ষান্ত থাকিত না—ইহা ডাকাতকে ধর্ম্মগুরুর আসনে বসাইত পাড়াগেঁয়ে লোকেরা সংস্কৃত বড় বড় শাস্ত্র না জানিলেও মনসা মঙ্গল দিয়া যে শিক্ষা যে নীতি ও যে নির্ভর লাভ করিত, তাহা অবহেলার যোগ্য নহে।

হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া এখনও পূর্ব্ববঙ্গে মনসা-মঙ্গল গান করিয়া থাকে আমি মনসামঙ্গলের কয়েকখানি পুরাতন হাতের লেখা পুঁথি পাইয়াছি—তাহা মুসলমান লেখকগণ নকল করিয়াছেন সুতরাং এই কাব্য হিন্দু মুসলমানকে—সমস্ত বঙ্গদেশবাসীকে—এক সময়ে আনন্দ দিয়াছিল ঢাকায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত ঝিনারদি গ্রামে ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন নামক সুবর্ণবণিক জাতীয় দুই কবি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ যে ভাসান কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা আকারে ছোট হইলেও গুণে বড় এই বিষয়ে সকলের চাইতে পুরাতন কাব্যগুলি আমরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাইয়াছি, এবং এপর্য্যন্ত প্রায় একশত জন মনসা-মঙ্গল লেখকের অল্প বেশী লেখা আমরা দেখিয়াছি। মনসাদেবীর ভাসান যে এক সময় দুর্গোৎসবের ন্যায়ই বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই মনসাদেবীর সম্বন্ধে এই গান আমরা সংস্কৃত বইতে পাই নাই। কুন্দ ও চাঁপা ফুলের ন্যায় এই গান বাঙ্গালার খাটি নিজস্ব—এই দেশের জল, হাওয়া ও মাটীতে জন্মিয়াছে ক্রমশঃ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

নিধুরাম।



নিধুরাম

(১)
'নিধে' ছিল, চাষার ছেলে
হলো নিধুরাম;
গ্রামে যখন ফিরলে তখন,
পাক্‌ছে সবে আম

(২)
কলকাতাতে পড়তে গিয়ে,
হলো নিধের কাল;
ভুলে গেল বাপ পিতামো'
মাঠে যে দেয় হাল।

(৩)
মিহি সুতোর কাপড় প'রে,
সভ্য হলো খাস;
দুঃখ পেত বেজায় রকম,
বল্লে কেউ 'চাষা'।

(৪)
নিধে এলো গ্রামে শুনে,
সবাই মিলে ছুটে
ছেলে বেলার বন্ধুরা তার,
দেখতে এলো ছুটে

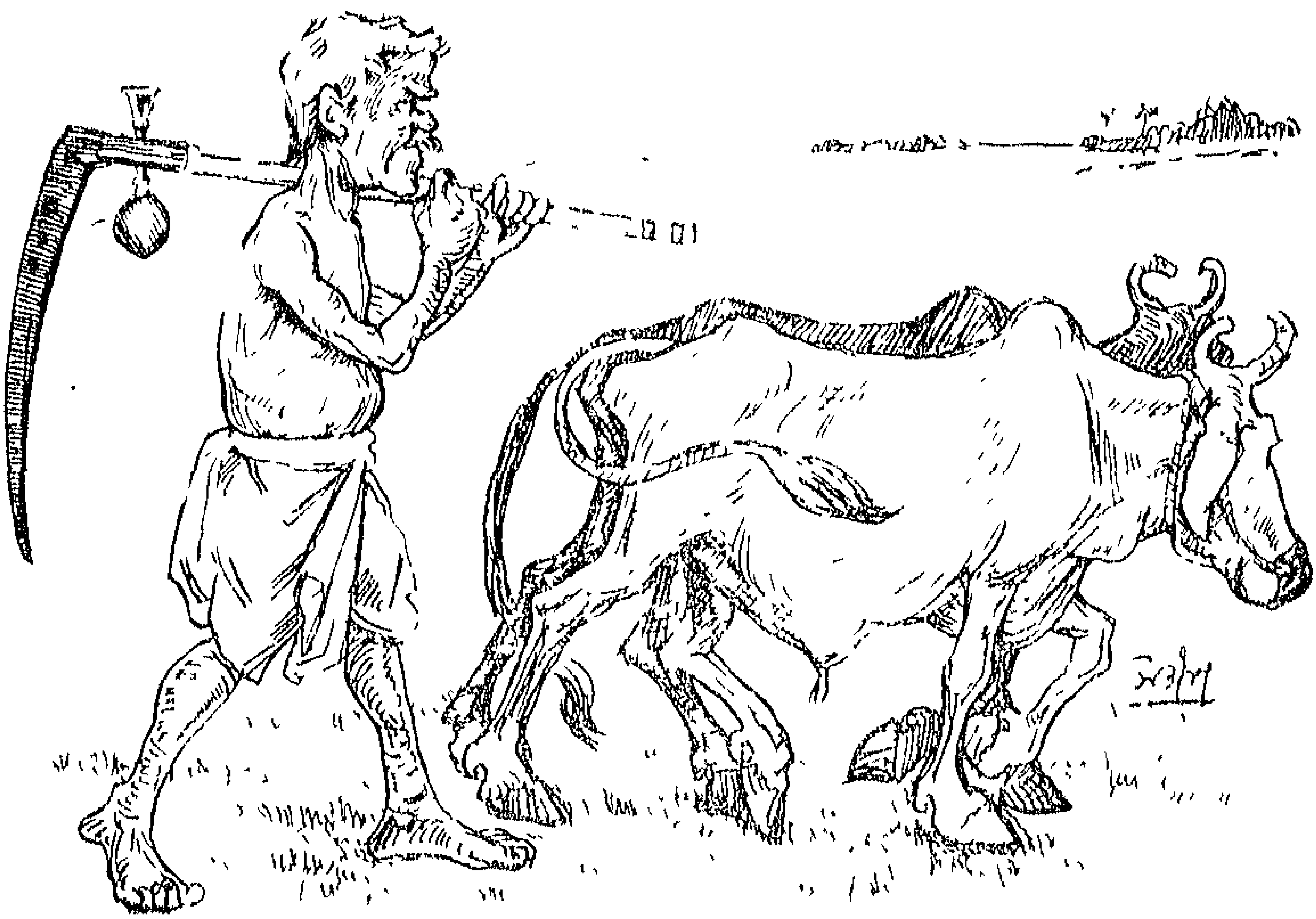
(৫)
গ্রামের জোলার কাপড় পরা
দেখতে কদাকার;
যেমনি কালো তেমনি মোট
নাই কোন বাহার।

(৬)
বল্লে সবাই ওরে নিধে,
কেমন আছিস ভাই,
তুই এসেছিস গ্রামে শুনে,
ছুটে এলেম তাই।

(৭)
কাপড় দেখেই নিধে গেল,
বেজায় রকম চোটে,
মুখ বেঁকিয়ে বল্লে তোরা,
সভ্য নস মোটে

(৮)
যেমনি তোদের কথার ছিরি,
তেমনি বেশের ঘটা;
চটের মত কাপড় পরা
মাথায় চুলের জটা।

(৯)
এই না বলে নিধে গেল,
চলে আপন বাড়ী;
দুলিয়ে দিয়ে মিহি কাপড়,
মুখ না করে হাঁড়ি।



[illegible] ফিল্লে যখন সূর্য্য তখন [illegible]

(১০)

নিধের বাপ লাঙ্গল চষে,
সারাটা দিন মাঠে ;
লাঙ্গল ঘাড়ে ফিল্লে যখন,
সূর্য্য তখন পাটে

(১১)

বলদ দুটো তাড়িয়ে বেঁধে,
লাঙ্গল খান রেখে,
বল্লে নিধে গোয়াল ঘরে,
জাব গুলো দে দেখে

(১২)

বাপের কথায় চটে নিধে,
বল্লে রাম রাম ;
'নিধে' 'নিধে' করো না কো,
আমি 'নিধুরাম'।

(১৩)

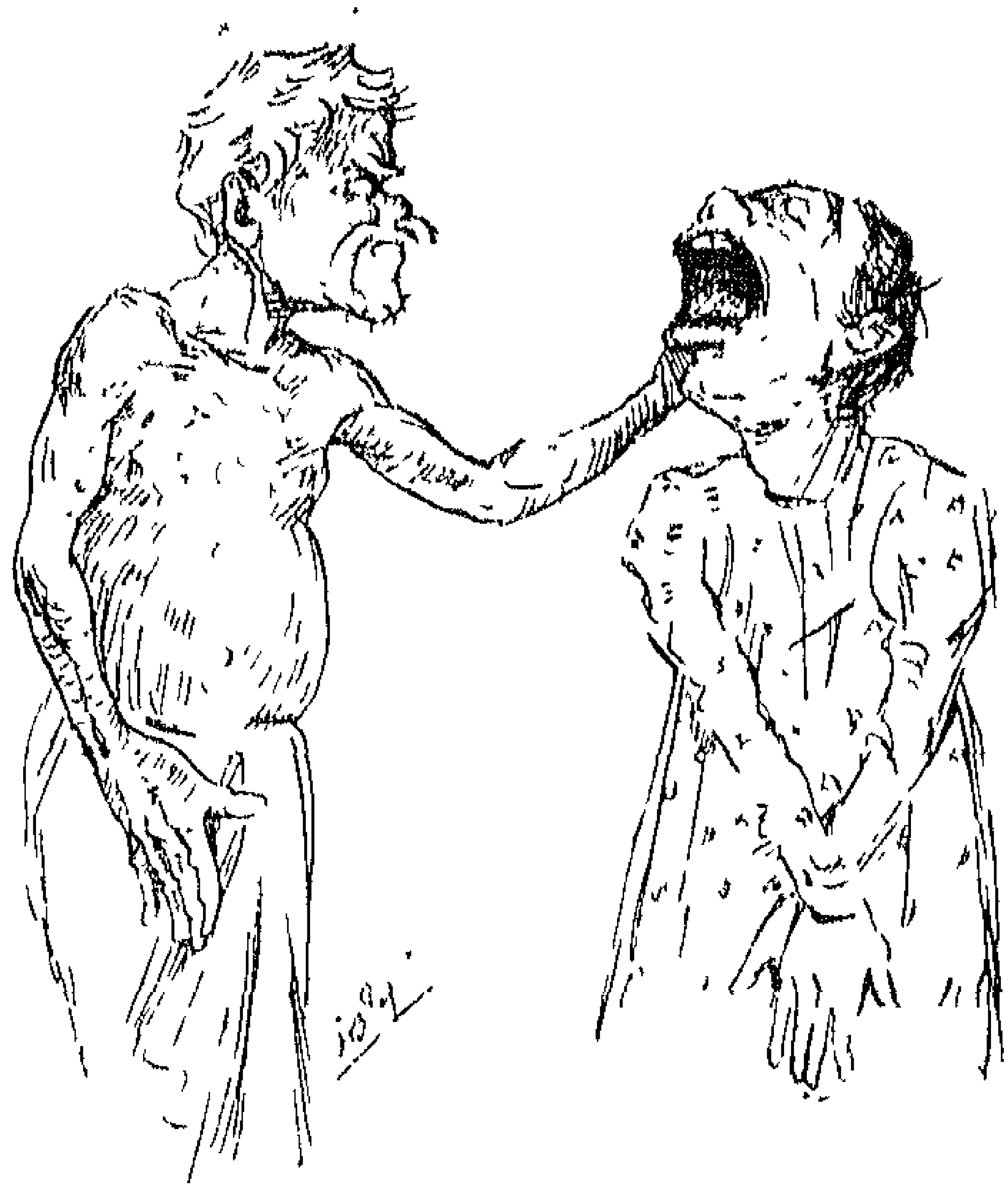
গরুর জাব মাখব্ আমি,
কল্‌কাতায় পড়ি।
কলের জলে চান করি,
ট্রাম মটর চড়ি

(১৪)

নিধের কথায় নিধের বাপ,
উঠলে অমনি তেড়ে;
কাণটি ধরে, রেগে দিল,
একটি চড় ঝেড়ে

(১৫)

বল্লে, ব্যাটা, পড়্‌তে তোকে,
হবে না কো আর;
আমার সঙ্গে মাঠে যাবি,
জোগাড় দেখ্ তার



কাণটি ধরে, রেগে দিল একটি চড় ঝেড়ে

(১৬)

বাপের চড়ে নিধের চোখে,
পড়্‌লো ঝরে জল;
ফেল্ ফেলিয়ে রইলো চেয়ে,
এমনি মজার কল

(১৭)

একটি চড়েই নিধুরামের,
বেরিয়ে গেল গুণ
রাত পোয়াতেই চোল্ল মাঠে,
মুখটী করে চুণ।

(১৮)

বাপের হাতের একটী চড়েই
একেবারে সিধে
চাষার ছেলে 'নিধুরাম',
আবার হলো 'নিধে'

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

চরকা-রাণী

একটী বুড়ী ছিল, সে বেচারী বড্ড গরীব, কোনও রকমে সে পরিশ্রম করে যা রোজগার করত তাই দিয়ে সে তার তিনটী মেয়ে ও নিজের খাওয়া পরা চালাত এমন কষ্টে দিন আর কাটে না বড় মেয়ে দুটী বেশী কিছু কাজ শেখেনি, তবু তারাও সামান্য কাজ করে পয়সা রোজগারে মন দিল, ছোট মেয়েটী যেমন সুন্দরী তেমন কুঁড়ে, সে যেন নড়ে বসতে পারে না একদিন তাদের গ্রামের মোড়ল এসে বুড়ীকে বল্ল "বুড়ী তুমি কেন মেয়েদের চরকা কাটা শেখাও না? আমি গ্রামের ঘরে ঘরে চরকা কাটা শেখাব—এবং যারা বড্ড গরীব তাদের তুলো ও চরকা দেব।" বুড়ী তাতে বড় খুসী হ'ল মোড়লের কৃপায় ও চরকার গুণে বুড়ীর সুদিন ফিরে এল, তাদের সংসারে বেশ দুপয়সা আসতে আরম্ভ করল। বড় মেয়ে দুটীর চরকা প্রাণ হ'ল কিন্তু ছোটটীকে কেউ একদিনের জন্য রাজী করাতে পারল না। তার মা বুড়ী বড়ই মুস্কিলে পড়ল—একদিন রেগে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিল! মেয়েটীর প্রাণে কিন্তু ভয় নাই, সে সমনের রাস্তা ধরে চলেই যাচ্ছে, হঠাৎ নদীর ধারে এসে পড়ল। নদীর ধারে সে দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য এক রাজার ডিঙ্গি নঙ্গর করা ছিল, মেয়েটীর ভয় ডর, ছিল না, সে কাউকে না বলে তাতে চড়ে বসল! মাঝি মাল্লারা অবাক, শেষে একজন বুড়ো মাঝি এসে তাকে বল্ল, "মা লক্ষ্মী, তুমি বোধ হয় ভুল এ নৌকাতে এসে বসেছ, এ নয়নপুরের রাজাদের ডিঙ্গি, রাজকুমার এখানে শিকার খেলতে এসেছিলেন, তিনি এখনই আসবেন—আমরা তাঁরই অপেক্ষায় আছি. মেয়েটী বল্ল, 'আচ্ছা, রাজকুমারকে দেখে আমি যাব" মাঝি আর কি বলে চুপচাপ বসে রইল, ইতিমধ্যে রাজকুমার এসে পড়লেন। তিনি এই সুন্দরী মেয়েকে দেখে তো অবাক, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে আর কোথা থেকে আসছ?" মেয়েটী বল্ল "আমার দিদির ও মা আমায় মারে বকে ভাল কাপড় পরতে ভাল খেতে পাই না, তাই রাগ ও ঝগড়া করে চলে এসেছি। আমার মা ও দিদিরা চরকা কেটে দিন কাটায়—আমার ও সব ভাল লাগে না।" রাজকুমার মেয়েটীর মুখখানি দেখেই তো ভুলে গেলেন, এবং রাজমাতার কাছে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন রাণী মা মেয়েটীকে দেখে বড্ড খুসী হলেন এবং তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন মেয়েটী তখুনিই রাজী হল। রাণী-মার স্নেহে ও যত্নে মেয়েটী তার মা ও দিদির কথা একটী বারও মনে করল না—মুহূর্তে সব ভুলে গেল! তাদের নৌকা ছেড়ে দিল, এবং তারা সন্ধ্যায় নিজেদের রাজ্যে এসে পড়লেন। নির্ভীক মেয়ে হাসতে হাসতে রাণীর হাত ধরে রাজপুরীতে গিয়ে উঠল!

এদিকে বুড়ী কোলের মেয়েকে তাড়িয়ে কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হয়ে গেল। কত রকমে কতদিন খোঁজ করল, কোনও খবর পেল না—শেষে সবাই বল্ল যে সে নিশ্চয়ই নদীতে ডুবে মরে গেছে বা কেউ তাকে নৌকা করে তুলে নিয়ে গেছে—সেকালে সুন্দরী মেয়ে দেখ্‌লে বড় লোকেরা অমনি নাকি করত। যা হ'ক বুড়ী মেয়ের আশ ছেড়ে দিয়েছে। বুড়ী তার অন্য দুটী মেয়েকে নিয়ে চরকা কেটে দিন কাটায়। তাদের এখন বেশ দুপয়সা রোজগার হয়েছে। বুড়ীর মেয়েদের জন্য ভাল বর আস্‌তে লাগল, ক্রমে তাদের বিয়েও হয়ে গেল। বুড়ী বেচারী কিন্তু এখনও ছোট কোলের মেয়ের কথা মনে করে চক্ষের জল ফেলে দিন কাটায়

সেই ছোট মেয়েটী এদিকে রাজবাড়ীতে এসে মহা আনন্দে আছে, মহারাজা তাকে বৌ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এ দেশের নিয়ম ছিল যে রাজার বাড়ীর বৌ হবার আগে তার চরকা কাটার পরীক্ষা লওয়া হয়, যে মেয়ে ভাল চরকা কাট্‌তে পারে সে হাজার গরীবের ঘরের মেয়ে হলেও তাকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। রাণী সে কথা সেই মেয়েকে বল্লেন—মেয়েটী কি করে, মাথায় হাত দিয়ে বসল। তার হাসি মুখখানি মলিন হয়ে উঠল রাণী তাকে এক ঘর বোঝাই তুলা দিয়ে সাতদিনের সময় দিয়ে বল্লেন যে এইগুলি চরকায় কাট্‌তে হবে মেয়েটী তুলার মাঝে বসে কাঁদতে লাগল। সমস্ত রাত, সমস্ত দিন কাঁদে তার মায়ের মুখখানা মনে করে। রাণী এসে তার কাজ দেখ্‌তে চাইলেন, সে কিন্তু কিছুই দেখাতে পারল না। পরদিন মেয়েটী কি দেখাবে কি করবে এই ভেবে অস্থির—কি আর করে, শেষে চরকা ছেড়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ীর বাগান রাস্তা সব দেখ্‌ছে এমন সময় দেখ্‌ল তিনজন বুড়ী ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; এমন একটী সুন্দরী মেয়েকে অমন দুঃখিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে তারা তার বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করল মেয়েটী সব বল্ল বুড়ীরা শুনে ভারি দুঃখিত হল, এবং তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিল। মেয়েটী দেখ্‌ল ১ম বুড়ীর পা দুটী মস্ত, আর বড্ড চেপ্টা, ২য় বুড়ীর ঠোঁট এত লম্বা যে থুতুনীতে গিয়ে লাগছে, ৩য় জনের অসম্ভব রকমের বড় ও বিশ্রী বুড় আঙ্গুল। বুড়ীরা সকলে মেয়েটীর ঘরে এসে তুলার রাশি দেখল, এবং কয়েক দিনের মধ্যে চমৎকার করে সূতা কেটে ঘর বোঝাই করে দিল। কিন্তু বুড়ীরা ঐ মেয়েটীর সঙ্গে একটী কথার চুক্তি করে নিল যে যখন রাজার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে তখন যেন এদের মাসী বলে পরিচয় দিয়ে নিমন্ত্রণ করে।

এদিকে রাণী মা ঠিক সাতদিনের দিন এসে সূতা দেখে অবাক হয়ে গেল মেয়েটীর

প্রশংসা রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ের সব যোগাড় হতে লাগল কত রাজা মহারাজার নিমন্ত্রণ হল, ফলে তার মাসীদেরও নিমন্ত্রণ হল। শুভদিনে শুভলগ্নে রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ের দিন স্থির হ'ল। খুব জাকজমকের সঙ্গে সব ব্যবস্থা হল, বিয়ের সভার মাঝখানে পুরোহিত প্রথমে কণের চরকা কাটার প্রশংসা করলেন, যাতে ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন হয় রাজা মহারাজাদের প্রাসাদে চরকার মধুর শব্দ শুনা যায় তার জন্য অনুরোধ করলেন। বিয়ে হয়ে গেল—খাওয়ার ধুম পড়ল কণের মাসীরা আর ওঠেন না। তারা সভার মাঝখানে বসে রয়েছেন আর প্রত্যেক লোক তাঁদের লক্ষ্য করছে। শেষে যখন তাদের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল, তখন ১ম বুড়ী বললেন যে তার পা চরকা কাটতে কাটতে এত বড় ও চেপ্টা হয়েছে, দ্বিতীয়ের ঠোঁট তুলাতে জল ও থুতু দিতে দিতে ঝুলে পড়েছে এবং ৩য় বুড়ির আঙ্গুল সূতা টেনে টেনে অমন বিশ্রী হয়েছে এই বুড়ীদের এইরূপ বিকট আকৃতি দেখে, কেন এমন হল তার ব্যাখ্যা শুনে, রাজা মহারাজার মাথা তো ঘুরে গেল. তাদের সব কল্পনা জল্পনা তখনই ভেসে গেল। তারা তখনই স্থির করলেন যে যে চরকায় মানুষকে এমন কদাকার করে তার প্রচলন রাজপ্রাসাদে? সেই থেকে আর রাজাদের মেয়ে বৌরা চরকা কাটা ছেড়ে দিল। তখন থেকে "চরকা-রাণী" রাজপ্রসাদ ছেড়ে গরীবের কুড়ে ঘরে বাস নিল

অনেক অনেক দিন আগে রাজকুমারীরা এত ভাল চরকা কাটত যে তাদের সূতা কাটার প্রশংসা শুনে রাজকুমাররা তাদের বিয়ে করতেন। কিন্তু সেই বুড়ী তিনটীর দুষ্টুমীর দরুণ সেই থেকে আর রাণীরা চরকা কাটেন না। বুড়ীরা কেন এমন করেছিল জান? তারা ভাবল, সবাই যদি এ কাজ করে তাহলে গরীবের পেট চলে কি করে, তাই অমন করেছিল রাণীরা যেমন ছেড়ে দিল, গরীবেরা দ্বিগুণ উৎসাহে "চরকা"কে বরণ করে নিল—এবং চরকার দৌলতে নিজেদের দিনগুলো ভাল রকমে কাটাতে লাগল। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে একটা ছড়া সবাই বলে—

চরকা আমার সোয়ামী পুত
চরকা আমার নাতি;
চরকার দৌলতে আমার
দোয়ারে বাঁধা হাতী

তোমরা নিশ্চয় বলবে যে বুড়ীরা বড্ড অন্যায় করেছে; কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে আবার চরকা-রাণী ফিরে এসেছেন—আমাদের ঘরে ঘরে গান্ধী

আমাদের দেশ

মহারাজের কৃপায় চরকার প্রচলন হচ্ছে। আশা হয় যে আমাদের প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় হাতী বাঁধা থাকবে।

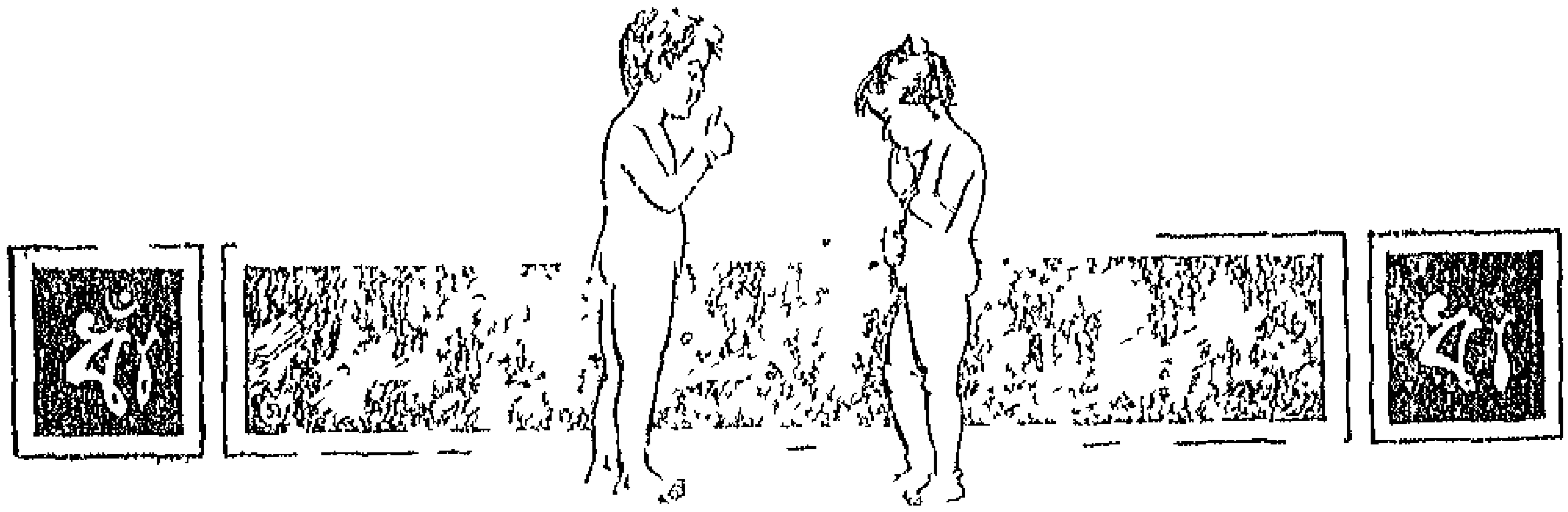
শ্রীপ্রশান্ত দেবী

পার্ব্বণী

পূজার দিনের পাওনাটুকু
দিবি কে?
হৃদয়-হাসির পরশটুকু
নিবি কে?
বরষ পরে বারেক তরে
আসি রে ভাই তোদের ঘরে,
একটুখানি আদর করে
ডাকবি নে?
হাসি খুসির মাণিক-কণা
রাখবি নে?
মায়ের পূজার বাজন বাজে
মধুরে
আমিই কি আজ রইব শুধু
বিধুরে?
আকাশ ভরা আলোর মেলা,
বাতাস ভরা সুধার খেলা
ফুলের বনে পাখীর গানে
মাতায় রে
যার যা' আছে মায়ের নামে
বিলাশ রে!

আজকে সবার পাওনাটুকু
দিয়ে দে!
গরীব দুখীর নয়নবারি
মুছে দে
প্রবাসী বাপ ভায়ের সনে
মিলবি তোরা হরষ মনে,
নূতন জামা কাপড় পরে
ছুটবি রে!
পূজো বাড়ীর আঙিনাতলে
জুটবি রে!
সেই পুলকের সবটুকু যে
এনেছি!
শিউলি ফুলের মোহন মালা
গেঁথেছি!
আজ যে ছুটি, নাইক পড়া,
দাঁতখিচুনি দিনটী' ভরা,—
হাজার খেলা, হাজার মজা
লুটবি যে!
আমিই দিব তোদের সব
চাইবি যে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।



আমরা গত মাসে আমাদের দেশের গ্রাহকদের তাহাদের পড়া বই হইতে এমন দুইখানি বইর নাম করতে বলিয়াছিলাম যাহা তাহাদের সকলের অপেক্ষা ভাল লাগে। তাহাদের উত্তর।

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর (বিনয়কুমার) হিমালয় (জলধর)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত পাটনা।
হিন্দুস্থানী উপকথা (সীতা ও শান্তা) সাঁঝের ভোগ (দীনেশচন্দ্র)	শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা।
রাজকাহিনী (অবনীন্দ্র) আটটি গল্প	শ্রীবিধুশেখর বসু, পালাঘাট
ছাত্রজীবন (রঘুনন্দন) ব্রহ্মচর্য্য (রমেশচন্দ্র)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন, গোয়ালপাড়া
বত্রিশ সিংহাসন (কুলদারঞ্জন) শকুন্তলা (বিদ্যাসাগর)	শ্রীমতী গিনিসোণা দেবী, দেওরিয়া
রবিন্সন্ ক্রুসো হিতোপদেশ	শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাস পাকর
রবিনহুড (কুলদারঞ্জন) অনাথ (প্রিয়ম্বদা)	শ্রীবুদ্ধদেব বসু, নোয়াখালী
হিন্দুস্থানী উপকথা (সীতা ও শান্তা) বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে (নরেন্দ্রকুমার)	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু বসু, ঝাপি।
বিজ্ঞান চিত্রে গল্পে (নরেন্দ্রকুমার) "আমার দেশ" (মাসিক পত্র)	শ্রীসুধীন্দ্রলাল বিশ্বাস, কুমিল্লা।
মুকুট (রবীন্দ্রনাথ) হুকাহুয়া (শান্তা দেবী)	শ্রীসুজাতা রায়, গৌহাটি
বিজ্ঞানচিত্রে ও গল্পে (নরেন্দ্রকুমার) রামকৃষ্ণের আরো গল্প (শিশুতোষ সিরিজ)	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডুমডুমা।

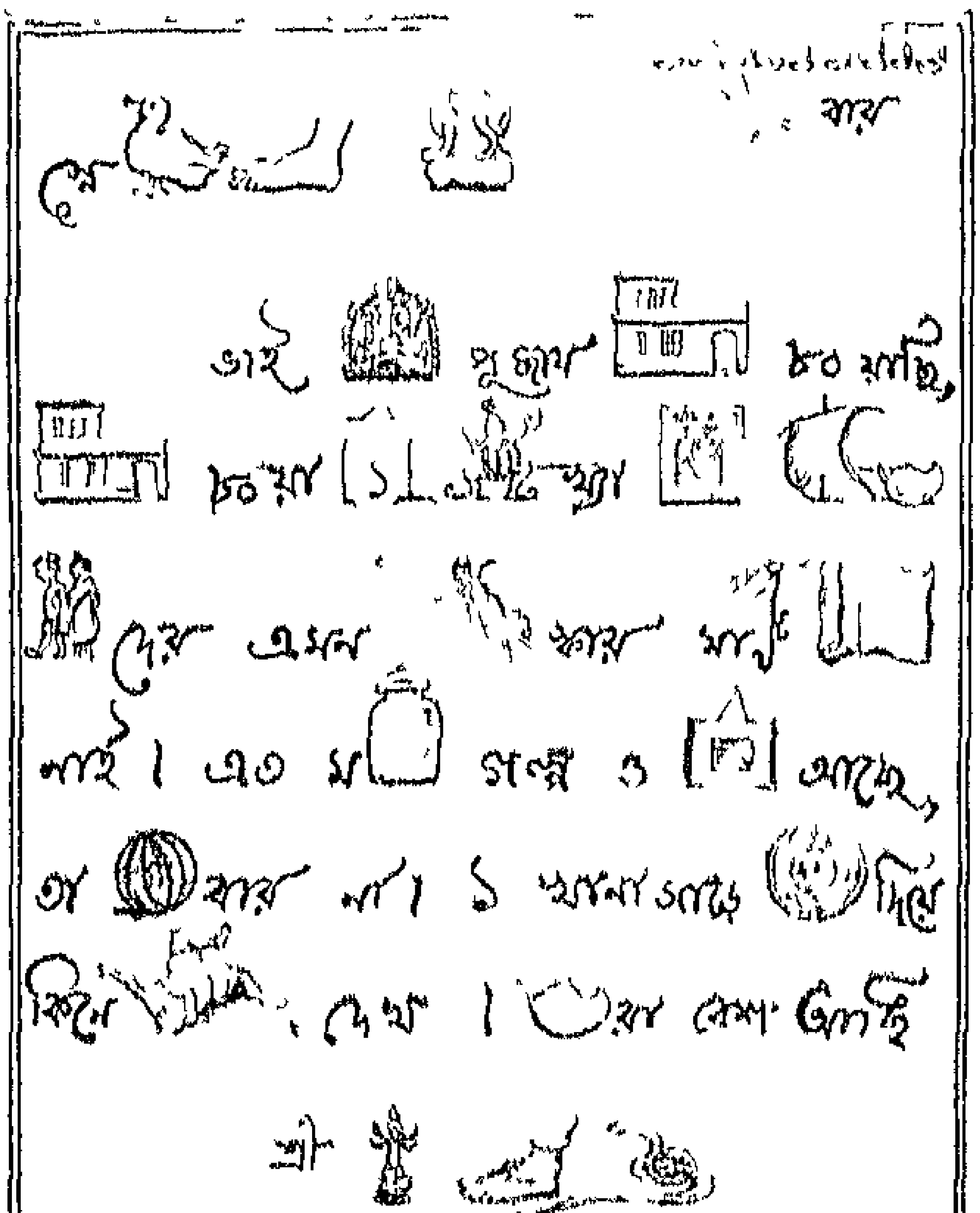
আমার দেশ

ভক্তির ডোর (সত্যচরণ) প্রতাপ সিংহ	শ্রীরমণীমোহন পাইন, কলিকাতা।
শিশু টুনটুনির বই	এ, কে সৈয়দুল করিম, ফেণী।
অনাথ (প্রিয়ম্বদা) বিজ্ঞানচিত্রে ও গল্পে (নরেন্দ্রকুমার)	শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস, ময়মনসিংহ।
ছেলেদের রামায়ণ (উপেন্দ্র) জীবনী সংগ্রহ	শ্রীললিতমোহন মণ্ডল, নবাবগঞ্জ।

আশ্বিনের নূতন ধাঁধা

চিঠিখানি পড় দেখি,

আশ্বিনের ধাঁধার উত্তর অগ্রহায়ণের আমার দেশে ছাপা হইবে
১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে উত্তর পাঠাইতে হইবে



৺পূজায় নূতন বই

আলোচনা।

মানুষের মনটা ধর্ম্মের ডাকে যে রকম সাড়া দেয়, এ রকম আর কিছুতে দেয় না। হিন্দুরা দুর্গা পূজায়, মুসলমানেরা মহরমে, খৃষ্টানের খৃষ্টমাসে যেমন আনন্দে মাতিয়া উঠে এমনটি আর বৎসরে কোন দিন তাহারা মাতে না। সারা বৎসর মানুষ কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, আর বৎসরের এই সময়টা তাহারা কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর লয়, আত্মীয় পরিজনের সহিত দেখা সাক্ষাত করে। এই সময়ে সকল দেশেই একটা রীতি আছে—যে যার প্রিয়জনকে একটা কিছু উপহার দেয়।

এটা আশ্বিন মাস। এই মাসেই হিন্দুদের মহা পর্ব্ব দুর্গাপূজা। হিন্দুদের পর্ব্ব হইলেও এ আনন্দ উপভোগ করে ভারতের সবাই—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। আজ বাঙ্গালার প্রত্যেক বালক বালিকা পথের পানে চাহিয়া আছে—দেখিতে, তাহাদের পূজার উপহার কে কি দেয়। খ্রীষ্টমাসে ইউরোপেও ছেলেমেয়েরা উপহারের জন্য এইরূপ উৎসুক হইয়া উঠে। এই সময়ে সে সব দেশে বড় একটা সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। কাপড়ের দোকান, খেলানার দোকান, সব ছাড়াইয়া আসিয়া তাহারা বইয়ের দোকানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যে যার পছন্দ মত বই বাছিয়া লইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে এখনও তেমন বইর আদর হয় নাই, কিন্তু তবু আমরা জানি অনেক ছেলে মেয়েরা ৺পূজার সময় নূতন বই খুঁজিয়া থাকে। এ বৎসর আমরা ৺পূজার সময় তেমন বিশেষ কিছু নূতন বইর আয়োজন করিতে পারি নাই, তবে যে গুলি করিয়াছি তাহার পরিচয় তোমরা বিজ্ঞাপনে পাইবে। দু-একটি পরিচয় এখানেই দিতেছি—

হিতোপদেশ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস বইখানি লিখিয়াছেন শিশুদের জন্য, কিন্তু নিতান্ত শিশুরা ইহা বুঝিতে না পারিলেও, যাঁহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া বুঝিতে পারে, তাহারা ইহা বুঝিতে পারিবে। কবি গল্পগুলি পদ্যে পয়ার ছন্দে লিখিয়াছেন—রামায়ণ, মহাভারত যে ছন্দে লেখা। বইখানির ভিতর বাহির সমান। গল্পগুলির কথা আর নূতন করিয়া শিশুদিগকে কি বলিব? হিতোপদেশের গল্প কে না জানে?

যতগুলি ভাষা আছে তাহার প্রায় সব ভাষাতেই এই গল্পগুলি অনুবাদিত হইয়াছে। শিশুদের উপযোগী এমন সুন্দর গল্প আজ পর্য্যন্ত কোন ভাষায় বাহির হয় নাই। তাহার পর গল্পগুলি পদ্যে লেখা, পড়িতে পড়িতে ত ছেলেরা মুখস্থই করিয়া ফেলিবে। এতক্ষণ ত

বইর ভিতরকার জিনিসের কথা বলিয়াছি, এইবার বাহিরের সৌন্দর্য্যের কথা বলি। বইখানি আগাগোড়া আর্টপেপারে বেশ বড় অক্ষরে ছাপা, প্রত্যেকখানি পাতায় পৃষ্ঠায় ভাল ভাল ছবি আছে। বাঁধাইও সুন্দর, সোনালি জলে নাম লেখা, তাহা ছাড়া মলাটের উপর যে আচ্ছাদন আছে তাতে একখানি রঙিন ছবি আছে। ... করিব না যে এই বইর একটি গল্প তোমাদের জন্য লিখিব ও এই বইর একখানি ছবি তোমাদের নমুনা দেখাইব। তবে সব দেখিবে গল্পগুলি কত সুন্দর ও ছবিগুলি কত ভাল। (দাম ।৶০ আনা মাত্র)

পার্ব্বতী - (১৩২৭) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই বইখানি গত বৎসর তোমাদের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বইখানির আর নূতন পরিচয় আশা করি, তোমাদের দিতে হইবে না। দিতে হইলে লজ্জার কথা। কারণ যে বইখানি বাঙ্গলার সব বড় বড় লেখক লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীরা যে বইখানির জন্য ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন সে বই প্রত্যেক ঘরে ঘরে থাকা উচিত। জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত হয়ত তোমাদের এখনও পরিচয় হয় নাই, কারণ তিনি ছেলেদের জন্য বড় একটা লেখেন না, কিন্তু এই কবিবর রবীন্দ্রনাথ তোমাদের জন্য 'পার্ব্বতী'তে গল্প লিখিয়াছেন। এই গল্পের মধ্যে এমন একটা নূতনত্ব সজীবতা আছে যে হয়ত অন্য যত গল্প পড়িয়াছ তাহা হইতে এই গল্পের বিশেষত্ব বাহির করিতে তোমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও চিত্রকরের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছবি ও চিত্র আছে। মাত্র খান কয়েক বই আমাদের নিকট আছে, আমরা ৵ পয়সা কমাইয়া তোমাদিগকে দিব মনস্থ করিয়াছিলাম। বইখানির দাম হইতেছে ১।৶ কিন্তু আমার দেশের গ্রাহকগণ এই বইখানি মাত্র ১৲ এক টাকায় পাইবে। তবে হয়ত সকল গ্রাহককেই এই বইখানি দিতে পারিব না। কয়েকখানি মাত্র আমাদের নিকট আছে। যাহাদের পত্র প্রথম পাইব তাহাদিগকেই আগে দিব।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
শিশির পাব্লিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিশ্বোদয় প্রেস,
৮।২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছেলেমেয়েদের একখানি বার্ষিক পত্র

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

১৩২৭ সালের

পার্ব্বণী

লেখক

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম, বি
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত
ইত্যাদি ইত্যাদি

লেখিকা

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী
শ্রীমতী সীতাদেবী বি, এ,
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি, এ
শ্রীমতী এণা দেবী
ইত্যাদি ইত্যাদি

প্রধান চিত্রকর

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলেমেয়েদের এমন মন ভোলান বই অল্পই বাহির হইয়াছে।

নানারকম গল্প এবং প্রবন্ধে পূর্ণ—মূল্য ১৸০।

আমার দেশের গ্রাহকারের জন্য (৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মূল্য ১৲ মাত্র)।

শিশির পাব্লিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ছেলে মেয়েদেব আশা ও তৃপ্তি

শিশুতোষ সিরিজ

আশ্বিন (১৩২৭) হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

এত সস্তায় ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী এমন সুন্দর সুন্দর বই প্রকাশ করিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত ভাবতবর্ষে হয় নাই।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲, ষাণ্মাসিক ২৲, প্রতি সংখ্যা ৵০ মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে—

প্রথম বর্ষ

১। পৃথিবীর জন্ম (বিজ্ঞান)
২। প্রকৃতির পরাভব (বিজ্ঞান)
৩। কানুর কীর্ত্তি (গল্প)
৪। আর্য্য ও অনার্য্য (ঐতিহাসিক গল্প)
৫। আজগুবি জন্মকথা (রূপকথা)
৬। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ (পৌবাণিক গল্প)
৭। গল্পে রামকৃষ্ণ (উপদেশমূলক গল্প)
৮। সত্যযুগের কথা (ঐতিহাসিক গল্প)
৯। উদোল বুড়োর সাঁওতালী গল্প (রূপকথ)
১০। রামকৃষ্ণের আরো গল্প (উপদেশমূলক গল্প)
১১। সতী (জীবনী)
১২। উদোলবুড়োর আরো গল্প (রূপকথা)

দ্বিতীয় বর্ষ

১। বাপ্পা বীর (বাজস্থানেব গল্প)
২। পৌরাণিক জন্মকথা (পৌরাণিক গল্প)

প্রকাশক—

শিশির পাবলিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।



দেবভোগ্য সুগন্ধি

বড় শিশি ১৲ ছোট শিশি ৷৶০ আ৹

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা



সম্পাদক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস, সি
শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি এ

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲
সডাক ষান্মাসিক ১৷০
প্রতি সংখ্যা ।০

ছেলে মেয়েদের আশা ও তৃপ্তি

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲	# শিশুতোষ সিরিজ	ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲ প্রতিসংখ্যা ।৵০ ।

সম্পাদক - শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ।

আশ্বিন হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

প্রত্যেক বইতে অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে মোটা এণ্টিকে, রঙ বেরঙের কালিতে ছাপা।

আজ দেশের চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে যে সকল কার্য্যের সূচনা না করিলে জাতীয়-জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না, আজ সেই সব দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অত্যন্ত অভাব, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক এই অভাব পূরণ করিতে পারে না। "শিশুতোষ সিরিজ" নাম দিয়া যে ধরণের বই প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছি, ইহ দ্বারা কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকিবে তাহা নয়। এই সকল বই পড়িয়া তরুণ বয়স্ক বালক-বালিকার চিত্তবৃত্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

জাতীয় জীবনের যাহারা ভবিষ্যৎ, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই যে আয়োজন, ইহার সার্থকতা নির্ভর করে প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকের সহযোগিতার উপর। শিক্ষা বিস্তারই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের এই চেষ্টায় কি বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রত্যেক শিক্ষক সম্পূর্ণ সায় দিবেন না? যদি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শিশুতোষ সিরিজের বইগুলি স্থান পাই তবেই এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের চেষ্টা সার্থক হইবে।

সকলগুলিই ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

শিশুতোষ সিরিজের প্রথম বই—আশ্বিন সংখ্যা

পৃথিবীর জন্ম

এই অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া পৃথিবীর জন্ম হইল, দিন রাত্রি, সূর্য্য চন্দ্র, এই সকলের জীবনী ও কার্য্যাবলী শিশুদের উপযোগী সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে অনেক ছবি আছে।

শিশুতোষ সিরিজের দ্বিতীয় বই—কার্ত্তিক সংখ্যা

প্রকৃতির পরাভব

সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে;—সে এক ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু ফলে প্রকৃতিকেই ধীরে ধীরে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে এই যুদ্ধের বিবরণ হইতেছে—বিশ্ব-সভ্যতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস

শিশির পাব্লিশিং হাউস।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শিশুতোষ সিরিজের তৃতীয় বই—অগ্রহায়ণ সংখ্যা

কানুর কীর্ত্তি

একটি সুন্দর গল্প—গরীবের ছেলে কানু কি করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিল

শিশুতোষ সিরিজের চতুর্থ বই—পৌষ সংখ্যা

আর্য্য ও অনার্য্য

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ। এই বইখানি পড়িয়া ছেলে মেয়েরা আর্য্য ও অনার্য্যদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিবে যাহা শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া কোন দিনই তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সেই পুরাণ দেশের কথা আবার তাহাদের স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিবে বেদের দেব দেবী, সেকালের পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি বেদের অনেক গল্প আছে।

শিশুতোষ সিরিজের পঞ্চম বই—মাঘ সংখ্যা

আজগুবি রূপকথা

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কতকগুলি প্রচলিত রূপকথা। রূপকথার রাজ্যে কিরূপ সুখ ছিল—সেকালে কাপড়ের গাছে কাপড় হইত; ভাতের গাছে ভাত হইত—লোকের আর কোন কষ্ট ছিল না এখন ত আর সে সুখের দিন নাই—তাই বুড়ো বুড়ীরা আজও সেই সব দিনের কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন গল্পগুলি ঠানদিদির মুখে যেমন শুনা যায় তেমনি লেখা হইয়াছে—মধ্যে কোন ভেজাল নাই তাই ঠানদিদির মুখের সব মিষ্টিটুকু এতে আছে

শিশুতোষ সিরিজের ষষ্ঠ বই—ফাল্গুন সংখ্যা

ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণু পুরাণের কয়েকটি গল্প ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে গল্পগুলি যেমন মুখরোচক তেমন নীতিপূর্ণ

শিশুতোষ সিরিজের সপ্তম বই- চৈত্র সংখ্যা

গল্পে রামকৃষ্ণ

প্রভু রাম-কৃষ্ণ বেদ, পুরাণ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন গল্পগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী, সাত আট বৎসরের ছেলেরা পড়িয়া ভারি খুসি হইবে। তাই গল্পগুলি শিশুতোষ সিরিজের পাঠকদের নিকট উপহার দিতেছি। আজকাল ত দেশ হইতে ধর্ম্মশিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াও শক্ত; কারণ, 'শিশুরা ধর্ম্ম-উপদেশ' বড় শুনিতে চায় না। রাম-কৃষ্ণের গল্প শিশুদিগকে উপহার দিতেছি ধর্ম্ম সম্বন্ধে হইলেও শিশুরা আহার নিদ্রা ফেলিয়া এ গল্প শুনিবে

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমার দেশ



প্রকৃতি জননী লইয়াছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি [illegible] ধরিয়া [illegible] তার যে
পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে

তার দেখিতেছে

পৃথিবীর শোক দুঃখের দৃশ্য,

আর শুনিতেছে

পৃথিবীর দুঃখ কাহিনী



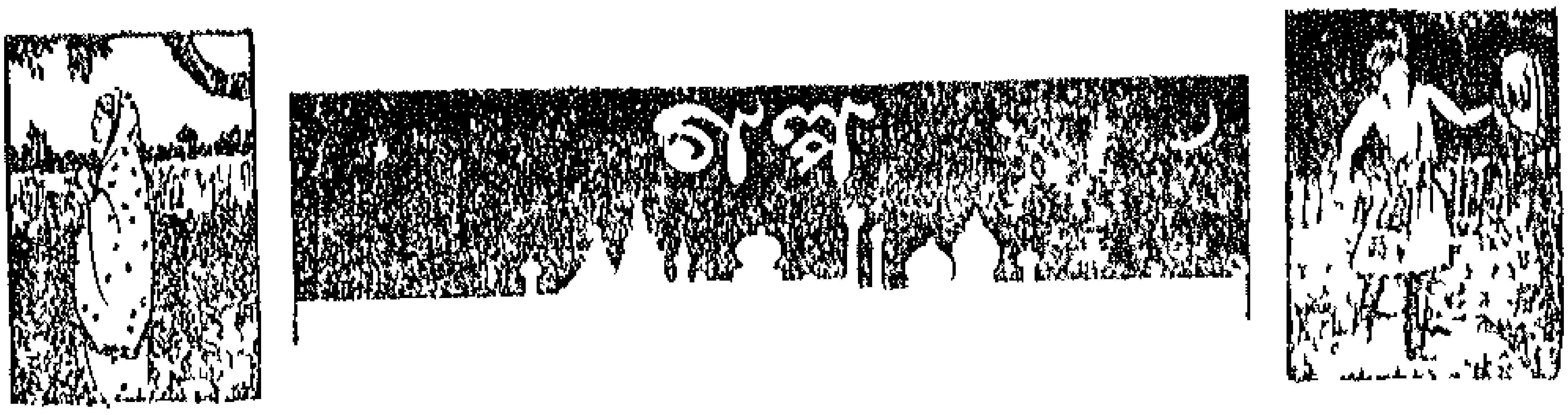
১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কার্ত্তিক, ১৩২৮

প্রভাতে।

কে থুয়েছে গাছের 'পরে
হাজার হাজার হীরে'
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে
খেলতে এসে দেখে চেয়ে —
আয় নাবে ভাই হীরে পাড়ি,,—
বলচে ধীরে ধীরে —

যেমনি বলা অমনি তার
বাড়িয়ে দিল হাত—
কোথা হ'তে এল তখন
হাজার শিশু রবির কিরণ—
এক নিমেষে সকল হীরে
করলে আত্মসাৎ.

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



চন্দ্র সূর্য্য

চন্দ্র সূর্য্য দু'ভাই। সূর্য্য বড়, চন্দ্র ছোট। তাদের বাপ ছিল না। মা তাদের দুটীকে বড় করেছেন। একদিন তারা খুড়োর বাড়ী নেমন্তন্ন খাইতে গেছে, আর মা তাদের পথ তাকিয়ে বসে ছিলেন।

তাদের খুড়ো খুড়ী খুব বড় লোক। দুটী ভাই খেতে বসেছে। নানারকম খাবার তাদের পাতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে — মাছ, মাংস, কালিয়া, পোলোয়া, মিঠাই, পায়েস, ক্ষীর, দই, ছানা, খলমল, ইত্যাদি আরো অনেক জিনিষ যাদের নাম পর্য্যন্ত তারা কখনো কাণে শোনেনি—খাওয়াত দূরের কথা।

সূর্য্যের আনন্দ দেখে কে? সে ঘাড় গুঁজে কেবল গব গব করে খেতে লাগল। মায়ের কথা একবারও ভাবল না। কোন দিকে চাওয়া নেই, কেবল খাচ্ছে—যত পায় তত খায়—'না' আর বলে না। যে পরিবেশন করছিল, দিতে দিতে তার হাত ব্যথা করতে লাগল।

চাঁদ কিন্তু তেমন নয়। সে খায়, আর মায়ের কথা ভাবে। সে মনে মনে বলতে লাগল "কি সুন্দর জিনিষ—মাকে যদি খাওয়াতে পারতেম তাহ'লে তিনি কত খুসী হতেন।" সে তখন অনেক ভেবে চিন্তে যা' কিছু পারল তা' তার হাতের বড় বড় নখের কোণে লুকিয়ে রাখল—ইচ্ছা বাড়ী গিয়ে মাকে খাওয়াবে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে দু'ভাই খুড়ো খুড়ীকে পেণাম করে বাড়ী ফিরল। মা তাদের দেখে হাসতে হাসতে বললেন, "কি বাবা, তোমরাও খেয়ে এলে—এখন মায়ের জন্য কি এনেছ বল শুনি?"

সূর্য্য একটুকু উদ্ধত প্রকৃতির। সে যেন একটুকু বিরক্ত হ'য়ে বলে' উঠল (আর সে অনেক খেয়েছে কিনা—তখন তার প্রাণ আইটাই করছে—মা'র কথা ভাল লাগবে কেন?)

"আনবে আবার কি ? আমরা নিজেরা খেয়ে এলুম — তাতেই লোকে বলবে কি ? সে ভারি লজ্জার কথা ।"

শেষে চাঁদ বললে "আমি মা সামান্য কিছু এনেছি ।" এই বলে সে নখের কোণ থেকে যা কিছু এনেছিল তা সব বার করে মাকে দিলে । মা তাই খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন । তখন তিনি চাঁদকে আশীর্বাদ করে এই বর দিলেন, "তুমি বাবা যেমন আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করলে তেমনি তুমি চিরদিন ঠাণ্ডায় থাকবে—তোমার কিরণে জগৎ শীতল হবে—আর সকলেই তোমাকে ভালবাসবে ।"

তারপর সূর্য্যের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি বড় লোভী ও উদ্ধত প্রকৃতির । আমি তোমাকে অভিসম্পাৎ করছি, তুমি যেমন আমার মনে কষ্ট দিলে তেমনি তুমি চিরদিন জ্বলবে । তোমার কিরণ এমনি জ্বালাময় হবে যে সে যার ওপর পড়বে তাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করবে ।—তোমার পানে কেউ ভাল করে তাকাবে না ।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জিদ্ বজায়

একবার এক সিংহের সঙ্গে একটা লোকের বিষম তর্ক বেধে গেল ।

সিংহ বলে "আমরা বড় ।" লোকটা বলে "মানুষ বড় ।"

রাস্তার ধারে একটা পাথরের মূর্ত্তি দাঁড়িয়েছিল । মূর্ত্তি একজন মানুষের—তার পায়ের নীচে একটা সিংহ পড়ে আছে ।

মানুষ মূর্ত্তিটাকে দেখিয়ে বল্লে—"এখন বোঝ, কে বড় ।"

সিংহ তখন উত্তর করল, "আমরা যদি তোমাদের মূর্ত্তি গড়তে পারতেম তা'হলে একজন কেন, অমন বিশ জন মানুষকে একটা সিংহের থাবার মধ্যে রেখে দিতেম্ ।"

যে যার নিজের জিদ্ বজায় রাখতে চায় ।



প্রাণ দান

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব শিখগুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করিয়া আদেশ দিলেন তেগবাহাদুরের দেহ তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহ সৎকারের জন্য লইতে পারিবে না; দেহ কেহ সরাইলে তাহারও প্রাণ দণ্ড হইবে। শিখগুরুর শব চৌরাস্তার উপর পড়িয়া রহিল, ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সৎকার অভাবে এভাবে পথে শবদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কাহার মনে না কষ্ট হয়? গুরুদেবের শবদেহ রাস্তায় লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, কিন্তু মোগল সম্রাটের আদেশ—কাহার সাধ্য সে শব স্থানান্তরিত করে।

তেগবাহাদুর দিল্লী যাইবার পূর্বে পুত্র গুরুগোবিন্দকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, সম্রাটের আদেশে আমি দিল্লী যাইতেছি, যদি কিছু হয় তবে প্রতিশোধ লইও। আর আমার শবের যেন সৎকার হয়।"

গুরু গোবিন্দের বয়স তখন মাত্র পনের বৎসর। তিনি স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক এ অপমানের—পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ লইতে হইবে। আর যদি আবশ্যক হয় নিজের জীবন দিয়াও পিতার শব উদ্ধার করিয়া আনিবে। গুরু গোবিন্দ তাঁহার সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও না জানাইয়া একাকী গভীর নিশীথে পিতার শবদেহ উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিলেন। যে কার্য্যে মরণ নিশ্চিত তাহাতে আর কাহাকেও সঙ্গী করিলেন না।

পথে গুরু গোবিন্দ দেখিলেন একজন শিখ গাড়োয়ান ও তাহার পুত্র গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। গাড়োয়ান ও তাহার পুত্র গুরু গোবিন্দকে জানিত এবং তাহার পিতার নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদ ও সম্রাটের ততোধিক নিষ্ঠুর আদেশও তাহারা শুনিয়াছিল। দিল্লীর পথে এই ভাবে গুরু গোবিন্দকে একাকী যাইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান গাড়োয়ান বুঝিল গুরু গোবিন্দ কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। শিখের সকলেই তাহাদের গুরুকে পিতার মত, দেবতার মত ভক্তি করিত। গুরুর পুত্র গুরু গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর পর গুরু হইয়াছেন—তাহাকেও সকলেই গুরুর মত শ্রদ্ধা করিত। গুরু গোবিন্দের মুখে ভীষণ প্রতিজ্ঞার চিহ্ন,—পিতৃ হত্যার জ্বালা বেদনা যেন তাহার অন্তর ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

গাড়োয়ান বুঝাল কি বেদনায় গুরুজী এই অসম সাহসীক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একাকী এ অবস্থায় পিতৃদেহ উদ্ধারের জন্য দিল্লী যাওয়া ও নিজ হইতে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া একই কথা। বৃদ্ধ শিখ গুরুগোবিন্দকে কহিল "বাবা আপনার পিতা ও আমাদের গুরুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে দিল্লী যাইতে হইলে আপনার অসম সাহসীক একদল শিখ যোদ্ধা লইয়া যাওয়াই উচিত কিন্তু এখন আর সে ভাবে লোকজন জুট হয় যাইবার সময় নাই তাই অনুমতি হয়তো আপনি এখনেই থাকুন, আপনার পরিবর্ত্তে দাসেরা গিয়াই কার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিতে পারিবে ভুলিয়া যাবেন না বাবা, আপনি এখন একটা জাতির আশা, ভরসা আমরা পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুকে আপনি আলিঙ্গন করিবেন না"

বৃদ্ধ শিখ গাড়োয়ান অনেক বুঝাইবার পর গুরুগোবিন্দ সম্মত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। গাড়োয়ানের পিতা পুত্র গুরু তেগবাহাদুরের দেহ উদ্ধারের ভার লইল তেজে গাড়ী চালাইয়া তাহারা দিল্লী পৌছিল দিল্লীর সহরের বাহিরে থাকিতেই তাহারা মুসলমানের ছদ্মবেশ পরিয়া রাত্রিকালে সহরে প্রবেশ করিল মধ্য রাত্রিতে সহর যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন তাহারা ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইয়া যে স্থানে গুরুর দেহ পড়িয়াছিল তথায় গেল গাড়ী হইতে নামিয়া চোরের মত গুরুজীর দেহের নিকট গিয়া দেখিল তথায় প্রহরী কেহ নাই। গলিত দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, কাহার সাধ্য সে-দেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, একটুও সময় নষ্ট না করিয়া বৃদ্ধ শিখ ও তাহার পুত্র ভক্তি ভরে গুরুজীর দেহ তাহাদের গাড়ীতে তুলিল।

এখন কথা উঠিল গাড়োয়ানদের পিতা পুত্রের মধ্যে প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্য কে গুরুজীর স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে গুরুজীর স্থান একজনে অধিকার না করিলে তাহাদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইবে; কারণ সে স্থানে কোন দেহ না দেখিলে এখনি একটা সোর গোল পড়িয়া যাইবে চারিদিকে বাদশাহের সৈন্য ছুটিবে ও তাহাদের তখনি ধরিয়া ফেলিবে

বৃদ্ধ গাড়োয়ান পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, তুই গাড়ী চালা আমি এখানে রহিলাম দেখিস গুরুজীর দেহ ভালয় ভালয় নিয়ে পৌঁছিয়া দিবি বাবা, অলখ্ নিরঞ্জন রক্ষা কর্ত্তা।"

পুত্র পিতাকে একার্য্য হইতে নিবৃত্ত করার জন্য বহু চেষ্টা করিল কিন্তু পিতার ইচ্ছা টলাইতে পারিল না পিতা সস্নেহে পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা এ বুড়ো

হাও আর কদিন, শিশুজাতি এখন তোমাদের মতই নবীন যুবক চাই। মরবার সুযোগ ঢের পাবে। এর চেয়েও বড় কাজে মরবার জন্য প্রস্তুত হওগে।"

পুত্র পিতার পায়ের ধূলি লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী যখন দৃষ্টি পথের বাহিরে গিয়াছে তখন বৃদ্ধ হেরাথান বক্ষে নিধ্যত্য দিয়া সজোরে বলে কহিলেন "গুরুজী কি ফতে"। বৃদ্ধের জীবনহীন দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কুড়ানো ছেলের কাহিনী

(৬)

পরদিন খুব সকালেই তাহারা যাত্রা করিল। আজ সকালে আর বৃষ্টি ছিল না—আকাশও মেঘমুক্ত। কুকুর তিনটা তাহাদের আগে আগে ছুটিয়া চলিল। কেপি আজ আর আমার কাছ ছাড়িল না—চলিতে চলিতে সে বারবার আমার মুখের দিকে তাকাইতেছিল। বেচারা কথা বলিতে পারে না—বারবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া সে এই কথাই বলিতেছিল—"ভয় নাই, আমি আছি তোমার বিপদে, তোমার দুঃখে তোমার বন্ধু কেপি তোমাকে কখনই ভুলিবে না।"

এই প্রথম আমি আমাদের ছোট্ট গ্রামটি ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। কাজেই সহর দেখিব এই কথা মনে করিয়া আমার মনে খুবই আনন্দ হইতেছিল। সহরে ঢুকিয়া প্রথমেই জুতার দোকান কোথায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই ধারেই দোকান—কিন্তু একটা দোকানও আমার পছন্দ হইল না। এমন দোকানে কি বুট জুতা থাকিতে পারে? বুট জুতার দোকান নিশ্চয়ই খুব মস্ত বড় একটা বাড়ি হইবে। কিন্তু কোথায় মস্তবড় বাড়ি? দুইদিকে কেবল ছোট ছোট খোলার ঘর। আমি হতাশ হইয়া এক একবার ভিটেলিসের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। ভিটেলিস্ কোনদিকে না তাকাইয়া চলিয়াছে। অবশেষে একটা দোকানের সম্মুখে আসিয়া তিনি থামিলেন। সেই দোকানের সম্মুখে কয়েকটা ভাঙ্গা লণ্ঠন, কতদিনের মরচে পড়া কতগুলি তালাচাবি ও একটা পুরাণো বন্দুক ঝুলিতেছিল

আমার সন্দেহ হইল ভিটেলিস তবে কি এই দোকান হইতে আমার জন্য জুতা কিনিবেন? এমন দোকানে জুতা? তাও আবার বুট-জুতা ভিটেলিস্ এই দোকানেই প্রবেশ করিলেন দোকানদার আগ্রহের সঙ্গে আমাদের বসাইলেন তার পর ভিটেলিসের আদেশ পাইলে দোকানদার আমার পায়ের মাপের কতকগুলি জুতা আনিয়া আমায় পরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—ভিটেলিস্ জুতাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তাহারই ভিতর হইতে পছন্দ করিয়া আমার জন্য এক জোড়া কিনিলেন জুতার ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না—বুট-জুতা ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই দোকান হইতে তিনি আমার জন্য সাটিনের কোট, পেন্ট, টুপিও কিনিলেন যে চিরকাল সামান্য ছিটের জামা কাপড় পরিয়া আসিয়াছে আজ কিনা তার গায়ে সাটিনের পোষাক, মা বারবেরেঁ তুমি কোথায়? তোমার আদরের রিমিকে আজ তুমি দেখিলে না ভিটেলিস্‌কে আমি কি করিয়া আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইব আমার মনে হইতে লাগিল তাহার মত এমন ভাল লোক পৃথিবীতে আর একটিও নাই

সেখান হইতে আমরা সরাইখানায় ফিরিয়া আসিলাম ভিটেলিস জিনিষপত্র রাখিয়াই তাহার ঝোলা হইতে মস্তবড় একটা কাঁচি বাহির করিলেন আর অমনি আমার প্যান্টলুনের দুই পায়ে সেই কাঁচিটা চালাইয়া দিলেন আমি তো হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন—"তুমি চিন্তিত হইও না, এই পোষাকে তোমাকে সুন্দরই দেখাইবে তুমি তখন ফরাশি বালক, কিন্তু এই পোষাকে আমি একদিনেই তোমাকে ইটালিয়ান্ করিয়া ফেলিব সেই উদ্দেশেই আমি তোমার প্যান্টলুনের পা ছাঁটিয়া ফেলিয়াছি"

আমি তাহার কোন কথাই বুঝিতে পারিলাম না, হাঁ করিয়া তেমনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভিটেলিস্ বলিলেন—"আগে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাকে সাজাই তাহা হইলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি কতকগুলি লাল নীলবর্ণের ফিতা আমার পায় জড়াইলেন, মাথায়ও টুপির চারিদিকে কতকগুলি ফিতা জড়াইলেন—তাহার মাঝে মাঝে আবার কতকগুলি পশমের ফুলও গুজিয়া দিলেন।

আমার এই নূতন বিচিত্র পোষাক আমার খুবই পছন্দ হইল—কেপিরও আমার এই সাজটা পছন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল, কারণ দেখিলাম আমার নূতন সাজের দিকে

তাবা হইয়া আনন্দে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—লেজ নাড়িতে নাড়িতে বারবার তার সম্মুখের দুই পা আমার বুকের উপর তুলিয়া দিতে লাগিল। জলি (বানরটা) কিন্তু আমাকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। সে বিচিত্র সব ভঙ্গিতে আমাকে ভেংচাইতে লাগিল।

ভিটেলিস আমার এই নূতন পোষাকের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"এইবার তোমাকে কি করিতে হইবে মন দিয়া শুন। আমার এই কুকুর তিনটি দেখিতেছ, ইহাদের সঙ্গে মিলিয়া তোমাকে একটি অভিনয় করিতে হইবে।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"অভিনয়? অভিনয় তো আমি কোনদিনই করি নাই।"

ভিটেলিস্ বলিলেন—"সেজন্য তুমি ভয় করিও না। তোমাকে আমি শিখাইয়া লইব। তোমার বুদ্ধি থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিতে পারিবে।" কুকুর তিনটাকে দেখাইয়া বলিল—"ইহাদেরও আমাকে শিখাইতে হইয়াছে। আমাদের অভিনয়ের বিষয়টি "জলির ভৃত্য।" জলির ভৃত্য কেপি বুড়া হইয়াছে—কাজ করিতে পারে না। নূতন চাকর নিযুক্ত করিয়া সে বিদায় লইবে। এই নূতন চাকরই তুমি।"

আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি ভৃত্য?"

"হাঁ। কেপি বিদায় হইলে তুমিই জলির ভৃত্যের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কিন্তু জলি তো মানুষ নয়, সে যে বানর।"

"তাতে কি? অভিনয়ে মানুষও বানরের ভৃত্য হইতে পারে। কিন্তু তুমি যে একটি একাট মূর্খ, কেপি তাহা জানিত না।"

"আমি একাট মূর্খ?"

"না, তোমার পরিচয় আমি এখনও পাই নাই। কিন্তু এই অভিনয়ে তোমাকে একাট মূর্খই সাজিতে হইবে। জলি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহারের টেবিল সাজাইতে বলিবে। ছুরি, কাঁটা, চামচ, প্লেট সবই টেবিলের উপর থাকিবে। তুমি সেইগুলি সাজাইয়া টেবিলে রাখিবে।"

একটি টেবিল আমার সম্মুখেই পাতা ছিল। তিনি বলিলেন—"আমার সম্মুখে তোমার একবার পরীক্ষা হইয়া যাউক—যাও টেবিলটা সাজাও।"

আমি টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু আমি কিরূপে টেবিল সাজাইব। আমি কোনদিন টেবিল সাজাই নাই—কাহাকে কোনদিন টেবিল সাজাইতেও দেখি নাই। ছুরি, কাঁটা, চামচ, প্লেট প্রভৃতি চারিদিকে ছড়ানো। কোনটায় প্রথম হাত দিই। একটায় যেমন হাত দিতে যাই অমনি ভয় হয়, এই বুঝি ভুল হইল।

আমার এই ভীত সন্ত্রস্তভ ব দেখিয়া ভিটেলিস হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"বাহবা, ঠিক হইয়াছে। তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না- অভিনয়ের সময়ও ঠিক তেমনিই বোকা, হাবার মত দাঁড়াইয়া থাকিবে"

প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরদিনই আমাকে অভিনয়ে নামিতে হইবে। সমস্ত রাত্রি আমার ভাবনায় ঘুম হইল না।

সকালে দেখিলাম অভিনয়ের জন্য বিরাট আয়োজন হইয়াছে কুকুর তিনটা ও জলিকে চেনা যায় না—তাহাদের সকলেরই গায় জামা মাথায় টুপি সর্ব্বাপেক্ষা জমকালো পোষাক জলির—তার গায়ে লাল কুর্ত্তা, মাথায় লম্বা মিলিটারি হ্যাট্, পায়ে লাল সাটিনের পাজামা—তাতে আবার জরির কাজ করা সে কেপির ঘাড়ে চড়িয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিল ভিটেলিসের দীর্ঘ উন্নত দেহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মুখে বাঁশি—তালে তালে পা ফেলিয়া তিনি চলিলেন তার পিছনেই কেপির পিঠে জলি তাহার পিছনে খানিকটা জায়গা রাখিয়া ডলসি ও জরবিনে চলিল—সর্ব্ব পশ্চাতে আমি নিজে। আমরা সংখ্যায় খুব বেশী না হইলেও সাজানোর কৌশলে আমাদের দলটিকে বেশ ভারি বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। আমাদের এই বিচিত্র পোষাক, তার উপর ভিটেলিসের বাঁশি, চারিদিক হইতে মানুষ ছুটিয়া আসিতে লাগিল পূর্ব্ব হইতেই একটা খোলা জায়গা ভিটেলিস অভিনয়ের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি তাহার খানিকটা অংশ দড়ি দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন লোকের ভিড় ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল

ভিটেলিস প্রথমতঃ কুকুরদের দ্বারা কসরৎ দেখাইলেন এক সময় ভিটেলিস বাঁশি রাখিয়া বেহালা ধরিলেন—বেহালার তালে তালে কুকুর তিনটা কখনও নাচিতে লাগিল কখনও ডিগবাজি খাইতে লাগিল। কিন্তু আমার সেদিকে মন ছিল না আমার নিজের অভিনয়ের কথাই আমি সর্ব্বক্ষণ ভাবিতে ছিলাম।

কিছুক্ষণ পর বেহালাও থামিয়া গেল। এইবার কেপির পয়সা আদায়ের পালা—সে একটা পিতলের বাটী মুখে করিয়া সকলের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল সকলেই তাহার বাটীতে কিছু কিছু ফেলিয়া দিতে লাগিল, যে কিছু দিল না সে তাহাদেরও ছাড়িল না, দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া সে তাহাদের পকেটে প ঢুকাইয়া দিল কেপির এই বুদ্ধি দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পয়সা আদায় শেষ হইলে ভিটেলিস্ এক হাতে বেহালা ও অন্য হাতে ছড়ি ধরিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ! আপনারা

আমার কুকুরের কসরৎ দেখিলেন। এইবার আমি আপনাদের সম্মুখে একটি রঙ্গচিত্রের অভিনয় করিব, অভিনয়ের বিষয় জলির ভৃত্য।" আপনারা তার বিলক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আগাগোড়া আমার এই অভিনয়টি দেখুন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি তাহার দলের বেশী প্রশংসা করিতে চাই না, তবে আপনারা দেখিয়া যে হাসিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমি নির্ভয়ে কথা দিতে পারি।"

সকলেই অভিনয় দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভিটেলিস তখন তার বেহালা ছাড়েন নাই, তিনি একটানা বেহালা বাজাইয়া চলিলেন। একটু পরেই "জলি" রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল— তাহার পরনে সেই মিলিটারি পোষাক।

ভিটেলিস্ দর্শকদের বলিয়া দিলেন, ইনিই আমার অভিনয়ের প্রধান নায়ক— ইংলিশ জেনারেল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জঙ্গী লাট ছিলেন। এখন পেনসন্ লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার প্রধান খানসামা কেপি বুড়া হইয়াছে, এখন তাঁহার আর একটি ভৃত্যের প্রয়োজন। কেপি ভৃত্যের অনুসন্ধানে গিয়াছে।

জেনারেল সাহেবের মুখে সিগারেট্। তিনি সিগারেট্ টানিতে টানিতে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়া দর্শকদের মুখের দিকে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু ভৃত্য সে আসে না। তিনি এদিক ওদিক উঁকি মারিতে লাগিলেন, পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন, তবু ভৃত্যের দেখা নাই। রাগে তিনি ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন, সজোরে মাটিতে পা ঘসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কেপি আসিল, সঙ্গে আমি,— আমিই জেনারেল সাহেবের নবনিযুক্ত ভৃত্য। জেনারেল সাহেব একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। আমি যে একটি অকাট্ মূর্খ একবার দৃষ্টিতেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া তিনি হতাশ দৃষ্টিতে কেপির দিকে তাকাইলেন। এত খুঁজিয়া সে এমন একটা অকাট মূর্খ ধরিয়া আনিয়াছে! জেনারেল সাহেব আমার সম্মুখে আসিয়া আমার নাক, মুখ, কাণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, যদি কোথাও তিনি একটু বুদ্ধির পরিচয় পান। তখনকার তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া দর্শকগুলো হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। আমি যে নিতান্তই একটি অকাট মূর্খ সে সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ রহিল না। অবশেষে নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই যেন তিনি আমাকে তাঁহার কর্ম্মে বহাল করিলেন। নিকটেই একটা টেবিল পাতা ছিল, তাহার উপর খাবার সজ্জিত। আঙ্গুলের ইসারায় জেনারেল সাহেব আমাকে টেবিলে আহারে বসিতে বলিলেন।

ভিটেলিস্ দর্শকদের দিকে ফিরিয়া বলিয়া দিলেন—"জেনারেল সাহেব মনে করিতেছেন কিছু আহার করিলে তাঁহার নূতন ভৃত্যের বুদ্ধি হয়তো কিয়ৎ পরিমাণে খুলিবে "

আমি আহারে বসিলাম কিন্তু ছুরি, কাঁটা, চামচ, নেপকিন্ দিয়া কি করিতে হয় আমি কিছুই জানিনা কতক্ষণ হাঁ করিয়া বোকার মত তাকাইয়া রহিলাম জেনারেল সাহেব আমাকে নেপকিন্‌টা দেখাইয়া দিলেন আমি তাড়াতাড়ি নেপকিন্‌টা তুলিয়া পাকাইয়া পাকাইয়া গলায় বাঁধিলাম। অমনি জেনারেল সাহেব হো হো করিয়া উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। নেপকিন্ কি নেকটাই যে গলায় বাঁধিতে হইবে? এই সামান্য বিষয়টাও তাহার নূতন ভৃত্য জানেনা—কি বোকা কি বোকা হাসিতে হাসিতে জেনারেল সাহেব মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল কেপিরও কি হাসি!

দুইজনের হাসিতে হতবুদ্ধি হইয়া নূতন ভৃত্য তাড়াতাড়ি নেপকিন্‌টা গলা হইতে খুলিয়া ফেলিল অনেকক্ষণ নেপকিনটার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল—নেপকিনটা দিয়া সে ফেচ্ ফেচ্, করিয়া নাক ঝাড়িতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ নেপকিনে নাক ঝাড়া! জেনারেল সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া ভৃত্যের হাত হইতে নেপকিনটা কাড়িয়া লইলেন। নিজে আর একটা নেপকিন লইয়া সোজা হইয়া টেবিলে বসিলেন। তারপর যে কি পরিপাটির সহিত নেপকিন্‌টা হাটুর উপর পাতিলেন। নূতন ভৃত্য হা করিয়া তাহার নূতন মনিবের কাজ দেখিতে লাগিল এমন সহজ বিষয়টা সে জানেনা!

জেনারেল সাহেব আহারে বসিলেন। ছুরি, কাঁটা, চামচ ধরিবারই বা কি ভঙ্গি! প্লেট হইতে রুটি কত ভঙ্গিতে একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিয়া মুখে পুরিতে লাগিলেন—কখনও গ্লাশ হইতে চুমুক দিয়া জল পান করিলেন

দর্শকেরা হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল বানরের কি বুদ্ধি আর তাহার নূতন ভৃত্য মানুষ হইয়াও বোকা! চারিদিক হইতে দর্শকেরা বাহবা, বাহবা করিতে লাগিল

আহার শেষ হইলে খড়্‌কে দিয়া যখন জেনারেল সাহেব দাঁত খুঁচিতে লাগিলেন তখন দর্শকেরা হাসি আর সামলাইতে পারিল না চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল সেদিনের মত আমাদেরও অভিনয় শেষ হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

আশানন্দ ঢেঁকি

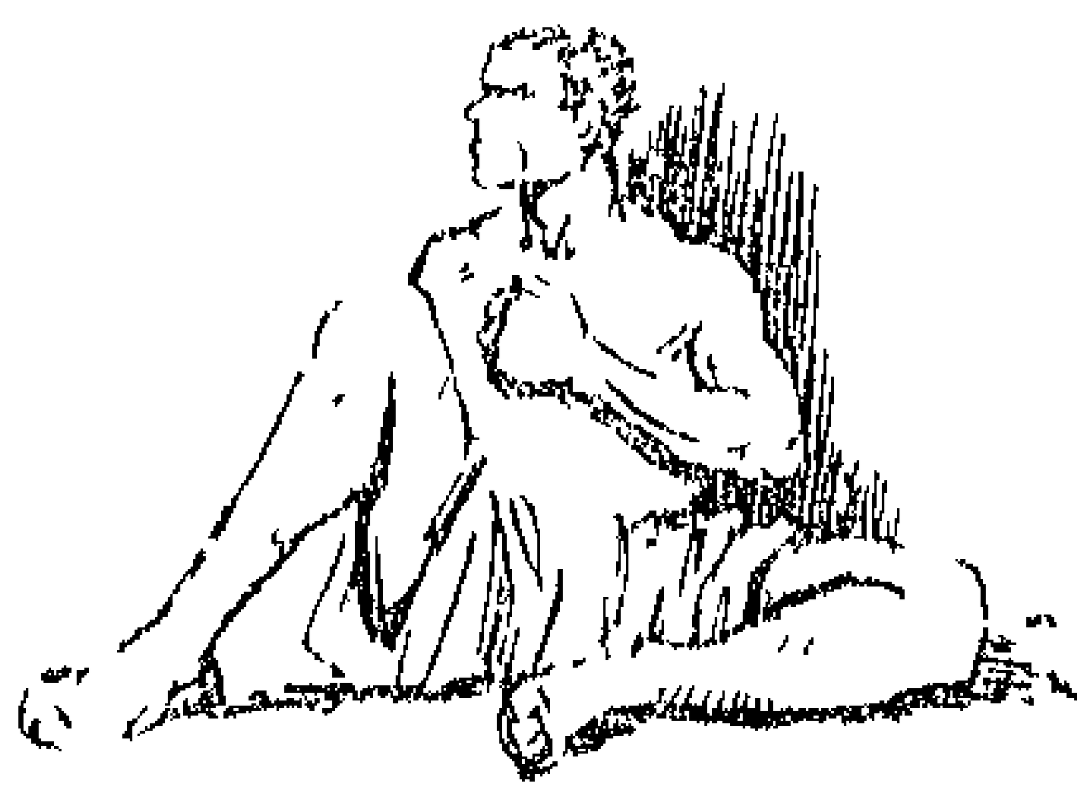
নাম ছিল তার আশানন্দ,
ময়রা ছিল জাতে,
দিন রাত্তির মর্ত্তে খেটে,
কেবল পেটে ভাতে
আপনার তার কেউ ছিল না,
বুদ্ধি ছিল খাটো;
মোষের মত কিন্তু ছিল,
দেহটা তার দাটো
ঈশান বোসের অনেক টাকা,
মিথ্যে কথা নয়,
সিন্দুক তার টাকায় ভরা,
রাষ্ট্র গ্রামময়
ডাকসাইটে ঈশান বোস,
কৃপণ নামজাদা;
বাল্য হ'তে আশানন্দ,
তার বাড়ীতে বাঁধা
বাপ হারিয়ে মা হারিয়ে,
শুধু পেটের জন্যে,
ঘুরছিল সে দোরে দোরে,
যখন হয়ে হন্যে,
সেই সময়ে ঈশান বোস,
আনলে তারে সাথে,



চাকর করে রাখলে তারে,
কেবল পেটে ভাতে
সেই অবধি আশানন্দ,
তাহার বাড়ী থেকে,
দিন রাত্তির মরে খেটে,
শুধু খেলে না পাকে
জল তুলতে ক্ষেত রাখতে,
করতো সকল কাজ;
দিনের ভেতর রইত কর্মনাশ,
শুনতে তারি নাম
রাতটা সেদিন অমাবস্যা,
ভর নিরেট কালো,
রে রে করে পড়লো ডাকাত,
জ্বেলে মশাল আলো
আওয়াজ শুনে ঈশান বোসের
চমকে গেল পিলে;
ফকির হতে হবে এবার,
সকল লুটে নিলে
কাঠের মত রইল পড়ে,
নড়লে না একতিল;
গিন্নি বল্লে "পড়লো ডাকাত,
দাওগে দোরে খিল"।

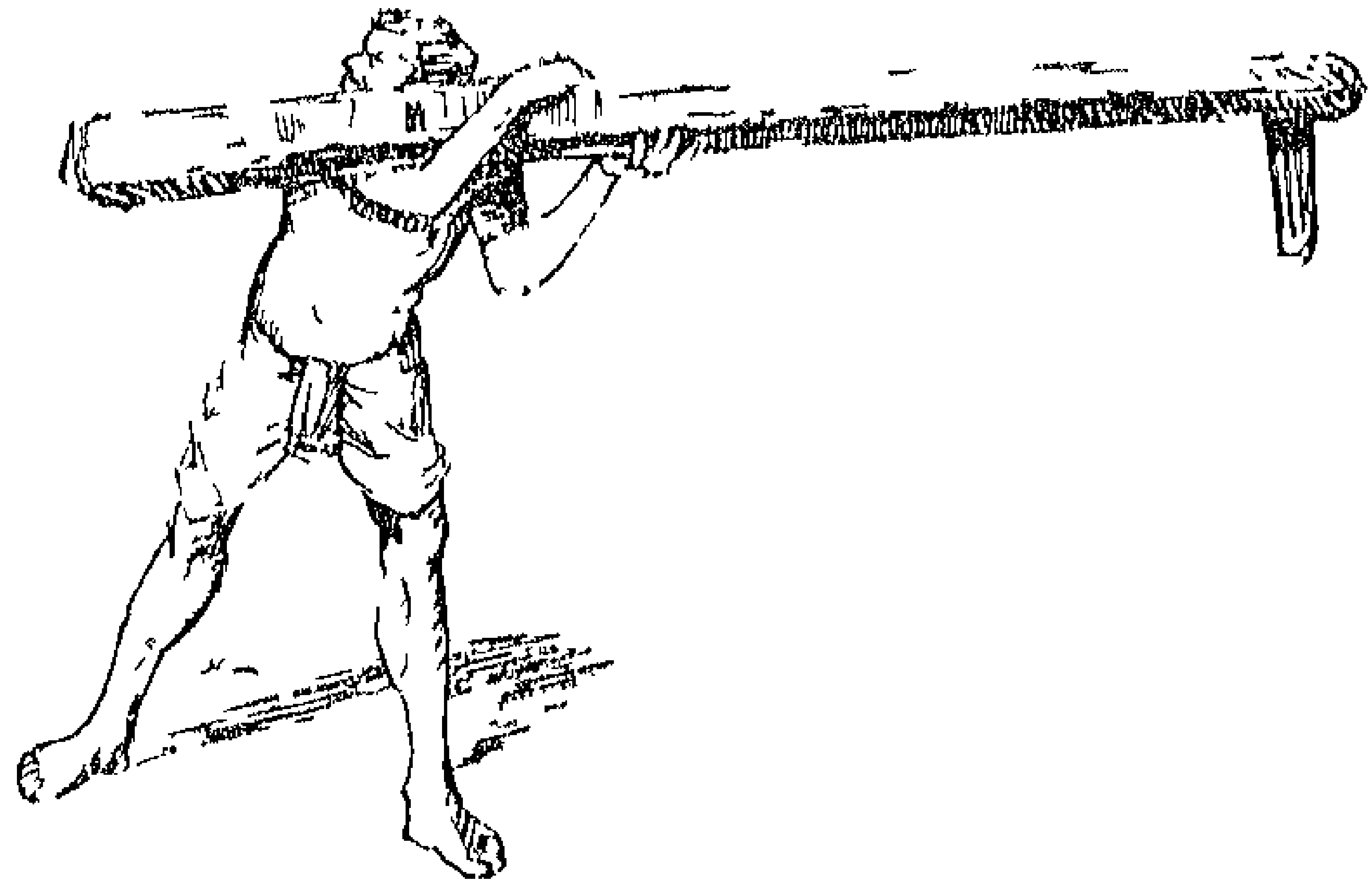
'দরজায় দাও খিলটা ভাই',
বলে সহজ ভাবি ;
ব্যাপারটা যে কঠিন কত,
বুঝবে কি তা নারী।
এদিকেতে ডাকাতরা সব,
দেখিয়ে লাঠির খেল ;
রে রে করে মাতিয়ে পাড়া,
দিচ্ছে দোরে ঠেল

মদন দে বেশ পড়েই ছিল,
আশানন্দের ঘর ;
ঘুমিয়েছিল নাক ডাকিয়ে,
সারা দিনের পর
ডাকাতদের এই হট্টগোলে,
ভাঙলে তাহার ঘুম ;
কান পেতে সে বুঝলে শুনে,
বাইরে বেজায় ধুম

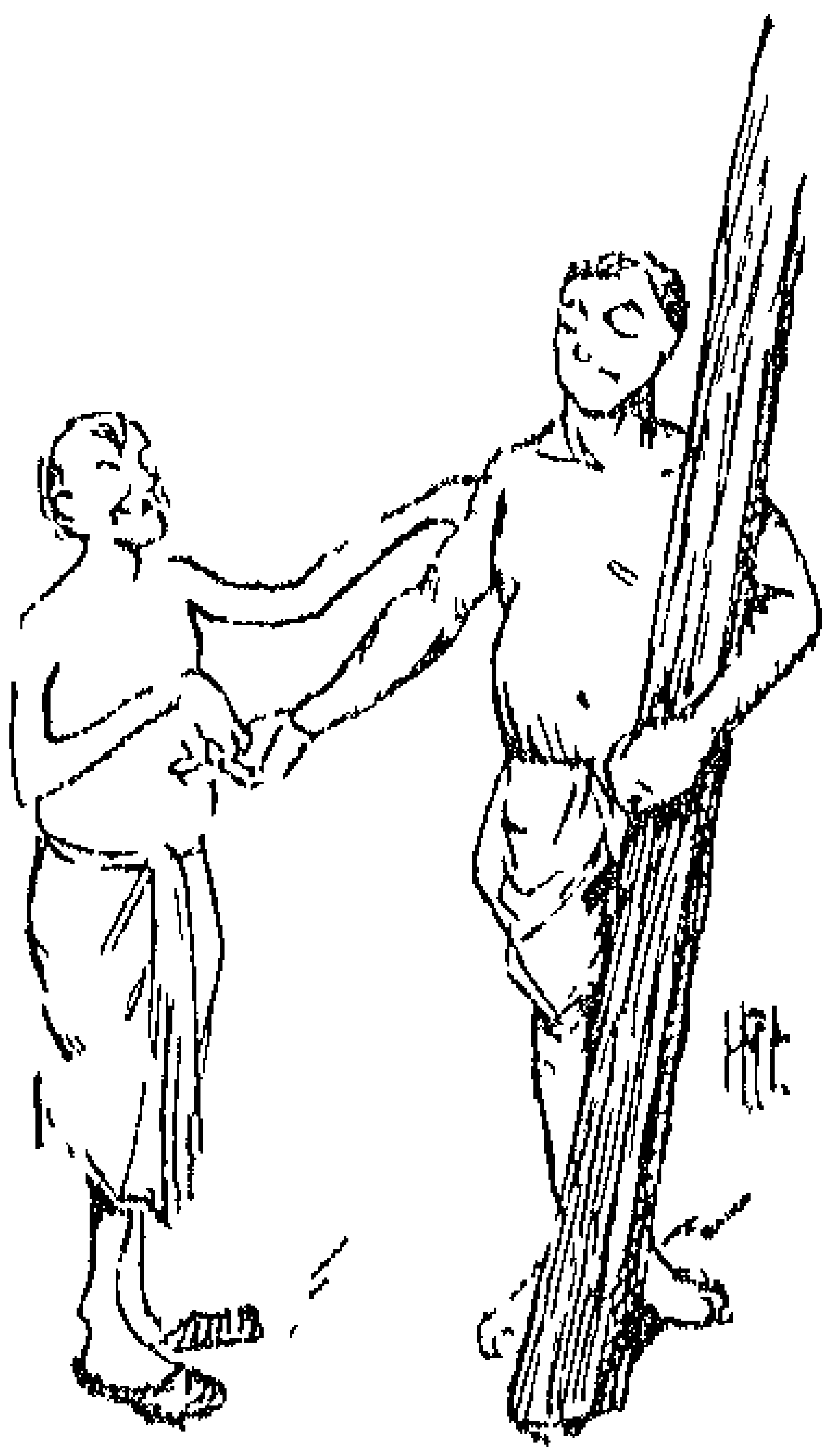


বল্লে হেঁকে "কে রে তোরা,
করিস গণ্ডগোল,
পাড়ায় এসে রে রে করে,
বাজিয়ে মাদল ঢোল"
"বাবা রে তোর দরজা খোল ;
বাঁচতে যদি চাস ;
নইলে পরে দরজা ভেঙে,
পাঠাব যমের পাশ"
"বাবা আমার তাই না কি রে,"
বল্লে আশানন্দ ;

"দাও তবে দরজা খুলে,
সেটাই মনের সন্দ"
এদিক ওদিক দেখে শেষে,
ঢেঁকি শালায় গিয়ে ;
দরজা খুলে আশানন্দ,
বেরুলো ঢেঁকি নিয়ে
বন বন বন ঘুরছে ঢেঁকি,
এগোয় সাধ্য কার,
ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে গো যায়,
লাগছে যেথায় যার



ডাকাতরা সব অবাক দেখে,
কে এ মর্দ্দরাম;
ধন বন বন ঢেঁকি ঘুরোয়,
ভুলোয় বাপের নাম
পালা পালা পড়লো রব,
মশাল ফেলে দিয়ে;
ডাকাতরা সব পালিয়ে গেল,
প্রাণটি শুধু নিয়ে
ছুটে এসে বল্লে ঈশেন,
"ওরে আমার বাব;
ধাপের বাড়া কল্লিরে কাজ,
কে বলে তুই হাব।
আজ থেকে তোর মাইনে হ'লো
দশটী করে টাকা;



সার্থক তুই কল্লিরে আজ,
আমার বাড়ী থাকা"
ঢেঁকি নাবিয়ে আনন্দ,
গেলো নাম জারি;
কদর তখন বাড়লো তার;
হ'লো মর্দ্দ ভারি
শরীরেতে শক্তি থাকা,
বিশেষ প্রয়োজন;
সবল স্বাস্থ্য দেহ ভরে
অমূল্য রতন
শক্তি নেই—শরীরটী যার,
অস্থি চর্ম্ম সার;
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা
বিড়ম্বনা তার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

ঘোড়ায় অঙ্ক কসে

এক হইতে একশ পর্য্যন্ত গুণিতে বলিলে তুমি হাসিতে হাসিতে গুণিয়া ফেলিতে পার। যদি কেহ যোগ বা বিয়োগ বা গুণ অঙ্ক তোমাকে দেয় তুমি তাহাও অনায়াসে কসিয়া দিতে পার। তোমার বুদ্ধি আছে সুতরাং সব করিতে পার। কিন্তু এমন কথা কখনও শুনিয়াছ কি যে, ঘোড়ারও বুদ্ধি আছে, সেও ঠিক তোমাদের মত অঙ্ক কসিতে পারে? গাড়ী টানে, মাল বয়, পিঠে করিয়া মানুষ লইয়া যায়, এই ত আমরা জানি। আবার, আমাদের দেশে যেমন গরুতে লাঙ্গল টানে বিলাতে তেমনই ঘোড়ায়ও লাঙ্গল টানে। কিন্তু এমন অনাসৃষ্টি কথা কে কবে শুনিয়াছে যে ঘোড়ারাও মানুষের মত গুণিতে পারে, অঙ্ক কসিতে পারে? খুব আশ্চর্য্য নয়?

এই যে সেদিন মস্তবড় একটা যুদ্ধ হইয়া গেল, এখনও যাহার জের চলিতেছে, সেই যুদ্ধটা কাহার সঙ্গে হইয়াছিল জান? জার্ম্মাণীর সঙ্গে। একপক্ষে জার্ম্মাণী, আর অন্যদিকে আর আর সব। আচ্ছা, সে কথা থাকুক। আমি এই জার্ম্মাণীর কথাই তোমাদিগকে বলিব।

আমাদের দেশে এখন সকল কবির অপেক্ষা বড় কবি রবীন্দ্রনাথ। বেলজিয়মেও একজন তেমনি বড় কবি আছেন। অবশ্য তিনি এখন সেখানে থাকেন না। তাঁহার নাম হইল মেটারলিঙ্ক। এই প্রসিদ্ধ কবি মেটারলিঙ্ক গিয়াছিলেন একবার জার্ম্মাণীতে। তখন যুদ্ধের নামগন্ধও ছিল না। সকলেরই বেড়াইতে সাধ হয়। তাই এই কবিও বেড়াইতে জার্ম্মাণীতে গিয়াছিলেন। কয়েক মাস সেই দেশে ঘুরিবার পর বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি একদিন উঠিলেন গিয়া এক পশুপালকের বাড়ীতে। পশুপালন করাই ছিল ইহার ব্যবসা। কবি দেখেন যে, এই লোকটার বাড়ীতে কত যে ঘোড়া তাহার আর অন্ত নাই। যুদ্ধের ঘোড়া, মালটানা ঘোড়া, এরকম অনেক ঘোড়া সেখানে ছিল। কিছুকাল তাহার সহিত কথাবার্ত্তা হইলে পর এই পশুপালকটি কবি মেটারলিঙ্কের হাত ধরিয়া একটা ঘরে উঠিয়া গেল। কবি কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে হঠাৎ ঘরের মধ্যে লইয়া গেল কেন? গিয়া দেখেন, ঘরের দেওয়ালে মিশমিশে কাল একখানি বোর্ড টাঙান। আর তাহার পাশেই টেবিলের উপর চক দিয়া তৈয়ারী একখানা পেন্সিল। তখনও মেটারলিঙ্ক কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর যখন সেই লোকটি মস্ত বড় একটি ঘোড়া ঘরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন তাঁহার মনে হইল সে নিশ্চয়ই এই ঘোড়াটির দ্বারা কোনপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য দেখাইবে। কিন্তু কি অদ্ভুত

কাণ্ড কারখানা যে হইবে তাহা ত স্বপ্নেও ভাবেন নাই। চক্ দিয়া ঘোড়া কি করিবে? তবে কি মুখ দিয়া চক্ ধরিয়া বোর্ডের উপর সে কিছু লিখিবে? কিছুই ঠিক করিতে পারেন না।

ঐ পশুপালকটি তখন সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিল। সে বলিল, এই যে চকচকে কাল রঙের ঘোড়াটি, ইহা যেমন তেমন ঘোড়া নয়—ইহার অনেক গুণ। যোগ বলুন, বিয়োগ বলুন, গুণ বলুন, যে অঙ্কই বলুন না কেন এই নির্বাক প্রাণীটি তাহা অনায়াসে কসিয়া দিবে। কথা বলিতে পারে না বটে কিন্তু অনায়াসে সাধারণ ছোট ছোট অঙ্ক সে কসিতে পারে। দেখিবেন? এই বলিয়া সে বোর্ডের উপর একটি যোগ অঙ্ক লিখিয়া দিল। লিখিয়া দিয়া ঘোড়াটিকে টানিয়া বোর্ডের দিকে মুখ করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। হাঁ, একটা কথা বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। সেই ঘোড়াটির নাম ছিল ভোবার্ড। যাক, তারপর তখন ভোবার্ডের কার্য আরম্ভ হইল। দেখা যাউক ভোবার্ড কি করে। অশ্বরাজ তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিছু ভাবিয়া লইল কিনা কে জানে! ঘরের মধ্যে আর কেহই কিন্তু নাই। সেই প্রাণীটি আর লোক দুইজন। কেহ কোন কথাই বলিতেছেন না। কেবল চিন্তা অবাক হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। ভোবার্ড তখন মেজের উপর সজোরে পা দিয়া শব্দ করিতে লাগিল ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্। সেই পশুপালক জোর করিয়া বলিল, শুনুন। সেই ঠক্ ঠক্ শব্দগুলি গুণিয়া দেখুন অঙ্কটির যোগফল যাহা ঘোড়াও ঠিক ততটা বলিতেছে। ধর যদি ফল হয় একুশ, তবে ঘোড়াটিও ঠিক একুশটি ঠক্ ঠক্ শব্দ করিবে। কবি ত তখন একেবারে অবাক্। তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা সরে না। ঘোড়া অঙ্ক কসিল—এ আবার কি? চট্ করিয়া তখন তাঁহার একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিল, নিশ্চয়ই এসব এই লোকটার চাতুরী আর কিছুই নয়—সে মাত্র কয়েকটি শব্দ করিতেই ঘোড়াকে শিখাইয়া লইয়াছে এবং যে আসে তাহাকেই ঐ শব্দ কয়েকটি শুনাইয়া আসিতেছে, সকল বিদ্যা এখনই বাহির হইয়া পড়িবে, দাঁড়াও। এই বলিয়া তিনি নিজের হাতে লইলেন খড়ি। খড়িখানি লইয়া নিজের ইচ্ছামত একটি যোগ অঙ্ক বোর্ডের উপর লিখিয়া দিলেন। কিন্তু এবার? এবার উপায় কি? কবির হাতের খড়ি হাতেই রহিল এবং একদৃষ্টে সেই ঘোড়াটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটি তখন একটি সঙ্কেত করিয়া উহাকে অঙ্কটির ফল বলিতে বলিল। মেটার্লিঙ্ক হাসিতে লাগিলেন। হাসিলে কি হইবে, আবার সেই ঠক্ ঠক্ শব্দ। মেজের উপর খুব

দিয়া সেইরূপ ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া ঠিক ঠিক অঙ্কটির উত্তর জানাইয়া দিতে লাগিলেন। শুনিয়া দেখেন একেবারে নির্ভুল, একটি শব্দও বেশী বা কম হয় নাই। তোমাদের হয়ত বিশ্বাস হইতেছে না যে সত্য সত্যই কোন কাঠের ঘোড়া করিতে কি না। কিন্তু ইহা একেবারে খাঁটী সত্য। তখন সেটালিঙ্ক বুঝিলেন, যে এ সুবিক বুদ্ধিমান প্রাণীই বটে এ সামান্য অশ্ব নয়। তাহার পর তিনি একটি হাতে বিয়োগ অঙ্ক উহাকে কষিতে দিলেন এবারেও সে পরাজিত হইল না। ঠিক ফল বলিয়া যাইতে লাগিল। তার পর দিলেন একটি গুণ অঙ্ক। গুণের বেলায় কিন্তু সে একটু ভুল করিল। প্রথম বার ঠক ঠক্ করিয়া যাহা জানাইল তাহাতে একটি শব্দ বেশী হইয়া গেল। তার পর যখন আবার উহার ফল বলিতে তাহাকে সঙ্কেত করা হইল তখন আর ভুল হইল না।

তবে একটা কথা। ঘোড়াটি না হয় বুদ্ধি করিয়া মনে মনে অঙ্ক কসিতে পারে। সে ত আর অক্ষর চিনে না, তাই যে যে অক্ষর দিয়া বোর্ডের উপর অঙ্কগুলি লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল উহাকে এক একটি অক্ষরের জন্য ততগুলি শব্দ করিয়া শুনাইয়া দিতে হইত। ধর যেন বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে ৩, ৭, ৭, ৮ ইত্যাদি, ঠিক তত কয়টা শব্দ করিয়াও উহাকে শুনাইতে হইবে। শুনিয়া তার পর সে ফল মনে মনে হিসাব করিয়া বলিয়া দিবে। কিন্তু তাহাই কি সহজ? কোন দিন যে প্রাণীর মস্তককে হারাইয়া ফেলে তাহার ঠিক নাই। যুদ্ধের সময় কিন্তু তেমন কাণ্ডও হইয়া গিয়াছে। সে কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীঅনঙ্গকুমার সান্যাল



শিশুর সনে শিশু

শিশুর সনে শিশুটি হয়ে খেলছি ছেড়ে কাজ,
বয়স মোর অনেকখানি পিছিয়ে গেছে আজ
বিড়াল ছানা কোথায় গেল, কোথায় "বধ" নাচে
খবর সব রাখতে হয় "বেণুর" পাছে পাছে।
সকাল বেলা বেণুর সাথে মুড়ি মুড়কি খেয়ে,
পড়তে হয় "খেলার সাথী" ছবির পানে চেয়ে.
দুপুর বেলা বেণু আমার ঘুম পাড়াতে গিয়ে,
নিজে ঘুমায় কেমন আহা আমায় বুকে নিয়ে.
দু'টী কোমল কচি হাতের পরশ টুকু পেয়ে,
হৃদয় মন উঠেরে মোর নূতন সুরে গেয়ে
বেণু যখন সন্ধ্যাবেলা সারা উঠানময়
নেচে বেড়ায়, তখনো মোর থাকতে সেথা হয়.
মালতীফুলে বেণুর কানে দুলিয়ে দিলে দুল,
আমারো কানে দিতেই হবে নাইক কিছু ভুল.
গাইতে হবে বেণুর সনে আমাকে কত গান,
সন্ধ্যাতারা শুনবে বুঝি ঝিঁঝী দিবে তান
তারপরেতে খাওয়া সেরে সারা রাতটী ভোর
ঘুমাই সুখে জড়িয়ে গলা বেণুর সাথে মোর

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

সরল বঙ্গ-সাহিত্য

চণ্ডীমঙ্গল

মনসা-মঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলেরও এক সময়ে খুব আদর ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের গল্প দুইটি। তাহার একটিতে কালকেতু ও ফুল্লরার কথা আছে।

কালকেতু ব্যাধের ছেলে, পাঁচ বছর বয়সেই সে হরিণ শিকার করিতে পারিত, তখন তাহার কাণে দুইটি কুণ্ডল ছিল, সূতে দিয়া বাঁধা বাঘের নখ বুকের উপর ঝুলিত এবং দুইটি হাত লোহার শাবলের মত শক্ত ছিল। সে বাটুল দিয়া পাখী মারিত, এবং শিশুদের সঙ্গে যদি ঝগড়া করিত, তবে তাহাদিগের এক একজনকে এমনই জোরে আকড়াইয়া ধরিত, যে তার প্রাণ সংশয় ঘটিত। বাহুবলে তাহার সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তার শরীরটি কালো রংএ একটা জমাট মেঘের মত দেখাইত। ছোট একটা হাতীর বাচ্ছা যেমন দেখায়, সে দেখ্‌তে তেমনই ছিল। শিশুদের মাঝখানটায় তাকে দেখ্‌লে মনে হত যেন সে শিশুদের মোড়ল।

যখন তার উপযুক্ত বয়স হইল—তখন তার পিতামাতা তাকে ফুল্লরার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। ফুল্লরা ব্যাধের বউ। কালকেতু শীকার করিয়া হরিণের মাংস আনিত, আর ফুল্লরা সেই মাংস মাথায় করিয়া বাজারে বেচিত। ফুল্লরা বেশ রাঁধিতে জানিত। কিন্তু তা হ'লেও দুইজনে বড় কষ্টে সংসার চালাইত। তাহারা বড় গরীব ছিল। তাদের একখানি মাত্র কুঁড়ে ঘর ছিল, তার মাঝখানে একটা ভেরাণ্ডার থাম, বৈশাখ মাসের ঝড়ে প্রায়ই সেই থাম ভাঙ্গিয়া পড়িত। বর্ষাকালের বৃষ্টিতে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে জল ঢুকিত, তারা কড়ির অভাবে একখানি মেটে পাথরও কিনিতে পারিত না, ঘরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া 'আমানি' রাখিয়া দিত ও তাহাই খাইত। কোন কোন দিন মাংস বেচিতে পারিত না, এবং সেই সেই দিন বইচির ফল খাইয়া একরূপ উপোষ করিয়া দিন কাটাইয়া দিত। কতদিন কচু পাতা দিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মাংসের বোঝা মাথায় করিয়া ফুল্লরা বাজারের পথে চলিয়াছে হঠাৎ চিল ছোঁ মারিয়া মাংসের অর্দ্ধেক লইয়া উড়িয়া যাইত। আষাঢ়ের নূতন জলে দুধারে কচু বন—সেই পথ দিয়া যাইতে শত শত জোঁক আসিয়া ফুল্লরাকে ঘিরিয়া ধরিত। ফুল্লরা মনে ভাবিত, এত জোঁক না আসিয়া যদি একটি সাপ আসিয়া ছোবল মারে—তবে তো তাহার জ্বালা যন্ত্রণার শেষ হইতে পারে। শীতকালে কাপড়ের অভাবে তাহারা হরিণের ছড় পরিয়া থাকিত, একটা তালি দেওয়া বহু পুরাণ কাঁথা ছিল, কিন্তু তাহা টানিয়া গায়ে পায়ে দিতে গেলে ছিঁড়িয়া যাইত। আশ্বিন মাসে

সকলে নূতন কাপড় পরিয়া আনন্দিত হইত, কিন্তু সেই উৎসবের সময়ে ফুল্লরা পেট ভরিয়া ভাত পাইত না, কারণ পূজায় শত শত পাঁঠা বলি হইত, ঘরে ঘরে সেই মাংস লোকে পাইত—বাজারের মাংস কে কিনিবে? বসন্তকালে মালতী ফুল ফুটিত, ভ্রমরেরা ফুলে ফুলে বেড়াইত, কোকিল ডাকিতে থাকিত আর এক প্রকারে বা এই সুখের বসন্তকালে কত আমোদে দিন কাটাইত, কিন্তু ফুল্লরার দিন উপোসে উপোসে কাটিয়া যাইত।

কালকেতু খুব খাইতে পারিত, ফুল্লরা যা রাঁধিত খুব বড় বড় গ্রাসে কালকেতু একাই তাহা সাবাড় করিয়া ফেলিত। সে তাহার মস্ত বড় দুইটা গোঁফ মুচড়াইয়া কানের সঙ্গে জড়াইয়া খাওয়ার কাজে লাগিয়া যাইত, এক একটা গ্রাস তুলিত যেন এক একটা "তেএঁটে" তাল। অনেক সময় সে খাইয়া চলিয়া গেলে ফুল্লরার জন্য আর কিছু থাকিত না। ফুল্লরা স্বামীকে খাওয়াইয়া খুব সন্তুষ্ট হইত—তখন নিজের উপোসের কথা ভুলিয়া যাইত।

এত যে কষ্ট, তার মধ্যেও তাহাদের সুখ ছিল। ফুল্লরা প্রাণ দিয়া স্বামীকে ভালবাসিত এবং কালকেতু ফুল্লরাকে প্রাণের মত ভালবাসিত। দুইজনে দুইজনের মুখ দেখিয়া আর সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইত।

চণ্ডীর দয়া হইল। একদিন কালকেতু শিকার করিতে গিয়া সেখানে দরকারি কোন জন্তু পাইল না, কেবল একটা গোসাপ পাইল, সেইটিকে ধনুকের গুণে বাঁধিয়া লইয়া আসিল—এবং ভাবিল যে সেই গোসাপটাকে শিক-পোড়া করিয়া খাইবে। বাড়ীতে ফিরিয়া সে ফুল্লরাকে কিছু খুদ ধার করিয়া আনিতে পাঠাইল, এবং নিজে নুন কিনিতে বাজারে গেল।

কিন্তু গোসাপটি সত্য সত্যই আর গোসাপ নয়। চণ্ডী স্বয়ং গোসাপ রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন। ফুল্লরা বাড়ী ফিরিয়া দেখিল এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা, তাঁর গায়ে ভরা গয়না, তিনি কুঁড়ে ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। ফুল্লরা তাঁহাকে অনেক ভাবে বুঝাইল যে তাঁর মত বড় লোকের মেয়ের ব্যাধের ঘরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু দেবী বলিলেন, তিনি সেইখানেই থাকিবেন। তখন ফুল্লরা তাঁহাকে একে একে তার বারমাসের কষ্ট বুঝাইতে লাগিল—এই কষ্টের মধ্যে তিনি কি করিয়া থাকিতে পারেন? দেবী বলিলেন তিনি তাহাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন। তখন ফুল্লরার স্বামীর উপর সন্দেহ হইল। স্বামীর ভালবাসার গর্বে সে সকল দুঃখ খড় কুটার মত তুচ্ছ করিয়াছিল, স্বামীর প্রেম হইতে পাছে বঞ্চিত হয়—সেই আশঙ্কায় তাহার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। তার পর যখন দেবী

বলিলেন, "তোমার স্বামী আমাকে তাহার গুণে বাঁধিয়া আনিয়াছে" তখন সে আর কথা করিতে পারিল না। দেবী গুণ অর্থ ধনুর্গুণ বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু ফুল্লরা অন্যরূপ বুঝিল। সে ভাবিল এই স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর গুণে অনুরক্ত হইয়াছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাজারে যাইয়া স্বামীর সঙ্গে দেখা করিল। কালকেতু ফিরি সন্দেহে বাড়ি গিয়া ঘরে আসিয়া দেবীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল। সে বলিল "চলুন, আপনাকে বাড়ী রাখিয়া আসি, লোকের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং যে পথে বহুলোকজনের বাস সেই পথ দিয়া লইয়া যাইব।" কিন্তু বারংবার বলাতেও যখন দেবী কিছুতেই সেই স্থান ত্যাগ করিলেন না, তখন সে দেবীকে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী জ্ঞানে সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ধনুকে তীর ছুড়িতে গেল। কিন্তু ছুড়িতে পারিল না, এবং তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

দেবী নিজরূপ ধরিয়া কালকেতু ও তাহার স্ত্রীকে দেখা দিয়া একটি অমূল্য আংটি ও সাত ঘড়া মোহর দিলেন। তাহা দিয়া কালকেতু গুজরাটে যাইয়া এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম ভাগে এই সকল কথা লিখিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগে শ্রীমন্তের উপাখ্যান। ধনপতি সদাগর উজানি নগরের বিখ্যাত ও খুব ধনী বণিক ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল—প্রথমার নাম লহনা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম খুল্লনা, শ্রীমন্ত এই খুল্লনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। খুল্লনা লুকাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেন। কিন্তু ধনপতি সদাগর দেবীকে "ডাইনি দেবতা" বলিয়া গালি দিতেন এবং একদিন বাণিজ্যে যাওয়ার সময় মঙ্গলচণ্ডীর ঘট লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বাণিজ্যে যাইয়া ধনপতি ঘোর বিপদে পতিত হন। তিনি যখন সিংহলে উপস্থিত হন, তখন চণ্ডী তাঁহাকে এক আশ্চর্য্য লীলা দেখাইলেন। সমুদ্রের মধ্যে মস্তবড় এক পদ্মবন এবং সেই পদ্মবনের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় যে পদ্মটি তার উপর বসিয়া এক পরমা সুন্দরী কন্যা এক হাতে একটা হাতী ধরিয়া তাহা গিলিতেছেন এবং পুনরায় তাহা মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতেছেন। সিংহলের রাজার নিকট তিনি এই গল্প করাতে রাজা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। তখন সর্ত্ত হইল যদি ধনপতি রাজাকে এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি সদাগরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন, আর যদি না দেখাইতে পারেন তবে চিরকাল তিনি কারাকক্ষে থাকিবেন। ধনপতি রাজাকে সেই লীলা দেখাইতে পারিলেন না। যেহেতু দেবীর ঘটে লাথি মারাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া

ধনপতি কমলেকামিনী [illegible] দেখাইতে পারিলেন না। ধনপতিকে জেলে যাইতে হইল এবং রাজা তাহার জাহাজ ধন কাড়িয়া লইলেন।

এদিকে শ্রীমন্ত বড় হইল। তাহার পিতাকে সে জীবনে দেখে নাই। সে যে টোলে পড়িত, সেই টোলের পণ্ডিত দশজনের সাক্ষাতে তাহাকে [illegible] বলিয়া [illegible] করাতে সে স্থির করিল যেরূপে পারে সে তাহার পিতাকে খুঁজিয়া লইয়া আসিবে, না পারিলে প্রাণ ত্যাগ করিবে। যদিও তাহার বয়স তখন মাত্র বার বৎসর ছিল, তথাপি সে কাহারও বাধা নিষেধ না মানিয়া জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। সিংহলরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সেও সেইরূপ পদ্মবন ও তন্মধ্যে কমলেকামিনীকে দেখিল। রাজা সিংহলরাজের সঙ্গে এই সর্ত হইল, যে সে যদি সেই পদ্মবন ইত্যাদি রাজাকে দেখাইতে পারে, তবে সে অর্দ্ধেক রাজ্য সমেত রাজকন্যাকে যৌতুকস্বরূপ পাইবে, যদি না পারে তবে তাহার মাথা দক্ষিণ মশানে কাটা হইবে।

শ্রীমন্ত নিজে যাহা দেখিয়াছিল রাজাকে তাহা দেখাইতে পারিল না। সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাহাকে কাটিবার জন্য উহাকে লইয়া গেল। তখন শ্রীমন্ত 'মা' 'মা' বলিয়া চণ্ডীদেবীকে ডাকিতে লাগিল। দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া রাজার সৈন্য নষ্ট করিল এবং শেষে দেবীর উপদেশ মত সিংহলরাজ শালিবাহন স্বীয় কন্যাকে শ্রীমন্তের সহিত বিয়ে দিলেন। ধনপতির বন্ধন মোচন হইল, এবং পিতা পুত্র, রাজকন্যা সুশীলা ও অনেক ধনসম্পদ লইয়া উজানীনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

সম্ভবতঃ এই মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রথম কবি ইংরেজী ১১০০-১২০০ সনে বিরচিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যে কাব্যখানি পাইয়াছি, তাহা মাণিক দত্তের রচিত। বোধ হয় উহা ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। মাণিক দত্তের পরে চট্টগ্রামের দেবগ্রামবাসী মুক্তারাম সেনের চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্য ১৭৪৭ ইংরেজী সনে রচিত হয়, সুতরাং ইহা ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। তাহার পর ময়মনসিংহের কবি মাধবাচার্য্য ১৫৭৯ সনে আর একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন—এখন হইতে ৩৪২ বছর আগে এই পুস্তক বিরচিত হয়। আরও অনেকগুলি চণ্ডীমঙ্গল প্রায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ১৫৭৮—১৫৮৯ সনের মধ্যে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মুকুন্দরামের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। ইহার পিতামহের নাম ছিল জগন্নাথ, জগন্নাথের পুত্র হৃদয় মিশ্র। মুকুন্দরাম হৃদয় মিশ্রের পুত্র।

আমাদের বাংলা দেশে যত কবি জন্মিয়াছেন, উঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম একজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবি। ইঁহার চণ্ডীকাব্যের অনেক অংশ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল কাউএল সাহেব ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ দরিদ্র ছিলেন, তাঁর চরিত্র বড়ই ভাল ছিল। ... দামুন্যায় মামুদ শরিফ নামক একজন ডিহিদারের তাড়নায় কবি পুত্র কন্যা সহ পলাইয়া মেদিনীপুর জেলায় আরড়া ব্রাহ্মণভূমির জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লইলেন, এই রাজার পুত্র রঘুনাথ রায়কে তিনি পড়াইতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সিংহবাহিনী নামক এক দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতেন, দামুন্যাগ্রামে এখনও সে দেবী আছেন। মুকুন্দরামের হাতের লেখা-যুক্ত একখানি চণ্ডীকাব্য এখনও সিংহবাহিনীর মন্দিরে আছে। মুকুন্দরাম খুব পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি ছিল "কবিকঙ্কণ"। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল শিবরাম।

কবি ব্রাহ্মণ হইলেও নিজে চাষ বাস করিয়া খাইতেন, এইজন্য দীন দুঃখীর ঘরের খবরটি তিনি ভালরূপ রাখিতেন। তিনি তাঁহার লেখায় দরিদ্রগণের যে দুঃখ কষ্ট বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে, আর তাঁর লেখা এমনই স্পষ্ট যে যাহাদের কথা লিখিয়াছেন, তাহারা যেন ছবির মত চোখের সামনে দাঁড়ায়। অপর অপর অনেক কবি, তাঁহাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সাজাইয়া ভদ্রলোকের মত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কালকেতু ও ফুল্লরা মুকুন্দরামের কাব্যের দুইজন প্রধান ব্যক্তি হইলেও কবি তাহাদিগকে সাজাইতে কোনরূপ চেষ্টা পান নাই। কালকেতুর হাত দুইটা লোহার শাবলের মত, তাহার খাইবার ভঙ্গী অদ্ভুত এই সকল কথা খোলা ভাবে বলিয়া গিয়াছেন, যে আমরা ব্যাধের ছেলেকে ঠিক ব্যাধের ছেলের মতই দেখিতে পাইতেছি। ব্যাধের আকৃতি প্রকৃতির অসভ্যতা সত্ত্বেও চরিত্রেও যে মহত্ত্ব থাকিতে পারে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ইহা ছাড়া তাঁহার লেখায় অতি সরস ভক্তির কথা পাওয়া যায়। বইখানি পড়িলে মনে হইবে যেন সাড়ে তিনশ বছরের আগেকার ইহা একখানি নিখুঁৎ ছবি। সেই সময়ের সমস্ত খুঁটি নাটি কথা কাব্যের নানা দিকে ছড়াইয়া আছে। সমস্ত কাব্য জুড়িয়া দুঃখী ও অনাথের যেন একটা কান্নার সুর উঠিয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী দেবী পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত, রাগিয়া গেলে খুবই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন— খুব শিক্ষিতা মেয়েদের মত তিনি আদবেই নহেন। কিন্তু 'মা' বলিয়া ডাকিলেই তিনি সাড়া দেন। অনাথ ও দুঃখীর প্রার্থনা তাঁহার কাছে বৃথা হয় না। যে উপায়ে পারেন, দুঃখী ছেলেকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সমস্ত কাব্যটির মধ্যে এই মাতৃভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই

দুঃখ-প্রধান করে বটে, তবু ও মধুরগুণময় বর্ণ উপাদেয় করিয়া রাখে। খুব অন্ধকার মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে, সেইরূপ বিষাদের বর্ণনার মধ্যে তেমনই সময়ে সময়ে স্বভাবের সৌন্দর্য্যের বর্ণন সেইরূপ চোখ ধাঁধিয়া দেয়।

মানুষের স্বভাব যখন তিনি বর্ণন করেন, তখন মনে হয় কবি যেন তাঁদের রূপ যেন আমার চোখের কাছে দেখিতে পাই, কথাগুলি যেন স্পষ্ট কানে শুনিতে পাই। কালকেতু ভগবতীর দেওয়া আংটিটি ভাঙাইতে মুরারি শীল নামক এক বেনের নিকট গিয়াছে। সেই স্থানটি নীচে তুলিয়া দিলাম :—

"বেনে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু
কোথা হে বণিক রাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু
বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার
আজি কালকেতু যাহ ঘর
কাষ্ঠ আন একভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর
শুন গো শুনগো খুড়ি, কিছু কার্য আছে দেরি, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী
আমার জোহার খুড়ি, কালি দিহ বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাড়ী
বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন
সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কির পথে
মনে বড় কুতূহলী, কাঁধেতে কড়ির থলি, হরপা তরাজু করি হাতে
করে বীর বেণেরে জোহার
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এ তোর কেমন ব্যবহার
খুড়া, উঠিয়া প্রভাতে কাছে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ফিরি
ফুল্লরা পসার করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি
খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী
হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করহ মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি
বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোখে রত্ন চড়ায়ে পড়ান
কাঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান

"সোন রূপা নাই বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল
রতি প্রতি হ'ল বাপা দশ গণ্ডা দর
দুধ'নের কড়ি আ'র পাঁচগণ্ডা ধর।
অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গরীর কড়ি
মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি
কিছু চালু চালু-খুদ কিছু লহ কড়ি
কালকেতু বলে খুড় মূল্য নাহি পাই।
যে জন অঙ্গুরী দিল, দিব তার ঠাঁই
বেনে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট
আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট
ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেন দেনা
তাহা হইতে দেখে বাপু বড়ই সেয়ানা
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া
বেনে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি"
চালু খুদ না লইও গণি লও কড়ি

মুরারি নিজে বাকী কড়ি দেওয়ার ভয়ে পালাইয়াছিল টাকার লোভ পাইয়া খিড়কির দরজা দিয়া উপস্থিত হইল এবং কালকেতুকে উল্টা অনুযোগ দিয়া বলিল—"আজকাল তুমি দেখা করতে আসনা কেন?" কালকেতু এই কপটতা বুঝিল না সে ছিল সরল লোক, একদিকে বেনেটার ছলনা আর একদিকে কালকেতুর সরলতা লেখার গুণে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে

কবিকঙ্কণের পরেও অনেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জপসা নিবাসী জয়নারায়ণ সেন যে কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন তাহা খুব সুন্দর হইয়াছিল

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গ্রামবাসীর মহত্ত্ব! কীর্ত্তিগাথা—১

২৫০ বৎসর আগেকার কথা, ইংলণ্ডে একবার ভয়ানক প্লেগ হয় সে যে কি ভীষণ প্লেগ তোমরা হয়ত তাহা অনুমানও করিতে পারিবে না গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর সেই প্লেগে উজাড় হইয়া গেল ইংলণ্ডেরই একটী ছোট খাট গ্রাম, নাম তার 'ইয়াম'—সে গ্রামেও প্লেগ আসিল

রোগের জীবাণু—সে কত রকমে চলাচল করে সে বাতাসে ভর করিয়া উড়ে, আবার ট্রেনে যাতায়াত করে। লণ্ডন সহর ছিল জীবাণুর এক বড় রকমের আড্ডা সেখান হইতে জীবাণু আসিল, পোষ্টাফিসের সাহায্যে ক্ষুদ্র ইয়াম গ্রামে। এক দর্জ্জির নিকট কাপড়ের নমুনা আসিয়াছিল—তাহারই মধ্যে রোগের জীবাণু ছিল প্রথমটা দর্জ্জির বাড়ীতে রোগ দেখা দিল, তাহার পর একে একে যখন দর্জ্জির বাড়ীর ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সব একে একে শেষ হইয়া গেল, তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ী করিয়া গ্রামে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল।

গ্রামের লোক কতক মরিল, কতক পলাইল, কতক বাঁচিল, কিন্তু প্লেগ গেল না। এই সময়ে গ্রামের ধর্ম্মযাজক অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিল যেখানে আর্ত্ত, দীন দুঃখী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, সেইখানেই ধর্ম্মযাজক ও তাহার স্ত্রী। গ্রামের যে কয়টী লোক বাঁচিয়াছিল, তাহারা সকলে এক আত্মা হইয়া গেল।

কিন্তু আর বুঝি গ্রাম থাকে না, আর বুঝি মানুষ কেহ বাকী রহিল না, গ্রাম বুঝি মরুভূমি হইয়া যায় তখন এক উপায়, গ্রাম হইতে পলায়ন ধর্ম্মযাজক স্ত্রীকে বলিলেন, "আর আমাদের রক্ষা নাই, আমি থাকি রোগাতুরদের শুশ্রূষার জন্য, তুমি ছেলে মেয়েদের লইয়া অন্য গ্রামে যাও" কিন্তু স্ত্রী রাজী হইলেন না তিনি ছেলেমেয়েদের অন্য গ্রামে পাঠাইয়া নিজে রহিলেন, স্বামীর সঙ্গে রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে

আরও কিছুদিন গেল, গ্রামে যে কয়টী প্রাণ ছিল, তাহাদেরও প্রাণ বুঝি ধুক্ ধুক্ করে। তাহাদের রক্ষার একমাত্র উপায় অন্য গ্রামে চলিয়া যাওয়া। তাহাতে হয়ত তাহারা বাঁচিবে, কিন্তু যে গ্রামে যাইবে সে গ্রামবাসীদের মরণ সুনিশ্চিত, নীরোগ গ্রামে আবার রোগ দেখা দিবে, শান্তিময় গৃহে নিরানন্দের কালো ছায়া ঘনাইয়া উঠিবে।

তখন ধর্ম্মযাজক সবাইকে ডাকিলেন, এ বিপদে কর্ত্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিতে সেই মুমূর্ষু কঙ্কাল-সার মৃতপ্রায় লোকগুলি ধর্ম্মযাজকের নিকট নিজেদের অভিপ্রায় জানাইল তাহাদের মুখে তখন স্বর্গীয় জ্যোতি, চোখে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ, তাহাদের সেই অভিমত

ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য তাহারা মরিতে বসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জন্য পৃথিবীর আর একটী প্রাণীও মরে এ তাহাদের ইচ্ছা নয় এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মযাজকের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল

মহাপুরুষেরা শুধু প্রতিজ্ঞা করিয়াই ক্ষান্ত হন না তাঁহারা কথামত কার্য্যও করেন ইয়ামের গ্রামবাসীরাও কার্য্যে লাগিয়া গেলেন গ্রামের ব্যবসা, বাণিজ্য সব বন্ধ হইয়া গেল বহির্জগতের সহিত আর তাঁহাদের কোন সংশ্রব রহিল না ইয়াম গ্রামের বাহিরের জগৎ যদি প্রলয়ে ধ্বংসও হইয়া যায় ইয়াম গ্রামবাসীরা সে সংবাদ জানিবার কোন উপায় রাখিল না এমনি করিয়াই তাহারা নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া কত অসংখ্য জীবন রক্ষা করিল।

শেষে প্লেগ চলিয়া গেলে দেখা গেল ৩০০ লোকের মধ্যে মাত্র ৩১ জন লোক বাঁচিয়া আছে এই ৩০০ শত লোকের নাম আমরা জানি না। কিন্তু নাম নাই জানিলাম,— ইতিহাস এই তিন শত লোকের মহত্ত্বের কথা কখনও ভুলিবে না

শি



রাজা ও বানরের কথা

এক রাজা—তার ছিল এক দল বানর। রাজার অনেক বানর তাদের কাজ ছিল নিত্য ভূরি ভোজন করা, আর এ-গাছ ও-গাছ চড়িয়া বেড়ান তাদের সুখ দেখে কে— রাজা নিজে তাদের খাওয়ান, আদর করেন এমনি সুখেই তাদের দিন কাটিতেছিল

ঐ দলের মধ্যে ছিল এক বুড়ো মোড়ল গোছের বানর, তার বুদ্ধিটা ছিল কিছু বেশী। সকলে খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ করে, সে বুড়ো বানরের কিন্তু মনে স্ফূর্ত্তি নাই। সে রোজই একটা জিনিস বেশ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। রাজার ছেলের

ছিল দুইটা ভেড়া তাদের মধ্যে একটা রান্নাঘরে আসিয়া রোজই বেজায় জ্বালাতন করিত এই লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে সেই ভেড়াটার রোজই তুমুল কাণ্ড চলিত ভেড়াটাও নাছোড়বন্দ, সে রোজই রান্নাঘরে আসিবে শেষে অতিষ্ঠ হইয়া ভেড়াকে দেখিলেই ঠাকুর যাহা হাতের কাছে পাইত তাহা লইয়াই তাড়া করিত এমনও হইত, হাতের কাছে আর কিছু নাই, ঠাকুর উনানের মধ্য হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়াই তাড়া করিয়াছে সেই বুড়ো বানর দেখিল, একটা ত ভাল নয় এমনি করিয়া কোনদিন তাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। সেই ভেড়াটার লোম ছিল বড় বড়—কোনদিন জ্বলন্ত কাঠের আগুনে সেই লোম ধরিয়া উঠিবে। সেই রান্নাঘরের পাশেই ছিল রাজার আস্তাবল সেখানে অসংখ্য ঘোড়া থাকিত। আগুনের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেই ভেড়াটা শেষে নিশ্চয়ই আসিবে আস্তাবলের খড় কুটার উপর গা ঘসিতে। খড়কুটাও সামান্য আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। শেষে সেই আগুন রাজার আস্তাবলের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে রাজার সাধের ঘোড়াশালার ঘোড়া গুলির তখন শেষ অবস্থায় যাহা হইবার হইবে—ঘোড়া গুলি আগুনের হল্কায় পুড়িয়া আধমরা গোছের হইয়া থাকিবে। তখন চারিদিকে লোক ছুটাছুটি—আন বৈদ্যকে বৈদ্য আসিয়া শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা দিবে,—সে ব্যবস্থাত সকলেই জানে বানরের চর্ব্বিই হইল এ ক্ষেত্রে খুব ভাল ঔষধ ফলে কপিকুল ধ্বংস হইবে।

এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া বুড়ো বানরের দিন রাত্রি আর ঘুম নাই। রাজার এত আদরেও তাহার মন উঠে না শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুড়ো বানর এক মস্ত বড় সভা করিল, এবং সেই সভায় তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল।

"ভাই সব, আর এ দেশে থাকা ভাল নয়, জীবন আগে, না, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আগে চল আমরা আবার নিজেদের দেশে চলিয়া যাই—সেই গহন কাননে আবার আমরা স্বাধীন মুক্ত ভাবে বেড়াইয়া বেড়াইব কি ছার, এই বিলাসিতা, কি ছার এই পরের দেওয়া দুধ, ক্ষীর, সর,—মৃত্যু যখন আমাদের শিয়রে ঘুরিতেছে

আর সব বানরদের তখন অল্প বয়স, নবীন শক্তি—কাজেই কতকটা একগুঁয়ে—তাহারা বুড়ো বানরের কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না তাহারা বলিল,

"হ্যাঁ হ্যাঁ, জানা আছে, তুমি এখন বুড়া হইয়াছ কিনা নিজে সমস্ত জীবনটা ভোগ করিয়া এখন ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তাই আমাদের ভোগ করিতে বারণ করিতেছ।" তাহার পর বানরেরা হাসিতে হাসিতে বলিল,

"আননে দশন নাই, লালা ঝরে গালে।
বুদ্ধি না জুয়ায় হেন বৃদ্ধ আর বালে
রাজার প্রাসাদে থাকি পরম আদরে।
রাজভোগ পাই নিত্য রাজার স্বকরে
এই স্বর্গ সুখ ছাড়ি কার লয় মনে।
কটু তিক্ত ফল খেয়ে বাঁচিতে কাননে"

বুড়া বানর এই কথা শুনিয়া আর কি করে, চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে বন ছাড়িয়া চলিয়া গেল—নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নয়, নিজেদের কুলক্ষয় স্বচক্ষে দেখিবে না;—এই জন্য।

এদিকে কিছুদিন যায়, তাহার পর বুড়া বানর যাহ বলিয়াছিল তাহাই ঘটিল একদিন একটা ভেড়ার দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হইয়া রাঁধুনি রান্নাঘর হইতে জ্বলন্ত কাঠ লইয়া ঠাকুর ভেড়াকে ছুঁড়িয়া মারিল। ভেড়ার লোমে আগুন ধরিয়া উঠিল তখন সে চীৎকার করিতে করিতে আস্তাবলে যাইয়া খড় কুটার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খড় কুটা ধরিয়া উঠিয়া সেই আগুন সমস্ত আস্তাবলময় ছড়াইয়া পড়িল। কতক ঘোড়া মরিল, কতক বা আগুনে পুড়িয়া আধমরা হইয়া রহিল। রাজ-বৈদ্যের ডাক পড়িল। তিনি আসিয়া শাস্ত্র ঘাঁটিয়া ব্যবস্থা করিলেন, বানরের চর্বি চাই, ঘোড়ার ক্ষতে প্রলেপ দিতে হইবে সহসা অত বানর রাজা কোথায় পাইবেন?—শেষে তাহার বাড়ীর ঐ সকল বানরকেই মারিতে রাজা হুকুম দিলেন। কপিকুল নির্ব্বংশ হইয়া গেল অতগুলি বানর—আর একটিও রহিল না।

বুড়া বানর বনে বসিয়া সব খবরই পাইল দুঃখে কষ্টে তাহার আর মুখে অন্ন রোচে না। দিনরাত সে ভাবে কি রকমে সে রাজাকে মারিবে—প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বনের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইল। ঘুরিতে ঘুরিতে তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, সরোবর দেখিয়াই সে জলপানের জন্য সরোবরের দিকে চলিল কিন্তু জলে নামিবার আগেই সে দেখে এক অদ্ভুত কাণ্ড। পুকুরের পাড়ে যাইয়া সে দেখিল লোকে পুকুরে গিয়াছে সেরূপ পদচিহ্ন অনেক আছে কিন্তু ফিরিয়া যে আসিয়াছে এরূপ চিহ্ন সে একটিও দেখিতে পাইল না সে ভাবিল হয়ত বা পুকুরে কুমীর আছে, সুতরাং জলে নামিয়া জল পান করা নিরাপদ নহে এই ভাবিয়া

সে একটি পদ্ম ভাঙ্গিয়া তাহার নল দিয়া কূলে বসিয়াই জলপান আরম্ভ করিল সহসা একি কাণ্ড! জল সেই একটু নড়িয়া উঠিয়াছে অমনি এক ভীষণ রাক্ষস সেই পুকুরের মধ্য হইতে উঠিয়া আসিল রাক্ষসকে দেখিতে ছিল খুব ভীষণ, কিন্তু তাহার গলায় মহা মূল্যবান এক ছড়া 'রত্নহার'। রাক্ষস কহিল

"বানর, তোমার বুদ্ধি দেখিয়া আমি ভারী সন্তুষ্ট হইয়াছি এই পুকুরে যাহারা জল খাইতে নামিয়াছে কেহই আর প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারে নাই, সকলকেই আমার এই পেটের মধ্যে যাইতে হইয়াছে যাহা হউক, তোমার বুদ্ধি বলে তুমি রক্ষা পাইলে। এখন বল, তুমি কি বর চাও"

বানর বলিল, "হে রক্ষরাজ, বলুন ত কত লোককে আপনি খাইতে পারেন?"

রাক্ষস কহিল, "ডাঙ্গায় আমার তেমন শক্তি নাই, কিন্তু একবার জলের মধ্যে পাইলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আসিলেও তাদের আর রক্ষা নাই"

বানর কহিল, "কোন এক রাজার সহিত আমার বিবাদ আছে, আপনি যদি আপনার ঐ বহু মূল্যবান গলার হার খানি আমায় দেন তবে রাজাকে সবংশে ভুলাইয়া এখানে আনিতে পারি"

রাক্ষস শুনিয়া তখনই মালা ছড়া বানরকে দিল বানর সেই মালা লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল রাজা ত সেই মালা দেখিয়া অবাক্! এত দামী মালা বানর কোথা হইতে পাইল? বানর বলিল,

"মহারাজ, এমন লক্ষ লক্ষ মালা এক সরোবরে আছে। প্রাতঃকালে যে-কোন ভাগ্যবান সেই পুকুরে আসিবে কুবেরের প্রসাদে সেই এইরূপ এক এক ছড়া মালা পাইবে"

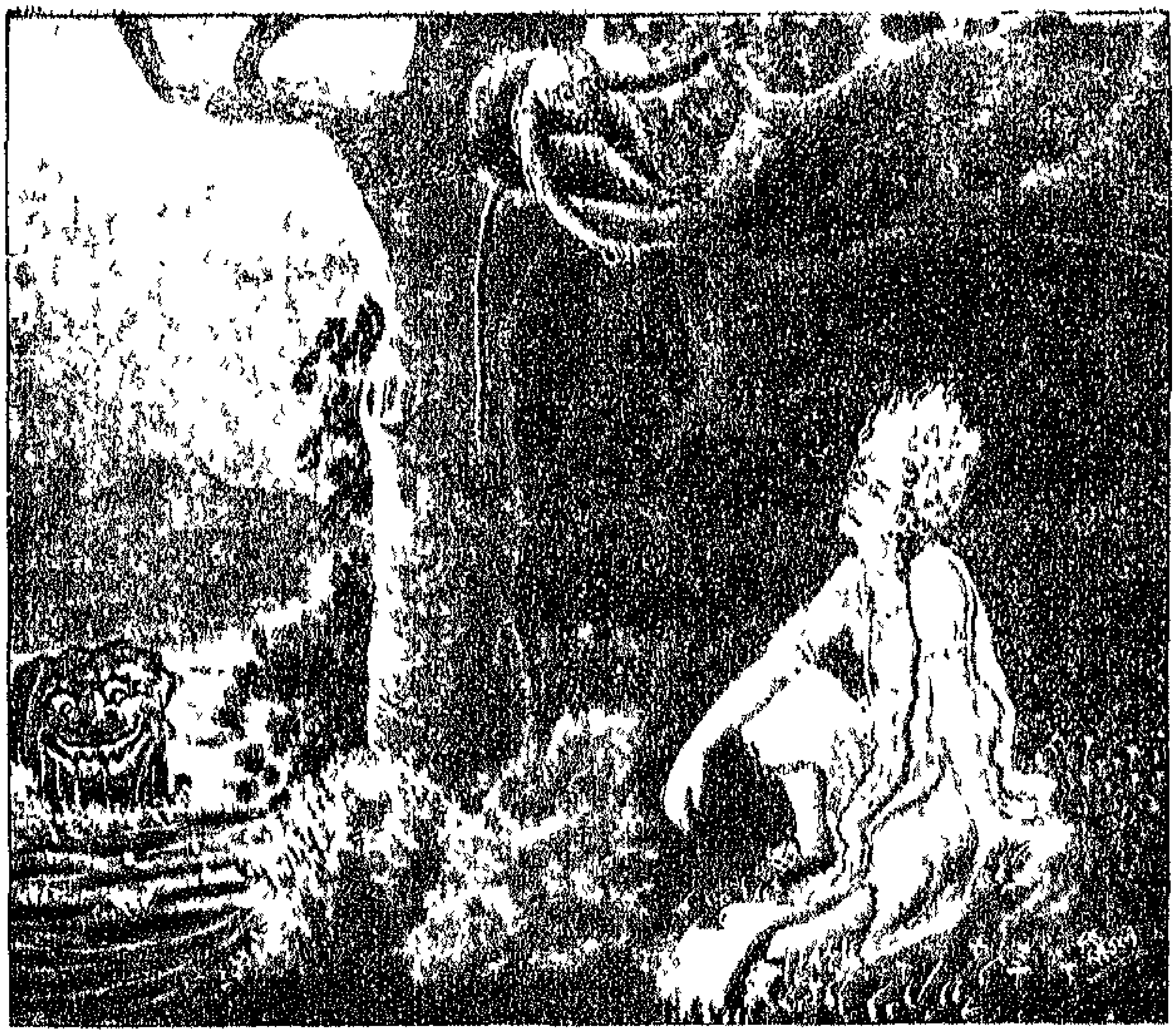
মহারাজ ত শুনিয়া ভারী খুসী তিনি তখনই হুকুম দিলেন, রাজ্যের যত লোক জন, অমাত্য, কর্ম্মচারী, সিপাহী, শান্ত্রী, প্রজা, মিত্র, সকলকে লইয়া তিনি সরোবরে স্নান করিতে যাইবেন। এক দিন ভোরে তিনি সকলকে লইয়া সরোবরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বানরের তখন কি আনন্দ! রাজা নিজের দোলায় বানরকে কোলে করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। পুকুর পাড়ে সকলে আসিলে বানর বলিল,

"মহারাজ, আপনার লোক জন সকলে একত্রে আগে স্নান করিতে নামুক, আমি আপনার সহিত পরে নামিব এবং যেখানে ঐ সকল রত্নমালা পড়িয়া আছে সেই স্থান হইতে পরে ঐ গুলি লইয়া আসিব"

রাজা সেই রকমই হুকুম দিলেন

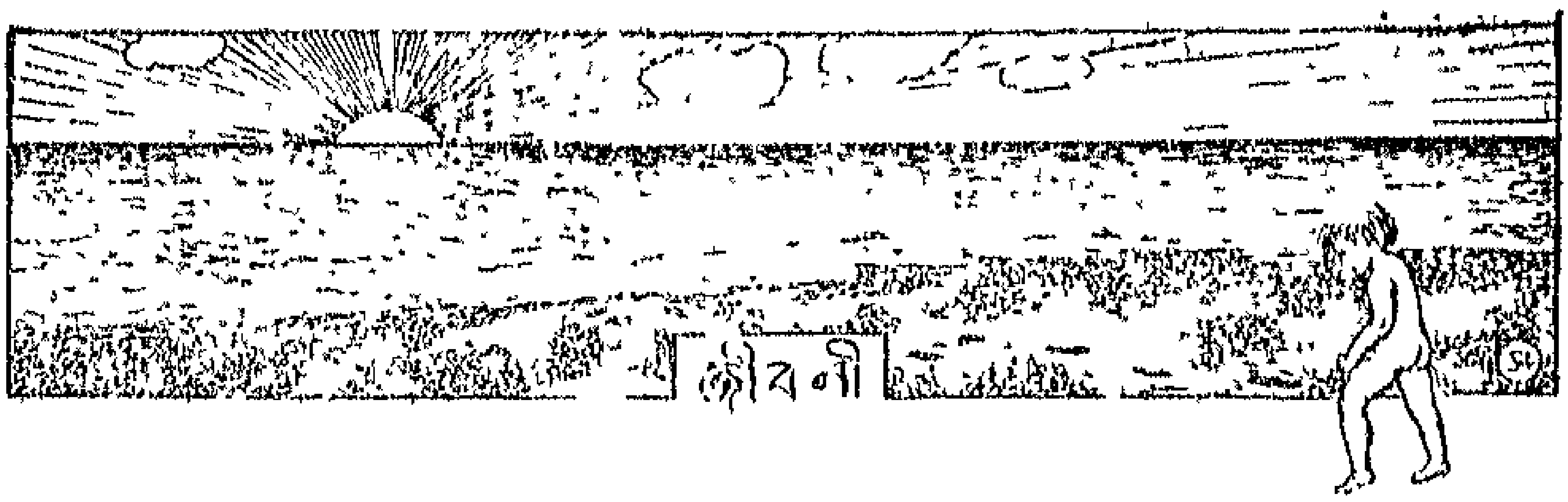
কতক্ষণ যায়, কিন্তু যাহারা জলে, নামিয়াছে তাহাদের আর দেখা নাই রাজা ত ভাবিয়াই অস্থির--ব্যাপার কি ? তখন বানর এক লাফে গ ছে উঠিয়া বলিল,—

"মহারাজ, বিনা দোষে তুমি আমার বংশ নির্ম্মূল করিয়াছ, তাই এতদিনে তাহার প্রতিশোধ লইলাম সরোবরের মধ্যে যে রাক্ষস আছে সেই তোমার পরিজন সকলকে খাইয়াছে। এবং



তুমি এবে প্রাণ লয়ে কর পলায়ন
প্রভু ছিলে তাই তব রাখিনু জীবন।
করিয়াছ কুলক্ষয় তুমি যে আমার।
আমিও বিনাশ কুল করিনু তোমার।"

শি



কুমারী হেলেন কেলার

"কান নেই তবু শুনছি, চোখ নেই তবু দেখ্‌ছি, বোবা ছিলেম, কিন্তু কথা কই"—এ যদি কেউ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বড়াই করে বলে, তাহলে তোমরা হয়ত রেগেই আগুন হবে, আর নইলে ঠাউরে নেবে লোকটার নেহাৎ মাথা খারাপ।

কিন্তু কুমারী হেলেন কেলারের জীবনে এর সবই সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে এক দিন কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাকালে তার নিজের মুখ থেকেই ঐ কথা কয়টী জোরের সহিত বেরিয়েছে, কি ভাবে কি করে—যা তোমাদের কাছে অসম্ভব বলে ঠেক্‌ছে তা সম্ভব হল, সে কথা একবার শোনাই, একটু মন দিলেই বেশ বুঝতে পারবে।

তোমরা অনেকেই আমেরিকা মহাদেশের নাম শুনেছ—যা ঠিক্ তোমাদের পাতাল-পুরী,—হেলেন কেলার সেখানকার লোক, তথাকার আলাবামা রাজ্যের মধ্যে টাস্‌কাম্বিয়া বলে একটা স্থান আছে, তিনি জন্মেছেন সেখানটায়, ইংরেজী ১৮৮০ সনে, তার পিতা আর্থার কেলার ছিলেন একজন পত্রিকার সম্পাদক; আবার তিনি এক সময়ে সৈনিক পুরুষের কাজেও বেশ নাম করেছিলেন

হেলেন যে জন্ম অবধি ওরূপ ছিলেন, তা নয়, সে ঐ রকম হইয়াছে তার পীড়ার দরুণ যখন তার বয়স সবে মাত্র দেড় বৎসর, তখন তার এমন ভয়ানক ব্যারাম হল যে তার ফলে তিনি অন্ধ হলেন, সঙ্গে সঙ্গে কথা বল্‌বার শক্তিও গেল, বোবা যারা, তারা মুখেও খাট, তারা কাণেও খাট—এতো জানই, সুতরাং এই তিনটি রিপুই সমান ভাবে তাকে ঘিরে ধরল। কি আক্ষেপের কথা! একবার ভেবে দেখ দেখি?

হেলেনের পিতা তাকে এক ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলেন, এও যে সে ব্যক্তি নন্ যিনি তোমাদের টেলিফোঁ সৃষ্টি করেছেন, ইনি সেই আলেকজ্যাণ্ডার গ্রেহাম্ বেল্,

কিন্তু এমন চিকিৎসকের হাতেও ও হেলেনের কিছু হল না শেষটা তারই চেষ্টায় খোঁজ মিলিল একজন শিক্ষয়িত্রীর, তার নামটি ছিল কুমারী সুলিভ্যান, এখন তাঁর বিয়ে হয়েছে কিনা, তাই তিনি আজ মিসেস্ ম্যাসী বলে পরিচিতা।

তিনি হেলেনদের বাড়ী এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন, হেলেনকে শিক্ষা দেবার জন্য, তখন হেলেনের বয়স ছ-বৎসর আট মাস, সুলিভ্যান্ ক্ষণিকের তরেও হেলেনের কাছ ছাড়া হ'তেন না। কি কাজের ঘরে, কি খেলার মাঠে, কি পাঠাগারে—তিনি তার সঙ্গের সঙ্গিনী, অবশ্য তোমরা বেশ বুঝিতেছ যে এ সকলই হয়েছে হেলেনের শিক্ষা দিবার বিভিন্ন কৌশল।

"পুতুল ও পিঠে" এ হল প্রধান দুটি কথা যা নাকি হেলেনকে অতি আয়াসে শিখান হল, কিন্তু এর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা যে সবটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল, একদিন হেলেন ও তার শিক্ষয়িত্রী গেছেন কুয়োর ধারে জল আনতে, এমন সময় "জল ও জলের বাটি," এই দুটির পৃথক্ ও স্পষ্ট জ্ঞান হেলেনের মাথায় ঢুকে এমনি শক্ত হয়ে বস্‌লো, যে তিনি ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে বা-হাতের তালুতে উহা রীতিমত লিখে পরখ্ করলেন।

এক মুহূর্ত্তে জ্ঞানের কলকাঠি বোবা, অন্ধ হেলেনের হাতের মুটোয় এসে পড়ল, তখন হ'তে ঐ ভাবে কোন নূতন শব্দ তার হাতে লিখতেই তিনি ঠিক্ ধরতে পারতেন। তাঁর অনুভব শক্তি এতই প্রখর ছিল যে প্রথম দিনেই তিনি ত্রিশটি নূতন শব্দ শিখে ফেললেন, তিন মাস পার না হ'তেই তিনশ শব্দ তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেল, তারপরের মাসেই দেখা গেল তিনি চলনসই গোছের চিঠি লিখতে শিখেছেন ক্রমশঃ এতটা এগিয়ে পড়লেন, যে ছ-মাস না যেতেই ছোট খাট গল্প পড়তে তাঁর কোন কষ্ট হ'ত না।

তোমাদের মনে হয়তো এখানে একটা খট্‌কা র'য়ে গেল, এবং প্রশ্ন করতে পার,—"অন্ধতো আর চোখে দেখে না, সে কি করে তবে পড়ে ?" কথাটা কি জান, এরূপ অন্ধদের পড়বার ব্যবস্থা হচ্ছে উচু উচু খোদান অক্ষর ; এই অনুকরণেই এদের জন্য সব লেখা হয়ে থাকে, এই প্রথার নাম Braillo Systo n. সে পথ ধরেই হেলেনের শিক্ষা খুব বেগে চলতে লাগল, এখন সাধারণ ছাড়া আরও অনেক ভাষা ও বিষয় হেলেনের শিক্ষার গণ্ডিতে প্রবেশ করেছে, তাই তিনি ইংরাজী, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাণীতত্ব, উদ্ভিদ্ বিদ্যা প্রভৃতির চর্চ্চায় মন দিলেন। তার উপর সে দেশের সাধারণ স্কুল পাঠ্যে আরও যে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সে সবেও পিছনে পড়ে রইলেন না।

এ সময় তাঁর জীবন আর এক নূতন পথে ধাবিত হল। সে খবর শুনলে তোমরা

আরও অবাক হবে তিনি বাক্‌শক্তি হীনা, তবু তাঁর ভাল মানুষটীর মত স্পষ্ট কথা বলা চাই, এই হল তাঁর নবীন উদ্যমের মূল মন্ত্র হোরেস্‌ম্যান্ স্কুলে এরূপ মূক-বধির অন্ধদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে হেলেন মাএকে সেখানে গেলেন, তথায় ঢুকেই তিনি এমন প্রতিভার পরিচয় দিলেন, যে অন্য মানুষে কখনো আশা করে না গুণা-বাছা এগারটী পাঠ নিয়েই তিনি বাড়ী ফিরলেন, তাই নাকি তার যথেষ্ট, তার প্রমাণও হাতে হাতে পাওয়া গেল, যখন রাস্তায় তাঁর মুখ থেকে শিক্ষয়িত্রী সুলিভান্ শুনলেন, "আমি আর বোবা নই, আমি বেশ কথা কইতে শিখেছি," কত বড় আশার বাণী। কি অদ্ভুত শক্তি!

বাড়ী এসেই খুব মন দিয়ে ভাষা শিখতে লাগলেন। ফরাসী, লাটিন, প্রভৃতি ভাষা সুন্দর করে শিখলেন। তার পর আসল হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে প্রবেশ অধিকারের চেষ্টা প্রথমটা অবশ্য সে কলেজের কর্ত্তারা খুবই ইতস্ততঃ করেছিলেন। তাঁরা ভাবলেন, "হেলেন একটা বধির অন্ধ বালিকা, একি কলেজের অত পড়া তেমন করে সাম্‌লে উঠতে পারবে?" হেলেন হটবার নয়; "সাহসি সৈনিক কখনো যুদ্ধে হার মানে না," এই কথ কয়টী বেশ স্পষ্ট করে লিখে কলেজের কর্ত্তাদের জানালেন। হেলেন কেমন মেয়ে তাঁদের বুঝতে আর বাকী রইল না তিনি ভর্ত্তি হলেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি তথাকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, যেমন তেমন করে নয়, ভাল পাশ দিয়ে।

এখন কলেজের উচ্চ শিক্ষাও নিবেন—এইটেই হল তাঁর মস্ত জেদ্ ভাষাগুলির বাছাই করলেন লাটীন, গ্রীক, ফরাসী ইংরেজী, তার বিষয় নির্ব্বাচিত হল, আইন বিদ্যা, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র, কিন্তু পাঠ্য তালিকা আর বিষয়গুলির নাম করলেই তো হেলেনের পক্ষে পড়ার ব্যবস্থা হয় না? এত সব ভাষায় এবং অতটা বিষয়ে অন্ধের জন্য সেই উঁচু উঁচু অক্ষরে ছাপান বই সম্ভব হলে তো? এখন উপায়—ঠিক্ হল, শিক্ষয়িত্রী সুলিভ্যান সঙ্গে সঙ্গে কলেজ-শ্রেণীতে যাবেন, প্রফেসারগণ যা বলেন, তার প্রত্যেকটী শব্দ প্রথম তিনি শুনে তার পর হেলেনের হাতে লিখে যাবেন, তাই বুঝে বুঝে হেলেন পড়া করবেন কি কঠোর তপস্যা!!

তোমাদের বোধ করি এতটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না; অথবা হেসেই উড়িয়ে দিবে, এই বলে, "এও কি আর সম্ভব?" হাঁ, সত্যি বলছি; অসম্ভব বলে জেন এ জগতে কিছু নেই, ধৈর্য্য ধরে আর একটু এস, দেখবে হেলেনের পক্ষে কত কি সম্ভব।

তাই হল; এ করেই হেলেনের বেশ পড়াশুনা চলতে লাগল, তার পর পালা এল শেষ পরীক্ষার—বি,এ উপাধীর, তখন ইংরেজী ১৮৯৯ এবার হেলেন কি করবেন? তিনি কি আর পরীক্ষায় বস্‌বেন না? অবশ্যই, সে কথা কি আর বলতে? যিনি অতটা এগুতে

পেরেছেন, তাঁর পক্ষে এখানে এসে ফেরা, তাও কি হতে পারে? তাঁকে এক পৃথক্ কামরায় বসান হল; সেখানে কারো প্রবেশ অধিকার নাই, প্রশ্ন হল সেই উঁচু উঁচু অক্ষরে, আর তিনি উত্তর দিলেন কি ভাবে, বলছি, তোমরা বোধ হয় আজকালকার টাইপ-রাইটার মেসিন্ দেখেছ—যা আফিস, আদালত স্কুল ইত্যাদিতে খুব চলেছে, এ দিয়ে 'তা' 'তা কাগজ ছাপার অক্ষরে লিখে যাওয়া যায়, হেলেন তারি একটায় উত্তরগুলি লিখে দিলেন। অবশ্য এ করতে তার যে কি কষ্ট হয়েছিল তা একবার ভাবলেই তোমরা বুঝতে পারবে। কিন্তু উত্তর এম্‌নি চমৎকার হল যে তিনি উপাধীর সঙ্গে সম্মানও পেলেন

কি আশ্চর্য্য! বোবার কথা বলা—অন্ধের বি-এ পাশ করা! তার উপর আবার উনিশ বছরে

এখানে এসেই যে হেলেনের কাজগুলি থেমে গেল তা নয় অনেক বিজ্ঞানে ও দর্শন-তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম তোমরা বুঝে উঠতে পারবে না। আর গুটি কতক কথা বলে শেষ করব, কিন্তু তোমরা বড় হয়ে হেলেনের জীবন কথা একবার মন দিয়ে পড়ে

তোমরা জান, আমাদের দেশেও নানা স্থানে মূক-বধির-অন্ধ বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে, এর মধ্যে অবশ্যই কলকাতারটাই খুব নামজাদা, সেখানে এক জনকে এক জীবনে একটি ভাষায় কথা বলা বা লিখতে শিখানই এক বিষম ব্যাপার, আর এক্ষেত্রে দেখ, হেলেন শুধু কেবল একটি ভাষায় নয়, ইংরেজী, জর্ম্মান, ফরাসী, লাটিন ও ও গ্রীক ভাষা নিয়ে বি এ, পাশ করে বেরুলেন!

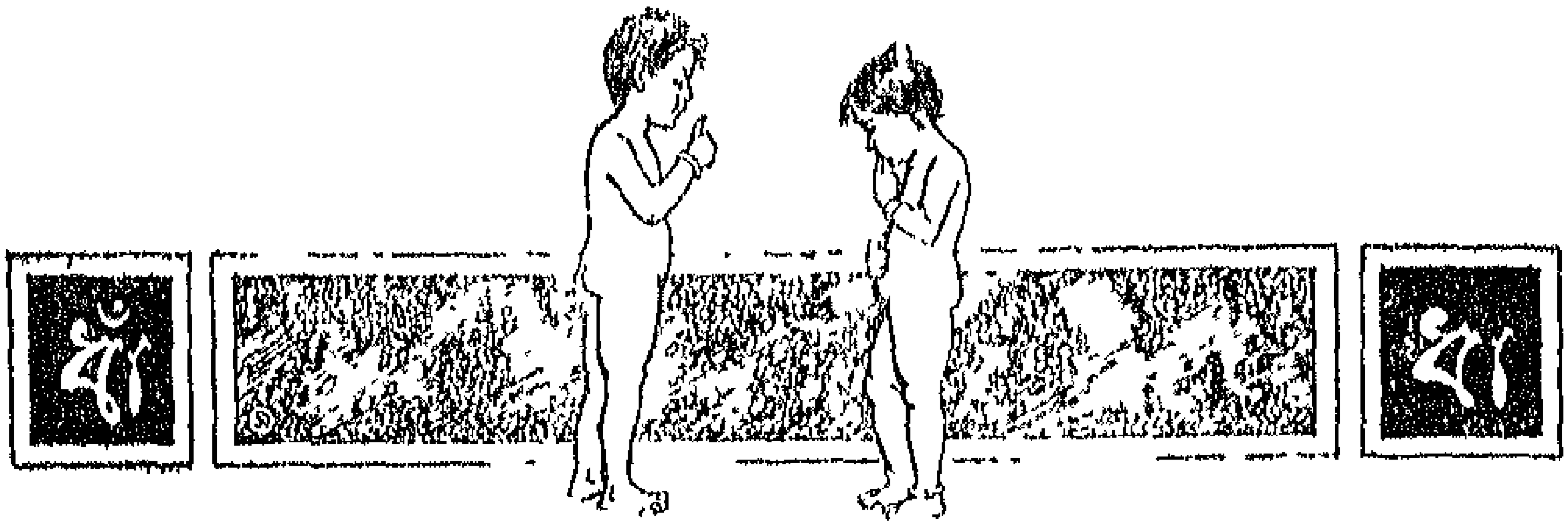
উপাধি জুটলেই আমেরিকার এক কোণে গা-ঢাকা দিয়ে চুপটি করে বসে থাকবেন, হেলেন তেমন হতেই পারেন না তাঁর দৃষ্টি ছিল সকল দিকে, ধর্ম্ম, ও রাজনীতি, সমাজনীতি—এ সবই তাঁর জীবনের লক্ষ্য, কিসে সেদেশের স্ত্রীজাতির কল্যান হবে, কি কল্লে দেশের কাজে তারা পুরুষদের সহিত টেক্ দিয়ে সমান অধিকার ভোগ করবেন, এনিয়ে সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত এবং তার জন্য তিনি অনেক বই লিখতে ছাড়েন নাই অবশ্য তিনি আরও অনেক বই ছাপিয়েছেন, তাদের বিষয়গুলি খুবই উচুদরের—তা তোমরা বড় হয়ে প'ড়ে নিও তিনি মাসিক পত্রিকাদিতেও খুব ভাবপূর্ণ রচনা লিখে থাকেন। আবার তাঁর কবিত্ব শক্তিও বেশ তীক্ষ্ণ, দুচার খানা কাব্যও রচনা করেছেন

আর একটু না বল্লে হেলেনের কাহিনীতে দোষ থেকে যায় বক্তৃতা শক্তিটিকে তিনি এম্‌নি সুন্দর করে আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে তিনি যখনি যা বলেন তা সভাস্থ সকলের রুচিকর না হয়ে পারে না। পূর্ব্বেই বলেছি গল্পের শীর্ষে যে কয়টি কথা বসান হয়েছে তা তাঁর নিজেরই।

আচ্ছা, এখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, এমন হেলেনকে তোমরা কি আখ্যা দিবে? দেবী না মানবী? তা তোমাদের যা খুসি বলো, স্থূল কথা এমনটি যে দেশে জন্মায় সে দেশ তো ধন্যই, তা ছাড়া সমস্ত লোকেই শুনে ধন্য হয়।

মার্কটোয়েইন্ যথার্থই বলেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুইটি অতি অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হয়েছে,—একটি "নেপোলিয়ান,' অপরটি 'হেলেন।"

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়



কার্ত্তিকের নূতন ধাঁধাঁ

(১)

তিন অক্ষরে নাম মোর সত্য কথা কই
মেঘের উপরে থাকি বৃষ্টি কিন্তু নই
কাটিলে আমার মাথা হই আমি মাথ
এমনি জটিল মোরে করেছেন ধাতা।
পাটি যদি কেটে দাও হই আমি পাত।
তীব্র ঔষধে মোর জ্বলে যায় গা
কেহ যদি মাথা মোর ভেঙ্গে দেয় পরে।
তখনি হইগো মাথা বিধাতার বরে
নামটি আমার ভাই বড়ই মধুর
বলে দাও জান যদি কে আছ চতুর॥

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী। রাঁচি।

(২)

কভু চলি পৃথিবীতে কভু শূন্যে ধাই
ধরণী আমারে বড় ভালবাসে ভাই
খাওয়ালেই খাই আমি তা নইলে না,
অনুরোধে গিলে ফেলি ইচ্ছে করে না
অতি বড় হতভাগ্য নিষ্কৃতিও নাই,
সর্ব্বদাই মার খাই যে দিকেই যাই।
কেউ মারে লাথি মোরে কেউ মারে ঘুষি,
কেউ মাথা দিয়ে মেরে হয় মহা খুসী।
ছুটে যদি মিছামিছি শ্রান্ত নাহি হই,
বল ত' পাঠক ভাই কেবা আমি হই?

শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্ত্তী।

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের ধাঁধাঁর উত্তর ও যাহাদের উত্তর ঠিক হইয়াছে তাহাদের নাম অগ্রহায়ণের 'আমার দেশে' বাহির হইবে।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি এ
শিশির পাব্লিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিদ্যোদয় প্রেস,
৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ—১৩২৮ ১১শ সংখ্যা



সম্পাদক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস, সি।

প্রতি সংখ্যা

ছেলে মেয়েদের আশা ও তৃপ্তি

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲

শিশুতোষ সিরিজ

ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲ প্রতিসংখ্যা ।৵০ ।

সম্পাদক—শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ ।

আশ্বিন হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

প্রত্যেক বইতে অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে। মোটা এণ্টিকে, রঙ বেরঙের কালিতে ছাপা।

আজ দেশের চারিদিকে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যে সকল কার্য্যের সূচনা না করিলে জাতীয়-জীবনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না, আজ সেই সব দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অত্যন্ত অভাব, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক এই অভাব পূরণ করিতে পারে না। "শিশুতোষ সিরিজ" নাম দিয়া যে ধরণের বই প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়াছি, ইহা দ্বারা কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে থাকিবে তাহা নয়। এই সকল বই পড়িয়া তরুণ বয়স্ক বালক-বালিকার চিত্তবৃত্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

জাতীয় জীবনের যাহারা ভবিষ্যৎ, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই যে আয়োজন, ইহার সার্থকতা নির্ভর করে প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকের সহযোগিতার উপর। শিক্ষা বিস্তারই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের এই চেষ্টায় কি বাঙ্গলাদেশের প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রত্যেক শিক্ষক সম্পূর্ণ সায় দিবেন না? যদি বঙ্গালার ঘরে-ঘরে শিশুতোষ সিরিজের বইগুলি স্থান পায় তবেই এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের চেষ্টা সার্থক হইবে।

সকলগুলিই ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুতোষ সিরিজের প্রথম বই—আশ্বিন সংখ্যা

পৃথিবীর জন্ম

এই অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া পৃথিবীর জন্ম হইল, দিন রাত্রি, সূর্য্য চন্দ্র, এই সকলের জীবনী ও কার্য্যাবলী শিশুদের উপযোগী সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক ছবি আছে।

শিশুতোষ সিরিজের দ্বিতীয় বই—কার্ত্তিক সংখ্যা

প্রকৃতির পরাভব

সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে,—সে এক জীবন যুদ্ধ! কিন্তু শেষে প্রকৃতিকেই ধীরে ধীরে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই যুদ্ধের বিবরণ হইতেছে—বিশ্ব-সভ্যতার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস।

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।



"গল্প শুনা"

আমার দেশ

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

মা ও ছেলে

দু' হাত দিয়ে মুখটী ধবে আপন জননীব
বল্লে খোকা ধীবে ধীরে, চক্ষে বহে নীব,—
'আমাদেরই বাহির দ্বারে
একটা ছেঁড়া ঝুলি ঘাড়ে
দু' চোক্ কাণা ভিখিবী এক কর্‌তেছিল গান,
আমাব ক'টা পয়সা ছিল,
তাবে দেখে মন গলিল,
তাইতে তারে কল্লুম্ আমি তেক্ষুণি, মা, দান।
তুমি, টিফিন্ খাবার তরে,
দিয়াছিলে তখন মোরে,
বক্‌বে না ত আমায় মাগো, দিয়ে ফেল্লুম ব'লে ?'
ছেলের কথা শুনে হেসে,
বক্ষে তারে নিলে এসে,
গণ্ডে দিলে স্নেহের চুমা, হৃদয় গ্যাল গলে।
বল্লে মাতা,—'হলুম্ খুসী,
এম্‌নি ক'রে পরকে তুমি,'
কাল কাটা'বে, সোনা মাণিক, আমার যাদুধন,
চিব জীবন থাকুক্ রে তোর এম্‌নি ভাল মন '

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

দুষ্টের বন্ধু

এক বক আর এক কাক দু'জনে বন্ধু ছিল।

একদিন পক্ষীরাজ গরুড়ের পূজা দিতে সব পাখী সমুদ্রের ধারে যাচ্ছিল। এই বক ও কাক এ'রা দু'জনেও যাচ্ছিল পথে দুষ্ট কাকটা একজন গোয়ালার দুধের ভাঁড়ের উপর বসে দুধ খেতে চল্ল গোয়ালা প্রথমে জান্তেই পারে নি।



শেষে যখন তার মাথার ভার হাল্কা মনে হ'ল, না'মযে দেখে—অর্দ্ধেকেরও বেশী দুধ নেই গোয়ালা চেয়ে দেখ্‌লে—কাছেই একটা বক, সে রাগে অজ্ঞান হয়ে বকটাকে মেরে ফেল্লে।

কাক আগে থাক্‌তেই উড়ে গেছল। দুষ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্‌তে নেই, তারা ভালমানুষকে এমনি বিপদে ফেলে নিজের প্রাণ বাঁচায়।

বি







আজ্ঞে হ্যাঁ।

বছরে একদিন করে' এক মস্ত চিড়িয়া-মেলা বসে চিড়িয়া মেলা হচ্ছে পাখীর মেলা।

রাজার সখ হল নিজে এবার মেলায় যাবেন, আর অনেক পাখী কিনে আনবেন পাখীর ভারি সখ তাঁর। হাতীর উপর হাওদা দিয়ে, আগে পিছে সৈন্য সাজিয়ে রাজা মশাই চল্লেন, মেলায় কিন্তু পাখী কেনা আর হ'ল না—মেলায় যে সব পাখী এসেছে সবই ছিল তাঁর রাজবাড়ীতে।

রাজাম'শাই হাতীর মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চল্লেন! চল্‌তে চল্‌তে মেলার শেষে একটা বুড়ো লোক একটা মস্ত বক নিয়ে বসে আছে দেখলেন। রাজামশাই ত অবাক আবে বকও লোকে বেচতে আসে মেলায়। লোকটাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করতে রাজা মাহুতকে বল্লেন, নামাও। হাতী অমনি মাথা নীচু করে বসে পড়লো রাজা নেমে এসে বুড়কে বল্লেন, ওহে বাপু তুমি পাখী টাখী জোগাড় করতে পার নি, একটি বকই নিয়ে এসেছ।

বুড়ো চুপ একটু ভয়ও হয়েছে। মুখটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল

তার শুক্‌নো মুখ দেখে রাজার দয়াই হলো। বল্লেন, এটির দাম কত বাপু?

বুড়ো বল্লে—মহারাজ ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব?

রাজা বল্লেন, ভয়ে কেন বাপু? নির্ভয়ে বল।

বুড়ো মস্ত দাম হেঁকে বস্‌লো, বল্লে—তিনশো টাকা?

রাজা হেসে উঠলেন, বল কি বাপু, একটা বক, তার এত দাম হতে পারে। এই ত পুকুর পাড়ে পা টিপে টিপে বেড়ায়, সেই বকই ত বাপু?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কে বল্লে ' পাখীটাই ত। রাজা ভারি খুসী হয়ে পাখীটাকে নিয়ে এলেন; রাণীকে সব কথা বললেন রাণীও খুসী হয়ে বকটিকে জিজ্ঞাস করলেন, তুই বুঝি সব বুঝতে পারিস।—উত্তর হল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজার মেয়ে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন—বেশ বক্‌টি।

বক্ মাথা নেড়ে বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন, বুড়োটা ঐ একটা কথাই অনেক কষ্টে বক্‌টাকে শিখিয়েছিল বক্ কি আর পড়ে? বুড়োটা পাঁচ সাত বছর ধরে তাকে ঐ একটা কথ বলাতেই পেরেছিল

রাজা যখন দেখলেন বক্‌ট ঐ এক আজ্ঞে হ্যাঁ ছাড়া কিছুই বলে না, তখন তিনি বড় দুঃখিত হলেন।

রাণী চটে বল্লেন, যেমন জোচ্চোর সেই বুড়টা, তেমনি জোচ্চোর এই বক্‌ট।

বক্ অমনি বলে উঠল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজকুমারী বক্‌টার লেজ ধরে একটান দিয়ে বল্লেন, দূর করে দাও মা এটাকে, এ হতভাগা। এতে আমাদের দরকার নই।

বক্ নড়ে চড়ে বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ—ওর ভাবটা যেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে ত বর্ত্তে যাই দিব্য গুঁড়ি মেরে মেরে পুকুরে পুকুরে মৎস্য কুল নির্ম্মূল করি।

রাণী রাজাকে বল্লেন, এবার থেকে যখন কিছু কিনবে টিনবে বেশ পরখ ক'রে কিনো জুচ্চুরীতে ঠকে এসো না যেন

রাজা চুপ করে রইলেন

তাঁর হয়ে জবাব দিলে—বক্ বল্লে আজ্ঞে হ্যাঁ

যেন সে রাজার মনের কথাই বল্লে, না, আর ঠকব না।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

বালিকার বীরত্ব (কীর্ত্তিগাথা—২)

কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মানুষ বীর হয় না—মনের জোর গায়ের জোরের বীরের চেয়েও মানুষকে বড় করে, আজ তোমাদের সে কথা বল্‌ছি। শুধু যারা লড়াই করে, তারাই বীর নয়—যার হৃদয়ে দয়া মায়া আছে, সেও বীর ; যে ক্ষমা করতে জানে—সেও বীর ; যে পরদুঃখকাতর, সেও বীর ; যে পরের দুঃখ মোচন করতে চেষ্টা করে—সেও বীর

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর হাল্ থেকে দণ্ডির পথে আসতে ফোরফাবসার জাহাজখানির কল-কব্জা খারাপ হ'য়ে যায় জাহাজখানার কল-কব্জা তেমন মজবুত ছিল না, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের নির্ম্মল আকাশের নীচে সমুদ্রে যাওয়ার পক্ষে তার কোন বাধা না থাকায় সে অনেক দূর চলে এসেছিল হঠাৎ ৬ই রাত্রে ভীষণ ঝড়ে সমুদ্র একেবারে তালগাছের মত উঁচু ঢেউ তুলে জাহাজখানাকে কাবু করে ফেল্লে ; কল কব্জা খারাপ ত ছিলই, ঢেউয়ে ঢেউয়ে জাহাজে শত ছিদ্র হ'যে জল ঢুক্‌তে লাগল—জাহাজের এঞ্জিনের আগুণ নিবে গেল, জাহাজ আর চলে না। নাবিকরা মাস্তুল খাটিয়ে চালাবার চেষ্টা কর্‌লে—অত ঝড়ে কি মাস্তুল থাকে ? ভেঙ্গে পড়ে গেল। মাঝের রাত্রে দূরে একটা আলো দেখে তাদের প্রাণ একেবারে উড়ে গেল। বিপদের ওপর বিপদ! এ পথে তারা অনেকবার আনাগোনা করেছে, জানত যে আলোর আশে পাশে সব জলে ডোবা পাহাড় আছে—তাতে ধাক্কা লাগ্‌লে আর বাঁচবার কোন আশা নেই। আর সেগুলোকে যে এড়িয়ে যাবে, তারও উপায় নেই, কেন না জাহাজের কলও চল্‌ছে না, পাল টাঙ্গিয়ে হাল ধরে যে যাবে, তারও যো নাই, পালশুদ্ধ মাস্তুল ভেঙ্গে পড়ে গেছে তাই হ'ল—জাহাজখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। চল্লিশজন অতলে কোথায় তলিয়ে গেল, কেবল হালখানা ধরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ৯ জন নাবিক ভগবানকে ভাবতে লাগল।

যেখানে তারা সারারাত এমনি ভাসছিল, তারই মাইলখানেক দূরে ছিল, লংষ্টোন আলো-ঘর সমুদ্রের মাঝে মাঝে আলো-ঘর থাকে। এই আলো ঘরে ডারলিং, তার স্ত্রী ও তার মেয়ে গ্রেস থাক্‌ত। সারা রাত্রি এরা ঘুমোতে পারে নি—যে সমুদ্র গর্জ্জন, তাতে কি আর ঘুম হয় ? সকালে গ্রেস আলো-ঘরের মাথায় চড়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সেই ন-জন নাবিককে দেখ্‌তে পেলে

তখন সকাল হয়ে গেছল, কিন্তু সমুদ্র, তখনও লাফালাফি মাতামাতি সমানভাবেই করছিল গ্রেস বুঝতে পারলে, যে, রাত্রে কোন জাহাজ ডুবি হয়েছে—তারই লোক এরা—সারারাত এমনি ভাসছে এখনও যদি এদের না রক্ষ করা হয় ঐ তুফানের নীচেই এদের কবর হবে।

গ্রেস তার বাবাকে বল্লে   তার মা একেবারে কেঁদে কেটে সারা হতে লাগলেন— কিন্তু গ্রেস বল্লে, সে যাবেই ; তার বাবা যদি নাও যান, সে যাবেই

তখন সে আলো-ঘরের জালি বোট নামিয়ে ফেল্লে, তার বাপও এসে উঠলেন   দুজনে সেখানে পৌঁছে সে ন-জনকে আলো ঘরে ফিরিয়ে আন্‌লেন

এই বীর বালিকা আর কোন বীরত্বের কাজ করেছে কি না জানা যায় নি, সম্ভবতঃ করে নি   কারণ, এর পরে বেশী দিন সে বাঁচে নি ; মোটে চারিটি বছর সে আর পৃথিবীতে ছিল   ঐ চার বছরে সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত হয়ে পড়েছিল। কত লোকে যে তাকে কত উপহার, সোনাদানা টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তার আর ঠিক নেই

তার মৃত্যুর পর তার আত্মীয়েরা সেইখানেই তারে সমাধি দিয়েছিলেন   বি

তাজ্জব !

পাখীর বাসা।



এক ভদ্রলোক বড় বনের পাখী ভালবাসতেন। অনেকেই পাখী ভালবাসে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেই পাখী এনে খাঁচায় পুরে আনন্দ পেয়ে থাকেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি এমন নির্দ্দয় ছিলেন না। তিনি তাদের স্বাধীনতায় হাত দিতেন না   বনের মধ্যে ধান চাল সব ছড়িয়ে দিতেন, পাখীরা এসে খেয়ে যেত—এই দেখেই তাঁর আনন্দ   যখন পাখীরা থাকত না, তখন ইঁদুর এসে ধান চাল সব খেয়ে যেত, সেই জন্যে তিনি একটা খালি বোতলের মুখে একটি টিন রেখে তাতেই খাবার ছড়িয়ে রাখতেন, ইচ্ছামত পাখীরা আসত, খেত, কলকাকলী করে আবার বনে বনে উড়ে বেড়াত   কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল, একটা পাখী কাঠ-কুটো এনে তারই উপরে বাসা বেঁধেছে। ওমা! তাইতে আবার চারিটি ডিম পেড়ে দিব্যি তা দিতে লেগে গেছে। ঐ দেখ—ছবিতে।

"বউ কথা কও"।

(গ্রাম্য-কাহিনী।)

জ্যৈষ্ঠ মাস সাঁঝের আঁধার তখন বেশ জমাট বেঁধে ঘনিয়ে এসেছে আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নাই তারার মালায় আকাশখানি বেশ ঝিক্ মিক্ করচে সেদিন ছিল দ্বাদশী তিথি, চাঁদ তখন অনেকটা উঁচুতে উঠে তার সুন্দর রূপোলি জোছনায় গাছপালা, আকাশ, মাঠ, বন সব ভাসিয়ে দিয়েছে নীল সাগরে আলোর নৌকার মতই চাঁদ আপন মনে ভেসে চলেছে আকাশের গায়ে কত রকম নূতন নূতন পাখীর মিষ্টি সুরে সেই জ্যোৎস্না ভরা আকাশ ভ'রে উঠ্ছে। বাছুড়গুলো পাকা আম জাম কাঁটাল খাবার লোভে ডানার দব্ দব্ শব্দ কর্ত্তে কর্ত্তে গাছের ডালে গিয়ে ঝুপ্ ক'রে পড়ছে, আবার সেখানে থেকে আর এক গাছে উড়ে যাচ্ছে বাদুড় দেখে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা সুর ক'রে বল্‌ছে—

"বাছুড় বাছুড় চৈতা,
বংশী বাড়ীর নিতা,
আমায় ছেড়ে যে ফল খাবি
সে ফল তিতা।"

দারুণ গরম পড়েছে এক এক বার ঝুর ঝুর ক'রে গাছের পাতা কাঁপিয়ে দু' চারটা পাকা আম ফেলে দিয়ে একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে অরুণার দিদিমা দারুণ গ্রীষ্মে ঘরের ভিতর অতিষ্ঠ হ'য়ে একখানা পাখা নিয়ে রোয়াকে ব'সে বাতাস খাচ্ছেন একটু পরেই আট ন' বছরের একটী মেয়ে,—নাম তার অরুণা, ফুল সমেত একটা হাস্‌নাহেনার ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসে তার দিদিমার নাকের কাছে ধ'রে বল্লে,— "ভাখ দিকিনি দিদিমা, কি সুন্দর গন্ধ। ছোট্ট ছোট্ট রত্তি রত্তি ফুল, কিন্তু গন্ধ এদের কত। আরো মজা দেখেছো দিদিমা, দিনের বেলায় মোটেই গন্ধ থাকে না এদের, যেমনি সন্ধ্যেটী হ'ল, অমনি ··· ·······

দিদিমা অরুণার হাতটা ঠেলে দিয়ে বল্লেন, "যা যা, এ গন্ধ আমি সইতে পারি না কি বিৎথুঁটে গন্ধ। ও তোরাই শুঁকগে যা।"

দিদিমার কথা শুনে অরুণা হেসেই বাঁচে না। সে ফুলের ডালটা একবার নিজের

নাকের কাছে নিয়ে বল্লে, "দিদিমার যেমন সব অনাছিষ্টি কথা! এ গন্ধ নাকি আবার বিৎখুঁটে কেনে সিনেব গন্ধটা বেশ মিষ্টি, নয় দিদিমা ?"

দিদিমা একটু বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন,—"হ্যা, তাই"

দিদিমা রাগ ক'রেছেন, অরুণা তাই ফুলের ডালটা বুকের নীচে ফেলে দিয়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে,—"রাগ কল্লে দিদিমা ?"

দিদিমা, হেসে অরুণার কপালের উপর এসে পড়া কোঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "নারে পাগলী না। উঃ আজ কি জ্বলনি পুড়নিই না হযেছে,—একটু বাতাস করবি দিদি"

অরুণা দিদিমার হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে বাতাস কর্ত্তে ব'সে গেল বাতাস কর্ত্তে কর্ত্তে সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আচ্ছা দিদিমা, চাঁদের ভেতর ঐ যে কালো দাগটা ওটা কি ?"

দিদিমা বল্লেন, "ওটা একটা বট গাছ এক বুড়ী ও গাছের নীচে বসে সুতো কাটে"

অরুণা জিজ্ঞাসা কল্লে, "কেন দিদিমা ?"

দিদিমা বল্লেন, "তা' কি ক'রে বলবো ?"

এমন সময়ে গাছের শাখায় একটা পাখী ডেকে উঠ্‌লে,—"বউ—কথা—কও"

বড় মিষ্টি সুর, চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়েও যেন এ সুরটা বেশী মিঠে অরুণা বুঝি পাখীর এমন মিষ্টি সুর কখনো আর শোনেনি তাই সে তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলে, "হাঁ। দিদিমা. ওটা কি পাখী,—এমন সুন্দর ডাকে ?"

দিদিমা বল্লেন, "ওটা 'বউ কথা কও পাখী"

পাখীর যে এমন নাম হ'তে পারে তা' অরুণা আগে আর কখনো শোনেনি। সে ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে দিদিমাকে বল্লে, "এ আবার কেমন নাম দিদিমা,—শালিক নয়, কাক নয়, পেঁচা নয়,—বউ কথা কও না দিদিমা, তুমি ঠাট্টা কচ্ছো।"

দিদিমা হেসে বল্লেন, "আরে না।"

অরুণা বল্লে, "হ্যাঁ, ঐ যে তুমি হাস্‌ছো ?"

দিদিমা বল্লেন, "দূর পাগলী, হাসছি বলেই কি ঠাট্টা হলোরে' ও পাখীটা ঐ বউ কথা কও বলেই ডাকে, তাই ওর নাম বউ কথা কও"

অরুণা বল্লে, "সত্যি ?"

এমন সময় পাখীট আবাব ডেকে উঠ্লো,—"বউ—কথা—কও "

এবাব অরুণা পাখীব ডাকটা বেশ কাণ পেতে শুনে এক গাল হাসি হেসে দিদিমার মুখেব দিকে ত কিয়ে বল্লে, "সত্যিত, এ ভারী মজার পাখী। আচ্ছা দিদিমা, এ পাখীটা অমন ক'রে ড'কে কেন ?

দিদিম বল্লেন, "ওব একটা গল্প আছে "

গল্পের নাম শুনে হাতেব পাখাখানা ফেলে দিয়ে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধ'রে অরুণা বল্লে,—"বল দিদিমা, গল্পটা

"আচ্ছা, আচ্ছা বলি শোন,"—ব'লে দিদিমা গল্প আরম্ভ কল্লেন ,—

"এক দেশে পাড়াগাঁয়ে এক গেবস্তের বউ ছিল। বড় কষ্ট তার দিন নাই, বাত নাই, সে সংসাবে খাট্তো, কিন্তু তবু তাব যশঃ ছিল না শাশুড়ী ননদ তাকে ভারী জ্বালা দিত ; বউ বেচাবীব আব কোনো উপায় ছিল না, সে এক হাতে কাজ কর্ত্তো আর এক হাতে চোখেব জল মুছতো "—

অরুণা— কেন জ্বালা দিত, কুঁড়েমি কর্ত্তো বলে ?"

দিদিমা— না, বউটা কাজে কর্ম্মে ছিল যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী তবে কিনা অনেক শাশুড়ী ননদ এমন ধারা থাকে যে, বউ যদি সাবাদিন সংসারে খেটে খেটে ম'রেও যায় তবু তাবা বউএব কাজ চোখে দেখে না —

দিদিমা আবাব আবম্ভ কল্লেন,—"বউকে তারা ছেঁড়া কাল কুট্কুটে কাপড় পরতে দিত, মাথায় তেলটুকু ছোঁযাতে দিত না, কোনো দিন পেট পু'রে খেতে দিত না, কোনো দিন বা উপোসী বাখত, কোনো দিন মাযে ঝীয়ে বউ বেচারীকে মেরে ধ'রে তাব গোছা গোছা চুল ছিঁড়ে দিতো, কোনো দিন শাশুড়ী মাগী উন্থন থেকে পোড়া কাঠ নিয়ে বউএর গালে পিঠে ছ্যাঁকা দিত, কোনো দিন বা বউএর সোয়ামীকে মিথ্যে ব'লে বউকে মার খাওয়াতো "—

অরুণা— এমন বউকে ধরে মাবে। বউ বেচারীর'ত ভারী কষ্ট।

দিদিমা "হুঁ,—তাবপর শোন ;—একদিন এম্নি জ্যৈষ্ঠি মাসে সে বাড়ীতে জনকয়েক কুটুম এল শাশুড়ী বউকে রাধতে বল্লে, বউ রাঁধতে গেল শাশুড়ী মাগী কবেছে কি, যেমন দশজন লোক খাবে, সে যায়গায় কর্ত্তে দিয়েছে আটজনের আন্দাজ বউ ভাত, ড'ল, তরকারী, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, চচ্চরী, টক, পিঠে, পায়েশ ইত্যাদি ক'রে রেঁধে চান কর্ত্তে গেছে পুকুরে। এরি ভেতর বজ্জাত শাশুড়ী করেছে

কি, রান্নাঘরে গিয়ে সমস্ত রান্না জিনিষ থেকে কিছু কিছু ক'রে তুলে নিয়ে, একখানা কলার পাতে কিছু পায়েশ মাখিয়ে রেখে রান্না ঘরের পেছনে ফেলে দিয়েছে।"

অরুণা—। কেন ?

দিদিমা—। শোন্ বলছি,—রেখে দিয়ে ছেলেকে ডেকে এনে সেই পায়েশ মাখান কলার পাতা দেখিয়ে বল্লে,—'দেখেছিস্, একবার চোখের মাথা খেয়ে ছাখ্, তোর বউএর কাণ্ডটা। ছু'জন ভদ্রলোক এয়েচে বাড়ীতে, আজো কি অমন বেহায়াপণা না করলে নয় ? বউ মানুষের অমন জিভ থাকবে কেন রে ?' ছেলে কিছু না বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস কল্লে, 'ব্যাপারখানা কি, খুলেই বলনা ছাই।' মা রেগে টং হ'য়ে বল্লে, "চোখ চেয়ে ছাখ না, ভাবিস আমরা বুঝি কেবল বউএর নামে মিথ্যে রটিয়েই বেড়াই। ছাখ, চুরি ক'রে পায়েশ খেয়ে পুকুরে গেছে চান কর্ত্তে" মায়ের কথা ছেলেও বিশ্বাস কর্লে। বউ যেমন চান ক'রে এসে কাঁখ থেকে জলের কলসী ঘরের দাওয়ায় রেখেচে অমনি তার সোয়ামী ছুটে গিয়ে সপাসপ্ ক'রে ঘা দশ পনের পিঠে বসিয়ে দিয়ে চুলের মুঠো ধ'রে ঘরের রকে মুখ র'গড়ে দিতে লাগলো। বউ বেচারীর কপাল দিয়ে, মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে দর্ দর্ ক'রে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

অরুণা— ও মা মা, অমন ডাকাতে সোয়ামী।

দিদিমা— সে দিন আর খাওয়া হলো না, সারাটা দিন রাত্তির কেবল ব'সে ব'সে কাঁদলো পরদিন হাট বার ছিল। সেই গাঁয়ের লোক, বউএর বাপের বাড়ী যে গাঁয়ে, হাট কর্ত্তে যাচ্ছে। বউ একটা ছেলেকে ডেকে তার কাছে ব'লে দিলে,—"আমার ভাইকে ব'লো যে তার বোনের বড্ড ব্যামো হ'য়েছে, তাকে আজই গিয়ে দেখে আস্‌তে বলেছে।" পরদিন ভাই এসে উপস্থিত। বউ তার পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বল্লে, "দাদা গো, আমায় বাড়ী নিয়ে চল এখানে থাকলে এরা সত্যি সত্যি আমায় মেরে ফেলবে, ছাখ আমায় মেরে মেরে কি ক'রেছে পেট পু'রে যে এক মুঠো ভাত খাবো তাও এরা খেতে দেয় না গো। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমায় বাড়ী নিয়ে চল।"

অরুণা— বউএর ভাই, কাউকে গাল মন্দ দিলে না ?

দিদিমা—তা' আর কি ক'রে দেবে ?—যা'কগে, শোন্,—তার পর হ'ল কি, বউর ভাই সবাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে বোনকে নিয়ে বাড়ী চলো। যেতে যেতে পথে ছু'জনেরি খুব ক্ষিদে পেল। তখনই ভাই বোনকে বল্লে,—"এই গাছতলায় তুই একটু বোস, ঐ যে পুকুর ধারে আমের বাগান দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে পাকা আম

পেড়ে নিয়ে আসি।" বউ গাছের তলায় বসলো, ভাই আম আনতে গেল। কতক্ষণ যায়, কিন্তু ভাই আর ফেরেনা, বোন অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে শেষে ভাইএর খোঁজে সেই বাগানের ভিতব গিয়ে দেখে, সেখানে ভাই নেই, কেবল তার মাথাটা প'ড়ে আছে, বাঘে তাকে খেয়ে ফেলেছে।

অকণা— বউ যে সেখানে গেল, তাকে বাঘে খেলে না ?

দিদিমা— না, বাঘ কি আর সেখানে ব'সে ছিল ? তারপর, বউ আর কি করে ? সেত বাপের বাড়ীর পথ আব চেনে না যে বাপের বাড়ী যাবে তাই সে চোখের জল মুছতে মুছতে যে পথে এসেছিল সেই পথে আবার শ্বশুর ঘরে চললো। বউকে একা ফিরে আস্‌তে দেখে বাড়ীর সবাই তাকে জিজ্ঞেস কর্ত্তে লাগলো, "ও বউ, একা যে ফিরে এলি ? তোমার ভাই কোথা ?" কিন্তু বউ কোনো উত্তরই না দিয়ে ঘোমটা টেনে দিয়ে কেবলি কাঁদছে। বউ কথা কয়না দেখে ননদের ভারী রাগ হ'ল, সে দু' তিনবার বল্লে, 'বউ কথা কও, 'কিন্তু তবু বউ উত্তব দিচ্ছে না দেখে খুব জোরে বউএব গ'লে গোটা কয়েক ঠোণা বসিয়ে দিলে হায়, বাছার এমন শোকের সময়, তার উপর আবার তাকে অমন ক'রে জ্বালা দিচ্চে, এও কি আর ধর্ম্মে সয়। বউএর অভিশাপে ননদ একটা পাখী হ'য়ে উড়ে গেল। সে গাছে গাছে উড়ে উড়ে কেবল বলতে লাগলো,—'বউ—কথা—কও' এটাই হচ্ছে সেই পাখী

তখন গাছের ডালে পাখীটা আবার ডেকে উঠ্‌লো—'বউ—কথা—কও।' অকণা সে দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "কেমন মজা এখন, বেশ হ'য়েছে, আচ্ছা সাজ।"

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত

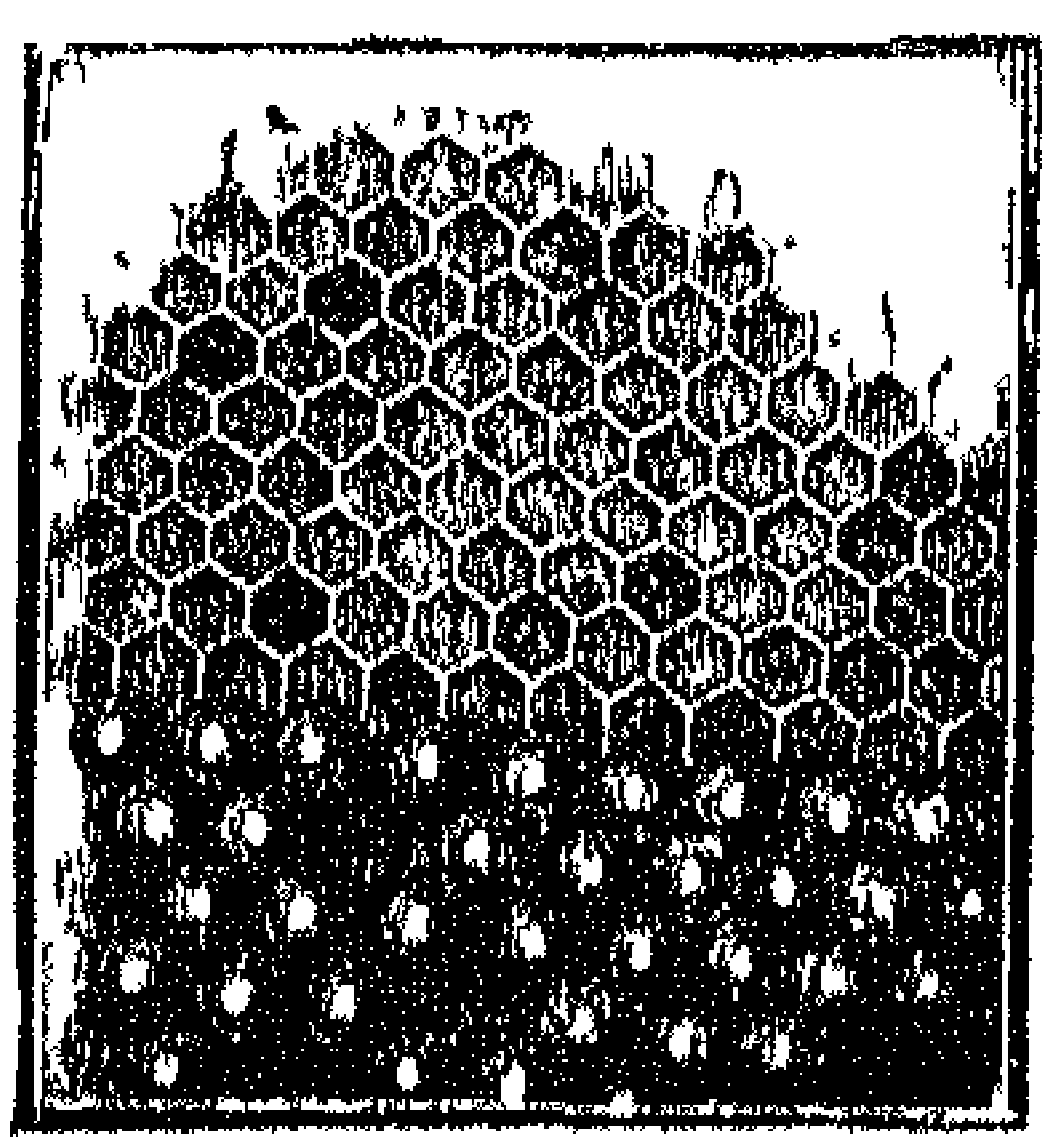


সঞ্চয়

আমার দেশের পাঠক পাঠিকা। তোমরা তোমাদের পিতা মাতা বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা, পয়সা পেয়ে থাক অনেকে রোজ পাও, অনেকে মাঝে মাঝে পাও, কেউ বা কচিৎ কখন পাও কিন্তু কটি পয়সা, কটি টাকা জমাইয়াছ বলিতে পার কি? আমার ত ধারণা লজেঞ্চেস অথবা সন্দেশের দোকানেই সেগুলি রাখিয়া আসিয়াছ। হঠাৎ যদি কোন দরকার পড়ে আবার তোমাকে তোমার পিতা মাতার কাছেই ছুটিতে হইবে; হাত না পাতিলে উপায় নাই তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন, কিছু কিছু জমাইয়া ফেল না চাবীওয়ালা একটা বাক্স কর, বাক্সের চাবিটা হয় মা'র কাছে রাখিয়া দাও, নয়ত সেটি কোন একটা পুকুরে কি নদীতে ফেলিয়া দিয়া এস তার পর রোজ তোমার সাধ্যমত একটি, দুটি কি চারিটি পয়সা বাক্সের উপরে একটা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ফেলিতে থাক মাঝে মাঝে বাক্সের চাবিটার তোমার দরকার পড়িবে বটে, কিন্তু সুযোগ হয়ত সব সময়ে ঘটিয়া উঠিবে না। তোমার দরকার পড়িল, জাপানী লজেঞ্চেসের বাক্স কিনিতেই হইবে, কিন্তু তখন "চাবী-তালা-সারা" মিলিল না, বাক্সটি ভাঙিতেও মায়া জন্মিতেছে—কাজেই পয়সাটা তখন জমা রহিয়া গেল এমনি করিয়া পাঁচ সাত কি দশ বছর পরে যখন তোমারাই বাক্স খুলিবে, তখন দেখিবে, এই এ তো-গুলি।

অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা জমান অনেকে পোষ্টাফিস সেভিংসব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত করেন, অনেকে আবার জীবনবীমা করিয়া কিছু কিছু সেখানেই দিয়া আসেন মোটের উপর যাহার যেমন আয় ব্যয় তাহা হইতে সাধ্যমত বাঁচাইয়া থাকেন এবং তাহা করাই সকলের উচিৎ

এই ত গেল মানুষের কথা। মানুষ ছাড়া জীবজন্তুদেরও ব্যাঙ্ক আছে। অসময়ের জন্য তাহারাও কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে মৌমাছির ব্যাঙ্ক, মৌচাক অবশ্য এই ব্যাঙ্কে তাহারা খুব নিরাপদে তাহাদের ধনসম্পত্তি জমাইয়া রাখিতে পারে না বরঞ্চ এখানে জমানো তাহাদের বোকামী, কিন্তু কাজ নাই সে কথায়। তাহাদের 'বোকা' বলিলে তাহারা আমাদের চোর-ডাকাতও বলিতে পারে গাছের গুঁড়িতে গর্ত্ত করিয়া কাঠবিড়ালী তাহার ব্যাঙ্ক বসায়।



মৌচাক।

তোমরা চিড়িয়াখানায় ও সার্কাসে উট্ দেখিয়াছ। উটের পিঠের উপরে যে দুইটা উঁচু মণ্ডপ আছে—উটের সেই মণ্ডপ দুইটিই হইল ব্যাঙ্ক তন্মধ্যে উট্ খাদ্য ও পানীয় লুকাইয়া রাখে অসময়ে তাহা হইতেই তাহার চলে ভাল্লুক সারা শীতকাল ঘুমায়—কিন্তু আগেই সে দেহটি চর্ব্বিতে বেশ পুষ্ট করিয়া রাখে, শীতকালটা সেই চর্ব্বি হইতেই তাহার চলিয় যায়

অনেক লোক নিজেদের জন্য না হোক্ ছেলেপিলেদের জন্যও কিছু কিছু জমাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। মানুষ সকল জীব-জন্তুর চেয়ে বুদ্ধিমান, তাহারা ত এই চেষ্টা করিবেই। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও এই রকম জমাইবার চেষ্টা আছে তোমরা ডিম খাইয়াছ, যে না খাইয়াছ কখনও কখনও ভাঙ্গা ডিম দু' একটি দেখিয়াছ ডিমের মধ্যে হলদে রঙের একটা পদার্থ থাকে দেখিয়াছ, সে জিনিসটা কেন থাকে জান কি? ডিম হইতে যে বাচ্চা জন্মিবে—সে সেই অংশটুকু খাইয়া তাহার জন্মকালটা কাটাইয়া থাকে।

জীবজন্তু ছাড়া, তরী তরকারী ফল-ফসলের মধ্যেও সঞ্চয় প্রথা আছে। আম খাইয়া আমের আঁটি তোমরা ফেলিয়া দাও, তার মধ্যে কি থাকে? তাহার ছেলেপুলের খাদ্য থাকে—আঁটিটা তুমি ফেলিয়া দিলে, দেখিবে দিন কতক পরে একটি গাছ বাহির হইল, ক্রমে সেটা বাড়িতে লাগিল, তখন যদি তুমি মাটীতে পুঁতিয়া দাও, চাই কি একদিন তাহার মিষ্ট ফল খাইয়া তোমার অনেক আনন্দ হইবে তবেই দেখ যতদিন না তুমি ছোট্ট গাছটিকে মাটিতে পুঁতিলে ততদিন সে কি খাইয়া বাঁচিল ? সেই যে আঁটির মধ্যে আমটা কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা খাইয়া।



আলুর গাছ।

অনেক গাছপালা আবার শিকড়ে ব্যাঙ্ক বসাইয়া থাকে, যেমন আলু, পেঁয়াজ। আলু গাছ শিকড়ে খাবার রাখে কিন্তু আমরা তাহার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান—আমরা মাটী খুঁড়িয়া সে গুলির সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি আলু গাছ বুদ্ধি করিয়া এমন জিনিসটা রাখিয়াছিল, তাই, নহিলে আমরা যে কি খাইতাম, আমি ত ভাবিয়াই পাই না। ভাতে, ভাজায়, ঝোলে, ঝালে, ডালনায়, কালিয়ায়, অম্বলে, যাহাতে দিবে, আহা, অতি পরিপাটী। বি

বীর মেয়ে (কীর্ত্তিগাথা—৩)

একবার একদল ছেলেমেয়ে পেন্‌সিলভিনিয়ার বনে বনভোজন করতে এসেছিল। বসন্তকাল, বনে বনে কত ফুল ফুটেছে, তাদের মধ্যে কতক ফুল তুলতে লেগে গেল; কেউ কেউ পাখী টাখী মারতেও ছুটল ক্রমে তারা দল ছাড়া হ'য়ে পড়ছিল। অবশ্য বেশীদূর তারা যাবে না, কারণ নদীর ধারেই তারা বৈকালের খাওয়াটা এক সঙ্গে খাবে—এই ঠিক ছিল।

হঠাৎ বিলি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল—কাছেই একটী ছেলে ফুল তুলছিল। সে ছুটে এসে দেখ্‌লে বিলির পাশ দিয়ে একটা সাপ ঝোপে ঢুকে গেল। বিলির বন্ধুর চেঁচামেচিতে আরও ক'জন ছেলে ছুটে এল—তারা প্রথমেই খুঁজে খুঁজে সাপটাকে মেরে ফেল্লে। আর হৈ-চৈ করতে লাগল

মেরী বার্ণ্টন বলে একটি মেয়েও এসেছিল। সে এসেই বিলির জামা ছিড়ে খুলে ফেলে দেখ্‌লে ঠিক কুনুয়ের নীচেই ছোট ছোট দাঁতের দাগ—আর তার পাশেই রক্ত জমে উঠেছে মেরী নিজের রুমাল বের করে বিলির বাহুর মঝখানে খুব শক্ত করে' বেঁধে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে সেই রক্তজমা জায়গাটি চুষতে লাগ্‌ল। অন্য ছেলেমেয়েরা বল্লে—ওকি করছ মেরী?

মেরী বল্লে—দাঁড়িয়ে দেখ চুপ করে, আর না পার চলে যাও

ছেলেরা বল্লে—আমরা ডাক্তার আনিগে যাই মেরী ঘাড় নেড়ে বল্লে—যাও, যা হয়েছে ব'লে তাঁকে ডেকে নিয়ে এস ছেলেরা গ্রামের মধ্যে ঢুকল। অন্য মেয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল

খানিক পরে মেরী দেখ্‌লে বিলি অনেকটা সুস্থ হয়েছে, তখন তারা সব গ্রামের দিকে চল্‌তে লাগল। পথেই দেখা ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার স্থানটি পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন, আর বিষ নাই, কিন্তু মেরীর ঠোঁট দুখানি একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার বল্লেন—তুমি যে নিজের জীবন সংশয় করে ফেলেছ, মেরী?

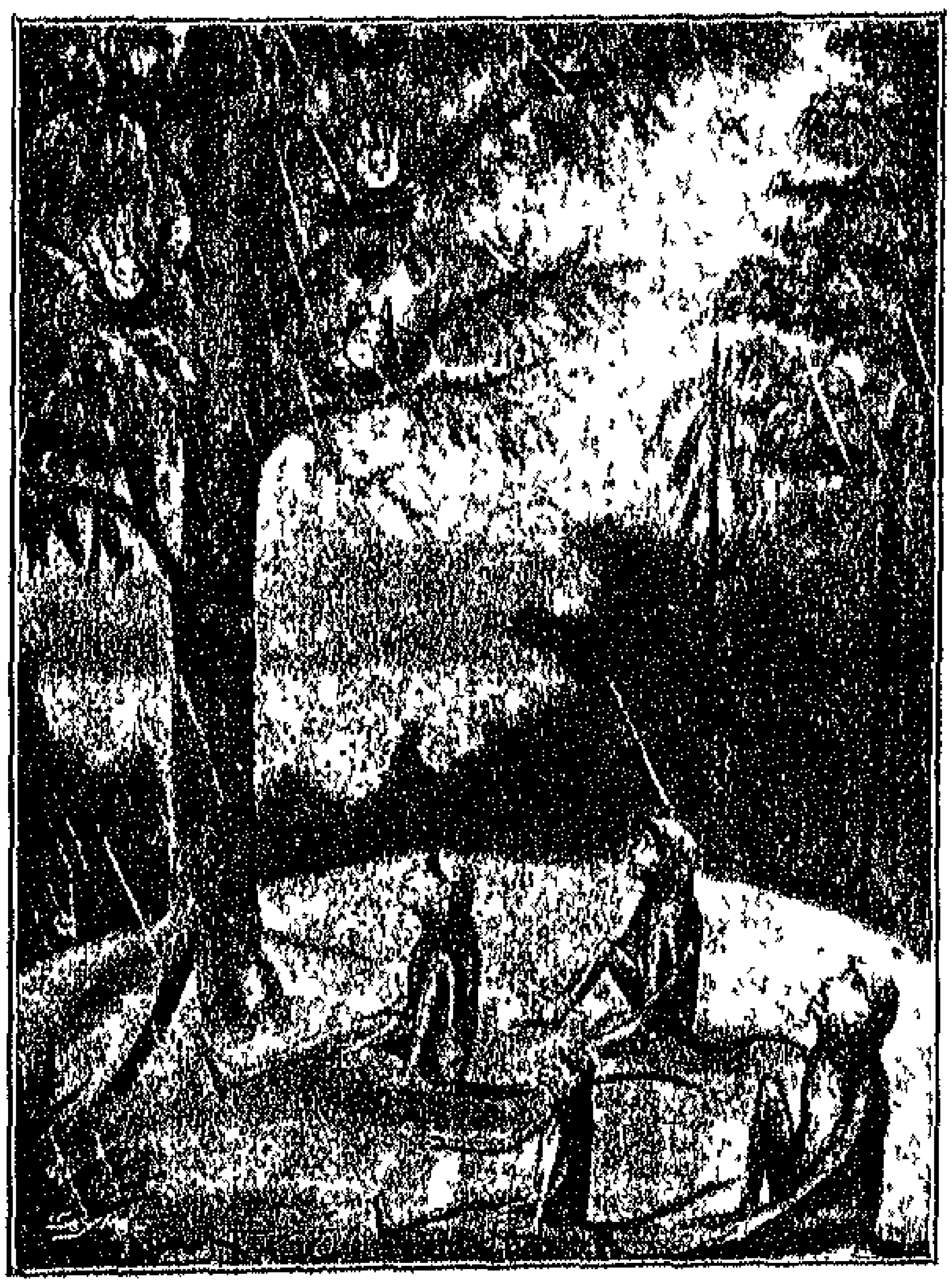
যাক্—তাঁর ঔষধে মেরীরও কোন অসুখ হল না। বরং সে-যে বিলিকে বাঁচাতে পেরেছে তারই জন্যে সে খুব সুখ বোধ করতে লাগল।

বি।

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী

একদিন বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি পড়িতেছে। নর্ম্মদা তীরে এক গাছের তলায় বসিয়া জলে ভিজিয়া একদল বানর হিঁ হি করিয়া কাঁপিতেছিল সেই গাছের ডালপালায় বাসা বাঁধিয়া অনেকগুলি পাখী বাস করিত গাছতলায় ভেজা বানরগুলিকে দেখিয়া তাহাদের মনে বড়ই কষ্ট হইল আহা, বেচারীরা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে

তাহারা বানরগুলিকে ডাকিয়া বলিল—দেখ ভাই বানর, আমরা মুখে করিয়া খড় কুটী তুলিয়া কেমন বাসা বাঁধিয়া বাস করিতেছি, আর তোমরা হস্তপদবিশিষ্ট, মানুষের মত বুদ্ধিমান লোক হইয়াও কেন নিরুপায়ের মত জলে ভিজিয়া কাঁপিয়া মরিতেছ ?



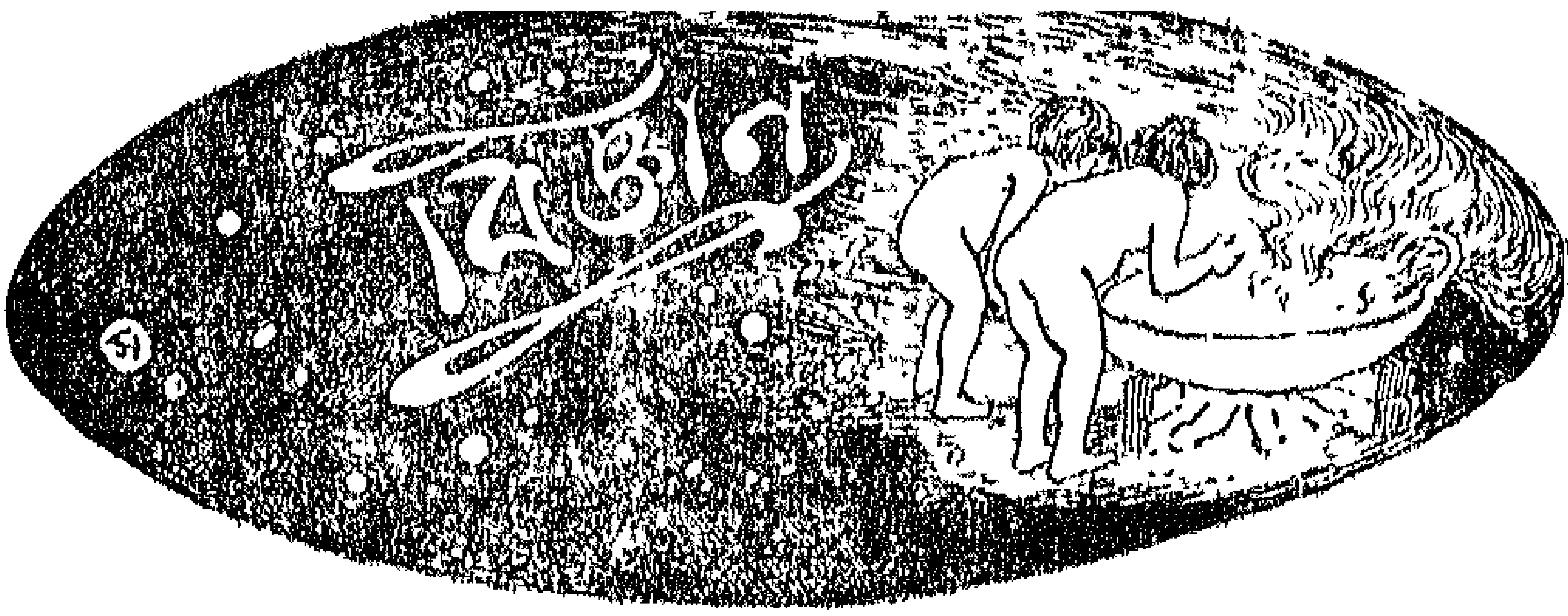
ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে

হঁা, এমন কথা বলে ঐ পাখীগুলা। এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমাদের নিন্দা করা। দাঁড়াও মজাটা দেখাইতেছি এই ভাবিয়া, বৃষ্টি থামিবামাত্র তাহারা গাছে উঠিয়া পড়িল। যত বাসা ছিল, যত ডিম ও ছানা ছিল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া মারিয়া শোধ তুলিল।

এইজন্যই কথায় বলে :—

কাল সাপের বিষ বাড়ে দুগ্ধ করে' পান
দুষ্টেরে উপদেশ কভু না করিবে দান।

বি



ধ্বংসোন্মুখ উটপাখী

বলতে পার উটপাখী কি কখনও লোপ পাবে? নিশ্চয়ই পারে আজ নয়, কাল নয়, তোমার আমার সময়েও হয়ত নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে ডোডো পাখীর মতন উটপাখীও ধরাতল হতে চির বিলুপ্ত হবে ডোডো পাখী কি জান? এক রকমের পায়রা—খুব বড় বড় হয়, তবে ডানাবিহীন, এদের কথা সবাই শুনেছে কিন্তু আজ কালকার জীবিতদের মধ্যে কেউই এদের চর্ম্মচক্ষে দেখে নাই কারণ, ডোডো পক্ষীর শেষ বংশধরেরা প্রায় দুশো বছর আগে মরিশাস দ্বীপের কাছে আইল অফ রিইউনিয়ন নামে দ্বীপে উজাড় হয়ে মরে গেছে

শিকারীরা এদের উজাড় করে নি, কোন পক্ষী-শত্রুতে এদের উচ্ছেদসাধন করে নি দুর্ভিক্ষের দরুণ তারা না খেতে পেয়েও মরে নি। ডোডোর বংশ নির্ম্মূল হয়ে যাবার কারণ জাতি হিসেবে তাদের জীবনশেষ হয়ে গেছল। উটপাখীও ঠিক এই কারণেই কোন ভবিষ্যৎ শতাব্দীতে ধ্বংস পাবে

মনে করো না যে মানুষ ওদের বাঁচাবার কোন চেষ্টা করে না বলেই ধ্বংস পাবে দক্ষিণ আফ্রিকার এটিফনটিন কৃষিবিদ্যালয়ে উটপাখীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য্যের অধ্যক্ষ ও বৈজ্ঞানিক, প্রোফেসার ডুয়েরডেন স্বয়ং এদের ধ্বংসের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন আর তিনি এই দক্ষিণ আফ্রিকার উটপাখীর লালনপালন ও চাষে যথাশক্তি যত্নপর কিন্তু মানুষের কোন যত্ন ও চেষ্টা প্রকৃতির নিয়মকে উল্টাইয়া দিতে পারে না দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় প্রকৃতিদেবীর বিধানই যেন এই যে, যে ঘটিক যন্ত্র উটপাখী জাতটাকে চালিয়ে রেখেছে, কালক্রমে তার দম ফুরিয়ে আসবেই—আসবে।

তোমরা হয়ত ভাবছ কিসে একথা জানলুম? তার উত্তর এই যে, বহুদিন হতে উট-পাখীরা দেখিয়ে আসছে যে জাতি হিসেবে তারা বৃদ্ধত্বে পঁহুচচ্ছে ও আগেকার তুলনায় তাদের জীবন সংগ্রামে যুঝ্‌বার শক্তি কমে আসছে।

উটপাখী, উড়িতে অক্ষম কিন্তু ছুটিতে সক্ষম পাখীর দলভুক্ত—যেমন পেঙ্গুইন ও ও অধুনালুপ্ত ডোডো পাখী। এই ধাবনশীল পাখীর জাতকে জাতই ক্রমাবনতির পথে নামিতেছে।

এই জাতীয় পাখীরা যে উড়তে পারে না সেটা তারই একটা চিহ্ন। পুরুষানুক্রমে আগে, ডানার যে অংশটী পালকগুলোকে একত্র বেঁধে রাখায় ওরা উড়তে পারত, সেই অংশটী ওরা হারায় তার পর তারা পালকের অন্যান্য অংশ সকল হারাতে থাকে; তার পর ডানাগুলো হ্রাস পেতে থাকে; ইহার পর তাদের পায়ের আঙুলগুলো এক এক করে খসতে সুরু করে।

এই জাতের সকল পাখীর মধ্যে উটপাখীকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অতীতে ওরা এই সকল ক্ষতি সহ্য করেছে ও ভবিষ্যতে আরও করবে। এরা উড়তে পারে না, এখনও ডানা বলতে যেটুকু আছে তা ঘোরবার ফেরবার সময় ছাড়া এদের কোনও কাজে আসে না; এদের পালকও কমে আসছে, এবং এদের পালকগুচ্ছের খুব দাম হলে কি হয়, এদের দেহে যত অল্প পরিমাণ পালক আছে এমন আর কোন জীবিত পাখীর দেহেই নাই এদের মাথায় আবার একটা টাক পড়ে আসছে জাতিটাকেই জরা আক্রমণ করেছে।

এক সময়ে উটপাখীর পায়ে পাঁচটী আঙ্গুল ছিল; তার প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চমটী কালক্রমে অন্তর্হিত হয়েছে; চতুর্থটীও যেতে বসেছে, কাজেই কালে এদের পায়ে মাত্র একটি করে আঙুল থেকে যাবে—যেটী আগে তৃতীয় স্থান অধিকার করত

এই রকম ভাবে হ্রাস পাওয়াটা চিরকাল ধরে চলতে পারে না। উটপাখী তার শরীর বিন্যাস (গঠন) হারাতে বসেছে এমন দিন আসবেই যেদিন উটপাখী তার শরীরের এতখানি হারিয়ে বসবে যে আর প্রাণধারণ করে থাকবার শক্তিই থাকবে না জাতিটা তখনই নিঃশেষ হ'য়ে ধ্বংস পাবে

এই ক্রমিক ক্ষয়ের গতি পরিবর্তন বা রোধ করবার কোনই উপায় নেই—কারণ ইহা আকস্মিক নহে উটপাখীর জীবনীশক্তি, জীবনের দম যে ফুরিয়ে আসছে এটা তারই লক্ষণ—এর কোন প্রতীকার থাকতে পারে না

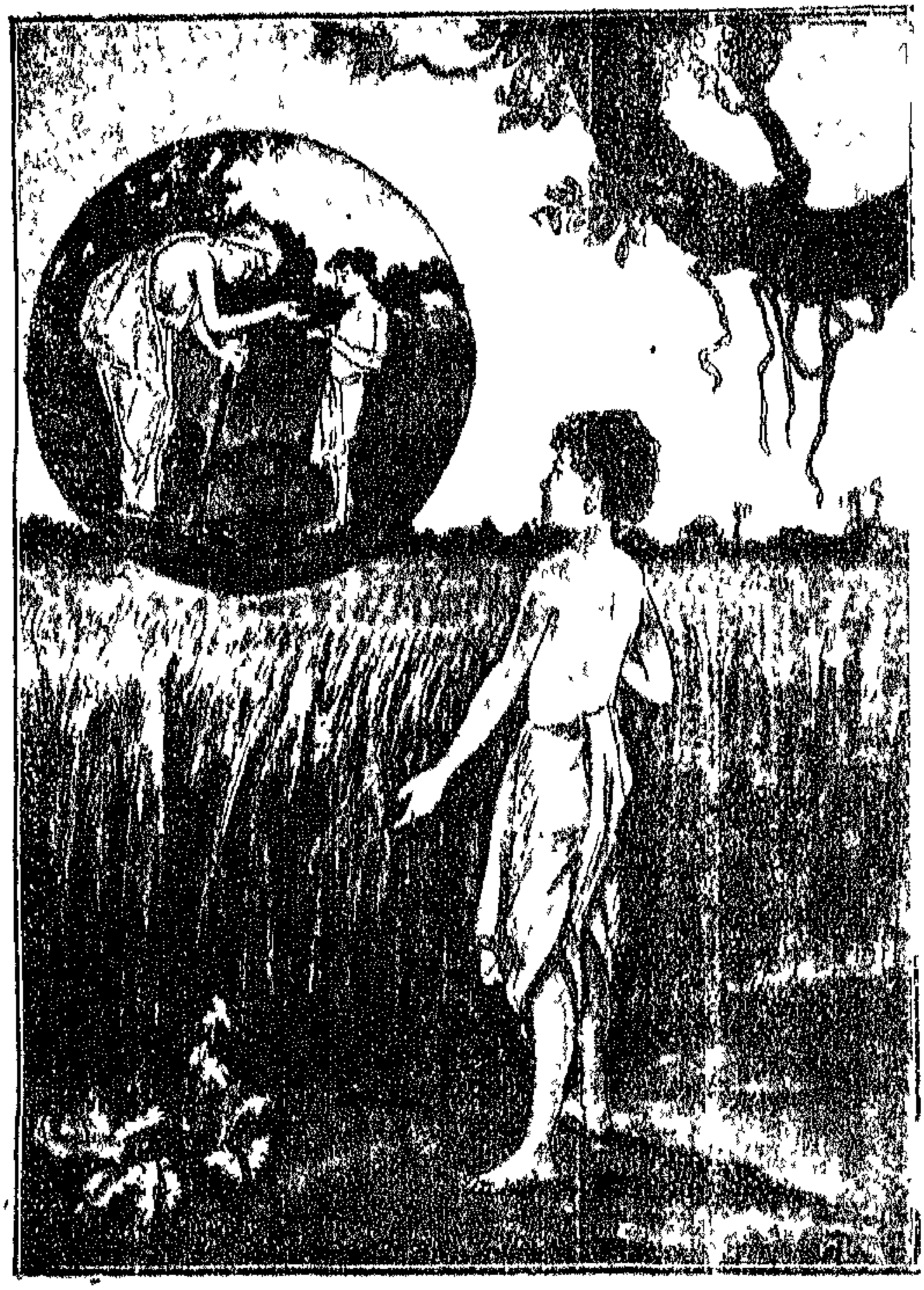
শ্রীধানি লঙ্কা।

ব্রতকথা

অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মীপূজা

ক্ষেত্রব্রত।

কোদালের কথা।



এক দেশে এক চাষা ছিল—সে ভারী গরীব। সারা দিন পরের ক্ষেতে লাঙ্গল চষে অতি কষ্টে তার দিন কাটতো। চাষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ বড় আপনার লোক ছিল না—কেবল ছিল একটা ছেলে। ছেলেটা ছিল চাষার প্রাণ। সারাদিন পরের ক্ষেতে লাঙ্গল চষে চাষা যাহা পেত তাই দিয়ে নিজে না খেয়েও ছেলেটার জন্যে রোজই মুড়ি মোওয়া যা পেত কিনে নিয়ে আস্‌তো, কিন্তু ছেলেটীর এমন পোড়া অদৃষ্ট যে চাষা একদিন হঠাৎ মারা গেল। কাজেই ছেলেটীর আর

দুঃখের সীমা পরিসীমা রইল না একদিন খেতে পায় একদিন খেতে পায় না—এই ভাবেই দিন কাটতে লাগল গাঁয়ের লোক ছেলেটার দুর্দ্দশা দেখে তাকে ডেকে বল্লে,—"ওরে তোর মামা মামী বড় লোক, তাদের অনেক জমিজমা আছে, তুই তাদের কাছে যা, তা হলে তোর দু'বেলা দুমুটো নিশ্চয়ই জুটবে "

এই গাঁয়ের লোকেরা তাকে একখানা কোদাল দিয়ে মামা মামীর কাছে পাঠিয়ে দিলে। ছেলেটী কোদাল ঘাড়ে করে মামার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো মামা তাকে দেখেই বলে,—"তুই আবার আমার বাড়ীতে এলি কেন আমি তোকে খেতে টেতে দিতে পারব না বাপকে খেয়ে আবার আমাকে খেতে এসেছ—বের, বের এখানে তোর জায়গা হবে না

ছেলেটী দুদিন কিছু খায়নি; মামার কথায় তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়লো, সে কাঁদতে কাঁদতে মামাকে বল্লে,—"মামা তোমার ঢের জমিজমা আছে—অনেক অনেক জন মজুরও খাটছে—আমি তোমার এমনি খেতে চাইনি—আমাকে তোমার ক্ষেতের কাজ কর্ত্তে দাও, আমি তোমার ক্ষেতের কাজ করবো, শুধু আমায় দুবেলা দুমুটো খেতে দিও "

মামা তাতেও রাজি হলেন না, কিন্তু মামী কাছেই বসে ছিল,—ছোট ছেলের কান্না দেখে তার একটু মন ভিজলো। সে তাড়াতাড়ি বল্লে,—না না বাছা তুই থাক্ তোর মামা না তোকে খেতে দেয় আমি তোকে দুবেলা দুমুটো যেমন করে পারি খাওয়াব। আপন জনকে কি আর ফেলতে পারি "

মামীর কথায় মামাকেও রাজি হতে হলো ছেলেটী সেই থেকে মামা মামীর বাড়ীতেই রইল কোদাল ঘাড়ে করে এনেছিল বলে মামী তার নাম দিলে কোদালে। কোদালে সেই দিন থেকে মামার ক্ষেতে দিন রাত কোদাল পাড়ে, কিন্তু তবুও সে পেট ভরে খেতে পায় না দিন রাত তার খিচ্‌খিচ্ শুনতে হয় এক মিনিট কোদাল ঘাড় থেকে নামাবার জোটী নেই কোদাল নামিয়েছে কি সর্ব্বনাশ মামা অমনি হৈ হৈ করে তেড়ে আসে। তার ওপর মামীর হুঙ্কার তো আছেই কাজেই কোদালের কোদাল ফেলবার উপায় ছিল না কোদালে দিন রাত ক্ষেতে কোদাল পাড়তো—কিন্তু সে ছেলেবেলা থেকেই ক্ষেত্রদেবীর বড় ভক্ত ছিল,—সে তার বাপের মুখে শুনেছিল যে ক্ষেত্রদেবীর পূজো কল্লে মানুষের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়। সেই থেকে সে সকালে উঠে আগেই ক্ষেত্রদেবীকে নমস্কার করত আর মনে মনে বল্‌তো "মা আমার দুঃখ ঘুচিয়ে দাও।"

এই ভাবে কোদালের দিন কাটে; একদিন সে দেখে রান্নাঘরে উনুনে দুধের কড়া বসান রয়েছে, তাতে এতখানি মোট সর পড়েছে তাই দেখে কোদালের একটু সর খেতে বড় লোভ হলো। সে ছেলেমানুষ, জ্ঞান বুদ্ধি তখন তো তার তেমন হয়নি সে মামীর কাছে গিয়ে বল্লে,- মামী আমায় আজ একটু সর খেতে দেবে?"

মামী তাই শুনে তো একেবারে চটে আগুন চীৎকার করে বল্লে, -ছেলের বিদ্ধি তো কম নয়, না খেয়ে মচ্ছিলি, দুবেলা দুমুটো দিচ্ছি তাই বুঝি লোভ লেগেছে। সর দেব, না, তোমায় ছাই দেব। সারা দিন বসে বসে কেবল কাড়ি কাড়ি গিলছেন ক্ষেতের কাজ করবার নামটী নেই। কলির ধর্ম্মই যে এই"

মামীর কথায় কোদালের বড় দুঃখ হলো,—সে মামীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে কাঁদতে কাদতে চলে গেল তারপর দিন সকাল বেলা উঠে সে ক্ষেত্রদেবীকে নমস্কার করে কোদাল ঘাড়ে করে ক্ষেতে গিয়ে উপস্থিত হলে ক্ষেতে গিয়ে দেখে এক বুড়ি ক্ষেতের মাঝখানে বসে আছে কোদালে বুড়ির কাছে যেতেই বুড়ি বল্লে,—বাছা তোমার জন্যেই আমি এখানে বসে আছি। তুমি আর পরের বাড়ী থেক না। ওই যে দেখছ বিলের ধারে ধু ধু কচ্ছে মাঠ—এই ধানের বীচ্ গুলো ঐ মাঠে ছড়িয়ে দাও গে তা হলে তোমার সব দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে।"

কোদালে বুড়িকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই বুড়ি একেবারে শূন্যে মিলিয়ে গেল। কোদালে তাকে আর কোথায়ও দেখ্‌তে পেল না। তখন সে বুঝ্‌ল এ বুড়ি আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই ক্ষেত্রদেবী কোদালে সেই ধান গুলো নিয়ে সেই বিলের ধারে গিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে সেই মাঠের এক পাশে পড়ে রইল। সকালে উঠে সে দেখে এক দিনেই ধানের সব গাছ বড় বড় হয়ে উঠেছে তাতে সোনার শিষে রাশি রাশি কেবল সোনার ধান ঝুল্‌ছে। এ সব রাষ্ট্র হতে বেশী সময় লাগলো না—গাঁয়ের জমিদারেরও কানে গেল। তিনি স্বয়ং সোনার শিষে সোনার ধান দেখ্‌তে এলেন। রাজা এসে কোদালের মুখে সব শুনে তিনি সেই জমী কোদালেকে চিরকালের জন্যে দান করে গেলেন এবং তার সেই সোনার ধান যাতে উপযুক্ত দামে বিক্রি হয় তার ব্যবস্থা করে দিলেন। ক্ষেত্রদেবীর কৃপায় কোদালের দুঃখ কষ্ট ঘুচে গেল—তার বাড়ী হলো, বাগিচা হলো, সে একেবারে মস্ত বড় লোক হয়ে গেল। কোদালে না খেতে পেলে মানুষের যে কি কষ্ট তা সে প্রাণে প্রাণে বুঝেছিল, তাই সে বড়লোক হয়েই এক অন্নছত্র খুলে দিল—সেখানে যে আসবে সেই খেতে পাবে। এখন, এদিকে কোদালে বনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রদেবীর

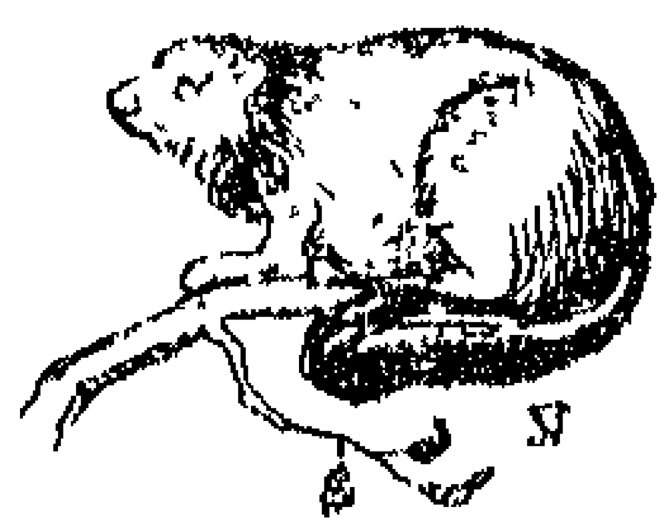
কুদৃষ্টিতে কোদালের মামা মামীর দুঃখের আর অবধি রইল না—জমি গেল, জমা গেল, লাঙ্গল গেল, বলদ গেল। এমন অবস্থা হলো যে দুবেলা দুমুটো খেতে জোঠে না পেটের জ্বালায় ঘুরে ঘুরে তারা একদিন কোদালের অন্নছত্রে এসে উপস্থিত হলো। কোদালে তাদের দেখেই চিন্‌তে পাল্লে। সে তাদের যত্ন করে বাড়ী নিয়ে গেল তখনই নানা রকম সামগ্রী এনে তাদের খাওয়ার আয়োজন করে দিলে। সেই থেকে মামা মামী কোদালের বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। মামা হলেন বাড়ীর কর্ত্তা আর মামী হলেন বাড়ীর গিন্নি তাঁদের আর কোন দুঃখ কষ্ট রইল না নিজে বসে লোকজনকে রোজ খাওয়াতে আরম্ভ কল্লেন সে যজ্ঞের ধূম দেখে কে। একদিন খাওয়ার পর কোদালের মামী একবাটী দুধের সর এনে বাল্লেন,—"আজ তোমার ভাল খাওয়া হয় নি, এই দুধের সরটুকু খাও" মামীর কথায় কোদালে হাসতে হাস্‌তে বল্লে,—

সে দিন মামী ভুল্‌লে কিসে কল্লে যেদিন পর
আজকে কেন সাধছ নিয়ে বাটী ভরা সর

মামী লজ্জায় মরে গেল; তার চোখ ছল্ ছল্ করে উঠ্‌লো—দু ফোটা জলও গড়িয়ে পড়্‌লো। মামী চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সেখান থেকে উঠে গেলেন। ক্ষেত্রদেবীর কৃপায় কোদালের আর কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের শনিবার দিন ক্ষেত্রদেবী তার দুঃখ দেখে দেখা দিয়েছিলেন সেই জন্য কোদালে প্রতি বৎসর ঐ দিনে মহা ধুমধামে ক্ষেত্রদেবীর অর্চ্চনা কর্ত্তো—তাতে কত কাঙ্গাল গরীব যে খেত তার সংখ্যা করা যায় না। সেই থেকে অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্রব্রত প্রচার হ'লো

অগ্রাণেতে ক্ষেত্রব্রত যেইজন করে।
ক্ষেত ভরা শস্য হয় কমলার বরে॥

লোভের সাজা



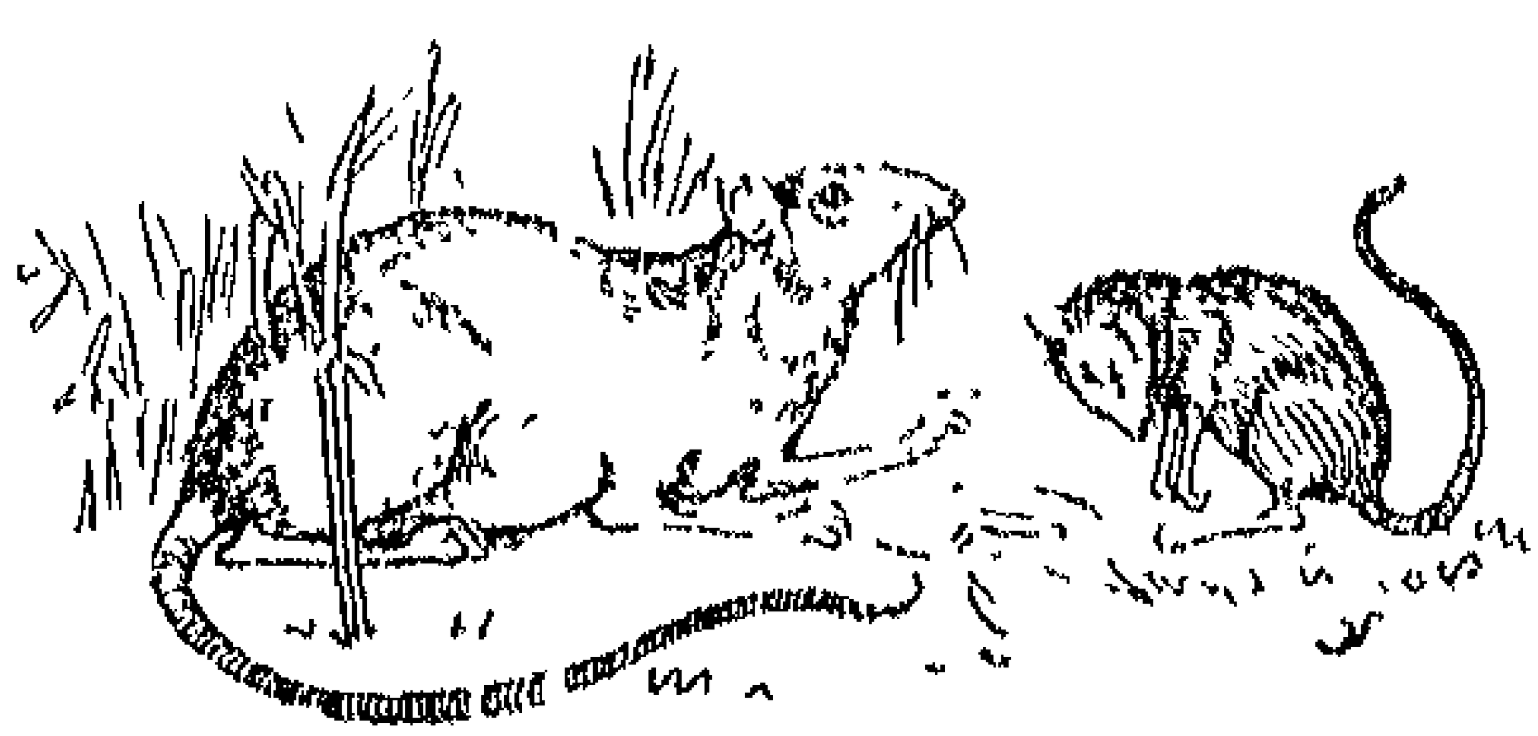
এক দেশে এক ইন্দুর ছিল,
আর ছিল তার ছানা ;
এদিক ওদিক পালিয়ে যেত,
শুন্‌তো না মার মানা।

[২]

মা বল্‌তে বাছা আমার,
যাস্‌নে এমন করে ;
চার দিকেতে শত্রু ফেরে,
ফেল্‌বে করে ধরে

[৩]

মায়ের কথা ইন্দুর ছানার,
লাগ্‌তো নাকো ভালো ,
ল্যাজটা কেবল নাড়তো শুধু,
মুখটা করে কালো।



[৪]

এক দিন সেই ইন্দুর ছানা,
বল্লে মাকে তার ;
"দেখে এলেম আজকে মাগো,
গিয়ে নদীর পার।

[৫]

"মোদের তরে কেমন খাসা,
বানিয়েছে এক ঘর ;
তার ভেতরে আছে মাগো,
বাটী ভরা সব

[৬]

"চার দিকে তার রেলিং ঘের,
একশো বেড়াল এলে ;
ঢুক্‌তে তারা পার্ব্বে নাকো,
হাজার বছর ঠেলে।

[৭]

"জল বিষ্টির ভয় নেইকো,
মাথায় কাটের চালা ;
আরাম করে ঘুমুব শুধু,
বিছানা আছে ঢালা।"

[৮]

ছানার কথা শুনে ধাড়ী,
বল্লে কঠিন স্বরে,—
"ভুল্ বুঝেছ বাছা আমার,
যেও না সে ঘরে।



[৯]

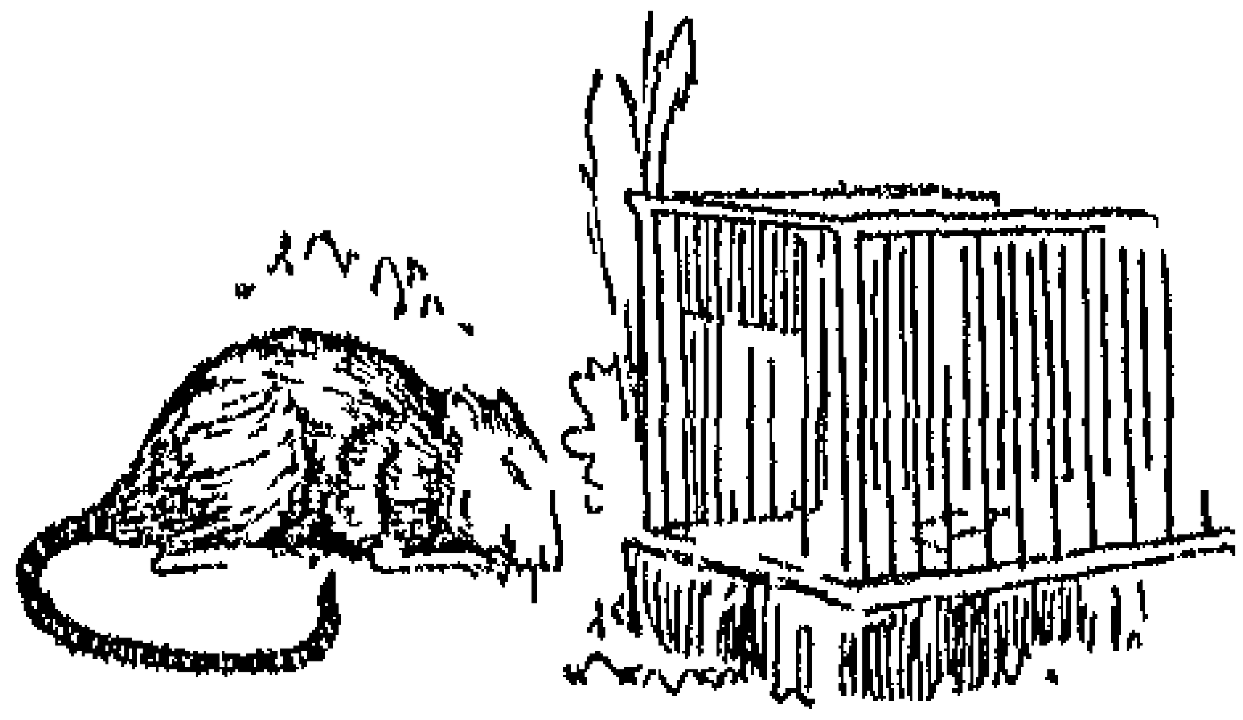
"মানুষ বড় কঠিন প্রাণী,
জানে অনেক ছল ;
ওইটী হালে জেন বাছা—
ইন্দুর মারা কল্

[১০]

"লোভ দেখিয়ে ওই ঘরেতে,
আন্‌তে পারে কারে ;
অমনি মানুষ মজা করে,
জ্যান্ত তাকে মারে ;"

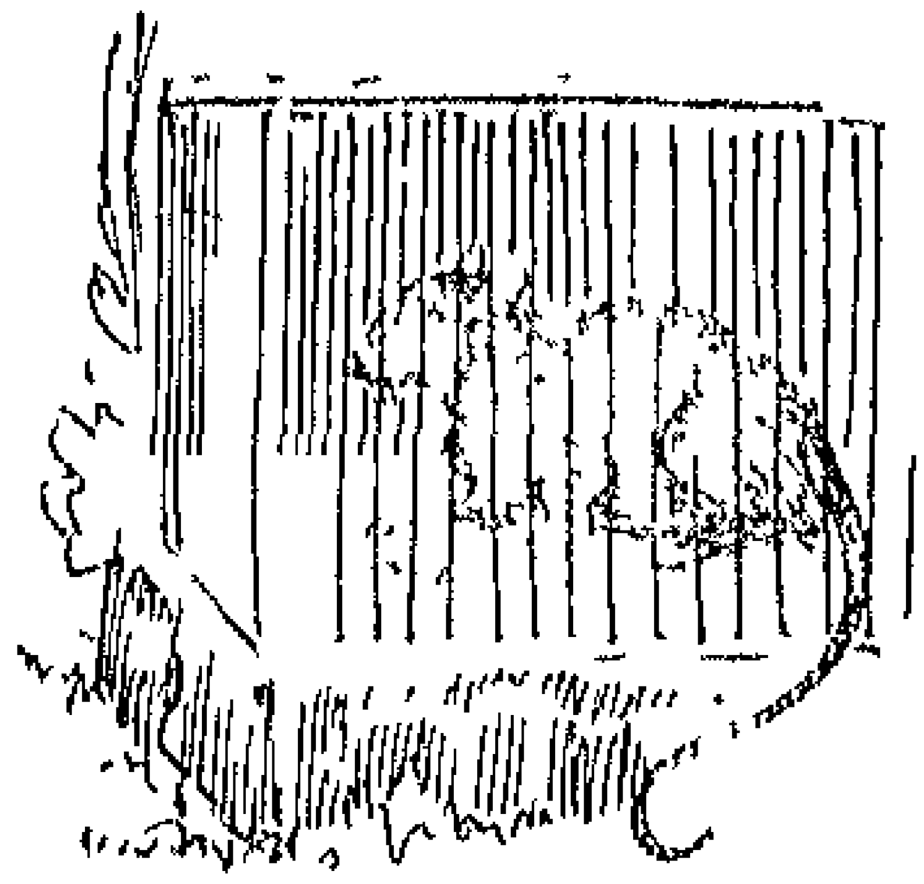
[১১]

মায়ের কথা শুন্‌লে না'ক,
দু'চার দিন পরে ;
সরের জন্যে বাচ্ছা ইন্দুর,
ঢুক্‌লো সেই ঘরে



[১২]

যেমন ঢোকা আর কোথা যায়
বন্ধ হ'লো কল ;
মায়ের কথা না শুনে সে
পেলে উচিত ফল ।

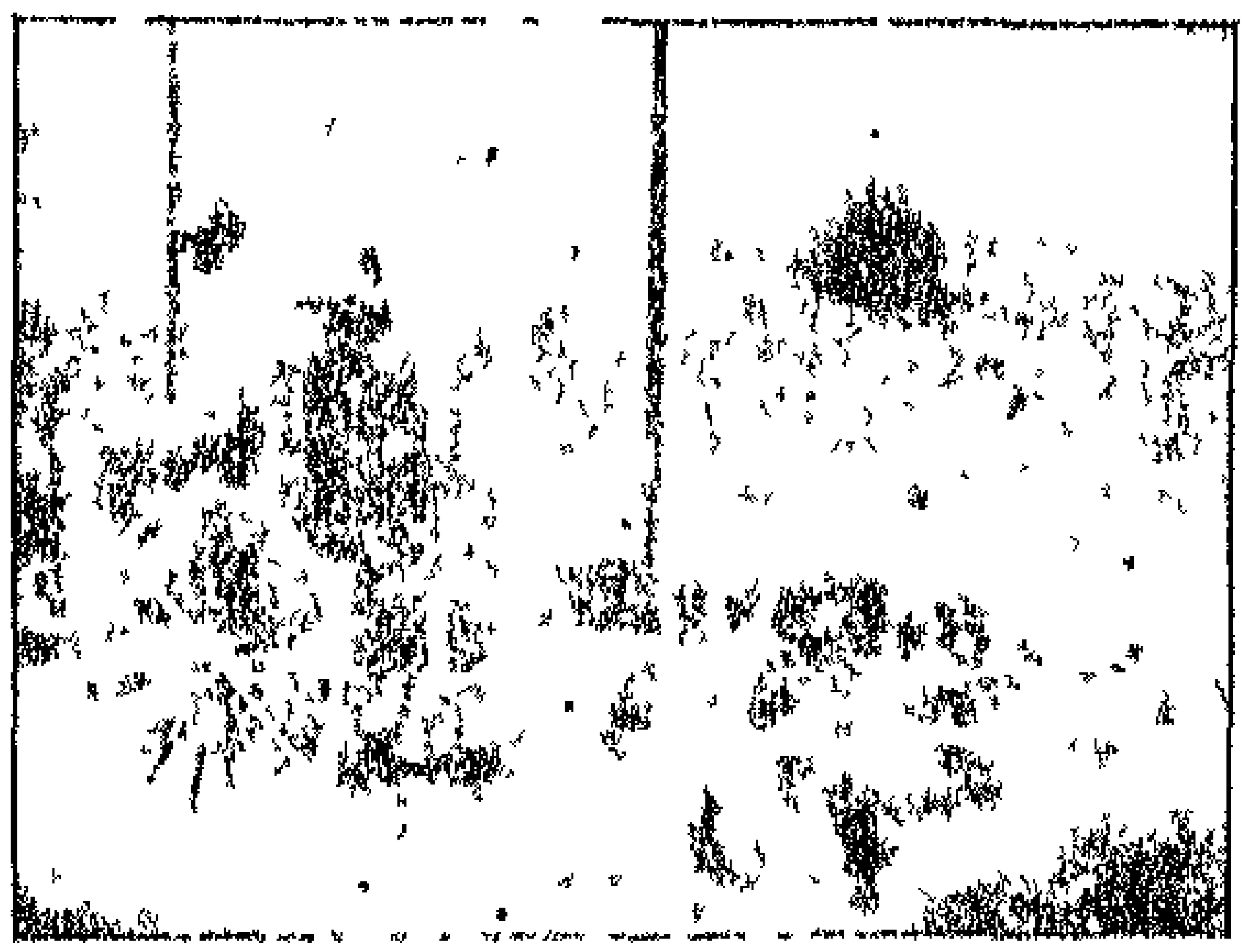


[১৩]

মায়ের কথা যে না শোনে,
লোভটা বেশী যার ;
ইন্দুর ছানার মতন হবে
এমনি দশা তার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল

কুকুর-মোটর



এক খোঁড়া ভদ্রলোকের একখানা গাড়ী আছে, ভারি মজার সাধারণতঃ গাড়ীতে ঘোড়া ছাগল, গরু ভেড়া যাই কেন জোড়া হোক না, সামনে দিকেই হ'য়ে থাকে, এ গাড়ীঠিক তার উল্টো সামনে ভদ্রলোক নিজে বসেন, একখানা চাকা (মোটরের ষ্টিয়ারিং হুইলের অনুরূপ) ধরে ; কুকুর দুটো বাঁধা থাকে পিছনে তারা মুখ দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলে এই গাড়ীতে চ'ড়ে খোঁড়া লোকটি প্রায় ইয়োরোপখণ্ড ভ্রমণ করেছেন। গাড়ীট তাঁর নিজের মনোমত তৈরী আর তিনি ভারী কুকুর ভক্ত কুকুর না হ'লে তাঁর ভ্রমণে আনন্দ হয় না

রাজা হরিশ্চন্দ্র

সূর্য্য বংশে রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। দাতার নাম করিতে হইলে লোকে হরিশ্চন্দ্রের নাম সর্ব্বপ্রথমেই করিয়া থাকে রাজা ত্রিশঙ্কুর পর হরিশ্চন্দ্র সিংহাসনে আরোহন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন তাঁহার রাজত্বে প্রজার সুখ-শান্তি দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ একদিন স্বর্গে দেবগণের সাক্ষাতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন—তিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন সুখের রাজ্য আর কোথাও নাই হরিশ্চন্দ্র লোকের দুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত তাঁহার মত দাতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নাই।

ঋষি বিশ্বামিত্রও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল না, সে কথা তোমাদের আর একদিন বলিব বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মুখে হরিশ্চন্দ্রের অশেষ সুখ্যাতি শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যমধ্যে আসিয়া দেখিলেন, মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন তাহা সমস্তই সত্য—একবর্ণও মিথ্যা নহে। প্রজারা অত্যন্ত সুখী, রাজা অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ন্যায়বান এমন রাজার রাজ্যে প্রজার সুখে থাকিবে না ত থাকিবে কোথায় ?

কিন্তু বিশ্বামিত্রের ইহাতেও মন উঠিল না তিনি শুনিয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্র মস্ত দাতা ; অতিথিকে বিমুখ করেন না বিশ্বামিত্র পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তখন সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছিলেন, পাত্র মিত্র, অমাত্য সচীব তাঁহার চারিদিকে বসিয়া। মহাতপা বিশ্বামিত্রের আগমনে সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বিশ্বামিত্র বলিলেন—মহারাজ, শুনিয়াছি তুমি দানবীর। তোমার কাছে আমার কিছু প্রার্থনা আছে।

হরিশ্চন্দ্র সবিনয়ে কহিলেন—আজ্ঞা করুন

আমার ইচ্ছা যে রাজত্ব করি ; কিন্তু পৃথিবীতে এমন একজন নৃপতিও দেখিলাম না যিনি রাজ্যভার সমস্তই নিঃশেষ করিয়া দান করিতে পারেন শুনিয়াছি, তোমার দানের তুলনা হয় না—তুমি পারিবে কি ?

হরিশ্চন্দ্র হাস্যমুখে কহিলেন—ঋষিবর, আপনাকে দান করিতে পারিলে যে আমার জন্ম সার্থক হইবে।

বিশ্বামিত্র বলিলেন—রাজ্য ত দান করিবে। তার পর তুমি থাকিবে কোথায় ? রাজ্যেই

ত থাকিবে, তখন তোমার প্রজাবৃন্দ তোমার সঙ্গেই মিলিবে আমাকে কি আর কেহ মানিবে ?

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—ঋষি, আমি রাজ্যমধ্যে যাইব না আমার সসাগরা ধরণীর বাহিরে গোপনে বাস করিব, কেহই আমাকে জানিবে না।

তখন স্থির হইল, পুণ্য কাশীতীর্থে গিয়া হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব দান করিবেন। কাশীধাম পৃথিবীর বাহিরে—লোকে জানিত মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে এই কাশীতীর্থ স্থাপিত আছে। সেই কাশীতে আসিয়া হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিলেন

বিশ্বামিত্র কহিলেন—উত্তম করিলে মহারাজ। কিন্তু দক্ষিণা কৈ ? দক্ষিণা ব্যতিরেকে যে দানসিদ্ধ হয় না রাজা

কিন্তু রাজার যে তখন আর কিছুই নাই। তিনি যে এক নিঃশ্বাসে সমস্ত দান করিয়াছেন। অথচ দক্ষিণা দিতে না পারিলে দানই অসিদ্ধ হইয়া যায়। রাজা বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন আর যে কিছু নাই, একটি কপর্দ্দকও না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন মহারাজ এখনো তোমার রাণী রহিয়াছে, পুত্র রহিয়াছে—তাহাদের বিক্রয় করিয়া দানের কড়ি সংগ্রহ করিতে পার।

হরিশ্চন্দ্র তাহাই করিলেন। এক ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে ক্রয় করিলেন, কিন্তু রাজদানের অনুরূপ দক্ষিণার কড়ি তাহাতেও হরিশ্চন্দ্র পাইলেন না। তখন তিনি নিজেকেও বিক্রয় করিলেন তাঁহাকে কিনিল এক চণ্ডাল, বিশ্বামিত্র দক্ষিণা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে চণ্ডালের কাজ করেন। একদিন যিনি সসাগরা ধরণীর অধিপতি ছিলেন, আজ তিনি শ্মশানের চণ্ডাল যে হাত রাজদণ্ড ধারণ করিত সেই হাত শবের কাষ্ঠ বহন করে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাহাতে আদৌ দুঃখিত নহেন। তবে কখনও কখনও একটু আধটু কষ্ট হয়—রোহিতাশ্বের কথা মনে পড়িলে শৈব্যার কথা মনে পড়িলে

এদিকে শৈব্যার দিন অতি কষ্টে কাটে। রাজরাণী দাসীর মত গৃহকর্ম্ম করেন, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু গৃহকর্ত্তা ব্রাহ্মণ, বালক রোহিতাশ্বের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতেন,—তাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত।

রোহিতাশ্বকেও গৃহের অনেক কার্য্য করিতে হইত একদিন বনে রোহিতাশ্ব একটা কাজে গিয়াছিল, হঠাৎ সর্পাঘাতে রোহিতাশ্বের জীবন-বায়ু বাহির হইয়া গেল। শৈব্যার অন্ধের যষ্টি, অভাগিনীর একমাত্র শেষ সম্বলটিও গেল।



শ্মশানে চণ্ডাল বলিল, শ্মশানের কড়ি দাও, নহিলে দাহ করিব না

শৈব্যা মৃত পুত্রকে বক্ষে লইয়া শ্মশানে চলিলেন   শ্মশানে চণ্ডাল বলিল, শ্মশানে কড়ি দাও, নহিলে দাহ করিব না।

হায় রে! এমন সোনার শিশুই শ্মশানে দিতে আসিয়াছি, আবার কি কড়ি দি আর কোথায় বা পাইব!

চণ্ডাল সে কথা শুনিল না। বিনি-কড়িতে দাহ করিতে দিবে এমন দাতা সে নয়।

শৈব্যা কাঁদিতেছিলেন, চণ্ডালের নির্দয় ব্যবহারে তাঁহার কান্না থামিয়া গেল। তিনি বলিলেন—কি বলিতেছ তুমি, চণ্ডাল? এই সামান্য দয়াটুকু তুমি করিতে পার না? আর এই অভাগিনীর যে পুত্রকে তুমি দাহ করিবে তাহার পিতা পৃথিবী দান করিয়াছেন জান কি?

চণ্ডাল বলিল—কে-ও শিশু! রোহিতাশ্ব? আর তুমি—তুমি কি শৈব্যা?

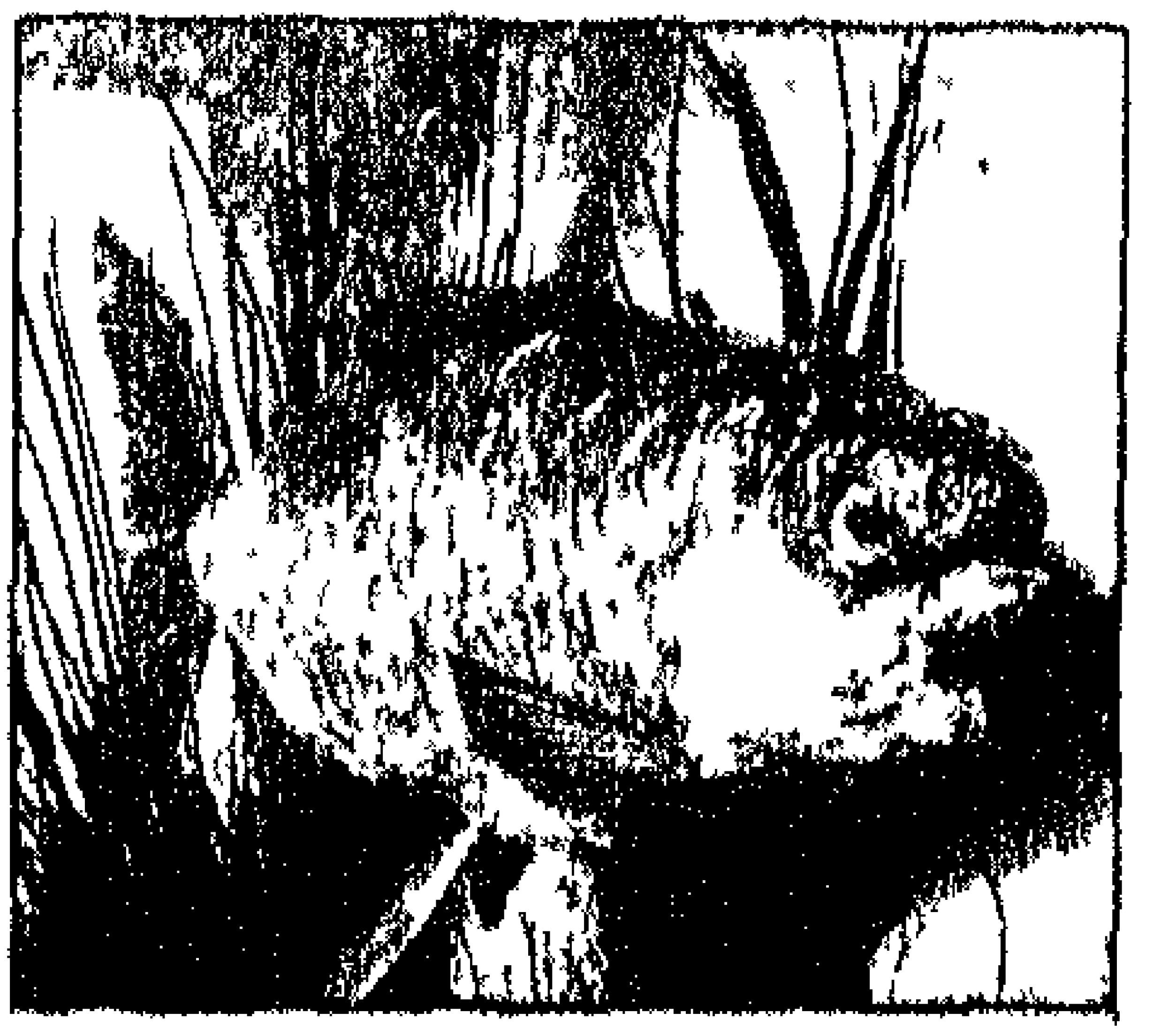
* * * * *

বিশ্বামিত্র ফিরিয়া আসিলেন—পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। তিনি তপস্যাবলে রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের হাতে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে বনগমন করিলেন।

বি।

দু-মুখো মাছ

এক সাহেব ছিপে একটা মাছ তুলে দেখ্‌লেন, তার দুটো মুখ। দুটো মুখই বেশ আলাদা আলাদা। তোমরাও ছবিটায় মাছটার দুটো মুখ দেখতে পাবে। মাছটা ওজনে বেশী নয়, আট সের। সে যদি না ধরা না পড়ত কালে হয়ত মস্ত মাছ হত—দুটো মুখ দিয়ে খুব খেতেও পারত।



আর একবার একটা মাছ পাওয়া গেল, তার তিনটি চোখ। আমাদের দেশের অনেক দেব-দেবীর তিনটি চোখ দেখেছি, আর কারো দেখিনি। তোমরা দেখে থাক যদি আমাদের বলো।

সরল বাঙ্গালা-সাহিত্য

সূর্য্যের গান।

সূর্য্যের গান এক সময়ে বঙ্গদেশে খুব আদর পাইয়াছিল। সূর্য্যকে এক সময়ে বাঙ্গালী কবিরা শিশুর মতন ও যুবকের মতন করিয়া কল্পনায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার লীলার গান বাঁধিতেন সূর্য্য ঠাকুর কাঁসারীদের ঘরের চালের কোণ দিয়া, মালীদের বাগানের লাল ফুলগুলিকে আরও লাল করিয়া, বামুনদের ঘরের খোলা দরজায় উঁকি মারিয়া, কলুর বাড়ীর ঘানিটার উপর চিক্ চিকে আলোর শর ছুড়িয়া—পূর্ব্ব আকাশে উদয় হইতেছেন; বামুন মেয়েটী তাঁকে পৈতা উপহার দিতেছে, মালীর মেয়েরা ফুলের জোগান দিতেছে, কাঁসারীর মেয়েরা পুষ্পপাত্র দিতেছে শিশু সূর্য্য ঠাকুর হেসে হেসে সেই দান লইতেছেন; একজন জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সূর্য্য ঠাকুর উঠেছেন, বল তো ভাই ওর বর্ণ টা কেমন?" সে বলিল "আগুণ বর্ণ।" আর একজন বলিল, "রক্তবর্ণ।" তাহাও হইল না, আর একজন বলিল, "পান খেয়ে যে ঠোঁট লাল হয়, এ সেই বর্ণ," সকলের কথাই ঠিক। যখন সূর্য্যদেব প্রথম উঠেন, তখন চোখ দুটি যেন জবার মত রাঙ্গাইয়া চাহিতে থাকেন। যে জন পানের লাল, রক্তের লাল আর জবার লাল দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন, তিনি সবটুকু বুঝাইতে পারিলেন না কারণ তাঁর রঙ্গের মধ্যে একটু তাপ আছে, এই জন্য "আগুণ বর্ণ" বলিয়া একজন সেই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

তার পরে সূর্য্যের অভিষেক,—গচন্দনের বাটী লইয়া মা আসিয়াছেন, কাঁসর করতাল ও শাঁখ বাজাইয়া পাড়াপড়সীরা সূর্য্যের ঘুম ভাঙ্গাইতেছেন। এ সকল কবিতার, যে ঠাকুর শত শত যোজন দূরে, তাঁকে যেন ভক্ত কবি একেবারে ঘরের আঙ্গিনার কোণে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন এইজন্য কবিতাগুলি ভারি মিষ্ট।

তার পর সূর্য্য ঠাকুর যুবক হইয়া দাঁড়াইলেন। বামুণের মেয়েরা তাঁদের সাড়ী শুকাইতে দিতেন, কোন মেয়ে তাঁহার লম্বা কালো চুলগুলি সূর্য্যের সাম্‌নে রাখিয়া বসিয়া যাইতেন, কোন মেয়ে পায়ের মল বাজাইয়া রাস্তায় যাইতেন, এ সকল দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুরের বিয়ে করিবার ভারি সাধ হইল।

ছোট্ট কণে-বউ গৌরীকে বিয়ে করিয়া সূর্য্য ঠাকুর নৌকা-যোগে বাড়ী চলিলেন। মেয়ে কাঁদিয়া বাপ-মায়ের কাছে আবদার করিতে লাগিল, "আমায় পরের বাড়ীতে যেতে দিও না।" মা কাঁদিতে লাগিলেন বাবা গামছা দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমি সভার মধ্যে টাকা লইয়া পরকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, এখন কি করিয়া তোমায় রাখিব?"

গৌরীকে হারাইয়া ভাইটি খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল,—এই না দুই দিন

আগেও সেই ভাই কত ঝগড়া করিয়া গৌরীকে গাল মন্দ দিয়াছে। ছোট বোনটি খেলার পুতুল ফেলিয়া দিদির জন্য কাঁদিতে লাগিল—এই না সেদিনও পুতুল লইয়া সেই দিদির সঙ্গে সে আড়ি করিয়া দিয়াছিল?

গৌরী "নাইওযেব ভাত" খাইতে বসিয়া কাঁদিতেছে—তার পর যখন সূর্য্যঠাকুর তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন গৌরী বিনয় করিয়া মাঝিকে বলিতেছে—"মাঝি ভাই, অত তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিও না,—মা কাঁদিতেছেন, তুমি ধীরে ধীরে নৌকা চালাও, ঐ কান্না যেন আর একটু শুনিতে পাই।"

তার পর একা কন্যা স্বামীকে বলিতেছেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি, আমার ক্ষুধা হইলে কোথায় ভাত পাইব?" উত্তরে সূর্য্যঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, "আমি শত শত চাষী নিযুক্ত করিয়া আসিযাছি। তাহারা তোমার জন্য সরু চালের ধান তৈরী করিতেছে"।



আমার যে মা আছে—মা বললে তারে।

"আমি তোমার সঙ্গে যাইব,—আমার পরিবার কাপড় কোথায় পাইব?"

"শত শত তাঁতি তোমার শাড়ী তৈরী করিতে নিযুক্ত করিয়াছি।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাইব,—কে আমায় শাঁখ পরাইবে?"

"আমি আমার রাজ্যময় শাঁখারীদের নিযুক্ত করিয়াছি, তারা তোমার জন্য শাঁখা গড়াইতেছে।"

কিন্তু এ সকল কথ ত কথা নয়—তার যে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, অবশেষে স্বামীর কোঁচায় মুখ লুকাইয়া চক্ষের জল সংবরণ করিয়া গৌরী সে কথাটি বলিয়া ফেলিল। তখন তাঁর কোমল ঠোঁট দুখানি

কাঁপিতেছিল ও চোখের জল স্বামীর কোঁচায় মিশিয়া ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল গৌরী বলিল—

"তোমার দেশে যাইমু সূর্য্য
আমি মা বলিমু কারে?"

তখন উভয়ে ডাঙ্গায় উঠিয়াছেন অতিস্নেহে অতি আদরে গৌরীর মুখখানি বুকে ঢাকিয়া সূর্য্যঠাকুর বলিতেছেন,—

"আমার যে মা আছে মা বলিবে তারে"

এই সূর্য্যের গানে দেবতারা মানুষের ঘরে আসিয়া লীলা খেলা করিতেছেন, তাঁহাদের আমরা আপনার জনের মতন পাইতেছি। বৈষ্ণব-কবিতা এই ভাবের সৌন্দর্য্য আরো শতগুণে বাড়াইয়া ছিল, তাহা পরে লিখিব।

শীতলা-মঙ্গল।

মনসাদেবীর পূজার শত্রু ছিলেন চাঁদসদাগর। মঙ্গলচণ্ডীকে ধনপতি সদাগর কিছুতেই দেবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই, শেষে কিন্তু চাঁদসদাগর মনসা দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন এবং ধনপতি মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত হইয়াছিলেন,— সেইরূপ চন্দ্রকেতু ছিলেন শীতলা দেবীর পূজার বিরোধী; কিন্তু শেষে চন্দ্রকেতুকে শীতলাদেবীর পূজা করিতে হইয়াছিল। আমরা অনেকগুলি পুরাতন শীতলামঙ্গলও পাইয়াছি।

এগুলি ছাড়া আরও অনেক রকমের জিনিষ পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে পাইয়াছি, তাহার কতকগুলির কথা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব

শিবঠাকুরের গান।

প্রায় দুইশত বছর পূর্ব্বে রামেশ্বর নামক কবির 'শিবায়ন' লেখা হইয়াছিল। শিবায়ন শব্দটি 'রামায়ণ' শব্দের মত। এই শিবায়ণে শিবঠাকুরের অনেক কীর্ত্তির কথা উল্লেখ আছে।

যদিও রামেশ্বর খুব বেশী পুরাণো কবি নহেন, তবুও তিনি যে অনেক দিনের পুরাণো একটা ছড়াকে নূতন করিয়া সাজাইয়া বই লিখিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই এক এক জায়গায় ভাষা যে খুব বহুদিনের, তাহা বুঝিতে পারা যায় না এই কাব্যের ভাবগুলি সেই সময়ের, যখন চাষারাই বাঙ্গাল গান বাঁধিত ও গাহিত শিবঠাকুর একবারেই ভদ্রঘরের লোকের মতন নহেন; তিনি দস্তুর মত চাষা ইন্দ্রের কাছে বাঘের ছাল ও শূল বাঁধা দিয়া এক জোড়া বলদ, কয়েকখানি জমি ও হাল প্রভৃতি লইয়া চাষের কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার চাকরের নাম ছিল ভীম। কাস্তে হাতে আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া, জমিটা নিড়াইয়া

শিবঠাকুর চৌকোণা ক্ষেত তৈরী করিয়া—আইল বাঁধিয়া ফেলিলেন। দলদুর্ব্বা, শ্যামা, ত্রিশিরা এবং কেশর প্রভৃতি কতরকম আগাছা সেই ক্ষেত হইতে উঠাইয়া ফেলিলেন।—সেই সকল বুনো লতা ও ঘাসের অনেকগুলির নাম চাষারা ছাড়া আর কেহ জানে না। ভূমি ভাল করিয়া চষিয়া ফেলিয়া তাহাতে মহীপাল, গোপাল-ভোগ, সোণার চড়া প্রভৃতি নানারকমের ধান বুনিতে লাগিলেন। বাঙ্গ'লা দেশে যে কত রকমের সরু, মোটা, সুগন্ধ, সুন্দর চাল জন্মাইত, তাহাদের কত রকমের নাম ছিল—তাহা এই সকল বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

শিবঠাকুর বুড়, ভীমকে দিয়া চাষ করাইতেন এবং রাত দিন ক্ষেতের পাহারা দিয়া বসিয়া থাকিতেন, "বাঘ নাই বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।" ঠিক বাঘের মত খেতের ধারে দুইটা জ্বল্ জ্বল্ চোখে চাহিয়া পশু পাখীর উৎপাত হইতে ধান রক্ষা করিতেন।

এদিকে বয়সে বুড় হইলেও তিনি লোকটি বড় সহজ ছিলেন না। ডোমের পাড়া, কুচনি পাড়া এই সকল ছোট লোকের পাড়ায় যাইয়া মেয়েদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস ইত্যাদি চালাইতেন।

এদিকে তাঁহার স্ত্রী দুর্গার বড়ই অশান্তি হইত। ক্ষেতের অছিলা করিয়া শিবঠাকুর কোথায় যান কোথায় থাকেন, তার ঠিকানা নই,—হয়ত রাতেও বাড়ী ফিরিতেছেন না। রাগিয়া দুর্গা ঠাকুরুণ জোঁক ও মশা পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা শিবঠাকুরের ক্ষেত ঘিরিয়া ধরিল। বুড় শিব, ভীম চাকরকে চুণের জল দিয়া জোঁক মারিতে শিখাইতে লাগিলেন এবং ক্ষেতে ঘুঁটে পোড়াইয়া ধোঁয়ার এমনই একটা কাণ্ড করিতে লাগিলেন—যে মশাগুলি আর তিষ্ঠিতে পারিল না। এদিকে দুর্গা একদিন ডুম্‌নী সাজিয়া খেয়া নৌকায় যাইয়া চড়িয়া বসিলেন,—দুর্গার মূর্ত্তিটি ছিল ভারি সুন্দর, ডুম্‌নীদের মত শাড়ী ও গলায় ফুলের মালা পরাতে শিবঠাকুর তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। বুড় লোকটি সহজ ছিলেন না, আগেই বলিয়াছি, তিনি দুর্গাকে ডুম্‌নী ভাবিয়া তার সঙ্গে রসিকতা করিতে গেলেন। তখন দুর্গা ক্ষেপিয়া গিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, লজ্জা ও ভয়ে শিবঠাকুরের মুখ শুকাইয় গেল। এই ভাবে রোজই 'শিব-দুর্গার কেন্দাল' চলিতে লাগিল। এক দিন দুর্গা শিবের নিকট একজোড়া শাঁখা চাহিয়াছিলেন, শিব বলিলেন, "আমি কোথা পাব?

বাপ বটে বড লোক, বল গিয়া তায়।"

এই কথা শুনিয়া এক হাতে কার্ত্তিককে ধরিয়া, গণেশকে কোলে লইয়া রাগিয়া দুর্গা বাপের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। তখন নারদ আসিয়া উপস্থিত। শিব ঠাকুর দুর্গা-ছাড়া হইয়া মাথা হেঁট করিয় বসিয়া ছিলেন। নারদ বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন—আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তাহা শোন নাই?

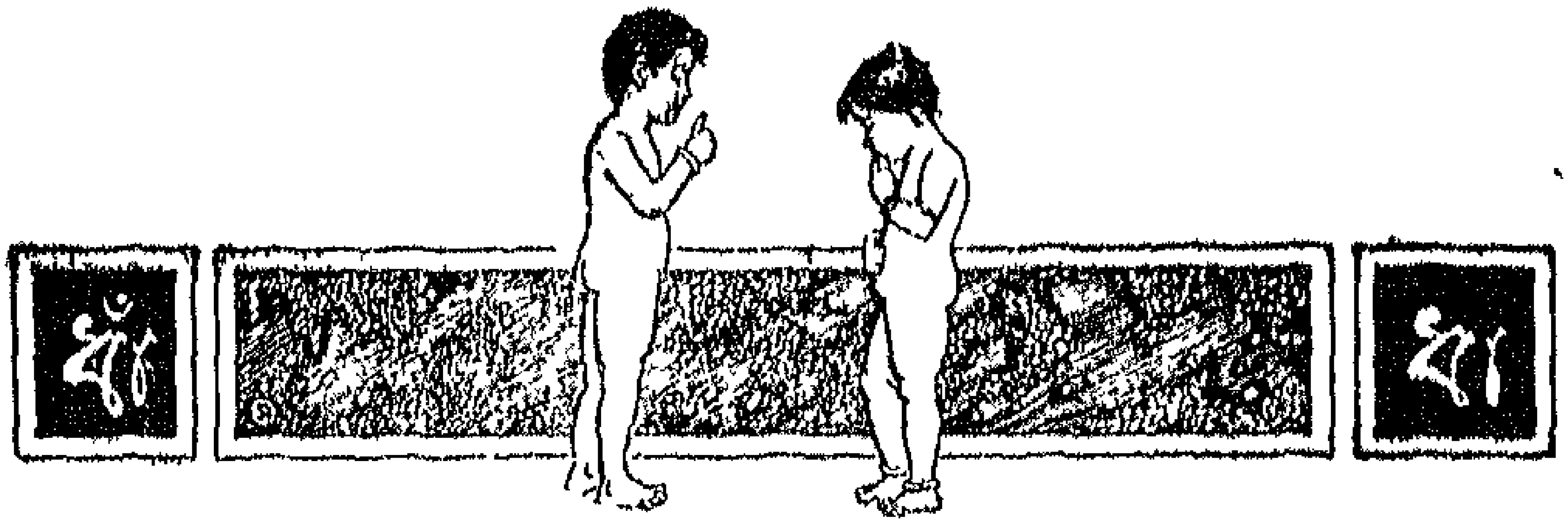
"পাথারে ফেলিয়া গেল, পর্ব্বতের ঝিউ।"

ইহার পরে নিজে শাঁখারী সাজিয়া হিমালয়-পুরীতে গিয়া দুর্গাকে নিজ হাতে শাঁখা পরাইয়া ফিরিয়া লইয়া আসিলেন। তখন শিব দুর্গার আবার ভাব হইল।

এই গান মস্ত বড়, কিন্তু ইহা খাঁটি-চাষার গান। ক্ষেতের কথা, চাষ-আবাদের কথা, ধান চাউলের কথা,—গ্রাম্য রসিকতা,—দরিদ্র ঘরের অভাব-অভিযোগ, গ্রাম্য-কলহ, অশিক্ষিত লোকের ঠাট্টা-তামাসা—প্রভৃতি পড়িলে মনে হয়, ছোট জাতির পাড়ায় আসিয়া ঢুকিয়াছি। এই চাষাদের হাতের আঁকা শিব—গ্রাম্যমোড়লের মত; বেশ কয়েকটা হৃষ্টপুষ্ট বলদ, ধান-ভরা ক্ষেত,—দুর্গাও হাসুলী পরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত,—চাষারা তাদের ঠাকুর ঠাকুরাণীর কথা তাদের মনের মতন করিয়া লিখিয়াছে ইহার মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর ছবির মত কতকগুলি বর্ণনা আছে। যে জায়গায় শিব খাইতে বসিয়াছেন, কার্ত্তিক গণেশ খাইতে বসিয়াছে, নন্দী-ভৃঙ্গীও প্রসাদের জন্য পাত পাতিয়াছে—এলো চুলে দুর্গা পরিবেশন করিতে-ছেন। একা নানারূপ খাদ্য দিয়া সারিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কেউ বলিতেছে, ভাত দেও, কেউ বলিতেছে, আর একখানি ভাজা, কেউ ব্যন্নুনের জন্য হাঁকিতেছে। দুর্গা বলিতেছেন—একটু ধীরে ধীরে খাও; সবই দিতেছি।" এদিকে শিব ঠাকুর একটা পাড়াগেঁয়ে রসিকতা শিখাইয়া দিতেছেন, গণেশ বলিতেছে—"আমরা ধীরে খাইতে জানি না, রাক্ষসীর পেটে হয়েছি—রাক্ষসের মত খাব" শিব ঠাকুর শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এদিকে দিতে দিতে দুর্গা অবসর পাইতেছেন না, তাহার সুন্দর মুখে মুক্তার ন্যায় ঘাম ফুটিয়া উঠিতেছে, আঁচল তাড়াতাড়ি যাতায়াতে বায়ুতে উড়িয়া যাইতেছে, এলো চুল পিঠ ছুঁইয়া দুলিতেছে—তখন কি শোভাই না হইয়াছে! বাঙ্গালার কুঁড়ে ঘরেও যে অন্নপূর্ণা দেবী বিরাজ করিতেছেন, এই ছবি দেখিলে তার সম্বন্ধে আর ভুল হয় না।

রামেশ্বরের শিবায়নের একটা দোষ চোখে বাজে। যেখানে কবি পুরাণো ভাষা ও ভাব বজায় রাখিয়াছেন, সে স্থানগুলি বেশ লাগে, কিন্তু যেখানে এই পুরাণো মাল-মসলা নূতন সাজে আনিয়াছেন সেইখানেই ঠকিয়াছেন ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আনিয়া এই পাড়াগাঁয়ের ছড়াটিকে মাঝে মাঝে বড়ই খাপছাড়া করিয়া ফেলিয়াছেন চাষাদের কথা চাষাদের ভাষাতেই মানায়, সেই কথার মধ্যে পণ্ডিতী চাল দিলে তাহা মাটী হইয়া যায় স্থানে স্থানে রামেশ্বরী শিবায়ণে এই গুরুচণ্ডালী দোষ হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।



আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর।

নবদ্বীপ

রবিবার।

স্নেহাস্পদ গণেশ,

ভাই দুর্গা পূজায় বাড়ী আসিয়াছি বাড়ী আসিয়া এক সংখ্যা আমার দেশ পাইলাম ছেলেদের এমন পরিষ্কার মাসিক পত্র নাই এত মজার গল্প ও ছবি আছে ত বলবার নয়। একখানা সাড়ে চারি আনা দিয়ে কিনে পড়ে দেখ আমরা বেশ আছি

শ্রীকালীপদ নাগ।

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ধাঁধাটির নির্ভুল উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

শ্রীপরিমল বালা বসু, পাটনা ; অম্বুনাথ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ ; সুশীলকৃষ্ণ মজুমদার, দত্তপাড়া ; হেমেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহট্ট, ; বিনয়কুমার লাহিড়ী, গৌহাটি ; ইন্দিরা দত্ত ; শোভা গুপ্তা, ঢাকা ; ব্রজেন্দ্রনারায়ণ নন্দী, বালিগঞ্জ ; শম্ভুচরণ সেনগুপ্ত, পাটনা ; কালীকুমার কুণ্ডু, কলিকাতা ; পাইকপাড়া পল্লী লাইব্রেরীর সভ্যবৃন্দ, নদীয়া , বিজয়ভূষণ মজুমদার, বড় পেটা ; পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য ; সৌদামিনী বড়াল, গণেশতলা, দিনাজপুর ; অজিতনাথ ঘোষ, শরদিন্দু বসু, পূর্ণেন্দু বসু, অর্দ্ধেন্দু বসু, ঝাঁসি ; কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজবাড়ী , জিতেন্দ্রনাথ সাহ , কুচবিহার, কামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা ; ললিতমোহন মণ্ডল, নবাবগঞ্জ ; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, ঢাকা ; সত্যবালা দত্ত, চন্দননগর ; সুধীরচন্দ্র বসু, কাশীপুর ; করুণাময় দে, শ্রীহট্ট , সুশীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী , কৃষ্ণলাল দাস, চন্দননগর ; শ্রীমতী বিনাপাণি দেবী, বর্দ্ধমান ; সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পাটনা ; দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, বালিহার ; গোপালপুর সাধারণ পুস্তকালয়ের সভ্যগণ,

মহিষাদল ; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ওয়ারী ;, অমূল্যবন্ধু দাসগুপ্ত, মাদারীপুর , চারুকুন্তলা সেন, চন্দনপুরা ; বঙ্কেন্দ্রকুমার মিত্র, হাবেবপুর , নৃপেন্দ্রনাথ নাগ ডুমডুমা , অনিলচন্দ্র সেন, কলিকাতা , মল্লিনাবিকাশ মণ্ডল, রেঙ্গুন ; এস্ এন লাইব্রেরীর সভ্যগণ , বিজলীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ও জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা. জ্যোতিষেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; সুজাতা রায়, প্রসেনজিৎ রায় ; কুমারী হেনারাণী ঘোষ, কলিকাতা , কমলা বালা ঘোষ, কলিকাতা ; বেল ঘোষ, কলিকাতা ; বিভূতিভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান , জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, হাওড় , বিনয়েন্দ্রনাথ দাস, পাবনা , রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, মাদ্রাজ

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের উত্তরে এক হইতে তিনটি পর্য্যন্ত ভুল হইয়াছে :—

শ্রীবীণাপাণি বিশ্বাস, দেউলপুর ; সন্তোষকুমার দত্ত, পলাশবাড়ী , সত্যেন্দ্রলাল কুণ্ডু, শ্রীহট্ট , রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আলিপুর , গোষ্ঠবিহারী নন্দী, কাপাষডাঙ্গা, হুগলী , সূর্য্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ; প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়, বরিশাল , নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী, কলিকাত , লীলা রায়, কলিকাতা, গৌরহরি ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া , কুমারী সুমনা গুহ, ডুমডুমা ; সুধাংশুশোভন মৈত্র, সাসারাম ; মৃণ্ময়ী দেবী, ঠাকুরগাঁও , প্রবোধকুমার বসু, বাহার , বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ভাগলপুর , জীবন চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম ; জিতেন্দ্রকুমার মিত্র, ভবানীপুর ; কুমারী রাধারাণী ভাদুড়ী, হরদই ; সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহেরপুরা ; প্রভাতরঞ্জন বৈতালিক, কাঁটালদহ ; সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, বাঁকীপুর , অমিয়সিন্ধু রায়, পাটন ; মণীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, গোয়ালপাড়া , নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা , প্রমীলাবালা রায়, পুরী ; লতিকা মিত্র, ভবানীপুর ; শচীন্দ্রভূষণ দত্ত, নরসিংদী ; রণবীর রায়, রাঁচি , কুমারী পুষ্পলত বসু, গিরিধি ; কুমারী গিনীসোনা দেবী, দেওঘিয়া , রমণীমোহন পাইন, মণ্টুবাবু, পুরুলিয়া , সিদ্ধেশ্বর সাহা, দাঁইহাট , সুব্রতকুমার ঘোষ, কলিকাতা ; মিহিরলাল ভট্টাচার্য্য, চেৎলা , সুরবালা দেবী , ধানকোঁড়া , ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, চিন্তিগড় রাজবাড়ী, গিধনী ; দীলিপচন্দ্র চন্দ্র, রেণুকাবালা বসু, কলিকাতা

ভ্রম সংশোধন ।

ভুলবশতঃ শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তরটি দেওয়া হয় নাই, তাহা এই—ঢাকা ; জাহাজ

আমার দেশের গ্রাহক-গ্রহক গ্রাহিকাগণ নূতন ধাঁধ পাঠাইবার সময় উত্তরটিও লিখিয়া পাঠাইবেন । সঙ্গে উত্তর দেওয় ন থাকিলে, আমরা ধাঁধা ছাপাইতে পারি ন —

কার্ত্তিক মাসের নূতন ধাঁধার উত্তর অতি অল্প সংখ্যক গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে পাইয়াছি—এই কারণ এ মাসে তাঁহাদের নাম দিতে পারা গেল ন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাগণের নাম এক সঙ্গে পৌষ মাসে দিবার ইচ্ছা রহিল —সম্পাদক ।

নূতন ধাঁধা

[১]

অতি প্রিয় আমি হই তিন অক্ষরে নাম,
সবার আদরে তই থাকি সর্ব্বধাম
ছেলে বুড়ো নির্ব্বিচারে করিছে আহার,
ময়রার দোকানে তাই সদাই বাহার।
কোন কিছু বাদ মোর দিবে না ক' তুমি,
শেষাক্ষর ত্যজ যদি উঠি ফুঁড়ে ভূমি।
মধ্যাক্ষর দিলে বাদ রহি রাজার ভবন
আদ্যাক্ষর ছেড়ে যা হয়, করো না কথন

[২]

এমন দু'টি কথা একসঙ্গে লিখিয়া দাও যাহার প্রথমটিও তোমার নিজের শেষেরটিও তোমার; দু'টি একসঙ্গে ত তোমারই। সে'টি আবার মাসে মাসে তোমার কাছে আসে। তার জন্যে তুমি পথ চেয়ে থাক। এ বড় আশ্চর্য্য জিনিষ ভাই, সে'টা আসলে যেমন, তোমার কাছে যেজিনিষটা আসে সেটিও তেমনি প্রিয় কি ?

[৩]

এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় জেলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, বাবু পুকুরে মাছ ধরা হইবে কি? মালী জিজ্ঞাসা করিল, শাক কাটিব কি? নাপিত জিজ্ঞাসিল, দাড়ী কামাইবেন কি? ছেলেও সেই সময় আসিয়া জিজ্ঞাসিল, বাবা, ভাত বাড়া হইবে কি? বাবুটি সকলের দিকে চাহিয়া তিন অক্ষরের এমন একটি কথা কহিলেন যে জেলে, মালী, নাপিত, ছেলে, সবাই বাড়ী চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাবুও চটিজুতা পায়ে দিয়া অন্দরে ভাত খাইতে গেলেন

কুমারী মায়াময়ী মজুমদার

দুই অক্ষরে নাম মোর বিখ্যাত ভুবন
প্রত্যেকের ঘরে মোর অতীব যতন
ব্রাহ্মণের কাছে মোর অতি সমাদর
বাঙ্গালা ভাষাতে আমি অতি মনোহর
ইংরাজীতে সেই শব্দ রোগের আকর।
বলত সকলে দেখি সেই দুই অক্ষর ॥

শ্রী নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ। শিশির পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বিদ্যোদয় প্রেস, ৮২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত

হিতোপদেশ।

ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

হিতোপদেশের গল্প পদ্য পয়ার ছন্দে লেখা

এত সুন্দর লেখা যে, ছেলেরা একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিবে।

[illegible] এন্টিক পেপারে ছাপা

বড় বড় ছবি—বইখানির ভিতর বাহির সমান।

ছেলেমেয়েদের উপহারোপযোগী একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"বঙ্গের সমস্ত শিশুমণ্ডলী এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমোদিত ও উপকৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ;—যেহেতু এই হিতকথা বিশ্বের সর্ব্বত্র শিশুমণ্ডলীর নিকট শত শত বর্ষ আদর পাইয়া আসিতেছে। ইহা পুরাতন হইলেও চির নূতন, ইহাতে, কৌতুক-যমুনার কলহাস্যের সঙ্গে নীতি-গঙ্গার পবিত্রতা মিশিয়াছে।"

মূল্য সম্ভবাতিরিক্ত কম—৸৵০ মাত্র।

শিশির পাব্লিশিং হাউস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা



সম্পাদক—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস, সি।

শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৲
সডাক ষান্মাসিক ১৷০
প্রতি সংখ্যা ।১০

আমার দেশের গ্রাহক গ্রাহিকা,—

অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া আমার দেশের প্রথম বর্ষ শেষ হইয়া গেল। প্রথম বৎসরে আমাদের অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে আমার দেশের জন্য যে আয়োজন করিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, প্রথম বৎসরের এ সব ত্রুটী ধুইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় বৎসরের আমার দেশের জন্য যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে তাহা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। ছেলেমেয়েদের জন্য এমন আয়োজন এদেশে কোন দিনই হয় নাই।

গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা, জীবনী, কাহিনী, মজার মজার কথা এ সব ত থাকিবেই, তাছাড়া প্রত্যেক মাসে ২ খানি করিয়া রঙিন ছবি ও ২০।২৫ খানি এক রঙা ছবি থাকিবে। প্রত্যেক মাসে মোট ৫০ পাতার উপর লেখা থাকিবে।

তোমরা অনেকে লিখিয়াছ অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রের মত 'আমার দেশের' আকার হওয়া উচিত। সেইজন্য দ্বিতীয় বৎসর হইতে 'সন্দেশ' ইত্যাদি মাসিক পত্রের আয়তন আকার হইবে, কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা অনেক বেশী থাকিবে— ছবিও বেশী থাকিবে। [illegible]

আবার আগামী সংখ্যায় তোমাদের সাথে দেখা হইবে।

ইতি

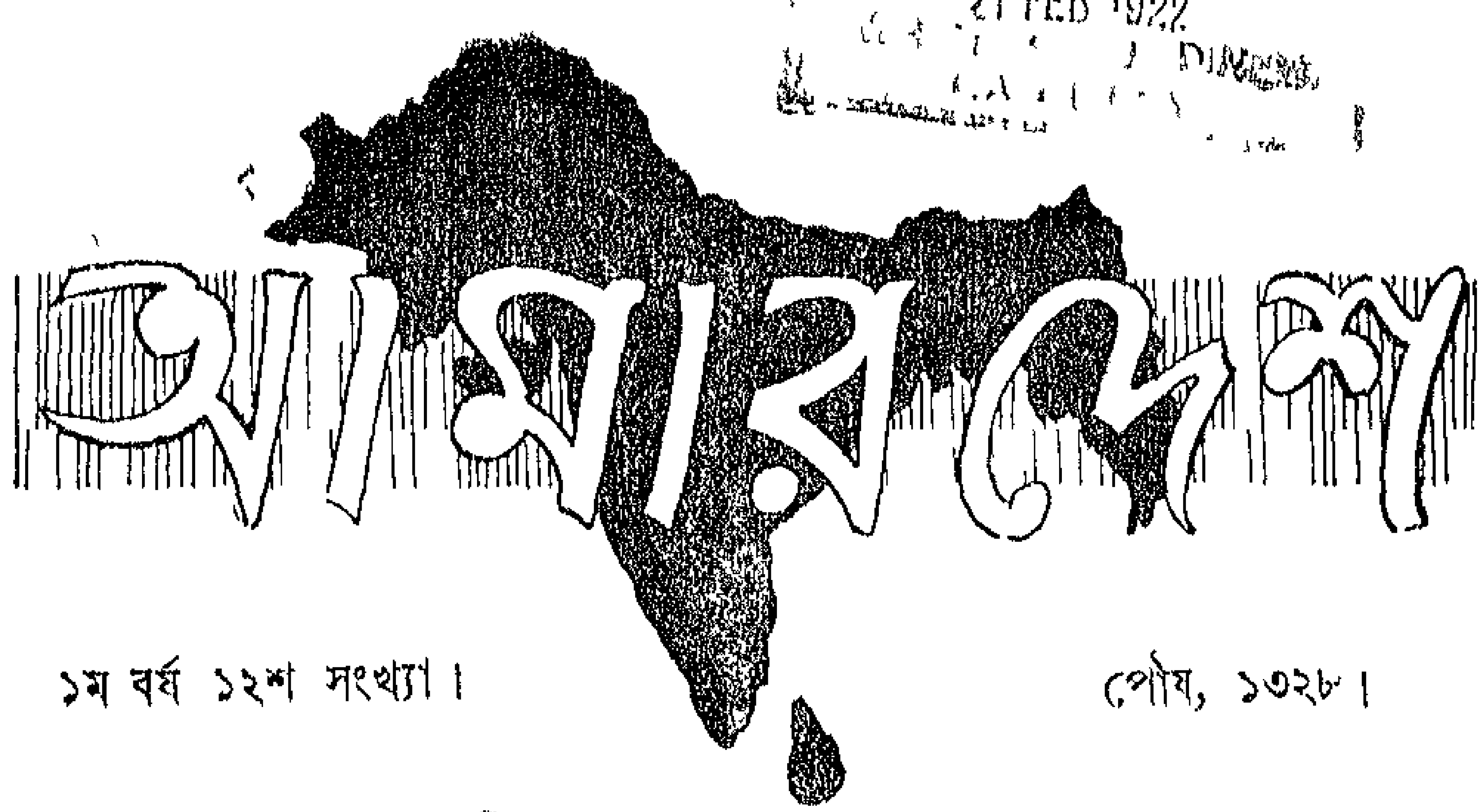
সম্পাদক... "আমার দেশ"

পুঃ— ২০শে পৌষ তোমরা মাঘ সংখ্যা আমার দেশ পাইবে। তাহার পূর্বেই সকলে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইতে চেষ্টা করিও। কারণ ভি, পি,-তে লইলে অনর্থক রেজিষ্ট্রেশন খরচ বাবদ তোমাদের ৵০ অতিরিক্ত লাগিবে।



মহসীন বলিলেন, "না ম , আমি দেবতার দাস,... একজন সামান্য মানুষ"

কুঁড়ে ঘরে পৃঃ



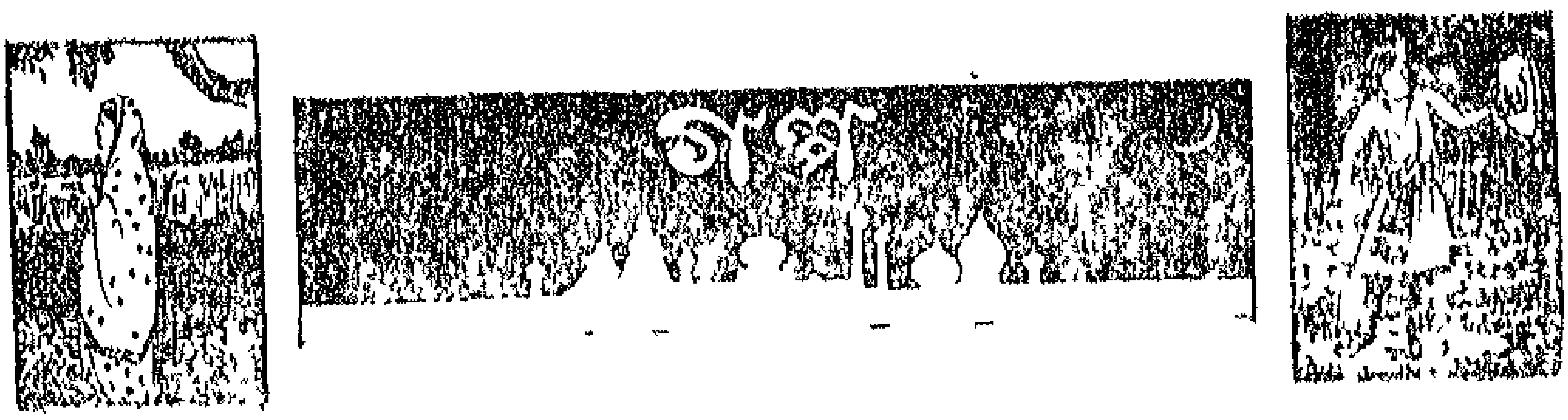
১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা। পৌষ, ১৩২৮।

বীর-শিশু জালিমসিংহ।

(ছড়া)

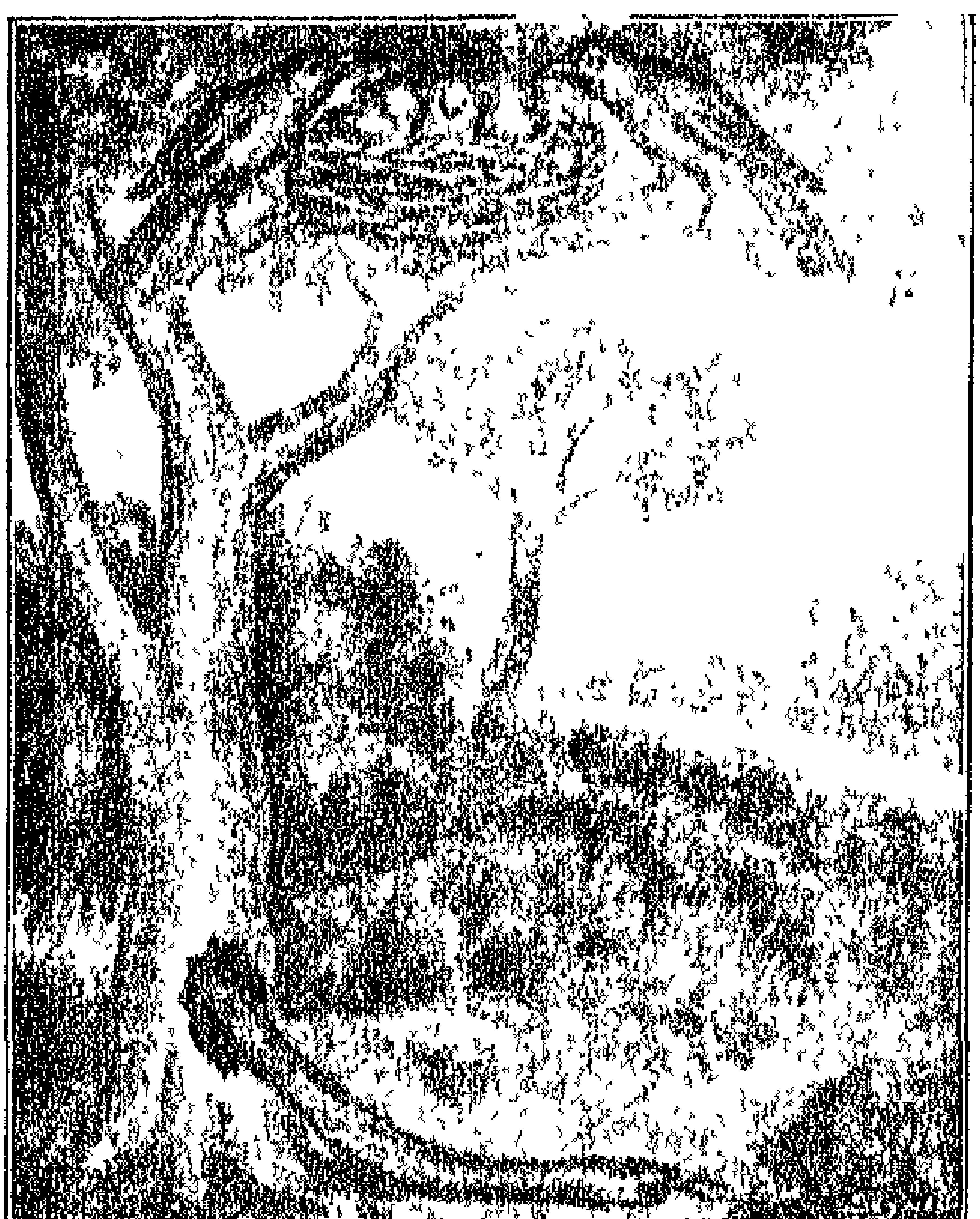
ন'বছরের শিশু জালিম সাহস কত বুকে!
পিতা পরাজিত,
মহা রণে হত,
শত্রু আসে দল্‌তে সে কয় গরজি কৌতুকে!
ঘুরাইয়ে অসি,
যমের মত রুষি
ডাকে জালিম—"আয় রে আয়, মর্‌বি যদি সুখে।"
বিশাল অরি সেনা
স্তব্ধ পুতুলখানা—
কাঁপে না আর কৃপাণগুলি—অচল ঊর্দ্ধ মুখে!
নবাব ডেকে কয়—
"আজ্‌কে শিশুর জয়,
ওরে, যুদ্ধ আর ত নয়,—মরণ লাজে দুখে।"
জালিম হেন চাই
পিতৃভক্ত—ভাই,
শঙ্কা কারে? দল্‌ব বৈরী, আস্‌বে যবে রুখে!
ন'বছরের শিশু জালিম সাহস কত বুকে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।



কাক ও কালসর্প।

একটি গাছের ডালে এক জোড়া কাক বাস করত। তাদের ছেলে পুলে হ'ত—কিন্তু একটিও বাঁচত না। বড় মনের দুঃখেই তাদের দিন কাটছিল। একদিন কাক দেখ্‌তে পেলে ঐ গাছেরই গুঁড়ি থেকে একটা সাপ বেরিয়ে বনের দিকে চলে গেল। তার পর দিনও তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই সাপটাকে দেখ্‌তে পেলে। তখন আর তাদের জানতে বাকী রইল না যে কেন তাদের বাচ্চাগুলি থাকে না। ঐ সাপটাই তাদের খেয়ে ফেলে দেখে তাদের দুজনের মন বড় খারাপ হ'য়ে গেল। স্ত্রী তখন স্বামীকে বল্লে—প্রভু, চল আমরা অন্য কোনও গাছে বাসা বাঁধিগে। ঐ কাল সাপ থাক্‌তে আমাদের ছানা কিছুতেই বাঁচবে না। জানত, কথায় বলে—



দুষ্ট জায়া, মিত্র শঠ অশিষ্ট চাকর—
সর্প-সহ গৃহে বাস, মৃত্যুর আকর।

শুনিয়া কাক বলিল—প্রিয়ে, ঐ কালসর্প বারবার আমাদের যে অনিষ্ট করিয়াছে, ও সেইরূপ সাজা পাইবে ইহা নিশ্চয়। তুমি ভাবিও না।

কিন্তু এ-কথায় তাহ র স্ত্রীর মন সায় দিল না সে জিজ্ঞাসিল তুমি উহাকে সাজা দিবে ? ও তোমার চেয়ে ঢের ক্ষমতাশালী, উহাকে সাজা দেওয়া তোমার কর্ম্ম নয় বরং চল, এই বেলা অন্য গাছে গিয়ে বাসা করি

কাক বলিল—কিছুই করিতে হইবে না উহাকে মারিবার উপায় করিতেছি দেখ বলিয়া সে নিকটের পুষ্করিণীটি দেখাইয়া স্ত্রীকে বলিল—এখনই রাজপুত্র স্নান করিতে আসিবেন দেখিয়াছ ত রাজকুমার গলার মণিময় হারটি খুলিয়া জলে নামেন। যেমন রাজার ছেলে জলে নামিবেন, তুমিও মুখে করিয়া তাঁহার হারছড়াটি লইয়া আসিয়া ঐ কাল-সাপের গর্ত্তে রাখিয়া দিয়া গাছের উপরে আসিয়া বসিও

খানিক পরেই,

হার রাখি রাজপুত্র নামি গেল জলে
হরণ করিল কাক অতি সুকৌশলে
কোটরে রাখিয়া হার বৃক্ষোপরি চড়ি।
ডাকিতে লাগিল পতি কা কা-করি
স্নান করি রাজপুত্র নিরখিতে ক'ন
আমার সোনার হার—কে করে হরণ।

তাহা শুনিয়াই—

লোকজন যত ছিল অন্বেষণে ধায়।
দেখিয়া বায়সপত্নী করে হায় হায়!
কি-করিতে কি হল বুঝিতে না পারি
বংশসহ বুঝি আজ রাজরোষে মরি

রাজপুত্রের লোকজন হুড় হুড় করিয়া গাছে উঠিতে লাগিল উঠিতে উঠিতে সাপের বাসা দেখিতে পাইয়া উঁকি মারিতেই দেখিল—সোনার হারগাছটি তাহার মধ্যে পড়িয়া চক্ মক্ করিতেছে তাহারা খোঁচা খুঁচি দিয়া হার বাহির করিতেছে, ফোঁস করিয়া সাপটা বাহির হইয়া পড়িল তখন—

সাপে বধি হার লয়ে চলি গেলা ঘরে
আনন্দিত মনে কাক কা কা করে॥   বি।

হাতুড়ির গল্প।

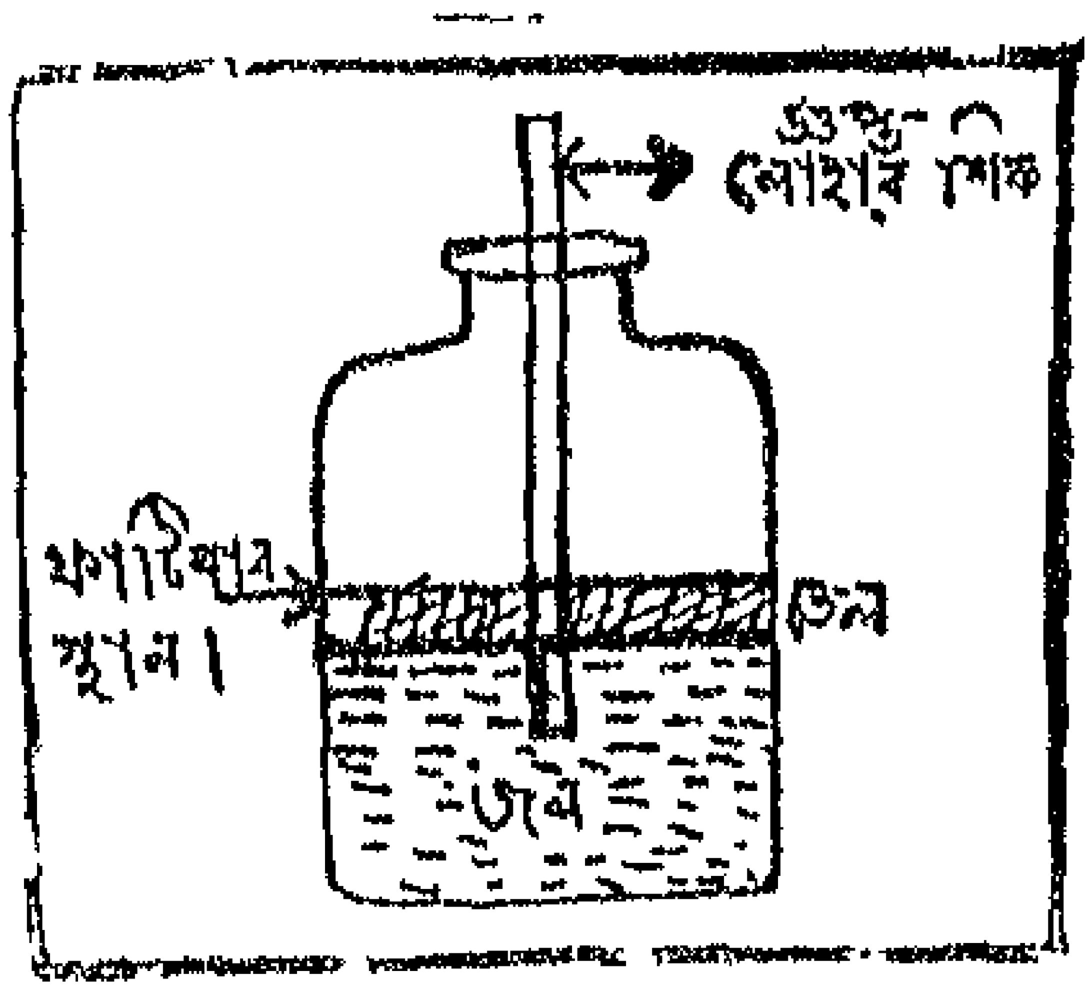
নিজের মধ্যে পদার্থ থাকিলে সামান্য অবস্থা হইতে লোকে কি করিয়া পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইতে পারে ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে—আলফ্রেড ক্রুপ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন প্রুসিয়ায় এসেন নগরের লৌহ কারখানার মালিক হন তখন এই কারখানায় সামান্য ক'টি মজুর ঠুক ঠাক্ করিয়া কাজ করিত; কারখানার তবিলে পয়সা কড়িও বিশেষ ছিল না কিন্তু চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ঐ কারখানার এমন উন্নতি হইয়াছিল যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আলফ্রেডের মৃত্যুকালে সেখানে বিশহাজার লোক খাটিত আর আলফ্রেড নিজে তখন অনেকগুলি লৌহ ও কয়লার খনির মালিক। ইস্পাত হইতে কামান তৈরী ক্রুপের ফ্যাক্টরীতে প্রথম হইয়াছিল এবং সমস্ত ইয়ুরোপকে কামান জোগাইত। এই বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর সমস্ত কামান, গোলাগুলি ক্রুপ ফ্যাক্টরীই সরবরাহ করিয়াছিল—ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে, এখন সে কারখানাটি কেমন ও কত বড়। আজকালকার যুদ্ধ ত গোলাগুলির যুদ্ধ—যে পক্ষের গোলাগুলি কামান বন্দুক বেশী থাকে সেই পক্ষই জেতে, বলিতে কি, গত যুদ্ধে জার্ম্মাণী যে এত বড় বড় সব জাতির বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ চালাইয়াছে তাহা কতকটা এই ক্রুপ ফ্যাক্টরীর জন্যই।

জার্ম্মাণীর তখনকার সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের সঙ্গে ক্রুপের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সম্রাট প্রায়ই ক্রুপের কারখানায় আসিতেন কাজে-কর্ম্ম দেখিতেন; গল্পগুজব করিতেন, আবার চলিয়া যাইতেন। একদিন সম্রাট আসিয়াছেন ক্রুপ তাঁহাকে কারখানার নূতন কলের হাতুড়িটি দেখাইয়া বলিলেন—এটির ওজন প্রায় ৫৫০ মন খুব বড় বড় ইস্পাতের খণ্ডকে খুব জোরে পেটা যায়।—আর যে লোকটি এই হাতুড়ী চালাইত, তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—সম্রাট, এই ফ্রিজ, ৫৫০ মণি হাতুড়ী এই-ই চালায়। এমন সুদক্ষ যে, সে খুব জোরে চালিয়ে যেমন লোহা গুঁড়ো করতেও পারে, বড়ো একটি টুস্ না চিঁড়েও হাতুড়ি তুলে ফেলতে পারে।—শুনিয়া সম্রাট আশ্চর্য্য হইয়া পকেট হইতে তাঁহার বহুমূল্য হীরকাদি খচিত সোনার ঘড়িটি বাহির করিয়া হাতুড়ির নীচে রাখিয়া বলিলেন—কৈ, বাঁচাক দেখি।

সম্রাট নিজে ও তাঁহার অনুচর সকলে ফ্রিজের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, ফ্রিজ্ মাথা নাড়িয়া তাহার অক্ষমতা জানাইল কিন্তু তাহার মনিব জেদ করিতে লাগিলেন। মনিবের আদেশ পাইয়া ফ্রিজ হাতুড়ীর কল চালাইয়া দিল। ভীষণ শব্দ করিয়া হাতুড়ী উঠিল, কিন্তু ঠিক ঘড়িটির গায়ে লাগিবার আগেই বন্ধ হইয়া গেল।

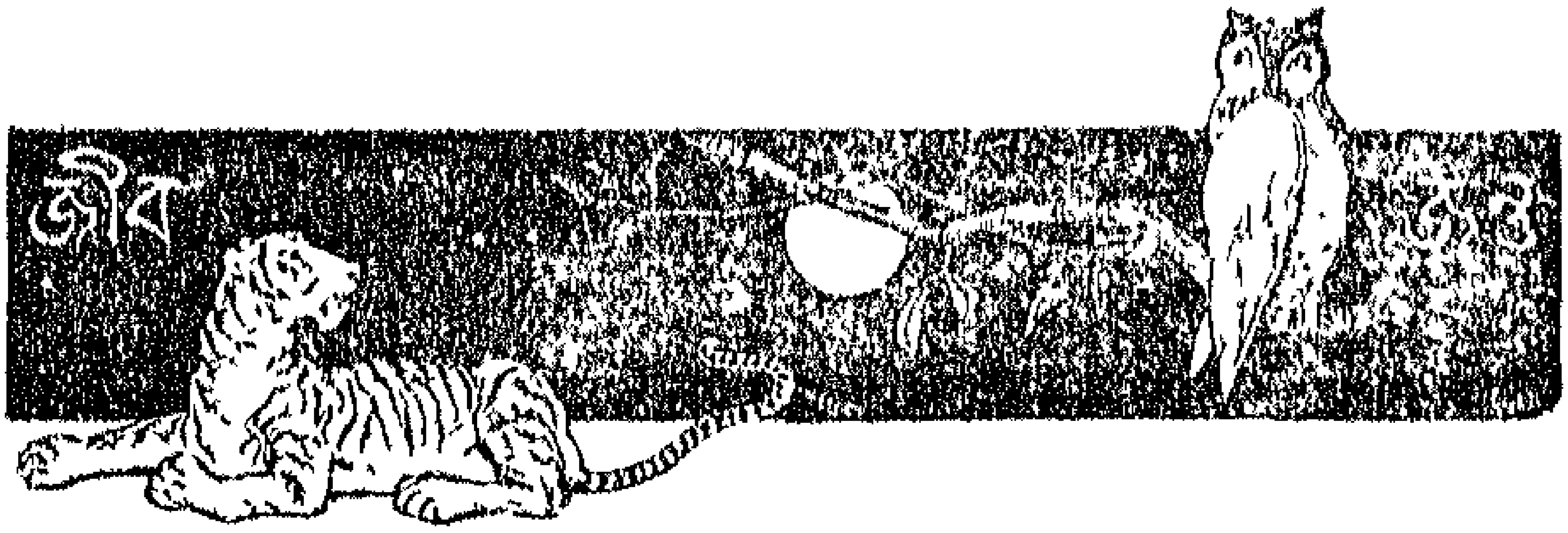
সম্রাট উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন , অন্য সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল। ক্রাপ্ ঘড়িটি তুলিয়া সম্রাটকে দিতে যাইতেছেন, সম্রাট বলিলেন—তুলো না, তুলো না ও আর আমার নয়—ও ফ্রিজের। সহকর্ম্মীরা আবার হাততালি দিতে লাগিল। ক্রাপও আনন্দিত হইয়া নিজের পকেট হইতে টাকা ভরা ব্যাগ বাহির করিয়া ফ্রিজের হাতে দিয়া বলিলেন—আমারও এই সামান্য পুরস্কার, ফ্রিজ!—আবার সবাই আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল সম্রাট নিজে হাততালি দিতে লাগিলেন বি।

বোতল কাটিয়া জার করা।



অনেক সময় সরুমুখ কাঁচের বোতলকে কাটিয়া চওড়া-মুখ (jar) জার করিতে পারিলে অনেক দরকারে লাগে জার করিবার এক অতি সহজ উপায় আছে। যেখান হইতে কাটিতে চাও, সেইখান বরাবর বোতলের গায়ে একটী দাগ কাটিয়া লও। এই দাগের এক ইঞ্চি নীচে পর্য্যন্ত জল ভরিয়া দাও এইবারে কাটিবার দাগ পর্য্যন্ত তিলের তেল আস্তে আস্তে ঢালিয়া দাও। তাহার পর একটী লোহার ডাণ্ডা বা শিককে গনগনে গরম লম্বাভাবে বোতলের তেলের ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া দাও। দেখিবে বোতল তেলের বরাবর ফাটিয়া গিয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে খুব সোজা নয় কি?

শ্রীধানি লঙ্কা



বিবর

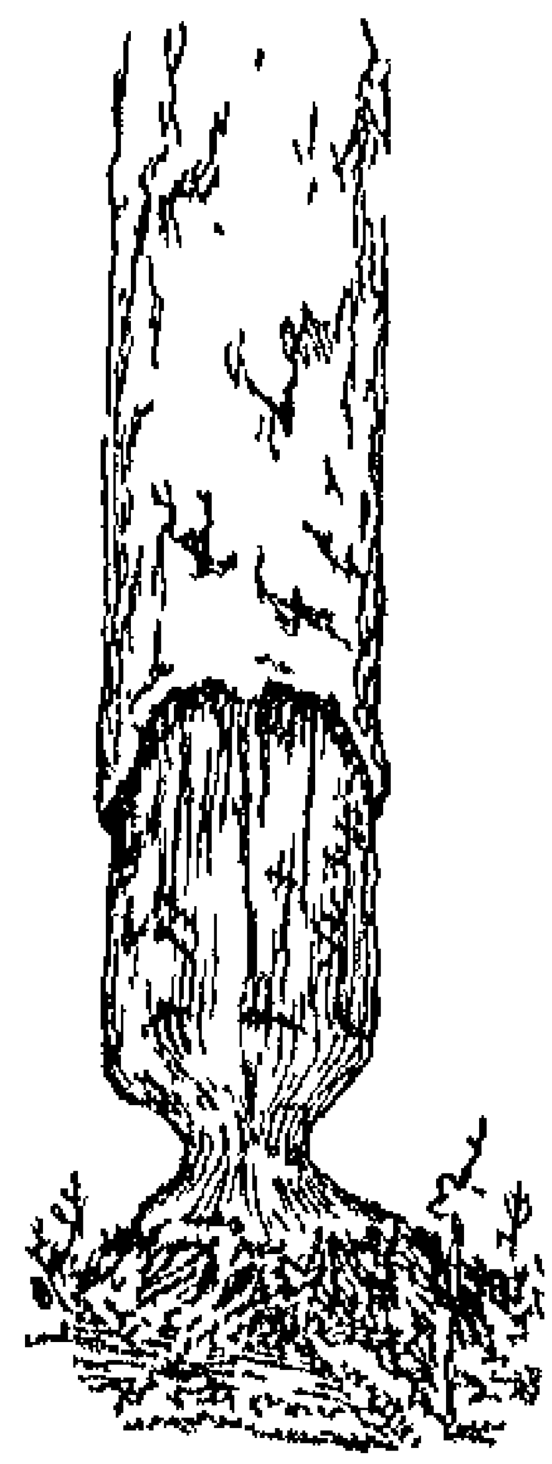
বিবর নামে এক জাতীয় জন্তু আছে। ইহারা আমাদের দেশে বাস করে না, তাই এই নামটী ও আমাদের দেশের নয়। বিদেশীয় চলিত নামে এই বিচিত্র প্রাণীটিকে পরিচিত করা গেল। বিবরেরা খুব সুন্দর, নয় দাম্ভিক, খুব সাদাসিধে আড়ম্বরহীন শ্রমশীল ও মেধাবী প্রাণী। তোমরা হয়ত অনেক প্রাণীর বাসস্থান সম্বন্ধে কত না কথাই শুনিয়াছ, যেমন বাবুই পাখীর নীড়, শিয়ালের বাসা আর মৌমাছির চাক কিন্তু এই অচেনা জন্তুর ঘর বাঁধা সম্বন্ধে শুনিলে অবাক হইয়া যাইবে। বলিতে এদের তুলনায় আজ মানুষ ছাড়া এত সৌখিন, অথচ নিপুণ ও দৃঢ় বসবাস কেহই করে নাই।



—বিবরের বাসা—

পথিকের যাতায়াতের পথ হইতে দূরে খুব নিবিড় বনে ছোট ছোট নদীর ধারে এদের বাসা পাতা সুরু হয়। প্রথমে জায়গাটী বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বাসা বাঁধা হয়—যেখানে সেখানে বাসা বাঁধে না। নদীটীর ধারে, অথচ একেবারে পাড়ে নয়। সরু সরু গুঁড়িওয়ালা অনেক গাছ আছে দেখিয়া বিবরেরা জায়গা দখল করে। এদের রাতে কাজ করা অভ্যাস, তাই কোন এক সন্ধ্যার পরে একটী গাছ ঘেরাও করে। পরে গাছটীর মূল হইতে আধ হাত পরিমাণ বল্কলটী আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়িয়া ফেলে ও গুঁড়িটির চারিধার কুরিয়া কুরিয়া কাটিতে সুরু করে। কাটিতে কাটিতে গুঁড়ির গোড়াটি অত্যন্ত সরু

হইয়া আসে। এত প্রখর এদের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি যে ঐ গাছের গোড়াটা এমন ভাবে একটু বেশী ঘেঁসিয়ে কাটে যে পড়িবার কালে গাছটি নদীমুখো হইয়া পড়ে। এমনও দেখা গিয়াছে প্রায় ৪০ ইঞ্চি বেড়ের গাছের গুঁড়ি এরা দিন কয়েকের পরিশ্রমে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে,



গাঁ চড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে।

এদের প্রধান অস্ত্র দাঁত, স্বভাবের এমন বিচিত্র কৌশল যে এই দাঁতের বাহির দিকটা একরকম কমলালেবু রঙের কঠিন আবরণে ঘেরা আর অপর দিকে অন্য এক প্রকার জিনিষে ঢাকা; ফলে এই হয় যতই এদের দাঁত কাজ করিয়া খইয়া যায়, ততই দাঁতগুলি বাড়িতে থাকে, আর আবরণের এমন কাঠিন্য যে সেই ধারাল ছুঁচ দাঁত একই রকম থাকে যদি দৈবাৎ উপরের বা নীচের একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া পড়ে, তা হইলে সেই ভাঙ্গা দাঁতের ঠিক সামনের দাঁতটী অবাধে বাড়িয়া বাড়িয়া অসাধারণ আয়তনে রূপান্তরিত হয়। সেই ভাঙ্গা দাঁত আবার কাঠের বাঁটে আঁটিয়া বিক্রী হয়, তা দিয়া কঠিন দ্রব্যের উপর সুচারুরূপে কারুকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে

এখন গাছত নদীমুখো হইয়া ধরাশায়ী হইল —তারপর? বিবরেরা কতক তাই দিয়া থাকিবার বাস ও বাকি দিয়া নদীর উপর বাঁধ তোলে। এই বাঁধ বাঁধিতে হয় বলিয়াই, গাছটীকে নদীমুখো করিয়া ই ফেলিবার চেষ্টা শীতের দেশে বাস করা সত্বেও এদের জলজন্তু প্রাণ কখন শীতে জল বরফ হইয়া জমিয়া যাইবে, দল বাঁধিয়া সাঁতার কাটা হইবে না;—এই ভয়ে, প্রকাণ্ড অবরোধ প্রথায় জলকে বাঁচান হয় যখন শীতের প্রভাবে সমস্ত দিক জমিয়া শাদা হইয়া গেছে, যখন নদীর চঞ্চল জল স্থির পাষাণে রূপান্তরিত, তখন এদের বাঁধের ভিতরকার সঞ্চিত জলে খেলার ধুম পড়িয়া যায় এরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারে তা জানি না, তবে দেখা গিয়াছে, যে খরস্রোত নদীর উপর এরা ক্যারাচে ভাবে বাঁধ বাধে, আর যে নদী স্থির তাতে সমান সমান বাঁধ তোলে। ২০০ হাত চওড়া নদীর বুকের উপর দিয়া ৪০ হাত উচু বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে খড় কুটো ধুলো মাটি, ডাল পালা এই সেতুবন্ধ গুলির উপকরণ গাছের ডালের ব্যাকই এদের খিলেনের কাজ করে ও কাদার প্রলেপ সমস্ত ফাটল বন্ধ করিয়া দেয়। গোড়ায় গোড়ায় স্থানে স্থানে অপক্ক থাকে, কিন্তু ক্রমাম্বয় মেরামতের পর মেরামত করিয়া, এরা এত শক্ত

ও কঠিন করিয়া তোলে, যে তার উপর দিয়া সচ্ছন্দে গতিবিধি করা যায়। এমন দেখা গিয়াছে যে, এই বাঁধের উপকরণ থেকে শিকড় বাহির হইয়া, কালে এমন প্রকাণ্ড গাছের সারির জন্ম লাভ করে যে তাদের ঘন পাতার আবরণের বিস্তারে অসংখ্য পাখির উপনিবেশে পরিণত হয়। এই বাঁধের কোল হইতে, জলের ভিতর গোপন পথ থেকে, সেই জল ক্রমশঃ শক্ত মাটিতে গিয়া নিকটস্থ বাসার সঙ্গে যোগ হইয়া যায়। শীতে ইহারা বড় একটা বাহির হয় না, তাই বাঁধের মধ্যে আটক থাকিবার দিনের মতন আহারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহাদের প্রিয় খাদ্য গাছের বল্কল। বল্কলে জায়গাটী প্রায় ভরিয়া যায়। কখনও বা শত্রুর কবল হইতে দুর্যোগে এর ভিতরে আসিয়া ইহারা প্রাণ রক্ষা করে। এর সদর পথ সম্বন্ধে আক্রমণকারী কিছুই জানিতে পারে না।



১৭

ইহাদের বাস একই সরঞ্জামে তৈয়ারী। সামনের দুটি পায়ের সাহায্যে কাদা আনিয়া ঘরখানির গায়ে লেপিতে লেপিতে খুব শক্ত হইয়া উঠে, তার উপর শীতের বরফ ও গ্রীষ্মের রৌদ্র আরও মজবুত করিয়া দেয়। ক্ষুধিত নেকড়ের দলও পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া তাহার কিছুই করিতে পারে না। তবুও এই সব ধান বিবর জাতী একেবারে শত্রু শূন্য নহে। মানুষে ইহাদের সুখে সংসার পাতার খবর পাইয়া সেখানে অশান্তি আনিতে যায়। শীতের প্রাদুর্ভাবে বাঁধের ফাটল মেরামতের সময় কতক ওস্তাদ বিবর সন্ধ্যা হইতেই ব্যস্ত থাকে। সেই সময়ে ফুটোর মুখে সংবক্ষিত কলে বিবরের ঠ্যাং আটকাইয়া যায়। কলটীর সঙ্গে খুব ভারী পাথর শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে। তা না হইলে কল সমেত সাঁতরাইয়া পালায়। পরাধীনতাকে ইহারা এতই ঘৃণা করে যে আবদ্ধ পাটিকে মুচড়ে মুচড়ে, কখনও বা শোনা যায় আপনার দাঁত দিয়ে কামড়ে কেটে পালায়, তবুও ধরা দেয় না। তাদের ধরিবার এক সম্প্রদায় ব্যাধ আছে, তাহারা জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া গহনবনে বিবরের সন্ধানে সন্ধানে ফিরে। শীতের শেষাশেষি বিবর ধরিবার মরসুম পড়ে।

গোড়ায় বলিয়াছি, খাবার সংগ্রহ করিয়া সমস্ত শীতকালটা বাঁধের আড়ালে ইহারা বন্ধ থাকে। এখন এই ব্যাধেরা বাঁধের গায়ে প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত কাটিয়া ফেলে, তারি গোড়ায় কচি কচি গাছের ছাল রাখিয়া যায়। অনেকদিন টাটকা ছাল না খাওয়ার দরুণ তাহারা খাইতে আসিয়া বল্কলটীর কোলে যে কল থাকে তাহাতেই বন্দী হইয়া যায় ইহাদের ধরিবার আর অনেক ফন্দি আছে ধোঁয়ার গন্ধ ইহারা সহ্য করিতে পারে না, বাঁধের মধ্যে কোনও স্থান কুড়ুল দিয়া কাটিয়া তার ভিতর জ্বলন্ত জ্বালানি কাঠের স্তূপ রাখিয়া বিবরের দস্তুরমত সর্ব্বনাশ করা হয় তখন ছোট ছোট ছানা বাঁচান লইয়া মহা হুলস্থূল পড়ে অত্যাচারে জীর্ণ হইয়া কত সাধনার কত প্রাণপাত-করা-পরিশ্রমের বাসার মায়া ত্যাগ করিয়া ইহারা আবার দল বাঁধিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় তখন হয়ত কাচা মাটির গন্ধ দেয়ালের গা ভরিয়া রহিয়াছে, তবুও এই শত্রুর স্পর্শ করা গৃহকে এরা এতই ঘৃণা করে যে আর সে স্থানে পুনঃপ্রবেশ করে না অন্য কোথায় আবার বাসা পত্তনের আয়োজন করে

একবার ২৫ সেরের বেশী ওজনের একটা বিবর ধরা পড়িয়াছিল এদের গায়ের রোম দুরকমের হয় রেশমের মত ঝকঝকে বলিয়া তাতে নানা দামী দামী জিনিষ তৈরী হয়। শিশু বিবর বিক্রী হয়। সৌখিন মানুষ ইহাদের পোষে। প্রায়ই মাঝে মাঝে ছোট ছেলের কান্নার মতন দুঃখে অভিমানে কাঁদিতে থাকে যখন শীতের বাতাস বহিতে থাকে, তখন এই পোষা বিবর বাসার কোণে বসিয়া কাঁদিতে থাকে বোধ হয় তাহাদের দল বাঁধিয়া বেড়ানের কথা বা রাতের মজলিসের কথা মনে পড়ে। কখন বা রাগে আসবাব পত্র কাটিয়া তচনচ করিয়া ফেলে

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ।

একটা ছেলে মস্ত এক কাৎলা মাছ হাত ছিপে গেঁথে তুলেছিল নদীর ধারে অনেক লোক জড় হয়েছিল, সবাই বল্লে, উঃ মাছটার ওজন মণ খানেক হবে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে ওর বয়স কত? লোকে অনুমান ক'রে বল্লে—ত্রিশ চল্লিশ বছর। ছেলেটা মাছটাকে জলে ছেড়ে দিয়ে বল্লে—আরও কিছুকাল বাঁচুক—দীর্ঘজীবন লাভ করুক

ভালোয়-মন্দয়। (কীর্ত্তিগাথা—৪)

এন্টিনোর ছিল ভেনিস্ শহরে একজন মস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অতুল ঐশ্বর্য্য, অগাধ সম্পত্তি, অনেক লোকজন এ সব যেমন অনেক ছিল, মনের মধ্যে গর্ব্ব, হিংসা দ্বেষও তেমনি অনেকখানিই ছিল। এক একজন লোক প্রায়ই দেখা যায়, যারা পরের ভালো দেখ্‌তে পারে না, তা'তে তাদের বড় কষ্ট হয় এন্টিনোর ছিল ঠিক সেই ধরণের মানুষটি যদি শুন্‌লে অমুক লোকটি বেশ পয়সা করছে, বাড়ীঘর তুলছে, অমনি এন্টিনোরের গায়ের জ্বালা ধরল। সম্প্রতি এন্টিনোরের ভয়ানক গায়ের জ্বালা হ'য়েছে, বণিক গালবেজোর কাণ্ড কারখানা দেখে অনেকে বল্‌ছে—গালবেজো ব্যবসা বাণিজ্য করে খুব পয়সা করেছে, দু' চারটে এন্টিনোরকে সে কিন্তেও পারে। কিন্তু গালবেজোকে দেখে ত বোঝবার জো টি নেই। সে খুব সাধাসিধে লোক, ভারি অমায়িক ব্যবহার—লোকে গালবেজোকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করত।

গায়ের জ্বালায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে এন্টিনোর বল্‌তে লাগ্‌ল—শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করে অত পয়সা করা সম্ভব নয়। অন্য কিছু আছে ক্রমে লোকেও সন্দেহ করতে লাগল যে হ'বেও বা। চুরী জুচ্চুরীতেই হঠাৎ বড়লোক হওয়া যায়। গালবেজো যে কি করছে, কে জানে।

এই সময়েই তুরস্কের সঙ্গে ভেনিসের যুদ্ধ বেঁধে উঠ্‌লো। ভেনিসের তখন এমনি অবস্থা যে কারুরই আর ব্যবসা-ট্যাবসা চল্‌ছে না, একদম সব বন্ধ; ভেনিসের জাহাজ সব বন্দরে নোঙর ফেলে বোসে আছে এই সময়ে গালবেজোর একখানা জাহাজ স্মীরনা থেকে ভেনিসের বন্দরে এসে থামল। লোকে অবাক হ'য়ে গেল এই ভেবে যে, তুরকীরা গালবেজোর জাহাজখানাকে ছাড়লে কেন? তারা ত যার জাহাজ পথে পেয়েছে লুটে পুটে নিয়েছে—এ'কে কেন ছাড়ে? এন্টিনোর তখনই বুঝিয়ে দিলে যে, গালবেজো নিশ্চয়ই তুরকীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্রও করেছে, নইলে ছাড়ে কখনও। তখন ভেনিসিয়ানরা গালবেজোকে ধরে কয়েদ দিয়ে দিলে

সত্য সত্যই কিন্তু তা নয় গালবেজোর জাহাজ স্মীরণা থেকে ছেড়েছিল যখন, তখন যুদ্ধের কোন সাড় শব্দই ছিল না। মধ্যপথে জাহাজখানা সারাবার জন্যে একটা বন্দরে আটকে ছিল। সারা হ'তেই জাহাজ এসে পৌঁছেচে গালবেজো এ সমস্ত কথা বল্লেন, কিন্তু কার কথা কে শোনে? এন্টিনোর বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ষড়যন্ত্র আছে গালবেজো নির্ব্বাসিত হ'লেন।

এদিকে যুদ্ধে তুরকী জয়লাভ করে ভেনিসের অধিবাসীদের ক্রীতদাস করে বেঁধে নিয়ে

গেল—এণ্টিনোরের একমাত্র ছেলেটিরও যেতে হয়েছিল অনেক কাল কেটে গেল, তুরকীর হাতে বন্দী হ'য়ে যারা গেছল, তারা কেউ ফিরল না—এণ্টিনেরের ছেলেও না। এণ্টিনোর শেষে হতাশ হ'যে ছেলের আশা ছেড়ে দিয়া বেচে মরে রইলেন।

অনেকদিন পরে একখান জাহাজ ভেনিসের বন্দরে লাগ্‌ল অন্যান্য আরোহীর সঙ্গে একটী যুবকও নেমে এল যুবক সোজা এণ্টিনোবের বাড়ী এসে ঢুকল লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে একটা ঘরে ঢুকে ডাক্‌লে—বাবা!

ঘরের কোণে এক অতি বৃদ্ধ লোক বসে'ছিলেন—তিনি চমকে উঠে চেয়ে দেখ্‌লেন—যুবক আবার ডাক্‌লে, "বাবা!" এণ্টিনোর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

কেমন করে ছেলে উদ্ধার পেয়ে বাড়ী এল এণ্টিনোর তা জান্‌তে চাইতেই, ছেলে বল্লে—এক গ্রীক মহাপুরুষ আমাকে কারাগার থেকে 'ক্রীতদাস' বলে ক্রয় করে আমাকে টাকাকড়ি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন বল্লেন—আমি তাঁর ক্রীতদাস নই, কেবল আমাকে মুক্তি দেবার জন্যই তিনি আমাকে কিনেছিলেন আপনাকে তিনি একখানা চিঠিও দিয়েছেন।

এণ্টিনোর চিঠি পড়লেন। পড়তে পড়তে হাঁত কেঁপে উঠ্‌লো, চিঠি পড়ে গেলো আর দু'টি চক্ষের জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগ্‌ল

এণ্টিনোর পড়লেন ঃ—

এই পত্রবাহক তোমার একমাত্র পুত্র! হঠাৎ কারাগারে একে আমি দেখ্‌তে পাই, আমার স্বদেশবাসী বলে একে ভালোবেসেছিলাম। পরে শুন্‌লাম—এ তোমার ছেলে আমার তাঁকে আমার ছেলে বলেই মনে হ'লো ইচ্ছে হ'য়েছিল এই সুদুর দেশে নির্ব্বাসিত হ'য়ে ত আছি—এই দেশবাসীকে সঙ্গে করে কষ্টের লাঘব করি—কিন্তু আমি তাকে এত ভালোবেসেছি যে সে দেশে গেলে সুখী হয় শুনে তোমার কাছেই পাঠিয়ে দিলাম ভাই এণ্টিনোর, ভেনিস যে আমার স্বদেশ, তার অধিবাসী যে আমার ভাই। তাদের সুখী করতে যে আমি প্রাণ দিতে পারি তুমি আমাকে নির্ব্বাসিত করে ভালোই করেছিলে, নইলে এই ভেনিস্-যুবক, তোমার একমাত্র পুত্র ত রক্ষা পেত না ভাই।—গালবেজো।

* * * * * *

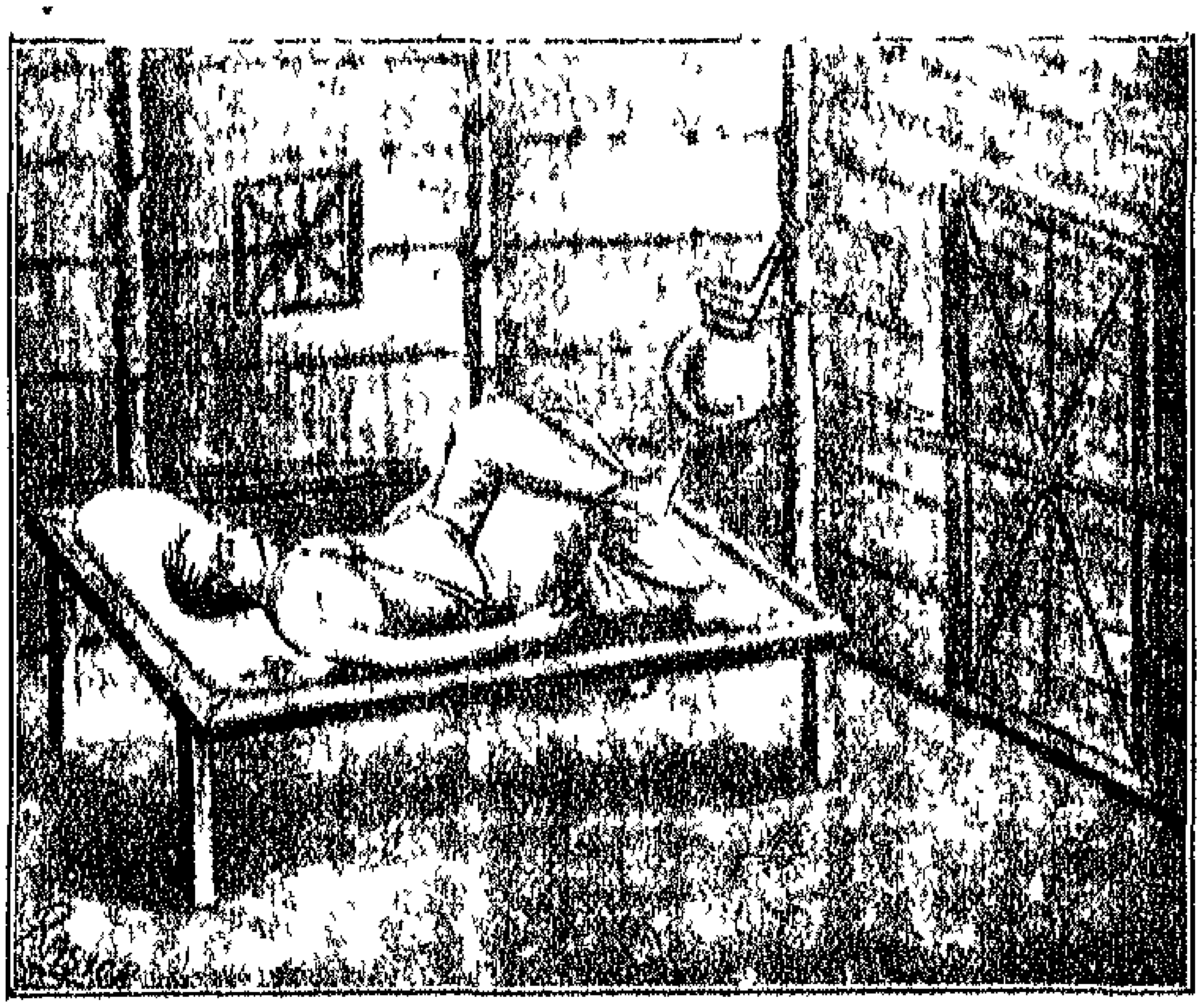
এণ্টিনোরের অনেক চেষ্টায় গালবেজো দেশে ফিরেছিলেন এবং উভয়ের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গাঢ় বন্ধুত্ব বর্ত্তমান ছিল।

মি।

আকাশ কুসুম।

এক ব্রাহ্মণ ছিল, ভিক্ষা করিয়াই তাহার জীবন কাটিত সারাদিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া খাইয়া দাইয়া শুইয়া পড়িত

ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া এক কলসী ছাতু সংগ্রহ করিয়া ঘরের দেওয়ালে একটা খুঁটীতে কলসীটি টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। কলসীর ছাতু খরচ করিবার ইচ্ছা নাই রোজ ভিক্ষা করিয়া যাহা জোগাড় হইত, তাহাতেই আহার চলিয়া যাইত ইহাতে ব্রাহ্মণের মনটা খুব খুসী হইয়া উঠিল। তবে ত কিছু জমিয়া গেল, আর ভাবনা কি। এখন যদি কিছুদিন বর্ষা হয় বা আমার অসুখবিসুখ করে, ভিক্ষায় বাহির হইতে না পারি তবুও আমার দুঃখ হইবে না, না খাইয়া মরিব না। এই গেল ব্রাহ্মণের প্রথম চিন্তা



আকাশে কুসুম ফুটিতেছে

তারপর হইল দ্বিতীয় চিন্তা ব্রাহ্মণ রাত্রিবেলা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—আচ্ছা দেশে যদি খুব দুর্ভিক্ষ হয়, কারুর ঘরে খাবার দাবার না থাকে,তাহা হইলে আমার ছাতুর কলসীর খুব দাম বেড়ে যায়—আমিও বেচে দিই। বেচে দুইটি ছাগী কিনি; ক্রমে ছাগ-ছাগী ছাগশিশুতে আমার উঠান ভর্ত্তি হইয়া যাইবে—তখন সেগুলি বেচিয়া ফেলিব। গরু কিনিব, গরুর সংখ্যা অমনি বাড়িলে বেচিয়া মহিষ কিনিব মহিষ যখন অনেকগুলি হইবে তখন যাদি ঘোড়া কিনিব। ঘোড়া অনেক হইলে বেচিব—তখন, তখন আমার এ ক ঘ র সোনা মোহর হইবে একটা মস্ত বাড়ী কিনিয়া ফেলিব। তখন লোকে আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবার জন্য আনা-গোনা করিবে কোন ব্রাহ্মণের একটি রূপবতী কন্যাকে বিয়ে করিয়া ঘর-সংসার করিব।

কবে বিবাহ হইবে, কবে সেই রূপবতী পত্নির সহিত ঘর-করণ পাতিবে তাহার ঠিক নাই কিন্তু ব্রাহ্মণের মুখচোখ তখনি হাসিতে আনন্দে ভরিয়া উঠল

ব্রাহ্মণ আবার ভাবিতে লাগিল—তাহার পর কি হইবে? ঐ পত্নীর গর্ভে একটি সুন্দর ছেলে হইবে; তাহার একটি সুন্দর নাম রাখিব। নাম রাখিব ভূদেব। হাঃ হাঃ। তারপর ভূদেব তাহার মাতার কোল হইতে আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, কিন্তু তখন আমার অনেক কাজ। আমি বলিব ব্রাহ্মণী, পুত্র লইয়া যাও। ব্রাহ্মণী আমার কথা উপেক্ষা করিয়া গৃহকার্য্যই করিতে যাইবে আমি অনেকবার ডাকিব, তবুও সে শুনিবে না, তখন আমার ভয়ানক রাগ হইবে আমি উঠিয়া ব্রাহ্মণীকে এক লাথি মারিব!

ঝান্ ঝান্ শব্দে ছাতুর কলসী মাটিতে চুরমার হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সশব্যস্তে উঠিয়া দেখে ব্রাহ্মণীকে লাথি মারিতে গিয়া সে ছাতুর কলসীতেই লাথি মারিয়াছে—এবং আকাশে যত ফুল সে ফুটাইয়া তুলিতেছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। ম।



পাঠ বন্ধ।

অধোমুখে আজ বসে আছে সন্তু,
কারুরে কিছু না বলে,
ম্লান হয়ে গেছে হাসি ভরা মুখ,
আঁখি ভিজে উঠে জলে।
বড়ই লাজুক, বড় অভিমানী,
বড় অনুরাগী পাঠে;
পুলক তাহার ছাপায়ে পড়িত
ঘরে দোরে ঘাটে মাঠে
কতই যতনে বই খাতাগুলি
সাজায়ে রাখিত ঘরে,
মলাট লাগায়ে মিটিত না আশ
নাম লিখে থরে থরে
সাজায়ে দু তিন রঙের কালিতে
মলাটে আঁকিত ছবি
এক সাথে সে যে শিশু কারিকর
চিত্রশিল্পী কবি
পেনে পেন্সিলে দাগ কাটা তার
হারালে পড়িবে ধরা,
তাই এর লাগিয়া বাছিয়া রেখেছে
যে বই হয়েছে পড়া।

আজিকে এসেছে দারুণ খবর
কাকার নিকট থেকে,
পড়াতে তাহারে পারিবে না আর
টাকা দিয়ে দূরে রেখে।

পিতা নাই তার কোথা পাবে টাকা
কেবা দেবে তারে খেতে
কাকা লিখিয়াছে দেনা না করিয়া
ত্বরা বাড়ী ফিরে যেতে
সন্তু যবে আহা ছমাসের ছেলে
মারা গেছে তার পিতা
আজি সে প্রথম জানিতে পারিল
পিতৃহীনের ব্যথা
অভাগা কখনো দেখেনি পিতারে
তবু সে অজানা শোকে,
এতদিন পর আজিকে তাহার
জল দেখা দিল চোখে
চিঠি পেয়ে সন্তু দারুণ ব্যথায়
ঘরেতে বসিয়া একা,
প্রতি বইখানি উলটিয়ে দেখিছে
সকলি মমতা মাখা
সযতনে লেখা খাতাগুলি তার
কত বার নেড়ে দেখে,
প্রতিদিবসের কথাগুলি হায়
মনে পড়ে একে একে।
সরেনা যে মন, বই খাতাগুলি
অপরে বিলায়ে দিতে,
তা'রা যে তাহার দিবস রজনী
পরাণের প্রিয় মিতে।

তাহাদের পানে চাহে যতবার,
   ততবার সে যে ভাবে,
কেমনে এ পোষা কপোতগুলিরে
   উড়াইয়' দিয়ে যাবে
অবোধ শিশুব একি কাতরত,
   হতেছে তাহার মনে,
বাবা নাই তাব কাকা আজ তাবে
   পাঠালে নির্ব্বাসনে।

হায় মা ভাবতি! অভাব পীড়নে
   যে জন তোমারে ছাড়ে,
বেদনা তাহার বেজে কি উঠেনা
   তোমার [illegible] তাবে?
তুমি তাবে যেন কোলে তুলে নিয়ো
   ভুলোনাক কোনো মতে
মানস যাত্রী যে মবাল তব
   পড়িয় বহিল পথে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বিশ্বাসের ফল।

[যাহাকে জান-না, চেন-না, সহজে তাহাকে বিশ্বাস করিও না]

ব্রহ্মদেশের বনে কর্পূরতিলক নামে এক বৃহদকায় হস্তী ছিল। সেই বনে কতকগুলি শৃগালও থাকিত। শৃগালরা হাতীটিকে দেখিত, আর বলাবলি করিত, আহা! ঐ লোকটি যদি ঐখানে মরিয়া পড়িয়া থাকে ত কি মজাই হয়! চারটি মাসের খোরাক একেবারে মজুত হইয়া যায়। আর যেমন তেমন খোরাক নয়, ভুরি ভোজন! এমন বরাত কি আমাদেব হইবে যে এমন উপাদেয় মাংস আমাদের অদৃষ্টে জুটিবে।

তাহাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ শৃগাল ছিল সে বলিল—ভয় নাই। ও মরিবে, আমরাও ভোজন করিতে পাইব; কিছু ভাবিও না

এই বৃদ্ধের প্রতি তাহাদের খুব শ্রদ্ধা ছিল। তাহারা আশায় বুক বাঁধিয়া রহিল।

একদিন কর্পূরতিলক বনে শুইয়া আছে বৃদ্ধ শৃগালটি তাহার নিকটে গিয়া খুব ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল

কর্পূরতিলক ইহার ভক্তিতে তুষ্ট হইযা বলিল—তুমি কে বাপু? কি চাও?

শৃগাল করজোড়েই কহিল—মহারাজ! এ বনে কেহ রাজা নাই, রাজসিংহাসন খালি পড়িয়া আছে। তাই আমরা আপনাকে বরণ করিয়া সিংহাসনে বসাইতে আসিয়াছি।

বর্পূরতিলক ভাবিল, মন্দ কি বলিল, রাজসিংহসন কোথায় বাপু ?—শৃগাল বলিল মহারাজ আমার সঙ্গে আসুন, আমি পথ দেখাইয় লইয়া যাইতেছি

এখন শৃগালের মতলব ত ভাল ছিল না সে একটা কর্দম ক্ত জলাশয়ের উপর দিয়া চলিতে লাগিল ; সে ছিল হালক, তার উপর চলিতে পারে কিন্তু হাতী কাদায় বসিয়া গেল শৃগাল বলিল —আসুন, প্রভু, আসুন।

হস্তী যতই নড়িতে যায়, তাই বসিয় যায় বলিল—আমাকে উদ্ধার কর, না হলে যে আমি মরি শৃগাল বলিল —আমার লেজটি ধরুন মহারাজ, আর কি করিবেন ?



কিন্তু শৃগালের লেজ ধরিয়া ওঠা ত আর সম্ভব নয়। হাতী কাদায় পুঁতিয়া মরিয়া গেল ; শৃগালটা মনে মনে হাসিয়া বলিল—আমাকে বিশ্বাস করিয়া যে রাজ্যলোভে ছুটিয়া আসে, তাহার এই দশাই হয়।

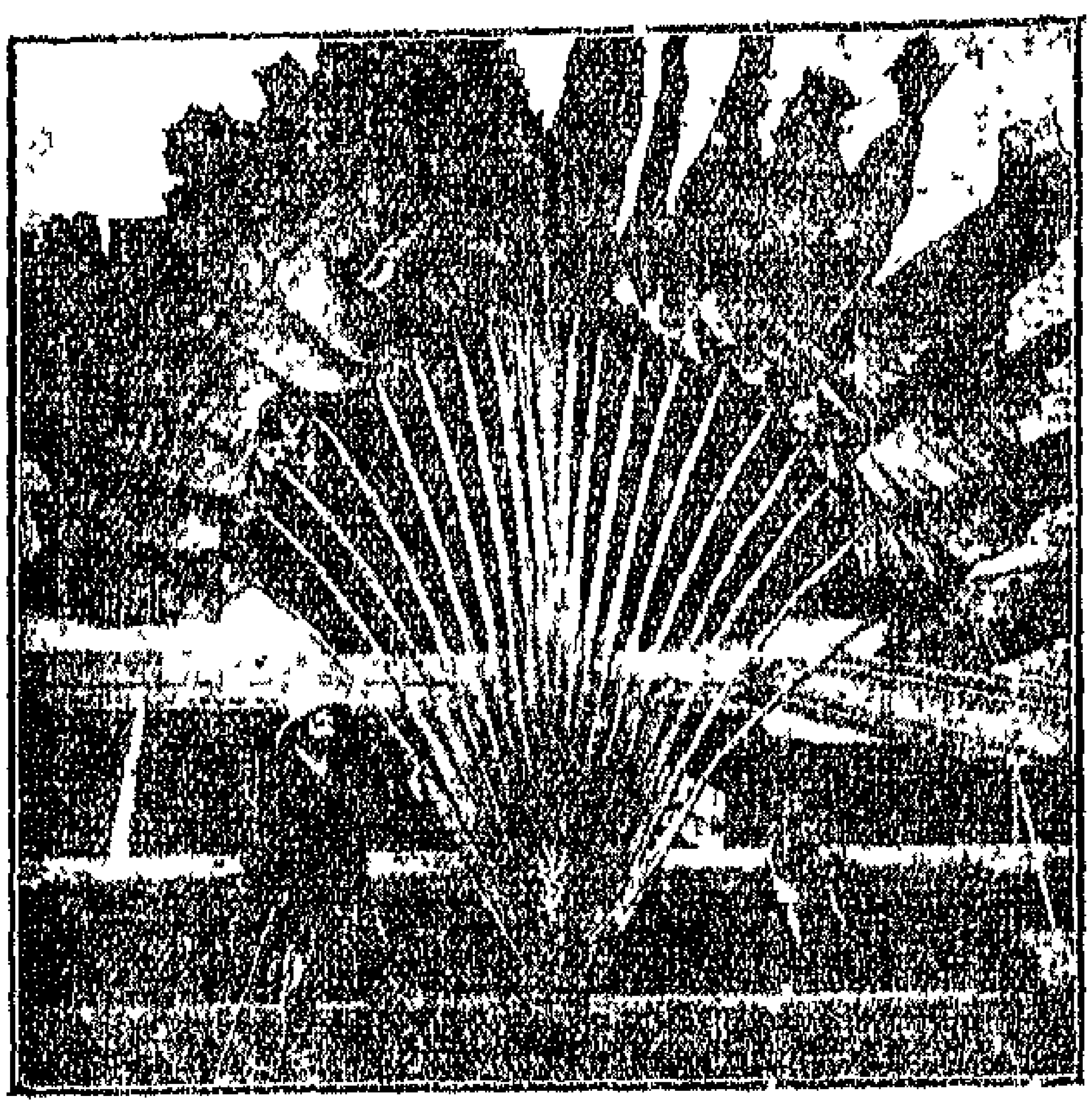
এই জন্যই লোকে বলে—

অসতের সঙ্গ কেহ না কোরো গ্রহণ।
অবশ্য হইবে তাতে তোমার পতন বি।

তাজ্জব !

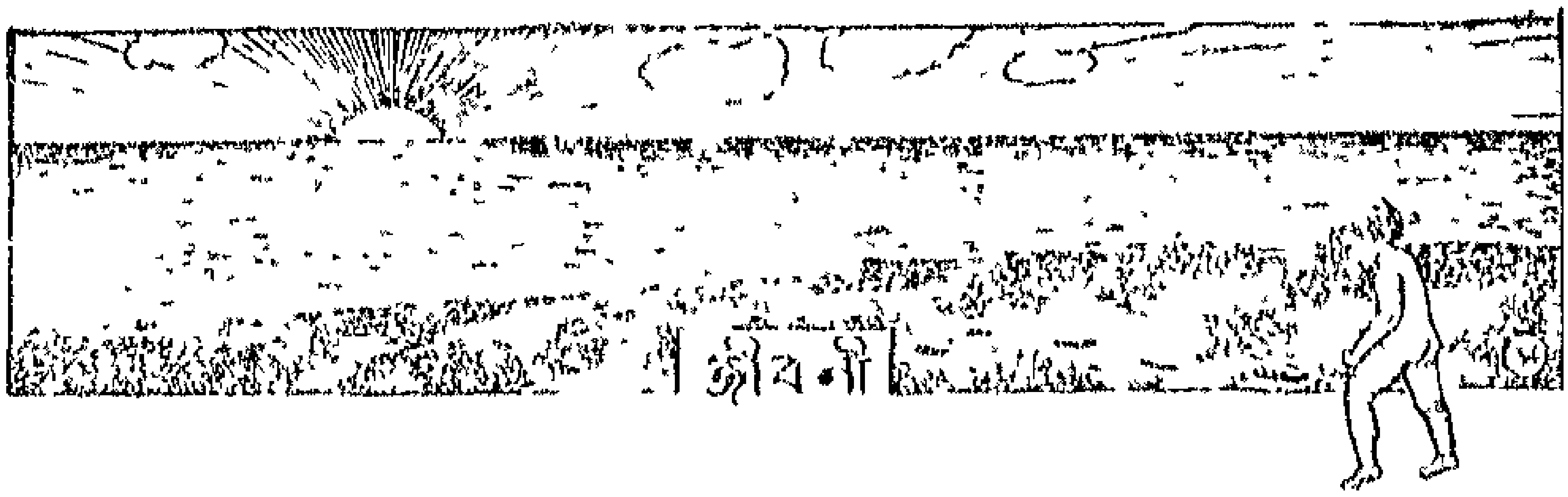
"পানি পাঁড়ে" গাছ।

রেল ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রী হাঁকে দেখিয়াছ, "পানি পাঁড়ে, এ পানি পাঁড়ে, ইধার, ইধার" অমনি বালতী আর লোঠা হাতে উর্দ্দি পরা "পানি পাঁড়ে" হাতে বা গ্লাসে জল ঢালিয়া দিয়া যায় সিঙ্গাপুরে একরকমের গাছ আছে, তৃষাতুর পথিককে অতি সুস্বাদু জল দান করিয়া থাকে। গাছটি দেখিতে অনেকটা তাল খেজুর গাছের মত, তবে তাল খেজুরের মত অত লম্বা নয় গুঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় বড় বেলদোর উপরে চওড়া পাতাগুলি রহিয়াছে দেখিতেছ ত। তালগাছেরও দেখিবে পাতাগুলি বেলদোর মুখেই থাকে।



এই গাছের বেলদোগুলি ফাঁকা তোমার তৃষ্ণা পাইয়াছে, ছুরি কি দা দিয়া একটা বেলদো কাটিয়া ফেল, অমনি দেখিতে পাইবে নির্ম্মল জল টলমল করিতেছে, তুমি তৃষ্ণা দূর করিয়া চলিয়া যাও সেখানকার অধিবাসীরা ঐ গাছের পাতার দ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে, পাতা পাতিয়া (আমাদের নিমন্ত্রণ বাড়ীর মত আর কি) ভোজন করিয়া থাকে পাতা গুলি এমনি শক্ত যে মুড়িয়া লইলে চামচের কাজও হয়।

আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি সিঙ্গাপুরে যাও, "পানি পাঁড়ে" গাছের জল খানিকটা খাইয়া আসিয়া কেমন লাগিল, খবর দিও। সিঙ্গারপুর এখান থেকে বেশী দূর নয় আর আজকাল সেখানে অনেক বাঙ্গালীও বাস করিতেছেন



মহম্মদ মহসীন।

কুঁড়ে ঘরে।

আমার বিশ্বাস দানবীর সাধু মহম্মদ মহসীনের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ এই মুসলমান সাধু পুরুষ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহসীন তখনকার কোন এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে হইয়া জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু পয়সা হিসাবে তাঁহার পিতামাতা ধনী ছিলেন না, তবুও মহসীন একদিন হুগলীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে একজন হইয়াছিলেন কোন ব্যবসা করিয়া নয়, চাকুরী করিয়া নয়, অন্য কোনও উপায়েও নয়;—দানে তোমরা বলিবে দান পাইয়া বড় লোক হওয়ার বাহাদুরী এমন কি? না ভাই, বাহাদুরী নাই। কিন্তু আমার এই আখ্যানটি শুনিয়া যদি বিচার কর আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তোমরা তোমাদের মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে

মহসীন বড় ঘরে জন্মিয়াছিলেন, বলিয়াছি। তখনকার দিনে বড় ঘরে পয়সা কড়ি যতই কম থাকুক, বাবুয়ানা, বিলাসিতার অভাব ছিল না। মহসীন শিশুকাল হইতেই এ সমস্ত ভালোবাসিতেন না—যখন অতি শিশু তখন যেমন তেমন একখানা বই ছিল তার সঙ্গী, বই পাইলে ছেলে আর কিছুই চাহিত না চাকর বাকরের কোলে চড়িয়া থাকা মহসীন পছন্দ করিতেন না, বরং একলা থাকিতেই ভালোবাসিতেন তবে তাহার সাত আট বছরের বড় একটি ভগ্নী ছিল, তাহার কোলে মহসীন বেশ থাকিতেন।

মহসীন বাঙ্গালাদেশের লেখাপড়া শেষ করিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে মক্কা, নজিফ্ নগরে লেখা পড়া করিয়া, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিলেন, কিন্তু হুগলীতে নয় তিনি ভারতের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন তিনি হজ করিয়া হাজী হইয়াছিলেন ফকির গৃহে বাস করে না, মহসীন ও গৃহে আসিলেন না। যখন তিনি বিদেশ যাত্রা করেন তখন তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, বিদেশে থাকিতেই সেই ভগ্নীটি বিধবা হইয়াছিলেন, মহসীন এ খবর রাখিতেন না বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকালে তাঁহার ভগ্নী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মহসীনকে দেশে ফিরাইলেন। নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য ভ্রাতার হাতে সমর্পণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ফকির মহসীন প্রকৃতপক্ষে রাজা হইলেন। ফকির রাজা হইয়া কি করিলেন জান? সে অনেক কথা, তত বলিবার স্থান এখানে কুলাইবে না। একটি ঘটনা বলিয়াই আজিকার মত কথা শেষ করিব।

মহসীন রাত্রে ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন কোথায় কে দুঃস্থ, অভুক্ত আছে খুজিয়া খুঁজিয়া তাহাদের অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেন, কিন্তু কখনো কাহাকেও জানিতে দেন নাই যে মহসীন আসিয়াছিলেন বা অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

একদা রাত্রে এক হিন্দু দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে এক দুঃখিনী জননী অনেকগুলি কাচ্ছা-বাচ্ছা লইয়া কান্নাকাটী করিতেছিলেন। তিন চারিদিন ইহারা খাইতে পায় নাই—জননী সারা-দিন পথে পথে ঘুরিয়া কিছুমাত্র ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাছারা মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে "ওমা খেতে দে মা"—মা'র দুটী চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি শুধু তাহাদের বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছেন মা ভাবিতেছেন, আমার মৃত্যু হইলে আর বাছাদের কষ্ট দেখিতে হয় না। হে ভগবান, আমাকে মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও।

এই সময়ে অকস্মাৎ অন্ধকার কুঁড়ে ঘর যেন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল জননী সম্মুখে মহসীনকে দেখিয়া কহিলেন—তুমি কি ভগবানের দূত, আমাকে যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেছ?—সত্যই তাঁহার মনে হইল, বুঝি তাঁহার সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনই তাঁহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইবে? আবার তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেগুলিকে জড়াইয়া ধরিলেন মা যে। সন্তান ছাড়িতে কি পারা যায়?

মহসীন বলিলেন—মা এই খাদ্য লও ছেলেদের খাইতে দাও, আর এই থলিশুদ্ধ টাকা লও, তোমার সংসার চালাইবে। আবার আমি আসিব।

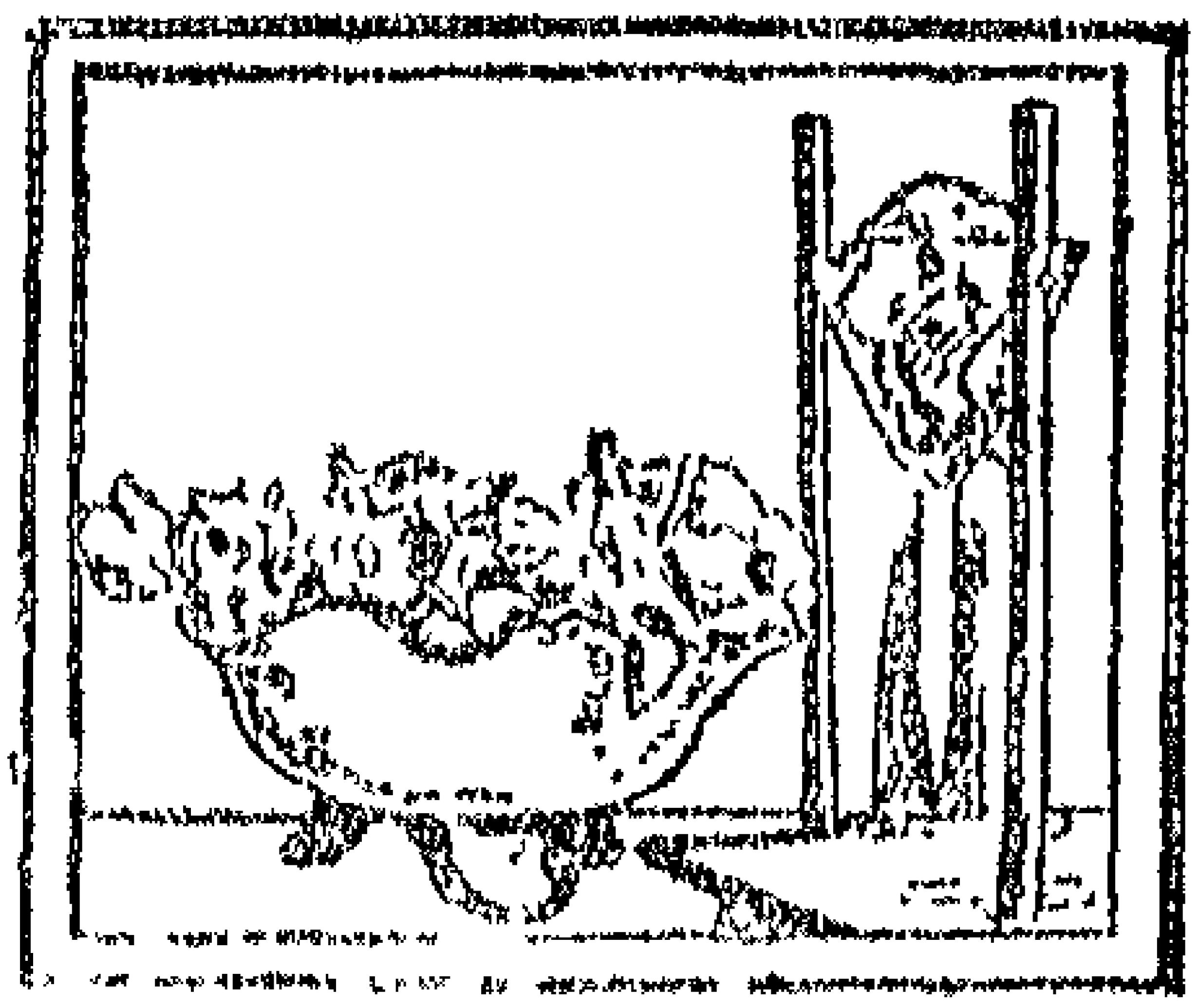
জননী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই ত ঠোঙ্গা ভরা খাবার, আর থলি ভরা টাকা। অশ্রু-পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কি দেবতা—আমাদের দুঃখ দেখিয় স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছ?

মহসীন বলিলেন—না মা, আমি দেবতার দাস। তোমার মতই একজন সামান্য মানুষ!

আর তাঁহাকে দেখা গেল না। আর কোন দিনই তিনি দেখা দেন নাই, তবে প্রায়ই প্রভাতে সেই সন্তানবতী রমণী দেবতা প্রেরিত টাকার থলি বিছানার শিয়রে দেখিতে পাইতেন, মাথার কাছে জানালাটি সে-দিন কি-জানি কেমন করিয়া খোলা থাকিত।

ফুলের গন্ধ ধরা

টাটকা ফুলের সুবাস ধরার যে একটি খুব সহজ উপায় আছে তাহা বোধ হয় অল্প লোকেরই জানা আছে। এই উপায়ে কোন বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার নাই। আগে একটি ফানেল যোগাড় কর। ফানেলের নীচের দিকটা ছুঁচোল হইয়া শেষ হইবে, আগায় ছিদ্র থাকিবে না। ফানেলটীকে খাড়া ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটা কিছু করিতে হইবে। ছবিতে, দুই পাশে দুইটি কাঠ ও তার দিয়া বাঁধিয়া খাড়া করা আছে। গোলাপ, বেলা, যুঁই প্রভৃতির মতন যে কোন সুগন্ধি ফুল তুলিয়া আন। ফুলগুলি খুব টাটকা হওয়া চাই। ফুটিবার পরই ফুলে গন্ধের তেজ থাকে। সেইজন্য সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলই সবচেয়ে ভাল। জলভরা একটি কাচের পাত্রে ফুলগুলি রাখিয়া দাও, তাজা থাকিবে। আচ্ছা, এইবারে খানিকটা বরফ আনিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফানেলে ভরিয়া দাও। ফানেলের নীচে একটি পাত্র বসাইয়া রাখ। বরফের উপর খানিকটা লবণ ছড়াইয়া দাও।

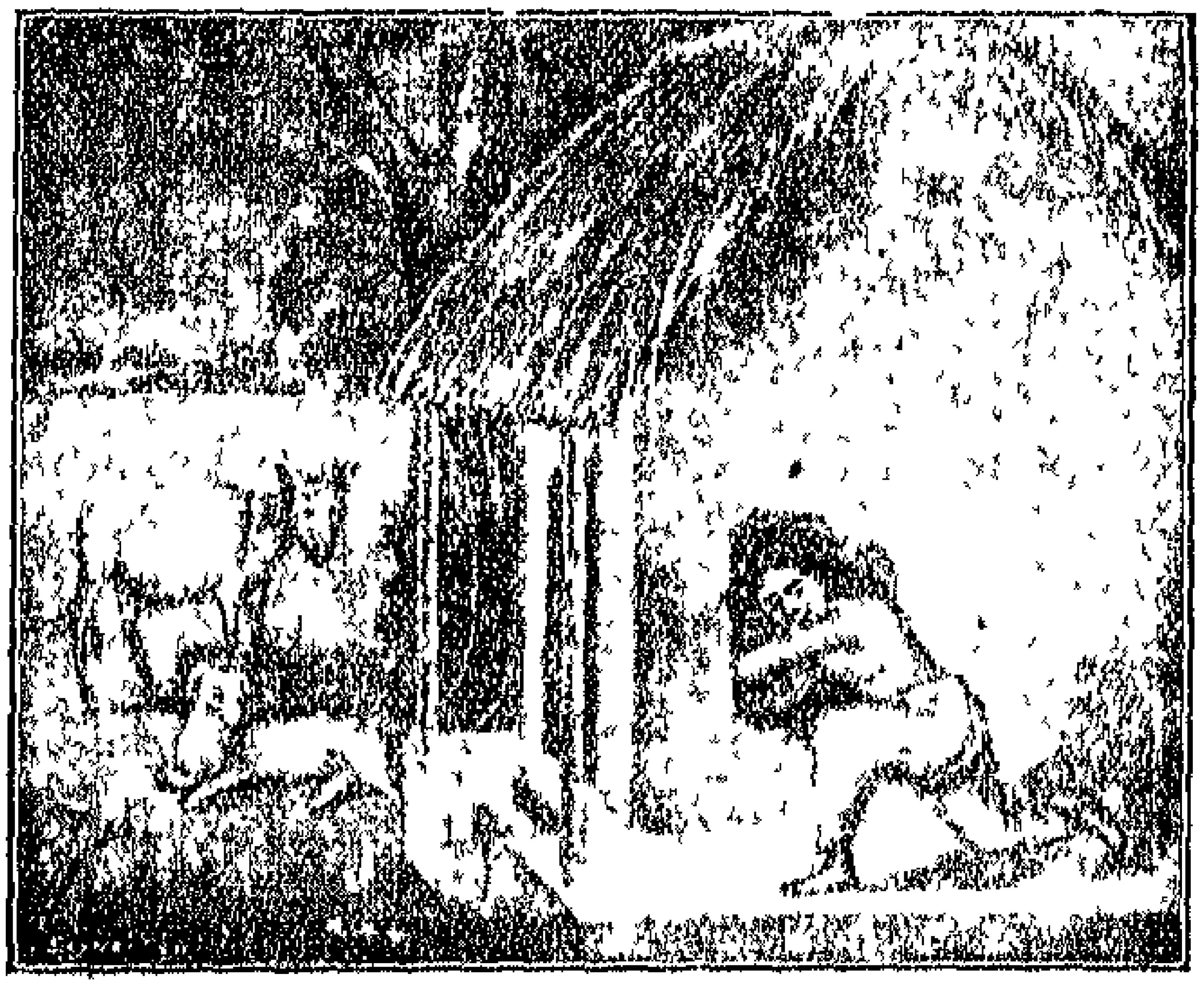


খানিকক্ষণ বাদে দেখিবে, বরফে ফানেল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে ও বাতাসে যে জল আছে, তাহা ফানেলের গায়ে জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাসে ফুলের গন্ধ এইবার ঐ জলের সঙ্গে মিশিতে থাকিবে। তার পর, জল ফানেলের গা বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নীচে রাখা পাত্রে গড়াইয়া পড়িবে। যথেষ্ট পরিমাণ সংগৃহীত হইলে উহার সহিত সমপরিমাণ সুরাসার (pure alcohol) মিশাইয়া বোতলে ভরিয়া রাখিয়া দাও। এই এসেন্স বহুকাল অবিকৃত থাকিবে। এই উপায়ে সকল প্রকার ফুলের সুবাস অনায়াসে ধরিতে ও ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে।

শ্রীধানি লঙ্কা।

অনধিকার চর্চ্চা

অযোধ্যা নগরে এক রজক ছিল, তার নাম কর্পূরপট। কর্পূবপটের একটি গাধা ছিল, সে কাপড়ের মোট বহিত ; আর একটি রোগা কুকুর কর্পূরপটেব উঠানে থাকিত, সে বজকের বাড়ী পাহাড়া দিত



চোর সিঁধ কাটিল।

একদিন রাত্রে একটা চোর আস্তে আস্তে আসিয়া ঘরের দেওয়ালে সিঁধ কাটিল। গাধা আর কুকুর দুজনেই তাহা দেখিতে পাইল চোর যখন সিঁধের ভিতর দিয়া ঘরে ঢুকিল, তখন গাধা বলিল—কি ভাই কুকুব, চোব ঢুকিয়াছে দেখিলে না ? মনিবকে না ডাকিয়া কেন এমন চুপ করিয়া রহিলে ?

কুকুর গম্ভীর ভাবে বলিল—ভাই গাধা। আমার কাজ আমি করি না কবি তুমি তার জন্য মাথা ঘামাইও না। আমি চিরদিন আমার কাজ করিযা আসিয়াছি, এখন কেন করি না ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ না কারণ গুরুতর। আমি সতর্ক থাকি বলিয়া অনেক দিন প্রভুব গৃহের কুটাটি অবধি চুরী হয় না—তাহাতেই মনিবও ভাবিতেছেন আর কুকুরটার দরকারই বা কি। আমাকে খাইতে দেওযা এক বকম বন্ধ করিয়াছেন।

গাধা চটিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বড় নেমকহারাম। চিবদিন তাঁব খাইয়া মানুষ হইলে, এখন কিনা এই কথা বলিতেছ। আচ্ছা, থাক তুমি। আমিই তাঁহাকে ডাকি—বলিয়া গর্দ্দভ তার সব-চিন্ মিহি সুর ছাড়িতে লাগিল তার সে সুরে চোরত চোর বনের শিয়াল কুকুরও পলায়ন করিতে লাগিল

কর্পূরপটেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে রাগে চোখ লাল করিয়া বাহিরে আসিয়া

দেখিল, কেহ কোথাও নাই, গাধাটা চেঁচাইয়া মরিতেছে। রাগের মাথায় কপ্ করিয়া একটা কাঠ ছুঁড়িয়া মারিল। কাঠটা গাধার মাথায় পড়িতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সেই যে কথায় বলে,

যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে

—তাই [illegible] দেখা যায়।

সিংহ হৃদয় রিচার্ড। (কৌতুগাং —৪)

রাজার নাম ছিল, রিচার্ড, কিন্তু লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল লায়নহার্ট। অর্থাৎ সিংহ-হৃদয়। সিংহ বলতে যা বুঝায়, রিচার্ডের প্রকৃতি প্রকৃতি ঠিক সেই রকমেরই ছিল। সিংহের মত বিক্রম, সিংহের মত তেজ কিছুরই তার অভাব ছিল না। তোমরা হয়ত অনেকেই জান, পশুরাজ সিংহ প্রবল ক্ষুধার সময়েও দুর্ব্বল বা নিরীহ জন্তুকে বড় একটা বধ করে পেট ভরান না। সিংহ হৃদয় রিচার্ড ও দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার করতেন না।

তাঁর ভাই জন্ ষড়যন্ত্র করে' রিচার্ডকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে বসবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, তাতে করে' রিচার্ডের অনেক ক্ষতিও হ'য়েছিল, কিন্তু জন্ ধরা পড়তে তাঁর মা যেমন এসে দাঁড়ালেন রিচার্ড জনকে মুক্তি দিলেন।

এই সিংহসম রিচার্ড তাঁর রাজ্যমধ্যে যেমন ভক্তি ও পূজা পেতেন, তাতে তাঁর যারা পরম শত্রু ছিল, তারাও এই মহৎ অন্তঃকরণ শত্রুকে শ্রদ্ধা না করে পারত না। মহৎ যে, ক্ষমাশীল যে, আশ্রিত বৎসল যে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করবে কে? রিচার্ডের মহত্ত্বের একটি বিশেষ ঘটনা তোমাদের বলি, শোন

তাঁর একজন অমাত্য ভিদোমার একবার তাঁর নিজের সম্পত্তির মধ্যেই কিছু খনিজ রত্ন পান। খনিজ রত্নে রাজারই অধিকার থাকে। ভিদোমার রাজাকে কিছু না দিয়ে সবটাই আত্মসাৎ করেছিলেন। খবর পেয়ে রিচার্ডের রাগ হ'ল। তিনি কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভিদোমারের প্রাসাদ অবরোধ করতে গেলেন। একদিন সকালে রিচার্ড ঐ প্রাসাদের প্রাচীর পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছেন যে কোথা দিয়ে আক্রমন করবেন, হঠাৎ কে অলক্ষ্য থেকে তীর ছুঁড়ে রাজার স্কন্ধদেশ বিদ্ধ করলে। রিচার্ডের মত বীরের অঙ্গে শরাঘাত এমন বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সে আঘাত ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠে শেষে মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়ালো

ভিদোমারের প্রাসাদ রাজার হস্তগত হ'ল, যে লোকটা রাজাকে তীর মেরেছিল, সেও ধরা পড়ে গেল—সে গর্দ্দন। রাজা তখন খাটে শুয়ে, ওঠবার ক্ষমতাও নাই। গর্দ্দনকে রাজার

সামনে হাজির করতে রাজা বল্লেন—রে দুর্ব্বৃত্ত। তুই কে? কেন আমায় মারলি? আমি তোকে চিনি না, জানি না, তোর কোন ক্ষতিও করি নি ত। আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা কেন?

গর্দ্দন বল্লে—তুমি নিজের হাতে আমার বাপ, আমার দুটি ভাইকে হত্যা করেছ। তারই প্রতিশোধ এতদিনে আমি নিলাম সে শাস্তি যত কঠিনই হউক, আমাকে তুমি দাও। আমি যে তোমার গায়ে তীর বিদ্ধ করেছি এরই আনন্দে সে সমস্ত, হাসি মুখেই আমি সহ্য করব

রিচার্ড আস্তে আস্তে বল্লেন—যাও প্রহরীদের বল্লেন, ওকে ছেড়ে দাও। কোষাধ্যক্ষকে হুকুম দিলেন—একশ' টাকা ওকে দিয়ে দাও।

গর্দ্দন তাতে রাজী হ'ল না

মুমূর্ষু রাজা কাতরস্বরে বল্লেন—যুবক, আমার দান প্রত্যাখান কর না —আর তিনি বলতে পারলেন না, তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল

কিন্তু তাঁর লোকজন তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে না রাজার হত্যার অপরাধে গর্দ্দনকে মেরে ফেল্লে

তা ফেলুক, রাজা ত তা'কে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে' গেছলেন সিংহহৃদয় রিচার্ড আপন হত্যাকারীকেও অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।

বি।

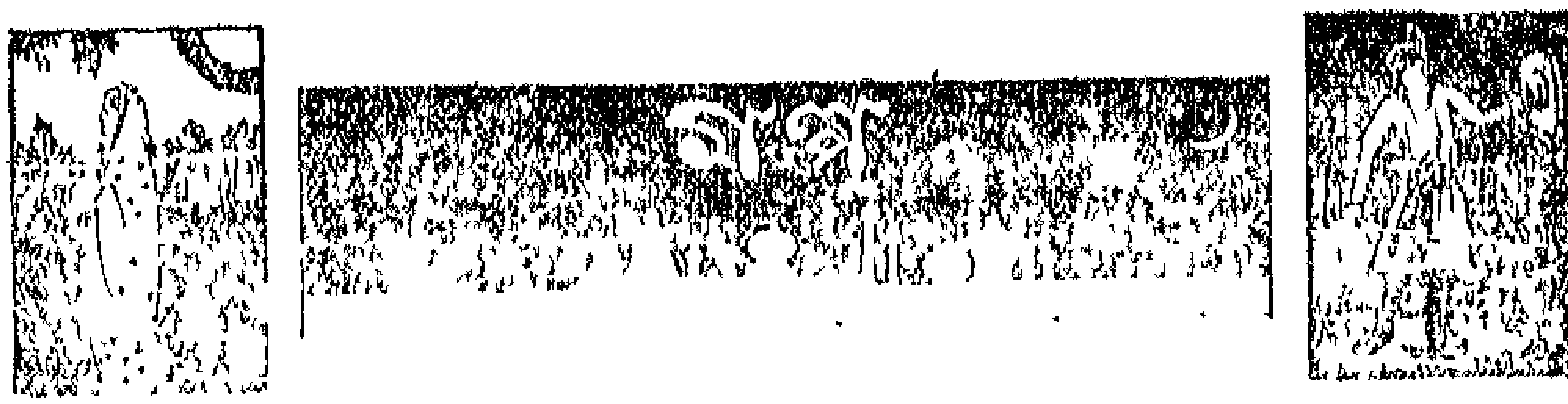
হাতীর স্নান

নদনদীর জলে লুটোপাটি করে অবগাহন করে বনের হাতী যে সুখ পায়, বেচারী পোষা হাতীর ভাগ্যে সে সুখ আর জোটে না, যদিও মাঝে মাঝে তাকেও স্নান করান হয়

পোষা হাতীকে স্নান করান বড় খরচ স্নানের সমস্ত খুঁটিনাটি আয়োজন করতে হপ্তাখানেক লাগে স্নান করাতে তিনজন লোক ও প্রায় হাজার টাকা খরচ লাগে। এত টাকা খরচ করা সোজা নয়,—তবে সার্কাসের কর্ত্তারা বাধ্য হয়ে খরচটা করে থাকেন, কেননা হাতীর চেহারাটা 'চেকনাই' রাখা তার সার্কাসের জন্য দরকার।

স্নানটা কি রকম করে করান হয় তা এইবার বলি। প্রথমে হাতীর ঐ পর্ব্বত প্রমাণ গায়ে বেশ করে ভাল সাবান মাখান হয়। এতে কত সাবান লাগে জান? প্রায় দু মণ। বাপ! কাণ দুটোতে আবার অন্য জায়গার চেয়ে বেশী করে মাখাতে হয় জলে গা ধোওয়া, তারপর শুখালে সিরিস কাগজ দিয়ে গা ঘসে দেওয়া হয় উঁহু, তাতে রক্তটক্ত কিছুই বেরোয় না! তার পর, ধূসর চামড়াকে মোলায়েম ও তেলচকচকে করবার জন্যে, গা'ময় খাঁটি সর্ষের বা জলপাইএর তেল উত্তম করে মাখিয়ে দেওয়া হয়। এইরূপে হাতী প্রভুর স্নানপর্ব্ব সমাপ্ত হয়। এই স্নানপর্ব্বে তেলের খরচটাই নাকি সবচেয়ে বেশী কত? এই শ পাঁচেক টাকা আর কি?

শ্রীধানি লঙ্কা।



দেড় আঙ্গুলে।

একজন ছিলেন রাজা, তাঁর মত লোভী সে রাজ্যে আর কেউ ছিল না। টাকা টাকা করেই রাজার দিন কাটত, না পারতেন রাজ্য চালাতে, না পারতেন প্রজাদের দুঃখ কষ্ট মোচন করতে যে দেশের রাজা এমন, সে দেশের প্রজাদের সুখের কথা আর কি বলব? তারা দিনরাত চোখের জল ফেলতো; যাদের একটু আধটু উপায় ছিল, তারা প্রায়ই অন্যরাজার দেশে গিয়ে চালচুলো বেঁধে বাস করছিল, কেবল যারা নেহাৎ অক্ষম, তারাই নানানখানা উপদ্রব সয়ে পড়ে ছিল

এখন এক বুড়ো চাষার ঘরে একটা মেয়ে ছিল তার নাম ছিল মালতী। তেমন মেয়ে চাষার ঘরে যে কেমন করে জন্মেছিল, কে জানে! সে যেন সত্যি একটি ফুল, আর যেন একেবারে স্বর্গের দেবীটি! রাজ্যের লোক যারা তাকে দেখেছিল, বলত সে কোন শাপভ্রষ্টা দেবীই হবে মালতী ছিল ভারি চালাক, আর খুব বুদ্ধিমতী প্রতিবেশী, আত্মীয় বন্ধুদের ওপর রাজার ও তাঁর অনুচরদের অত্যাচার অবিচার দেখে বেচারা মনে ভারি কষ্ট পেত

একদিন সে তার বুড়ো বাপকে দিয়ে বলে পাঠালো যে রাজার ত খুব টাকার দরকার. তা আমি পাথরকে "সোনার পাথর" করে দিতে পারি।

হাঁ?? কৈ, সে মেয়ে কৈ?—রাজা হাঁকলেন

মালতী আসতেই রাজা একটা ঘরে তাকে পুরে চার ঝুড়ি পাথর রেখে বলে গেলেন এইগুলো সব করা চাই; নইলে ছাড়ান পাবে না কারাগারে পুরব। আমার সঙ্গে চালাকি!

রাজা বাইরে থেকে ঘর বন্ধ করলেন। মালতী দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেল্লে। কেন সে চালাকি করতে এসেছিল। যে সে রাজা নয়, তাকে ছেড়ে দেবে-এমন তার মনে হ'ল না।

সে কাঁদচে, খুব কাঁদচে।

"কি গো মালতী সুন্দরী! বলি কাঁদ কেন গো?"

মালতী মুখ তুলে দেখে একটা এতটুকু মানুষ, ভূতের মত দেখতে, তার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে "কাঁদ কেন গো? বলই না ছাই।"

মালতী বল্লে, রাজার হুকুম এই পাথর গুলোকে সোণার চ্যাঙ্গর করতে হ'বে হ্যাঁ গো, তা কি কখনো হয়!—সে আবার কাঁদতে লাগ্‌লো।

ছোট মানুষটি বল্লে—বটে! তারই জন্যে কান্না! তা আমি যদি করে দিই, আমাকে কি দেবে বল দেখি শুনি আগে।

"আমার এই চুড়ী ক'গাছা"

অবশ্য চাষার মেয়ে, তার চুড়ী, সোণারও না, হীরে জহরতের ত নয়ই ছোট মানুষ কিন্তু তাতেই রাজী হ'য়ে গেল। সে এক কোণে বসে ঝুড়ি চারটে নেড়ে চেড়ে চুড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মালতী অবাক্! রাজা এসে হেসে বল্লেন বাহ্! বাহ্! কিন্তু ছাড়লেন না, লোভ বেড়ে গেল। আর চার ঝুড়ি দিয়ে গেলেন।

মালতী ভাবতে লাগল, আর কাঁদতে লাগ্‌ল।

ছোট মানুষটি আবার এল। গুঁড়ি মেরে আবার হাস্য করে বল্লে—দিচ্ছ কি বল এবার?

মালতী দেখলে কাণে তার দুটো মাকড়ী আছে, বল্লে—মাকড়ী দুটো।

ছোট্ট মানুষ খানিক পরে মকড়ী নিয়ে চলে গেল

রাজা এলেন খুসী হলেন, কিন্তু ছাড়লেন না, বল্লেন, আর ঝুড়ি চারখানা,

রাজা চলে যেতেই ছোট্ট মানুষ ঘরে ঢুকে বল্লে—দিবে কি বল শুনি?

মালতী কেঁদে ফেল্লে, বল্লে—দেব কি! আছে কি আমার?

ছোট্ট মানুষ বল্লে তবে এক কাজ কর যখন তুমি রাণী হবে, তোমার যে প্রথম ছেলেটি হবে, আমায় দেবে বল?

রাণী হব? হাঃ হাঃ

না হও—দিও না, যদি হও দেবে ত?

হাঁ।

রাজা পরদিন সকালে এসে আবার চার ঝুড়ি সোনা পেয়ে ভাবলেন, অমন মেয়েকে ছাড়া হবে না, বাবা! কার ঘরে যাবে, গিয়ে সোনা ছড়াবে। রাজা মালতীকে বিয়ে করে ফেল্লেন।

সে হল রাণী মালতী, সোনার গাঁদি।

বছর দেড়েক পরে রাণীর ছেলে হল। রাজপুত্রের জন্মে রাজ্যমধ্যে একেবারে সমারোহ পড়ে গেল। রাজার আগেকারও রাণী ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাই রাজ্যমধ্যে অনেক দিন ধরে খুব আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। তার সেই স্রোতে ভেসে গেল—মালতীর মনের সেই সব কথা।

একদিন রাজা গেছেন মৃগয়ায়। রাত্রে রাণী সোনার খাটে শুয়ে, পাশে সোনার কটে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সোনার ঘুম ঘুমোচ্ছেন—হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে দেখেন সেই ছোট্ট মানুষটা!!!



সেই ছোট্ট মানুষটা।

রাণী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে উঠে বসলেন। ভয়ে তাঁর মুখখানি সাদা হয়ে গেল। ছেলে ত কিছু জানে না, সে মার কোলে বসে হাস্‌তে লাগল।

ছোট্ট মানুষটা রাজপুত্রকে চুমু খেয়ে বল্লে—মালতী! একে নিয়ে যাই!

ভয়ে দুঃখে রাণীর গলার মধ্যে জিভ্ ঢুকে গেল, হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। তাঁকে কাঁদতে দেখে, অনুনয় বিনয় শুনে ছোট্ট মানুষটার বুঝি একটু দয়া হল। বল্লে, আচ্ছা

দু' রাত্রি সময় রইল, আমি কে যদি বল্‌তে পার তবেই আমি ছেলে তোমায় দিতে পারি, নইলে নিয়ে যাবই—যাব। সে চলে যেতেই রাণী যত নাম মনে পড়ে তত আওড়াতে লাগ্‌লেন

রাম, শ্যাম, যদু মধু, পদা, গদা, সদ, হাঁদা, কানন, আনন, ইলিস্‌, পুলিস্‌, ভেঁটকী শুঁটকী এমনি কত কী। কিন্তু একটাও মনের মত হল না।

পরের রাত্রে ছোট্ট মানুষটা এসে নাম জিজ্ঞাসা করলে; মালতী বল্লে—সতীশ।

ছোট্ট মানুষ বল্লে—না। কাল যদি না বল্‌তে পার, বুঝেছ?

মালতী সারা রাত চোখের জলে বুক ভাসালে। কিন্তু নাম ঠিক হল না।

ভেবে চিন্তে পরের দিন উপোস করে রাণী লোকজন নিয়ে "বন-কালীর" পূজা দিতে গেলেন মা-কালী যদি রক্ষা করেন—নইলে এ সঙ্কটে কে আর তাঁকে রক্ষা করবে।

পূজা দিয়ে ফিরছেন, সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, পাল্কী চড়ে ফিরছেন, দেখ্‌তে পেলেন—একটা পাহাড়ের উপরে কে একটা লোক খুব নাচ্‌ছে, কুঁদছে বল্‌ছে,—

কালকে পা'ব রাজার ছেলে,
রাখব তারে মাথায় তুলে—
তা ধিন্ তাক্ ধিন্ তা।
রাজার বেটা বল্‌বে ব বা,—
পরশু যাব দেশে চলে।
তা ধিক্—তাক্ ধিক্ তা।
রইব না আর—দেড়-আঙ্গুলে।

রাণী বাড়ী ফিরলেন।

আবার গভীর রাত্রে ছোট্ট মানুষ ঘরে ঢুকে ডাক্‌লে—রাণী।

রাণী বল্লে—কি গা দেড়-আঙ্গুলে? কি বল্‌ছ?

শুনে দেড়-আঙ্গুলে হাত কামড়াতে কামড়াতে চলে গেল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

ঠাকুরদাদার বিয়ে।

[১]

ঠাকুরদাদার খেয়াল হ'লে,
কর্ব্বে আবার বিয়ে;
নতুন ক'রে বরটি সেজে,
টোপর মাথায় দিয়ে

[২]

লাঠি ধরে চলেন তিনি,
এমনি গেঁটে বাত;
বয়স তখন মোটে তাহার
আটের কোঠে সাত

[৩]

একুশটি তার নাতি পুতি,
ন'টি জোয়ান ছেলে;
মদ্দমদ্দ জামাই গুলে,
হাড়ি হাড়ি গেলে

[৪]

এমন ধারা ঠাকুরদাদার,
পড়লো হঠাৎ মনে;
এমন করে দিন কাটে না,
চাই গো একটি ক'নে



ঘটক এলো ঘটকি এলো।

[৫]

ঘট্‌ক এলো ঘট্‌কি এলো,
পড়লো মহাধুম;
ক'নের জন্যে ঠাকুরদাদার,
হয়না রাতে ঘুম।

[৬]

পছন্দ আর হয় না কিছু,
মুখটি সদাই ভার;
ছেলে জামাই পাগল হ'লো,
ধমক খেয়ে তাঁর।

[৭]

বাপকে কি যে বলবে তার,
পায় না ভেবে ছাই;
ঠাকুরদাদা কচ্ছে কেবল,
কনে আমার চাই।

[৮]

ঘটক ঘটকি ঘুরে সারা,
পায় না খুঁজে ক'নে;
ঠাকুরদাদার তাইতো ওগো,
সুখ নাইকো মনে

[৯]

দিনের প'রে দিন চলেছে,
রাত চলেছে খাসা;
ঠাকুরদাদার এমনি বরাত,
মিটছে না আর আশা।

[১০]

মাসটা সেটা ফাগুন বোধ হয়,
হ'লো সাঁঝের বাতি;
ঠাকুর্দ্দাকে ঘিল্লে এসে,
একটি পাল নাতি।

[১১]

বল্লে সবাই ঠাকুর্দ্দা গো;
চলো শুভক্ষণে;
তোমার জন্যে আমরা সবাই,
ঠিক করেছি ক'নে।

[১২]

নাতির কথায় ঠাকুর দাদা,
আহ্লাদে আটখান;
ফোক্‌লা মুখে হাসির লহর
বিয়ে কর্ত্তে যান।

[১৩]

অনেক দিনের ভাঙ্গা টোপর,
একটি ছিল ঘরে;
নাতিরা সব সেইটা এনে,
পরিয়ে দিলে বরে

[১৪]

ঠাকুরদাদা তাতেই খুসি,
টোপর মাথায় দিয়ে;
বরটি সেজে হলেন বাহির,
নাতির পাল নিয়ে

[১৫]

বাইরে ছিল চারপায়ার এক
দড়ির ছাউনি বাঁধা;
নাতিরা সব বলে চড়ো,
এতেই ঠাকুরদাদা।

[১৬]

চুপটি ক'রে বসে থাক,
আজকে তুমি বর;
এতেই করে যাব তোমায়,
নিয়ে শ্বশুর ঘর।

[১৭]

তাতেই রাজি ঠাকুরদাদ,
বসলে উঠে খাটে ;
বললে "এতে মলে মানুষ,
যায় যে শ্মশান ঘাটে "

[১৮]

"এতেই করে যাওয়া বিধি,"
বললে নাতির দল ;
"তোমার মতন ঠাকুরদাদার
থাকলে বিয়ের ফল "

[১৯]

চারদিকেতে পড়ে গেল,
বেজায় গণ্ডগোল ;
খাট তুললে নাতিরা সব
দিয়ে হরিবোল

[২০]

হরিধ্বনি শুনে দাদার,
চমকে উঠে পিলে ;
হরিধ্বনি দিচ্ছে কেন,
আজকে সবাই মিলে।

[২১]

বললে "ওরে শালারা সব,
আজকে আমার বে ;'
হরিধ্বনি থামা শালা,
উলুধ্বনি দে।

[২২]

নাতিরা সব বললে হেকে,
মুচকি হাসি ঠোটে ;
"তোমায় বিয়েয় উলুধ্বনি,
মানায় নাকো মোটে।

[২৩]

তোমার বিয়ের উচিত সেট,
হচ্ছে হরিবোল ;
বরের মতন থাক ব'সে,
কচ্ছো কেন গোল।

[২৪]

যাচ্ছি তোমায় বিয়ে দিতে,
নিয়ে শ্মশান ঘাটে ;
ঘটা করে বিয়ে দেব,
আগুন আর কাটে "

[২৫]

যেমনি শোনা এই কথাটি,
অমনি ব'লে—বাপ।
খাট থেকে ত ঠাকুরদাদা,
দিলেন একটি লাফ।



দিলেন একটি লাফ

[২৬]

মাটির উপর পড়লেন তিনি,
হয়ে কোলা ব্যাং ;
বিয়ে কর্ত্তে ঠাকুরদার,
ভাঙ্গল একটি ঠ্যাং

[২৭]

নাতি পুতি থাকতে যিনি,
বিয়ে কর্ত্তে যান ;
ঠাকুরদাদার মতন তিনি,
এমনি ফল পান।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

ব্রতকথা

পৌষমাসে লক্ষ্মীপূজা

ননদ ভাজের কথা।

এক দেশে এক বামুন আর বামনী ছিলেন তাদের পাঁচটী ছেলে আর একটী মেয়ে। বামুন সারা দিন ভিক্ষে করে যা কিছু পান তাই দিয়ে অতি কষ্টে সংসার চালান। কাজেই বামুন বামনীর অতি কষ্ট ভিক্ষায় কি আর দিন চলে—তার উপর অতগুলি ছেলে

মেয়ে। যাহোক এক বেলা খেয়ে তাদের দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। সেই সময় ব্রাহ্মণ হঠাৎ একদিন জ্বরে মারা গেলেন। পাঁচটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিয়ে বামনীর মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়লো। মেয়ে ও ছেলে কয়টাকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবেন ভেবেচিন্তে কোন কিছু তেমন সুবিধে হলো না। তিনি তো আর এ গাঁ সে গাঁ করে করে ভিক্ষে করে বেড়াতে পারছেন না— তিনি মেয়েমানুষ পথ চলা যে তার অভ্যাস নেই। এক গাঁয়ের লোকে আর কত ভিক্ষে দিবে। দু'একদিন পর থেকেই ছেলেমেয়েদের উপোস আরম্ভ হ'লো। ছোট ছোট ছেলেরা খিদে পেলেই মার কাছে 'খিদে পেয়েছে' বলে কান্না আরম্ভ করে—তারা তো আর বোঝে না তাদের কি অবস্থা। বামনী কি আর করবেন—ছেলেদের বুকে করে ঘরে চোখের জলে ভাসেন, তাই তাঁর সম্বল—এমন একটা ক্ষুদও নেই যে তাই দিয়ে ছেলেদের ভুলাবেন। চোখের জল ফেলে ফেলে তাঁর চোখের জলও ফুরিয়ে এল— তবুও তিনি দিনরাত কাঁদেন আর এই বলে মা লক্ষ্মীকে দুঃখ জানান,

মা লক্ষ্মী, আমার প্রতি কৃপা চোখে চাও।
ছেলেমেয়ের জন্যে আমায় ক্ষুদ কুঁড়ো দাও॥

এইভাবে তাঁদের অনাহারে দিনের পরে দিন কেটে যেতে লাগলো—কিন্তু লক্ষ্মী ঠাকরুণের বামনীর প্রতি একটুকুও কৃপা হলো না। শেষে বামনীর কোলের ছেলেটা না খেয়ে কেঁদে কেঁদে মারা গেল। বামনী ছেলের জন্যে বুক চাপড়াতে লাগলেন— কত চোখের জল ফেললেন কিন্তু তাতে সে আর ফিরে বাঁচে না। বামনীর সব চেয়ে বেশী চিন্তা হ'লো এখন কি ছেলেমেয়ে ক'টাকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখেন। বামনী বোসে বোসে কাঁদেন আর সেই চিন্তাই করেন— কিন্তু কোন উপায়ই দেখতে পান না। একদিন বামনী মনের দুঃখে বসে বসে কাঁদছেন— সেই সময় তাঁর মেয়েটী এসে বল্লে,—"মা এমন করে বসে বসে কাঁদলে তো আর কোন ফল হবে না। আমাদের মামা মামীরা তো বড়লোক, যাও না একবার তাদের কাছে—তাঁরা আমাদের দুঃখের কথা শুনলে নিশ্চয়ই একটা কোন ব্যবস্থা কর্ব্বেনই কর্ব্বেন।"

আর যখন কোন উপায় নেই তখন বামনী আর কি করেন,—ছেলেমেয়েকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একদিন সকালে কাঁদতে কাঁদতে ভাইয়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দুঃখীকে কেউ দয়া করে না। ভাই বোনের অবস্থার কথা সবই জানতো। বোন যে কেন তার কাছে এসেছে তাও বুঝতে বাকি রইলো না। সে বোনকে দেখে দুর দুর করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল—পাছে কথা কইলে একমুঠো চা'লও দিতে হয়—

তাই কথাটী পর্য্যন্ত কইলে না। বামনী ভাইএর আচরণ দেখে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিলেন—তাঁর ভাজ তাকে ডেকে বল্লে,—"ঠাকুরঝি, সত্যিই তোমার বড় কষ্ট—তা তুমি এক এক কাজ করো না কেন? আমার বাড়ীতে তো চাল ডাল ঝাড়বার জন্যে একজন লোকের দরকারই, তা না হয় তুমিই সেই কাজ কর ডাল ঝাড়ুনীরা যত ঝাড়তে পারে তত কাজ তোমার দ্বারা হবে না—তা মরুকগে যাক্—হাজার হক্ তুমি আমাদের আপনার জন—না হয় একটু লোকসানই হবে। তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ ত আর ভিন্ন নয় তুমি তাই কর আমাদের চা'ল ডাল গুলো ঝেড়ে দিয়ে তার ক্ষুদ কুঁড়ো গুলো নিয়ে যেও—তাইতে তোমার ছেলেমেয়েদের একমুটো একমুটো—যাহক্ এক রকম করে হবে।"

বামনী তাতেই সম্মত হলেন—না হয়ে আর করেন কি রোজ ভাইএর বাড়ীতে চাল ডাল ঝাড়েন আর ক্ষুদ কুঁড়োগুলি আঁচলে বেঁধে নিয়ে যান, আর সিদ্ধ করে ছেলে-মেয়েদের খেতে দেন বামনীর দিন এই ভাবে কাটে— তাঁর দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই। তবুও তিনি যখনই একটু সময় পান, তখনই লক্ষ্মীঠাক্রুণকে কেঁদে বল্লেন,—

লক্ষ্মী ঠাক্রুণ, লক্ষ্মী ঠাক্রুণ, কৃপা চোখে চাও।
ছেলেমেয়ের জন্যে আমায় ক্ষুদ কুঁড়ো দাও

এই ভাবে বামনীর দিন কাটে—একদিন বামনী তাঁর ভাজকে বল্লেন,—বউ তোমার তো মাচা ভরা লাউ ঝুলছে, যদি আমায় একটী দাও তা হ'লে আজ ছেলেমেয়েকে রেঁধে খাওয়াই।"

বামনীর কথা শুনে তাঁর ভাজ বল্লে, "ঠাকুরঝি, লাউ তো তোমায় দিতে পারিনে, পাছে চুরি কর বলে তোমার ভাই এক এক করে সব গুণে রেখেছেন তবে যখন তুমি মুখ ফুটে চেয়েছ তখন নাও বলতে পারিনি তা তুমি এক কাজ কর, আমার মাথার উকুন গুলো বেছে দাও, তার বদলে তুমি একটা লাউ নিয়ে যাও"

এখন সে দিন ছিল লক্ষ্মীবার। বামনী সে দিন উকুন বাছেন কেমন করে? তাই তিনি তাঁর ভাজকে বল্লেন, "বউ আজ বেস্পতিবার—আজ লক্ষ্মী পূজো। আজ কেমন করে তোমার উকুন বাছি? আজ লাউটী দাও কাল এসে তোমার উকুন বেছে দিয়ে যাব।"

বামনীর কথায় ঠাকুরঝির ভাজ একেবারে রেগে আগুন। তিনি মুখটুক বেঁকিয়ে বল্লেন, "যার ঘরে এক মুটো খুদ নেই তার আবার লক্ষ্মীবার কিসের? পৃথিবীর ধারাই এই। যার যত ভাল করা যায় তারই তত তেজ বাড়ে।"

এই কথা না বলে সে ছুটে এসে বামনীর হাত থেকে খুদ কুঁড়োর পুঁটলীটা কেড়ে নিয়ে তাঁকে দূর দূর করে বড়া থেকে দূর করে দিলে। বামনী কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চললেন। ছেলে মেয়েরা পথ চেয়ে বসে আছে, তিনি খুদ কুঁড়ো গুলো নিয়ে গেলে তবে তাদের খাওয়া হবে। তারা যখন এসে বলবে মা খেতে দাও তখন তিনি তাদের কি বলবেন? তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, "আজ পথে যেতে যেতে 'তিনি যা' দেখবেন, তাই নিয়ে গিয়ে ছেলে মেয়েদের বেঁধে খাওয়াবেন।" বামনী এই ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলেছেন, বড়ীর সামনে গিয়ে দেখেন এক অজগর সাপ বড়ীর সামনে মরে পড়ে আছে। সাপটাকে দেখতে পেয়ে বামনী ভাবলেন ভালই হয়েছে। আর যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না। এইটাকে নিয়ে গিয়ে কুচি কুচি করে কেটে সিদ্ধ করে সকলে মিলে খাওয়া যাক। তা হ'লে সকলে মিলে মরে নিশ্চিন্ত হ'ব। কিন্তু ভগবান যাকে রাখেন তাকে মারে কে। এখন হয়েছে কি, বামনীর দুঃখ দেখে লক্ষ্মীদেবী মরা সাপ হয়ে প'ড়ে ছিলেন। বামনী তো সেই মরা সাপটাকে নিয়ে বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। ছেলে মেয়েরা মা, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও, খেতে দাও, বলে চীৎকার কর্ত্তে লাগলো। বামনী কাউকে কিছু না বলে সেই সাপটাকে কুচি কুচি করে



তাল তাল সোনা জলের উপর ভেসে উঠতে লাগলো।

কেটে সিদ্ধ কর্ত্তে চড়িয়ে দিলেন। তারপর যেমন হাঁড়ীতে জ্বাল দিয়েছেন তেমনি তাল তাল সোণা জলের উপর ভেসে উঠতে লাগলো। বামনী তো একেবারে অবাক তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপাতেই এমনটা হচ্ছে তিনি তাড়াতাড়ি এক তাল সোণা তাঁর বড় ছেলেটীকে দিয়ে সেকরা বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন সেঁকরা সোণার বদলে এক থলে টাকা দিলে তখন আর আনন্দ দেখে কে ? সেই টাকা দিয়ে তখনই খাবারের মত ভাল ভাল জিনিষ সে কিনে আনলে বামনী ভক্তিভরে নানা আয়োজন করে তখনই লক্ষ্মীদেবীর পূজা কল্লেন তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ঘুচে গেল লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁর বাড়ী হ'লো, বাগান হ'লো, চাকর হ'লো, চাকরাণী হ'লো মানুষ যা যা চায় সবই হ'লো—তাঁর আর কোন দুঃখই রইলো না

বামনী বার ব্রত করেন, ছেলেরা বিষয় সম্পত্তি দেখে এই ভাবে মহা সুখে বামনীর বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো। সৎপাত্র দেখে বামনী মেয়ের বিয়ে দিলেন, ছেলেদেরও এক একটী করে সুন্দর বৌ ঘরে আনলেন, তাদের গাভরা গয়না দিলেন। ছেলে বৌ নিয়ে বামনী মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন

এদিকে বামনীর ভাজ যখন শুনলে যে তার ঠাকুরঝির ঐশ্বর্য্য ধরছে না, বাড়ী হয়েছে, বাগান হয়েছে, দাস দাসীর অভাব নেই তখন সে তাঁদের সকলকে একদিন তাঁর বাড়ীতে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালে বামনী তাঁর বৌদের সোণায় অঙ্গ মুড়ে ভাজের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন তখন বামনীর অনেক টাকা ; কাজেই ভাজের আর যত্নের অভাব হ'লো না। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন বেঁধে বামনীর বৌদের খেতে দিলেন বামনীর বৌরা এসে খেতে বসলো কিন্তু তারা খাবার জিনিষে হাত না দিয়ে কেবলই বলতে লাগল ;

"সোণা দানার কদর ভারি
নিমন্ত্রণ জন্যে তারি ॥
তারাই থাক্ পিঠে ভাত।
আমরা থাকি গুটিয়ে হাত "

বামনীর ভাজ অনেক করে তাদের খেতে বললে ; কিন্তু তারা শুধুই কেবল বলতে লাগলো সোণা দানার কদর ভারি —— বামনীর ভাজ শেষে বামনীকে গিয়ে বললে, "হ্যাঁ ঠাকুরঝি, তোমার বৌরা খাচ্ছে না কেন ? ওরা ও কি বলছে ?"

ভাজের কথা শুনে বামনী বল্লেন, "বৌ, তুমি তো আর ওদের নিমন্ত্রণ করোনি, নিমন্ত্রণ করেছ আমার সোণা দানাকে সেই কথাই ওরা বলছে যখন আমার ছেলে মেয়ে

না খেয়ে মরে তখন তুমি দুটো লাউয়ের পাতাও দাও নি। লক্ষ্মীবার বলে উকুন বাছতে পারিনি বলে খুদ কুঁড়ো গুলো পর্য্যন্ত খাবলা মেরে কেড়ে নিয়ে ছিলে। সে কথা কি বৌ এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?”

বামনীর কথায় তার ভাজের বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না, সে একেবারে লজ্জায় মরমে মরে গেল। ঠাকুরঝির হাত ধরে তার জন্যে অনেক মাপ চাইলে। এতদিন পরে আবার ননদ ভাজে মিলন হ'লো—ভাই আপনার হ'লো। সুখ শান্তির আর কোন অভাবই রইল না।

বামনী বছর বছর পৌষমাসে লক্ষ্মীপুজো করে বুড়ি হ'লেন তারপর একদিন তিনি নাতি নাতনি বৌদের রেখে চলে গেলেন। মরবার সময় তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের বলে গেলেন তারাও যেন পৌষ মাসে তাঁরই মতন করে লক্ষ্মী পুজো করে, তাহলে তাদের আর কখন কোন দিন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। সেই থেকে পৃথিবীতে পৌষ মাসে লক্ষ্মীপুজো প্রচার হ'য়ে পড়লো। সেই থেকে আজও পৌষ মাসে লক্ষ্মীপুজো চলে আসছে।

পৌষ মাসে লক্ষ্মী পুজো যেবা নারী করে
কমলা অচলা হয়ে থাকে তার ঘরে
বামনী পেলে ধন দৌলত বড়ো বালাখান
পৌষ মাসে লক্ষ্মী দেবীর করে' আরাধন

সরল বাঙ্গালা-সাহিত্য

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য—

বৌদ্ধধর্ম্মটা এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ার কিছু পূর্ব্বে ইহার আকারটা বড়ই অদ্ভুত রকমের হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেব ধর্ম্মঠাকুর নামে ছোটলোকের মধ্যে পুজা পাইতেছিলেন। এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজার গানও একসময়ে বাঙ্গলা দেশে খুব আদর পাইয়াছিল। “ধর্ম্ম-মঙ্গল” কাব্যের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, লাউসেন। ইনি মেদেনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনের পুত্র ছিলেন। লাউসেনের মায়ের নাম ছিল রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতী, গৌড়ের রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের শ্যালিকা ছিলেন।

ধর্ম্মপালের শ্যালক ছিলেন মহামদ—লোকে ইঁহাকে মাহুদ্যা বলিয়া ডাকিত। মহামদ গৌড়ের রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ধর্ম্মপালের গোয়ালা জাতীয় এক প্রজা ইছাই ঘোষ খুব প্রবল হইয়া বিদ্রোহী হয়;

ইছাই ঘোষ ঢেকুর নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। ধর্ম্মপাল অনেক বার তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু ইছাই ঘোষ তাঁহাদিগকে বারংবার যুদ্ধে হটাইয়া দেয়। ইছাই ঘোষ "শ্যামরূপা" নামক এক কালীমূর্ত্তির পূজা করিত এই দেবীর বরে কেহ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিত না। তাহার রাজধানী "ঢেকুরের" নাম হইয়াছিল "অজয় ঢেকুর" অর্থাৎ কোন শত্রুই ঢেকুরকে জয় করিতে পারিত না।

ইছাই ঘোষের বাপ সোমাই ঘোষ গৌড়ের রাজা ধর্ম্ম পালের সাধারণ একজন চাকর ছিল, সুতরাং তাহার এই ব্যবহারে রাজা ভারি চটিয়া যান ধর্ম্মপাল ছিলেন "রাজ-চক্রবর্ত্তী" অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের অপরাপর রাজারা ছিলেন তাঁর অধীনস্থ রাজা। মেদিনী-পুরের ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেনও সেইরূপ তাঁহার একজন অধীন রাজা ছিলেন এইরূপ অধীন রাজাদিগকে "সামন্ত রাজা" বলা হইত।

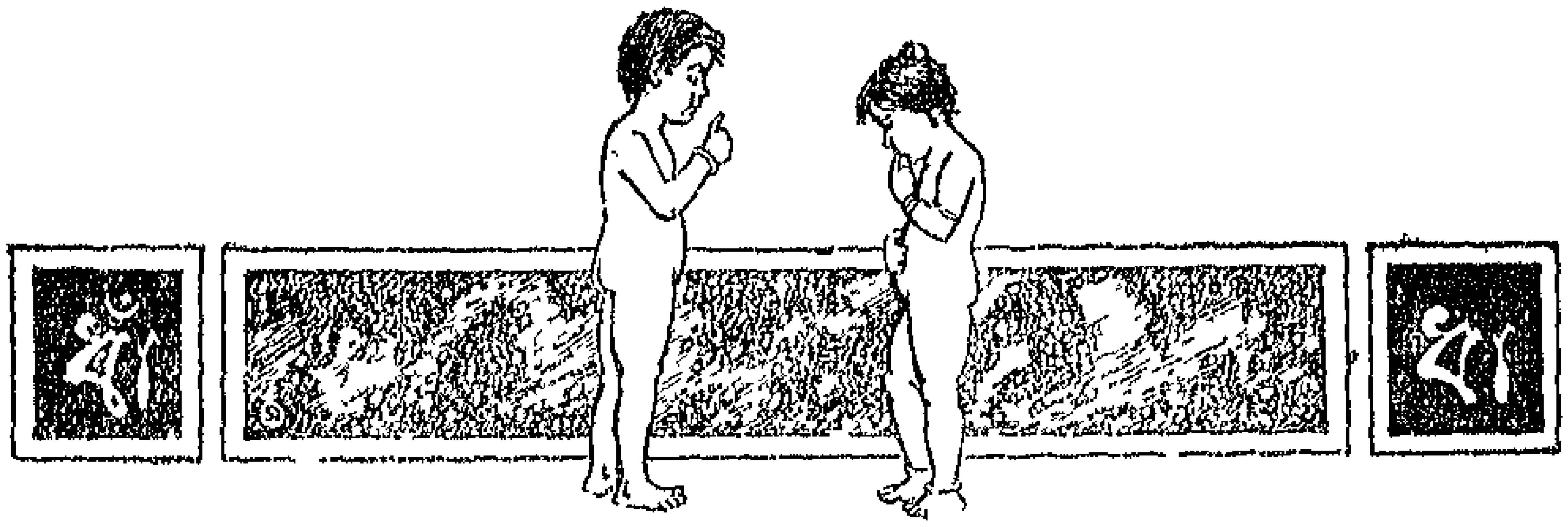
ধর্ম্মপালের আদেশে বৃদ্ধ কর্ণসেন তাঁহার সাত পুত্র লইয়া ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে সাত পুত্র মরিয়া যায় এবং কর্ণসেন যুদ্ধে হারিয়া আইসেন। কর্ণসেনের রাণী পুত্রগণের মৃত্যুতে শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন। কর্ণসেনের বয়স তখন প্রায় ৮০ বৎসর এই বয়সে এইরূপ শোক পাইয়া কর্ণসেন সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সন্ন্যাস লইয়া বনে যাইবার পূর্ব্বে রাজা ধর্ম্মপালের নিকট বিদায় লওয়ার ইচ্ছায় একবার গৌড়ে যান। ধর্ম্মপাল দেখিলেন, তাঁহারই জন্য এই সামন্ত রাজা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফকিরী লইতেছেন, তাঁহার চিত্ত কর্ণসেনের দুঃখে গলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শ্যালিকা পরমা সুন্দরী ষোলবর্ষ বয়স্কা রঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া বৃদ্ধরাজাকে আবার সংসার ধর্ম্মে মতি লওয়াইলেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রধান মন্ত্রী মহামদ রঞ্জাবতী ও গৌড়ের রাণীর সহোদর ভাই ছিলেন। ছোট বোনটিকে যখন রাজা, ৮০ বৎসরের বরের হাতে দিলেন, তখন মন্ত্রী গৌড়ে ছিলেন না তিনি বাড়ী আসিয়া এই কাণ্ডটা দেখিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং রঞ্জাবতীকে এই বুড় স্বামীর ঘর করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু রঞ্জাবতী বড় ভাইএর কথা তুচ্ছ করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন মহামদ এই ব্যবহারে রঞ্জাবতীর উপরও অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ময়নাগড়ে আসিয়া রঞ্জাবতী বহু তপস্যা করিয়া ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা করিতে লাগিলেন, এমন কি তিনি শালে চড়িয়া নিজকে ধর্ম্ম ঠাকুরের নিকট বলি দিয়া শেষে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পরিয়াছিলেন।

এই সকল তপস্যার ফলে তিনি এক পুত্র লাভ করিলেন, পুত্রের নাম হইল লাউসেন।

তোমরা যদি পুনরায় বঙ্গদেশ খুঁজিয়া দেখ, তবে কলিযুগের প্রসিদ্ধ রাজাদের মধ্যে ইঁহাদেরও নাম পাইবে।

ধর্ম্মপাল রাজার প্রধান মন্ত্রী মহামদ লাউসেনের মামা ছিলেন, এবং তিনি লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতীর উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহামদ মন্ত্রী গৌড়ের রাজাকে কুট বুদ্ধি দিয়া লাউসেনকে সর্ব্বদা বিপজ্জনক যুদ্ধে পাঠাইয়া দিতেন। মামার ইচ্ছা ছিল যাহাতে ভাগিনেয় লড়াই করিতে যাইয়া মারা যায় যেহেতু তাহা হইলে রঞ্জাবতী খুব জব্দ হইবেন। লাউসেন ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। তাঁহার মেসো মহাশয় ছিলেন গৌড়ের রাজা, এদিকে তিনি ছিলেন মেসোর অধীনে সামন্ত রাজা, সুতরাং যেখানে তিনি লাউসেনকে যাইতে বলিতেন তাঁহাকে সেইখানেই যাইতে হইত। লাউসেনকে ইছাই ঘোষকে দমন করিতে ঢেকুরে যাইতে হুকুম দিলেন। লাউসেনের সেনাপতি ছিল কালুডোম, কালুডোম একটি মহাবীর ছিলেন। ইঁহার সাহায্যে লাউসেন ইছাই ঘোষের সঙ্গে লড়াই করিতে লাগিলেন। ইছাই কালুডোমের মাথা কাটিয়া ফেলিল। ধর্ম্ম ঠাকুরের বরে লাউসেন তার কাটামুণ্ড জোড়া দিয়া বাঁচাইয়া দিলেন এবং শেষে ইছাই ঘোষকে বধ করিলেন। মাহুদ্যা মন্ত্রী আরও অনেক যুদ্ধে লাউসেনকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম ঠাকুরের বরে সর্ব্বত্রে লাউসেন জয়লাভ করিলেন। অবশেষে মাহুদ্যা রাজাকে একদিন বলিলেন, লাউসেন এত বড় বীর যে সে ইচ্ছা করিলে সূর্য্যকে পশ্চিমে উদয় করাইতে পারে। গৌড়ের রাজা লাউসেনকে পশ্চিম হইতে সূর্য্যোদয় দেখাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। একদিকে দুরন্ত মামা, অপরদিকে বুদ্ধিহীন মেসো—ইঁহাদের চক্রান্তে পড়িয়া লাউসেন কত না বিপদে পড়িয়াছেন। ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া লাউসেন সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে উদয় করাইলেন। এই সকল বিষয় ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লিখিত আছে। এই কাব্যের আদি লেখক ময়ূর ভট্ট ইং ১২০০ সনের কাছাকাছি কোন সময়ে একখানি ধর্ম্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন, তারপর রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ১৭১৩ ইং সনে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের সময় তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল পালা রচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ছাপা হইয়াছে, আর গুলি এখনও ছাপা হয় নাই। ক্রমশঃ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।



নূতন ধাঁধা

(১) সাগরেতে জন্ম মোর নগরেতে বাসা
মা ছুঁলে ছেলে মরে, একি দুর্দ্দশা শ্রীমতী মায়াদেবী- বিজনর।

(২) একজন ভদ্রলোক একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, -"তোমার নাম কি?" "তোমার বাড়ী কোথায়" এবং "তোমার কি হয়েছে?" ছেলেটি দুই অক্ষরের একটি কথা দ্বারা ভদ্রলোকটির কথার উত্তর দিলেন। আমার দেশের পাঠক পাঠিকা, বলত সে কথাটি কি? শ্রীসুধাংশু শেখর গুপ্ত ঢাকা।

(৩) শীতকালের সুখাদ্যের একটি নাম সহ ... কালার জন্য বুঝায়, এবং কথাটা উল্টাইয়া ফেলিলে এমন একটা পাখী বুঝায় যাহার স্বর শুনিলে প্রাণ মন মাতিয়া উঠে?

(৪) তুমি আমি সবাই যা—সেই কথাটা তোমার মুখেই আমি শুনিতে চাই অবশ্য কথাটা দু' অক্ষরের হইবে এবং সেটিকে উল্টাইয়া ফেলিলে একটা ভয়ানক জিনিষ হইবে লোকজনের মৃত্যুর কারণ হইবে কথাটি কি? কুমারী মায়াময়ী মজুমদার—কলিকাতা

কার্ত্তিক মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১) শিশির। (২) ফুটবল

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ দুইটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন।

পরিমলা ও বীণাপাণি দেবী, বর্দ্ধমান, অমর কুমার ঘোষ, মকলিয়া, নন্দকুমার বৈশ্য, তিলক, জীবন চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম, কামাখ্যা চরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা, জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, হাওড়া; নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, ঢাকা; কুমারী নীলিমা ভাদুড়ী হবদই, সীতা দেবী, বিষ্ণুপুর; অম্বুনাথ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; অমূল্য রত্ন দাসগুপ্ত, মদারীপুর; সৌরীন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত, রাণাঘাট, জহরলাল মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, করুণাময় দে, শ্রীহট্ট, সুবলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দিনাজপুর; নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণ গাঁ; কুমারী হিমাংশু বালা দে, নীবাট; বিনয়েন্দ্র নাথ সিংহ, ভাগলপুর, শম্ভু চরণ সেনগুপ্ত, পাটনা, কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা ভবেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা; জিতেন্দ্রনাথ সরকার, পাইকপাড়া; ললিত মোহন মণ্ডল, ব্রজেন্দ্র নারায়ণ নন্দী, বালীগঞ্জ, কলিকাতা; ইন্দিরা দত্ত, ঢাকা সূর্য্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ১টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন।

দেবীচরণ সেন গুপ্ত, পাটনা পরিমল বালা বসু, পাটনা; সুধীর বসু কাশীপুর; বিনয়েন্দ্র নাথ দাস, পাবনা; বিমলেন্দু মোহন গোস্বামী, রাঁচি, অমিয় সিন্ধু রায়, পাটনা, এন, মৈত্র, শশাবাস।

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর।

(১) কচুরি। (২) "আমার দেশ"। (৩) বাড়ুক। (৪) ফুল (Fool)

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের ৪টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন

কুমারী নীলিমা সুন্দরী রায়, মধুপুর ; মন্টু বাবু, পুরুলিয়া ; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা ; প্রফুল্ল শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, কামাখ্যানাথ বসু, কুমারখালি, জিতেন্দ্র নাথ সরকার, পাইকপাড়া, সভ্যগণ, শিবনাথ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ, নগেন্দ্র নারায়ণ নন্দী, নালিগঞ্জ ; হবিবর রহমান মোল্লা, আলমডাঙ্গা, শম্ভুচরণ সেন গুপ্ত, পাটনা, সুধীন্দ্র মোহন সেন, কলিকাতা, কুমারী ইন্দিরা দত্ত, ঢাকা ; বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ভাগলপুর, বিমলেন্দু মোহন গোস্বামী, রাঁচি, ললিত মোহন মণ্ডল, নারি-গঞ্জ ; জীবন চক্রবর্ত্তী, চট্টগ্রাম, বিজলী মোহন ও জ্যোতিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ; অনিল চন্দ্র সেন, সাতক্ষীরা ; ভবতোষ ও কুমারী মেনকা রাণী তরফদার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, করুণাময় দে, শ্রীহট্ট ; জহরলাল মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, অরুণ কুমার মিত্র, যশোহর, নরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্, এ, তাহের, দিনাজপুর ; কুমারী প্রমীলা বালা রায়, পুরী ; গোপালপুর সাধারণ পুস্তকালয়ের সভ্যগণ, মহিষাদল ; সত্যেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, পাটনা, নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, দিনাজপুর, জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ, হাওড়া ; হেমেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীহট্ট, বীণাপাণি বিশ্বাস, নবকুমার বৈদ্য, তমলুক ; অমল কুমার ঘোষ, কলিকাতা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের ৩টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন।

ক্ষীরোদ কুমার চৌধুরী, কলিকাতা ; অমিয় রঞ্জন রায় চৌধুরী, কলিকাতা ; অমিয় সিন্ধু রায়, পাটনা ; কুমারী হিমাংশু বালা দে, মীরাট, আশামুকুল দত্ত, করিমগঞ্জ, কুমারী কনক লতা দাসগুপ্ত, শিলং ; বিনয়েন্দ্র নাথ দাস, পাবনা, গৌরচন্দ্র কুমার দত্তগুপ্ত, লালঘাট, অমূল্য রতন দাসগুপ্ত, খাদারী পুর ; নবীন চন্দ্র মজুমদার, দক্ষিণ কাঁথি, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ, সীতা দেবী, বিষ্ণুপুর, বিভূতি ভূষণ মিত্র, বর্দ্ধমান ; কুমারী শান্তি ভাদুড়ী, হলদিবাড়ী, সুধাংশু শেখর গুপ্ত, ঢাকা, নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, ঢাকা ; মায়া দেবী, বিডনষ্ট্রীট, সত্যগোপাল দত্ত, কৃষ্ণনগর ; কামাখ্যা চরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা, অর্দ্ধেন্দু কুমার মিত্র, ফরিদপুর ; জিতেন্দ্র কুমার মিত্র ও সুধীন্দ্রলাল বিশ্বাস, কুমিল্লা, পরিবালা দেবী ও বীণাপাণি দেবী, বর্দ্ধমান, সুধীর বসু, কাশীপুর, পুষ্পরঞ্জন রাম বসু, পাটনা ; ভরতচন্দ্র রায়, পাড়াবাড়ী, দেবীচরণ সেনগুপ্ত, পাটনা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের ২টি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন

নির্ম্মল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা, সুশীলচন্দ্র ব্রহ্মচারী, কলিকাতা ; প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায়, বরিশাল ; নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মণ গাঁ ; বিজয় কুমার লাহিড়ী, গৌহাটী, নির্ম্মল চন্দ্র নিয়োগী, কলিকাতা ; নৃপেন্দ্র নাথ দত্ত, ডুগডুগা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের একটি ধাঁধার উত্তর দিয়াছেন।

সুবিমল ও পরিমল চন্দ্র, শিলং ;

প্রকাশক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ।
শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
বিদ্যোদয় প্রেস, ৮।২ কাশী ঘোষ লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুতোষ সিরিজের তৃতীয় বই—অগ্রহায়ণ সংখ্যা

কানুর কীর্ত্তি

একটি সুন্দর গল্প—গয়লাদের ছেলে কানু কি করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিল।

শিশুতোষ সিরিজের চতুর্থ বই—পৌষ সংখ্যা

আর্য্য ও অনার্য্য

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ। এই বইখানি পড়িয়া ছেলে মেয়েরা আর্য্য ও অনার্য্যদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিবে যাহা শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া কোন দিনই তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সেই পুরানো দেশের কথা আবার তাহাদের স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিবে। বেদের দেব দেবী, সেকালের পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি বেদের অনেক গল্প আছে।

শিশুতোষ সিরিজের পঞ্চম বই—মাঘ সংখ্যা

আজগুবি উপকথা

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কতকগুলি প্রচলিত রূপকথা। রূপকথার রাজত্বে কিরূপ সুখ ছিল—সেকালে কাপড়ের গাছে কাপড় হইত; ভাতের গাছে ভাত হইত—লোকের আর কোন কষ্ট ছিল না। এখন ত আর সে সুখের দিন নাই—তাই বুড়ো বুড়ীরা আজও সেই সব দিনের কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। গল্পগুলি ঠানদিদির মুখে যেমন শুনা যায় তেমনি লেখা হইয়াছে—মধ্যে কোন ভেজাল নাই। তাই ঠানদিদির মুখের সব মিষ্টিটুকু এতে আছে।

শিশুতোষ সিরিজের ষষ্ঠ বই—ফাল্গুন সংখ্যা

ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণু পুরাণের কয়েকটি গল্প ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। গল্পগুলি যেমন মুখরোচক তেমন নীতিপূর্ণ।

শিশুতোষ সিরিজের সপ্তম বই—চৈত্র সংখ্যা

গল্প রামকৃষ্ণ

প্রভু রাম-কৃষ্ণ বেদ, পুরাণ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন। গল্পগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী, সাত আট বৎসরের ছেলেরা পড়িয়া ভারি খুসি হইবে। তাই গল্পগুলি শিশুতোষ সিরিজের পাঠকদের নিকট উপহার দিতেছি। আজকাল ত দেশ হইতে ধর্ম্মশিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াও শক্ত, কারণ, শিশুরা ধর্ম্ম-উপদেশ বড় শুনিতে চায় না। রাম-কৃষ্ণের গল্প শিশুদিগকে উপহার দিতেছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হইলেও শিশুরা আহার নিদ্রা ফেলিয়া এ গল্প শুনিবে।

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত

হিতোপদেশ।

ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

হিতোপদেশের গল্প—পদ্যে পয়ার ছন্দে লেখা।

এত সুন্দর লেখা যে, ছেলেরা একেবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিবে।

আগ গোড়া আর্ট পেপারে ছাপা।

বড় বড় ছবি—বইখানির ভিতর বাহির সমান।

ছেলেমেয়েদের উপহারোপযোগী একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

১৯০

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"বঙ্গের সমস্ত শিশুমণ্ডলী এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমোদিত ও উপকৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ;—যেহেতু এই হিতকথা বিশ্বের সর্ব্বত্র শিশুমণ্ডলীর নিকট শত শত বর্ষ আদর পাইয়া আসিতেছে। ইহা পুরাতন হইলেও চির নূতন, ইহাতে, কৌতুক-যমুনার কলহাস্যের সঙ্গে নীতি-গঙ্গার পবিত্রতা মিশিয়াছে।"

মূল্য সত্ত্বাতিরিক্ত কম—৸৵০ মাত্র।

[illegible]

মার্কেট, কলিকাতা

কলিকাতা।